তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

অষ্টম খন্ড

তাফসীরে মাযহারী

অষ্টম খণ্ড

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পারা

(সূরা হাজ্জ্ থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা নাজিমুদ্দীন
পুনর্লিখন ও সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা-১২০৩।
ফোন ঃ ৭১১১০১২, ৭১১৯৪৯০

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৩, শাওয়াল, ১৪২৩ হিজরী

বিনিময় ঃ তিন শত টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI- (8th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Nazimuddin and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Three Hundred only. US$ 20.00

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুছে যাচ্ছে মানুষ— মানুষের আকৃতি, স্মৃতি ও নির্মিতি। পৃথিবীর প্রতিটি বসবাসে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে শোক ও সংহার। সংক্ষুব্ধ সময়ের শরীরে কেবল স্মৃতিবিস্মৃতির পালাবদলের দাগ। কেউ আসছে। কেউ যাচ্ছে। শুধুই সম্মুখযাত্রা। মহাজীবনের দিকে। মহাসিদ্ধান্তের আশা-নিরাশায়। ভয়-ভরসায়। সফলতা-বিফলতায়।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পুনরাবৃত্তি কতোক্ষণ চলবে আমরা জানিনা। জানিনা কখন কোথায় কীভাবে পাবো দিবস-বিভাবরী, আনন্দের। রোদনের। বিশ্বাসের। বেদনার। বিস্ময়ের। প্রশ্নের। জবাবের। প্রজ্ঞা ও প্রেমের এ অবাক পরিব্রাজনা যে অনন্ত।

ভাঙছে। ভেঙে ভেঙে পড়ছে বিশ্বাসের বৈশ্বিক দেয়াল। বিশ্বাসীরা বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত পৃথিবীপূজকদের ঔদাসীন্য ও ঔন্নাসিক্যের আঘাতে। চতুর্দিকে চিৎকার নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ চিন্তার, কথার, সমাবেশের। তবুও সতত সচল, অবিচল মহাসত্যের মহাগ্রন্থ আলকোরআন। হে মানুষ! হে সংকীর্ণতা ও আত্মসংহার-পরায়ণতাক্রান্ত মহামানবতা! দাঁড়াও। পরিহার করো পতনের পথ। ফিরে এসো।

আশ্রয় করো আত্মবিশ্বাসকে। পরিতৃপ্ত হও স্বগৃহের সম্ভারে। অনিঃশেষ আত্মার, সত্তার আওয়াজ দ্যাখো কতো প্রেমময়। বাঙময়। পিপাসিত পথিক! উৎখাত করো উদভ্রান্তিকে, অবিমৃশ্যকারিতাকে। তওবার তটদেশে এসে দাঁড়াও। দ্যাখো তোমার জন্যই তৈরী হয়ে রয়েছে তৃষিত তরণী। সম্মুখে দ্যাখো প্রেমসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। জ্ঞানতরঙ্গের ফেনিল সলিল। আত্মায় উচ্চারণ করো, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! তোমাকে বিস্মৃত হওয়ার কারণে আমি আজ আত্মঅত্যাচারী। কিন্তু দ্যাখো, আমি তো ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি এক আকাশ আশা নিয়ে। আমাকে দান করো তোমার একান্ত দয়া ও ক্ষমা। পাপে পোড়া এ আত্মায় জ্বালিয়ে দাও অনুতাপ ও ব্রীড়ানল। নয়নের নিলয়কে করো অশ্রুর সরোবর, সাগর। তোমার দেয়া রোদনের রহস্যময় পথেই চাই তোমার আশ্রয়, প্রশ্রয় ও পরিচয়। তুমি, কেবল তুমিই যে আমাদের, সকল প্রত্যাবর্তনকামীদের মার্জনাপ্রদাতা, বিধাতা, পরিত্রাতা।

আমাদের কর্ণকে করো সচকিত তোমার প্রত্যাদিষ্ট বাণীবৈভবের উচ্চারণে। মর্মকে করো মুগ্ধ ও মগ্ন, মস্তিষ্ককে করো তীক্ষ্ণ, তীর্ণ ও প্রজ্ঞাপরিকীর্ণ। করো পরাজিত সকল দেশের সকল ভাষার দর্পিত ও দ্রোহী কথাশিল্পী ও কবিকে। অবিশ্বাসীকে। বিকৃত বিশ্বাসীকে। আর আমাদের প্রতীতি ও প্রচেষ্টা জুড়ে জাগাও জয় ও জাগরণ। দহন ও রণন। ভালোবাসার। বিশ্বমানবতার।

মুছে যাচ্ছে অতীত। ম্লান হয়ে যাচ্ছে সুসময়, দুঃসময়। শস্যের সম্ভাবনা। সাফল্যের ভাবনা। তাই হে স্থবির, বধির ও অধীর মানবাত্মা! উৎকর্ণ হও। এসো অক্ষয়তার পথে। এসো আমাদের সকলের একান্ত ও একমাত্র সুহৃদ মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতার দিকে। এসো অবাক হয়ে শুনি, তিনি কী বললেন, ব্যক্ত করলেন। কোন রীতিকে করলেন সিদ্ধ, কোন নির্দেশনাকে করলেন অত্যাবশ্যক। আর নিষিদ্ধই বা করলেন কোন সংস্কার, প্রথাচার। আমাদের গন্তব্যকে নির্ভুল ও নিষ্পলক করতে গেলে কেবল তাঁর আরাধনা ও নির্দেশনার বিকল্প আর যে কিছুই নেই।

আর এ মহান আয়োজন সতত প্রস্তুত। সুতরাং আমাদের চেতনা, বেদনা ও সম্ভাবনাকে এসো সংহত ও সংযত করি। এসে দাঁড়াই চিরায়ত জ্ঞানের অপরিমেয় আলোয়। এ আলো যে আমাদেরই সত্তাসন্নিহিত। মহাগ্রন্থ আল কোরআন যে এই অন্তহীন অভিসারের দিকেই ডেকে চলেছে বার বার।

তবে মনে রাখতে হবে, যথাযথ ও অনুমোদিত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়ণ ছাড়া এ গ্রন্থের জ্ঞানাহরণ অসম্ভব। তাই যাঁর উপরে এ গ্রন্থ নেমে এসেছিলো প্রত্যাদেশরূপে সেই শেষতম, শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কোরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা

রেখে গিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসে, আচরণে, কথায় ও নীরবতায়। তারপর তা প্রবহমান হয়েছে দৃঢ়বদ্ধ সূত্রপরম্পরায়। সেই শুদ্ধ সূত্রপরম্পরাভূত মুখপাত্রগণই হচ্ছেন পরবর্তী সময়ের সম্মানিত তাফসীরকার। তাঁদের সেই অর্জন তাঁরা বিধৃত করেছেন তাঁদের সমকালে গ্রন্থাকারে, লেখনীতে, লিপিকায়। সেই তাফসীরসম্ভারের অন্তর্ভূত এক অনন্য, অবিস্মরণীয় ও অমলিন আয়োজনের নাম তাফসীরে মাযহারী। আর এর শ্রদ্ধার্হ রচয়িতার নাম কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী আল ওসমানী আল হানাফী আল মোজাদ্দেদি।

এ পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হন ১১৪৩ হিজরী সনে। আর ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজানে ঘটে তাঁর তিরোভাব। জন্মভূমি পানিপথই ছিলো তাঁর দীর্ঘ বিরাশি বছরের জীবনের কর্মমুখরতার কেন্দ্র। অতি শৈশব থেকেই তাঁর সহজাত সংবেদনশীলতা ও প্রতিভাকে ক্রমাগত শানিত করে তুলেছিলেন তিনি। মাত্র সাত বছর বয়সে স্মৃতিস্থ করেছিলেন কোরআন মজীদ। তারপর অভিনিবেশী হয়েছিলেন জবানী এলেমের প্রতি। হাদিস শাস্ত্র তিনি প্রধানতঃ শিক্ষা করেছিলেন সে সময়ের স্বনামধন্য হাদিসবেত্তা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীর নিকট থেকে। তিনি বলতেন, ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশতারাও সম্মান করে তাঁকে 'এ যুগের বায়হাকী' আখ্যা দিয়েছিলেন প্রথিতযশা আলেম শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী। আর তাঁর প্রানপ্রিয় পীর ও মোর্শেদ ও মাতামহ শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'পথের নিশান' (আলামুল হুদা)। । তিনি বলতেন, যদি আমাকে মহাবিচারের দিবসে জিজ্ঞেস করা হয় 'কী নিয়ে এসেছো', তখন আমি জবাব দিবো 'ছানাউল্লাহ্কে'।

পানিপথ শহরের মহামান্য বিচারকর্তার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো তাঁকে। এ দায়িত্ব প্রবহমান ছিলো পুরুষানুক্রমে। তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন ইবাদতপ্রিয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক পুরুষ। প্রতিদিন এক মঞ্জিল কোরআন আবৃত্তি ছিলো তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রাত্যহিকতা। নামাজও পাঠ করতেন প্রতিদিন একশত রাকাত করে। এভাবে নিরন্তর জ্ঞানানুশীলনে ও উপাসনায় এই অসাধারণ তাপসপ্রবর নিজেকে ও পারিপার্শ্বিকতাকে করেছিলেন আলোকিত ও ঋদ্ধ।

ধমনীতে ধারণ করতেন তিনি ইসলামের মহাসম্মানিত খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর রক্তের উত্তরাধিকার। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই বিরল প্রতিভূ ছিলেন ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার মাজহাবভুক্ত। আর তরিকাভুক্ত ছিলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মহান মোজাদ্দেদের। তাঁর প্রিয়তম পীর মোর্শেদের নামেই তিনি এই অমর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'তাফসীরে মাযহারী'। এর মধ্যে তাঁর এই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিটিই ফুটে উঠেছে যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানই মূল জ্ঞান। আর ওই মূল জ্ঞান আহরণের সূত্র ছিলেন তাঁর হৃদয়ের হৃদয় প্রিয়তম পীর শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ, তাঁর পীর ছিলেন শায়েখ নূর মোহাম্মদ

বদাউনি, তাঁর পীর শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী, তাঁর পীর খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী এবং তাঁর পীর হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহমাতুল্লহি আলাইহিম আজমাইন। অতএব একথা পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন থাকে না যে, হানাফী ও মোজাদ্দেদি এই দুই সমান্তরাল ও সুপরিমিতিশোভিত পক্ষে ভর করেই তিনি মহাজ্ঞানের মহাকাশে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর সৃজনশীল ও মননশীল উড়াল। তারপর নীড়ে ফিরে এসে বিতরণ করেছিলেন অপার্থিব জ্ঞানের জীবনঘন বিচ্ছুরণ।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশ। তার মধ্যে সর্ববৃহৎ উপস্থাপনা এই তাফসীরগ্রন্থটি সময়জ হয়েও সময়োত্তর। আরবী ভাষার ধ্রুপদী ধরণকে মান্য করে সুগ্রন্থিত হয়েছে এর বিশালাকৃতিবিশিষ্ট দশটি খণ্ড। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে রয়েছে আকাশের নক্ষত্রের মতো অসংখ্য আলোকমালা। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে সে আলোর সম্পাত এখনো সচল, সবল ও প্রবল করে চলেছে প্রজ্ঞা ও প্রেমের পিপাসিত পথিককুলের বৈদগ্ধ ও বিস্ময়কে। আশা করা যায় প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে বয়ে চলবে এর গতি ও অবহিতির সুতীব্র স্রোত। বয়ে চলবে জনপদ থেকে জনপদে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়। এভাবেই সতত অক্ষরান্তরণের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হবে পৃথিবী, পৃথিবীর প্রজ্ঞাপ্রেমিক মানুষ।

এতো গেলো এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের যৎকিঞ্চিত আবেগময় বিবরণ। এর সঙ্গে স্বভাবতই উন্মোচিত হতে চায় এর বঙ্গরূপ প্রদানের প্রচেষ্টায় রত অকিঞ্চনগণের প্রসঙ্গ। আমরা ভেবে পাইনা, কোন ভাষায় প্রকাশ করবো আমাদের কৃতজ্ঞতা। খানকাসম্পৃক্ত নেপথ্যচারী ফকির দরবেশ আমরা। উচ্চকিত বিনয় অথবা আড়ষ্ট কৃতজ্ঞতা কোনোকিছুই তো আল্লাহ্‌র এই অপার দয়া ও দানের উপযোগী নয়। কেবল বলি, আমরা তাঁর অভিপ্রায়ের আনুকূল্য মাত্র। তাঁর সৃজনরহস্যের উপলখণ্ড। মহাসৃজয়িতার মহাকাল নির্মাণের অনুল্লেখ্য উপকরণ। আমাদের পাপভারানত বিক্ষত বুকের বেলাভূমিতে তো কেবল সতত পরিদৃশ্যমান নেপথ্যচারিতার নির্যাস। আমাদের ঊর্ধতন পীর-মোর্শেদগণের প্রেমশৃঙ্খলাগত মৌনতার মহিমা নিয়ে কেবল স্বসমাজের ও স্বজাতির প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যই হয়তো এখন আমাদেরকে দেয়া হলো এভাবে উপস্থিতির অধিকার। আমাদের এ বিশুদ্ধচিত্ততাভিসারী প্রয়াস তাই বার বার প্রকাশিত হয়ে চলেছে শুধুই তাঁর আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে ও পরিপুষ্টতায়। তাই তাঁর উদ্দেশ্যেই আমাদের সত্তার, আত্মার ও অবয়বের নিরন্তর প্রণিপাত। হে আমাদের মার্জনাপরবশ একমাত্র প্রশ্রয়প্রদাতা! তোমার মহিমার কথা স্মরণ করে গ্রহণ করো আমাদের অপূর্ণত্ব ও অসহায়ত্বকে। তোমার প্রশংসা করি। সকল স্তব-স্তুতি, মহিমা-মহত্ত্ব তোমার। কেবলই তোমার। প্রেরণ করি সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও শান্তিবারতা তোমার প্রকৃত দাস ও একান্ত প্রেমাস্পদ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচর ও প্রিয়ভাজনগণের প্রতি, সকল আম্বিয়া ও আউলিয়ার প্রতি। বিশেষ করে পীর ও মোর্শেদ শায়েখ হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতিও। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

হে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণকারী সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্। আমাদের পরিপ্রার্থনার পরিধিকে করো অধিকতর সম্প্রসারিত। আর এই সম্প্রসারণের বলয়ভূত করো অনুবাদক প্রিয় আধ্যাত্মিক আত্মজ মাওলানা নাজিমুদ্দীনকে, যুথবদ্ধ তাফসীর কর্মীদেরকে, এই সুউচ্চ তরিকার সাধক পথিকগণকে, আর্থিক , অন্যবিধ ও বহুবিধ সহায়তা প্রদানকারী-কারিনী এবং সহৃদয় পাঠক— পাঠিকাগণকে। আমরা সকলে সর্ববিষয়ে কেবল তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে ত্রাণ করো। ক্ষমা করো। দয়া করো। আমাদের রোদন ও রহস্যকে করো অনন্ত, অফুরন্ত। চিরনিরাপদ করো আমাদেরকে তোমার অসন্তোষ ও আযাব থেকে। আমিন।

মহৎহৃদয় পাঠককুলের জ্ঞাতার্থে জানাই, তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। আর আমরা এর অক্ষরান্তর-প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি দিল্লীর নাদওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমকৃত উর্দু তরজমা থেকে। অবশ্য মূল আরবীকেও রেখেছি এর পাশাপাশি। দুর্বোধ্যতা অথবা অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে যথারীতি নিশ্চিতি আহরণ করছি অবশ্য আরবী প্রতিলিপি দেখেই। এভাবে এর বঙ্গায়ণকে প্রদান করতে চেয়েছি যথাযথ সুষমা, পরিশীলন, পরিমার্জন ও যত্নায়ন। বিদগ্ধ পাঠককুল যাতে করে অক্ষরাহত না হন, সেদিকে রাখতে চেষ্টা করেছি সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি। আর একটি জ্ঞাতব্য এইযে, বঙ্গানুবাদটি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে। এ নির্বাচন আমাদের নিজস্ব।

সবশেষে বলি, মুদ্রণজনিত অথবা অন্যবিধ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। শুভপ্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সংশোধিত হতে চেষ্টা করবো। আশা করি এই উপরোধটুকুকে নিশ্চয় মান্য করবেন আমাদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ।

প্রারম্ভে ও অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

সপ্তদশ পারা — সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১ — ৭৮

অষ্টাদশ পারা ঃ সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১ — ১১৮

সূরা নূর ঃ আয়াত ১ — ৬৪

সূরা ফুরকান : আয়াত : ১—২০

উনবিংশ পারা : সূরা ফুরকান : আয়াত ২১—৭৭

সূরা শুআরা : আয়াত : ১—২২৭

তাফসীরে মাযহারী

অষ্টম খণ্ড

সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পারা

(সূরা হাজ্জ্ থেকে সূরা শুআরা পর্যন্ত)

সূরা হাজ্জ্	ঃ আয়াত ১—৭৮
সূরা মুমিনূন	ঃ আয়াত ১—১১৮
সূরা নূর	ঃ আয়াত ১—৬৪
সূরা ফুরক্বান	ঃ আয়াত ১—৭৭
সূরা শুআরা	ঃ আয়াত ১—২২৭

সপ্তদশ পারা

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ○ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

❒ হে মানুষ! ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

❒ যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন দেখিতে পাইবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, মানুষকে দেখিবে মাতাল-সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুতঃ আল্লাহের শাস্তি কঠিন।

❒ মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

❒ শয়তান সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে; যে-কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে'। তারপর বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার'। এভাবে পাশাপাশি সন্নিবেশিত বাক্য দু'টোর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে উদাসীন ও অসচেতন মানুষ! সাবধান হও। স্মরণ করো মহাপ্রলয়ের পূর্বের অবশ্যম্ভাবী ভূপ্রকম্পনের কথা। অতিভয়ংকর সেই নিদর্শনের কথা স্মরণ করে সতর্ক হও। আশ্রয় করো তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতিকে। জীবনযাপন করো আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে। হও মুত্তাক্বী বা সাবধানী। মনে রেখো, তাক্বওয়া ব্যতিরেকে ওই ভয়াবহ গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য কারো থাকবে না।

আলকামা ও শা'বী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূপ্রকম্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে। আর তা হবে কিয়ামতেরই একটি আলামত। জালালউদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, ভূপ্রকম্পন হবে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্বে। ইবনে আরাবী এবং কুরতুবী শেষোক্ত অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে'। এ কথার অর্থ— যখন ওই ভয়ংকর ভূকম্পন শুরু হবে তখন স্তন্যদানরতা রমণী ভয়ে আতংকে ভুলে যাবে তার কোলের শিশুকে। দুগ্ধদান বন্ধ করে দিবে সাথে সাথে। আর গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের।

হাসান বলেছেন, সেদিন স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধদানরত শিশুকে পৃথক করে দিতেও ভুলে যাবে এবং গর্ভধারিণীদের ঘটবে অসম্পূর্ণ গর্ভস্খলন।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষকে দেখবে মাতালসদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি অত্যন্ত কঠিন'। এই বাক্যটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হাসান বসরী বলেছেন, শরাবাসক্ত লোকেরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যেমন অপ্রকৃতিস্থ ও উন্মাতাল হয়, ভয়াবহ ভূকম্পন দৃষ্টে তখনকার মানুষও হবে সেরকম। কারণ আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন। তাঁর আযাব দর্শনে স্বাভাবিক থাকার ক্ষমতা কারো থাকবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'তারা' (তুমি দেখবে) শব্দটি একবচনের শব্দরূপ। এর বহুবচন হচ্ছে 'তারাওনা'। কিয়ামত প্রত্যক্ষ করবে তো সকলেই। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক একবচন। সেদিন একজনের দৃষ্টিতে অন্যজন হবে মাতালসদৃশ। নিজের অবস্থা কেউ দেখবে না। কিন্তু ভয়ে আতংকে নিজেকে মনে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

যারা ভূকম্পনকে কিয়ামতের পূর্বের একটি আলামত বলে মনে করেন, তাঁরা আলোচ্য আয়াত উপস্থাপন করেন তাঁদের অভিমতের প্রমাণরূপে। বলেন, কিয়ামতের পরে স্তন্যদাত্রী, গর্ভবতী বলে কেউই থাকবে না। তখন তো প্রত্যেকে পুনরুত্থিত হবে তাদের আপন আপন কবর থেকে । সুতরাং ভূকম্পন সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে, যা প্রত্যক্ষ করবে তৎকালীন স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতীরা, ওই সময়ের মানুষেরা।

আমি বলি, পূর্বের আয়াতে 'হে মানুষ' বলে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. এর যুগের মানুষদেরকে। পরবর্তীকালের সকল মানুষও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেবল ভূকম্পনের সময়ের মানুষ 'ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে'— এই সাবধানবাণীর লক্ষ্য হতে পারে না। আর ভূকম্পন দর্শনকারীরা তো সাবধান হওয়ার সুযোগও পাবে না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানকার সাবধানবাণীটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মানুষকে এখানে সাবধান করার জন্য উপমাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে স্তন্যদাত্রী ও গর্ভবতী প্রসঙ্গ। স্তন্যদান করতে ভুলে যাওয়া , গর্ভপাত হওয়া— এরকম ঘটনা যে ঘটবেই সে কথা বলা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। ভীতি প্রদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, ভূপ্রকম্পন হবে হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারের পর, যখন সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে তাদের নিজ নিজ সমাধি থেকে। উল্লেখ্য, এরকম উপমার উল্লেখ এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ইয়াওমা ইয়াজ্আ'লুল বিলদানু শীবা' অর্থাৎ 'সেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ'। এখানে শিশুর বৃদ্ধ হওয়ার উপমা প্রয়োগ করে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কেবল। অর্থাৎ জানিয়ে দেয়া হয়েছে— দুশ্চিন্তা ও ভয়ে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ অবস্থা ঘটবে সেদিন। অতএব তোমরা এই মুহূর্তে সাবধান হয়ে যাও। এমতো তাফসীর হাদিস দ্বারাও সুসমর্থিত। যেমন— ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইমরান বলেছেন, আমরা একবার রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইয়া আইয়্যুহান্ নাসুত্তাকু থেকে আ'জাবাল্লাহি শাদীদ্' পর্যন্ত(আয়াত ১ ও ২)। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, সেদিন কোন দিন? আমরা নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই অধিক অবগত। তিনি স. বললেন, যখন পিতা আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমার বংশধরদের মধ্য হতে জাহান্নামীদেরকে পাঠিয়ে দাও'।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয় বনী মুস্তালিকের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের এক রাতে। রসুল স. যখন আয়াত দু'টো পাঠ করে শোনালেন, তখন আমরা সকলেই ক্রন্দন শুরু করলাম। এভাবে আমরা আর কখনো কাঁদিনি। ভোর হলো। কিন্তু কেউ তার ঘোড়ার জিন খুললো না। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও করলো না। সকলে যেনো শোকে পাথর। রসুল স. বললেন, তোমরা কি জানো, ওই দিবস কোন দিবস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ সেদিন বাবা আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমার বংশদ্ভূতদের মধ্যে যারা জাহান্নামী, তাদেরকে পাঠিয়ে দাও জাহান্নামে। আদম বলবেন, কতজনকে? আল্লাহ্ বলবেন, শতকরা নিরানব্বই জনকে। বাকি একজনকে পাঠিয়ে দাও জান্নাতে। একথা শুনে আমরা পুনরায় কাঁদতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর কান্নার আবেগ প্রশমিত করে বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এরপরেও কি মুক্তির আশা করা যায়? তিনি স. বললেন, তোমরা সাধুবাদ গ্রহণ করো আমার। অবলম্বন করো সরল সঠিক মধ্যম পথ। তোমাদের সাথে আছে আরো দু'টি বিশাল সৃষ্টি। তারা ইয়াজুজ ও মাজুজ। তাদের সংখ্যা হবে মানুষের চেয়ে বেশী। আর আমি অবশ্যই আশা রাখি, জান্নাতবাসীদের একতৃতীয়াংশ হবে তোমরা। আমরা আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলাম 'আল্লাহু আকবার'। তিনি স. পুনরায় বললেন, বরং তোমরা হবে অর্ধেকাংশ। পুনরায় আমরা উচ্চারণ করলাম আল্লাহু আকবার। তিনি স. এবার বললেন, জান্নাতবাসীদের মধ্যে আমার উম্মত হবে দুই তৃতীয়াংশ। জান্নাতীদের কাতার হবে একশত কুড়িটি। তন্মধ্যে আশিটি কাতার থাকবে আমার উম্মতের। আর তখন কাফেরদের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় ইমানদারদের সংখ্যা হবে নিতান্ত নগণ্য— যেনো বৃহদাকার উষ্ট্রীর শরীরের একটি ক্ষুদ্র তিলচিহ্ন। অথবা এক বর্ণের অশ্বের পায়ে অন্য বর্ণের একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন। কিংবা শাদা ও কালো কোনো গাভীর পশ্চাদাংশের একটি কৃষ্ণকায় বা শ্বেতবর্ণ পশম। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরো শোনো, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ওমর ইবনে খাত্তাব বিস্মিত হয়ে বললো, সত্তর হাজার! তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবার তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রবেশ করবে একহাজার জন করে। উককাশা ইবনে মুহসীন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুলল্লাহ্! দোয়া করুন, আমিও যেনো তাদের দলভূত হই। রসুল স. বললেন, তুমি তাদের দলভূত। এরপর জনৈক আনসারী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য এমতো প্রার্থনা করুন। তিনি স. বললেন, এ ব্যাপারে উককাশা তোমার অগ্রগামী।

যারা কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হবে বলেন, তাঁরা উপরে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন, হাদিসের বিবরণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ভূকম্পন ও জাহান্নামীদের পৃথক করার ঘটনা একই সময়ে ঘটবে। জাহান্নামীদের পৃথকীকরণও একটি ভয়ানক ঘটনা। রসুল স. এখানে ভূকম্পনের মতো ভয়াবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে ওই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। আমি বলি, তাঁদের এমতো বক্তব্য অসমর্থনীয়। কারণ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধসূত্র সম্বলিত হাদিসে বর্ণনাটি এসেছে আরো স্পষ্টরূপে। যেমন— আল্লাহ্ তখন বলবেন, আদম! তিনি বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! এই যে আমি। সকল কল্যাণের অধিকারী কেবল তুমি। আল্লাহ্ বলবেন, দোজখীদেরকে পৃথক করে ফেলো। আদম বলবেন, কতোজনকে? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে। এরপর রসুল স. বললেন, ওই সময় শিশুরা হয়ে যাবে বৃদ্ধ। গর্ভপাত ঘটবে গর্ভিণীদের। আর মানুষ হবে মাতাল সদৃশ, মদ্যপান ব্যতিরেকেই। কারণ আল্লাহ্র শাস্তি সুকঠিন। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কে থাকবে ওই হাজারে একজনের মধ্যে? তিনি স. বললেন, দোজখীদের হাজারে একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে। বাকী নয় শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ মাজুজ। যার আনুরূপ্যহীন হস্তে আমার জীবন, সেই মহাপবিত্র সত্তার শপথ! আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে তোমরা। আমরা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম 'আল্লাহু আকবার'। তিনি স. বললেন, না, এক তৃতীয়াংশ। আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের নামে পুনরায় আমরা আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করলাম। তিনি স. বললেন, অর্ধাংশ। আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার। তিনি স. এবার বললেন, দোজখীদের তুলনায় তোমরা হবে গাভীর চামড়ার একটি কালো অথবা শাদা পশম সদৃশ, অনুল্লেখ্যপ্রায়।

সারকথা বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে— শিশুর বৃদ্ধে পরিণত হওয়া, গর্ভবতীদের গর্ভপাত হওয়া, আর জাহান্নামীদের পৃথকীকরণ ঘটবে একই সময়ে। বরং ভূপ্রকম্পনের পূর্বেই কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে সকল মানুষ।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে'। একথার অর্থ— কোনো কোনো বিতর্কপ্রবণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর অবিভাজ্যতা ও আনুরূপ্যহীনতা সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দেয়। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেছ সম্পর্কে। সে ছিলো বিতণ্ডাপরায়ণ ও বাক্যবাগীশ। সে বলতো, পুনরুত্থান অসম্ভব, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা, কোরআন অতীতকালের উপাখ্যান ইত্যাদি। আবী মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেন ইবনে আবী হাতেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের'। একথার অর্থ— এবং ওই সকল বচসাপ্রবণ লোকেরা বিতর্ককালে অথবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করে অভিশপ্ত শয়তানের। এখানকার শয়তান কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে। আর এখানকার 'মারীদ্' অর্থ অকল্যাণ বা অমঙ্গলমগ্ন, বিদ্রোহী, অভিসম্পাতগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তার সম্পর্কে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে'। একথার অর্থ— শয়তান তার কর্তৃত্বাগতদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং পরিচালিত করবে দোজখাগ্নির লেলিহান শাস্তির দিকে। আল্লাহ্র বিধান এরকমই।

জুজায বলেছেন, এখানে 'আল্লাহি' কথাটির 'হি' (সে) সর্বনামটির সম্বন্ধ ঘটেছে শয়তানের সঙ্গে। আর 'তাওয়াল্লা' কথাটির অর্থ এখানে বন্ধুত্ব করেছে, ভালোবেসেছে বা অনুগত হয়েছে।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫, ৬

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى
الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ○ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى
وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ○

❒ হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর— আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে। তোমাদিগের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করিবার জন্য; আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখিয়া দিই, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও করা হয় জরাগ্রস্ত, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;

❒ ইহাই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো— আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে। একথার অর্থ— হে সন্দেহ ও অবিশ্বাসমগ্ন মানুষ! তোমাদের জন্মসূত্র, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রতি তোমরা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণসুলভ দৃষ্টি সম্পাত করো না কেনো? এরকম করলে বিষয়টির প্রকৃত রূপ বুঝতে সমর্থ হবে তোমরা। মৃত্তিকা, শুক্রকণা, রক্তপিণ্ড— এভাবে স্তরান্তরিত করা হয়েছে তোমাদেরকে।

এখানে 'খলাক্বনাকুম' অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কথাটির দ্বারা গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হওয়া অপরিণত শিশুদেরকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। 'মিন তুরাব' অর্থ মৃত্তিকা থেকে। অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে তোমাদের আদি পুরুষ আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরাসরি, আর তোমাদেরকে পরোক্ষভাবে। পানাহারকৃত খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্টি হয় বীর্যের। আর খাদ্যবস্তুতো মাটিতেই উৎপন্ন হয়। তাই পরোক্ষভাবে মাটি এবং প্রত্যক্ষভাবে শুক্রের কথা বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। 'মিন নুত্বফাতিন' অর্থ শুক্র থেকে। আর 'মিন আলাকাতিন' অর্থ রক্তপিণ্ড থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে'। এখানে 'মুদ্বগাহ্' অর্থ গোশতপিণ্ড। প্রকৃত অর্থ— কোনো বস্তুর ওই অংশ, যা চর্ব্য। 'মুখাল্লাক্বাতিন' ও 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'অর্থ যথাক্রমে পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দ দু'টোর অর্থ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট

ও অপূর্ণাবয়ববিশিষ্ট গোশতের টুকরা। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— আকৃতিবিশিষ্ট ও আকৃতিহীন। অর্থাৎ যার আকার দান করা হয়েছে এবং যার আকার এখনো দেয়া হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মাতৃউদরে পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে শিশুর জন্ম হয়, তাকে বলে 'মুখাললাক্বাতিন' আরো পূর্ণ সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ শিশুকে বলে 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। আর অপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ জন্মলাভকারী শিশুকে বলে 'মুখাল্লাক্বাতিন'। আর অপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী নবজাতককে বলা হয় 'গইরি মুখাল্লাক্বাতিন'। উল্লেখ্য, মাতৃজঠরে আকার ধারণের সময় মানবশিশুর পরিমাণ ও আকারগত পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। এভাবে তাদের কেউ হয় সুন্দর ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। আবার কেউ সেরকম হয় না। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এ ধরনের শিশুকেই এখানে 'অপূর্ণাকৃতি' বলা হয়েছে— গর্ভপাত হয়ে যাওয়া শিশুকে নয়। কারণ এমতোক্ষেত্রে পূর্ণ-অপূর্ণ কোনো আকৃতিই তার থাকে না।

আলকামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, মাতৃউদরে গোশতপিণ্ডের আকার ধারণের পর, একজন ফেরেশতা সেটিকে ধারণ করে বলে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তোমার এ সৃষ্টি কি অবধারিত? প্রশ্নের জবাব না সূচক হলে সে ওই গোশতপিণ্ডের গর্ভপাত ঘটায়। আর জবাব হ্যাঁ সূচক হলে ফেরেশতা নিবেদন করে, পুত্র, না কন্যা? হতভাগ্য, না সৌভাগ্যশালী? হায়াত, কর্ম, রিজিক কীরকম হবে ইত্যাদি। তখন তাকে বলা হবে সবকিছু লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দেখে নাও। ওই ফেরেশতা তখন লওহে মাহফুজ থেকে ওই শিশুর সকল বিবরণের অনুলিপি করে নিজের কাছে রেখে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করবার জন্য'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের অধ্যায়ান্তর ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আমি প্রকাশ করেছি আমার অপার ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার নিদর্শন, যেনো এমন নিদর্শন দেখে তোমরা একথা বুঝতে সমর্থ হও যে, পুনরুত্থান অনিবার্য। প্রথম সৃষ্টি যার দ্বারা সম্ভব, পরবর্তী সংস্করণ তো তাঁর জন্য অবশ্যই সম্ভব ও অধিকতর সহজ।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'লিনুবাইয়্যেনা লাকুম' কথাটির মর্মার্থ করেছেন এরকম— আমি তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছি তোমাদের হকিকত। নির্দেশ করেছি তোমাদের কর্তব্যাকর্তব্যকে। তোমাদেরকেই নির্ধারণ করেছি আমার নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের ক্ষেত্ররূপে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি'। একথার অর্থ— আমি মানবশিশুকে যতদিন মাতৃগর্ভে রাখতে চাই ততদিন সে সেখানে থাকে। অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভ তাকে প্রসব করে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি'। 'ছুম্মা নুখরিজুকুম' অর্থ তারপর আমি বের করি। 'তিফলান' অর্থ শিশুরূপে।

এরপর বলা হয়েছে—— 'পরে যাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও'। এখানকার 'আশুদ্দা' 'শাদীদ'এর বহুবচন। যেমন 'নি'মাত' এর বহুবচন 'আনউম'। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এভাবে তোমরা উপনীত হও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত জ্ঞানগত ও অবয়বগত পূর্ণতায় ও পরিণতিতে। আলেমগণ বলেন, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও দৈহিক পূর্ণত্ব ও পরিণতি ঘটে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে তারা যা কিছু জানতো সে সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না'। এ কথার অর্থ— ওই পরিণত বয়সে পৌঁছানোর পর আমি কারো কারো মৃত্যু ঘটাই, কাউকে উপনীত হতে দেই অধিকতর পরিণত বয়সে, আবার কাউকে নিয়ে যাই বার্ধ্যকের শেষ প্রান্তে অথর্ব অবস্থায়। তখন সে হয়ে পড়ে স্মৃতিশক্তিহীন। জানা বিষয়ও তখন আর তার স্মৃতিপটে উদিত হয় না। উল্লেখ্য, 'লি কাইলান' কথাটির 'লাম' পরিণতি প্রকাশক। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শিশুরা যেমন জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিহীন তেমনি অতিবৃদ্ধরাও। অতিবার্ধক্যজনিত বিস্মরণ তাদেরকে শিশুদের সমতুল করে দেয়।

হজরত ইকরামা বলেছেন, নিয়মিত কোরআন পাঠকারীরা এরকম বিস্মরণগ্রস্ত হন না। উল্লেখ্য অতি প্রবীণদের এ রকম বিস্মরণও পুনরুত্থানের পক্ষের একটি দলিল। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণ-বিস্মরণের এরকম আবর্তন যিনি ঘটাতে সক্ষম, তিনি সকলের পুনরুত্থান ঘটাতে অবশ্যই সক্ষম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ'। 'হামিদাতান' অর্থ শুষ্ক, মৃত। 'ইহতাজ্জাত' অর্থ আন্দোলিত হয়। 'রবাত' অর্থ উন্মোচিত, স্ফীত। মুবররাদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ নুয়ে পড়া, মৃত্তিকাভিমুখী হওয়া। এই অবস্থাকে স্ফীত হওয়া বলা যায় রূপকার্থে। প্রকৃত অর্থ এখানে রয়েছে সংগুপ্ত। 'মিনকুল্লি যাওজিন্' (প্রতি জোড়ায়) কথাটির

'মিন' এখানে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। আর 'বাহীজিন' অর্থ নয়নাভিরাম। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'বাহিজ্বাতুন' অর্থ আনন্দজনক। বাবে কারুমা হিসেবে ব্যবহৃত এখানকার শব্দরূপটি বিশেষণবাচক। আবার বাবে সামিয়া থেকে সিদ্ধ হলে এর অর্থ দাঁড়ায়— আনন্দিত হলো।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এটা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। এখানে 'জালিকা' (এটা) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়াবলীর প্রতি। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মৃত শুক্র থেকে জীবনের অস্তিত্বায়ন এবং নিঃসাড় মৃত্তিকা থেকে নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজির উদ্ভাবন ঘটান আল্লাহ্ই। কারণ তিনি মহাশক্তিধর, একমাত্র সৃজক। তিনি সত্য। মৃতকে জীবন দানকারী। সকলে ও সকল কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাগত। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ○
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ○
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ○ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ○

❒ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন।

❒ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

❒ সে বিতণ্ডা করে দম্ভভরে লোকদিগকে আল্লাহের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে, এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন যন্ত্রণা।

❒ সেদিন তাহাকে বলা হইবে 'ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ্ দাসদিগের প্রতি জুলুম করেন না'।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তাই কিয়ামত অবধারিত। তাঁর অভিপ্রায়ের অন্যথা হয় না। আর কবরবাসীদের পুনরুত্থানও অনিবার্য। বিচারানুষ্ঠান হবে পুনরুত্থানের পরে। তখন বিশ্বাসীরা হবে পুরস্কৃত এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে তিরস্কৃত। এরকম না করা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। সত্য-মিথ্যা, পুণ্য-পাপ, ভালো-মন্দ কখনো এক হতে পারে না। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'আমি কি অনুগতদেরকে পাপীদের মতো করে দিবো? এটা তোমাদের কেমন সিদ্ধান্ত!'

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব'। এখানে 'জ্ঞান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তিন ধরনের জ্ঞানকে— ১. ইলমে বদহী (সত্তাসঞ্জাত জ্ঞান) ২. ইলমে নকলী (প্রত্যাদেশিত জ্ঞান) এবং ৩. ইলমে নজরী (গবেষণালব্ধ জ্ঞান)। আর 'দীপ্তিমান কিতাব' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত কোনো আকাশী গ্রন্থকে।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'সে বিতণ্ডা করে দম্ভভরে লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্য'। এখানকার 'ইত্বফ' শব্দটির অর্থ প্রান্ত। 'ইত্বফুন' অর্থ দুই প্রান্ত— দক্ষিণ ও বাম। মুখ ফিরানোর সময় মানুষ শরীরের যে অংশকে ঘুরিয়ে নেয়, তাকে বলে 'ইত্বফ'। মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ— যখন তাকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, তখন সে অবজ্ঞা ও অহমিকাভরে পার্শ্ব পরিবর্তন করে, ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। ইবনে আতীয়া, ইবনে জায়েদ এবং জুরাইজ এরকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাবো দহন যন্ত্রণা'। এখানে 'লাঞ্ছনা' (খিজয়ুন) বলে বুঝানো হয়েছে হত্যা ও বন্দীত্বকে। বদর যুদ্ধের সময় এই লাঞ্ছনায় নিপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকেরা। নিহত হয়েছিলো নজর বিন হারেছ সহ সত্তর জন এবং আরো সত্তর জন হয়েছিলো বন্দী। জালালউদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আবু জেহেলও লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আর এখানকার 'হারীক্ব' শব্দটির অর্থ 'মুহরিক্বুন' বা দহনকারী।

এর পরের (১০) আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল, কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না'। একথার অর্থ— পরজগতে যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন

তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কৃতকর্মের পরিণামেই আজ তোমরা আস্বাদন করছো এই শাস্তি। আল্লাহ্ এ শাস্তি অযথার্থরূপে তোমাদের প্রতি আপতিত করেননি। কারণ তিনি ন্যায় বিচারক।

উল্লেখ্য, 'জুলুম করেন না' অর্থ 'ন্যায় বিচার করেন'। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লা ইউহিব্বুল্লহুল জাহ্রা' (আল্লাহ্ ভালোবাসেন না) অর্থ অপ্রিয় বা ঘৃণ্য জানেন)।

বোখারী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দূরদূরান্তরের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতো। তারপর তাদের স্ত্রীর পুত্রসন্তান ও ঘোড়ার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে বলতো, মোহাম্মদের ধর্ম উত্তম। আর এরকম কিছু না ঘটলে বলতো, তার ধর্ম উত্তম নয়। তাদের এরকম অপকথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ٟاطْمَاَنَّ
بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٟانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا
لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ
نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ○ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

❑ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহের ইবাদত করে দ্বিধার সহিত; তাহার মংগল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহলোকে ও পরলোকে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

❒ উহারা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহাদিগের কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি!

❒ উহারা ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর!

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ দৃশ্যতঃ ইমানদার হলেও প্রকৃত ইমানদার নয়। তারা মুনাফিক বা কপটচারী। তারা ইবাদত করে দ্বিধা-সন্দেহের সঙ্গে। তারা একবার থাকে ইমানদারদের সঙ্গে, আর একবার সঙ্গ নেয় কাফেরদের। পার্থিব উপকার পেলে হয় হৃষ্টচিত্ত। আর বিষণ্ন হয় বিপর্যয়ে। যুদ্ধের সময় তারা অবস্থান নেয় মুসলিম সেনাদলের পশ্চাতে। মুসলমানদের বিজয় দেখলে সোৎসাহে হয় অগ্রগামী। আবার পরাজয়ের আলামত দেখলে পশ্চাদপসরণ করে। এ ধরনের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে । তাদের এমতো ক্ষতি সুস্পষ্টও।

ইবনে আবী হাতেম সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বেদুঈন সম্পর্কে যারা মদীনায় এসে মুসলমান হতো এবং সেখানেই বসবাস শুরু করে দিতো। ওই বসবাস স্বস্তিকর হলে তারা বলতো, এই ধর্মের মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। লাভ হয়েছে পুত্র সন্তান, অশ্বশাবক। আর অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলে বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের তো উপকারই হলো না। পুত্রের বদলে পেলাম কন্যা। আবার ঘোড়াগুলোও তো কোনো শাবক প্রসব করলো না। এরকম বলে তারা ধর্ম ত্যাগ করতো। তাদের এমতো অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে'।

আতীয়ার মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মদীনার এক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর থেকে তার দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করলো। কিছুদিন পর তার এক সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বিনষ্ট হলো কিছু সম্পদও। সে তখন ধারণা করতে লাগলো ইসলাম গ্রহণের কারণেই সে হয়ে পড়েছে বিপদকবলিত। রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে সে বললো, আমার (ইসলাম গ্রহণের) অঙ্গীকার ফিরিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, ইসলাম ফিরিয়ে দেয়া যায় না। সে বললো, আমি তো এই ধর্মে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। এক ছেলেও মারা গেলো। রসুল স. বললেন, ইসলাম মানুষের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয়, যেমন আগুন দূর করে সোনা, রূপা ও লোহার ময়লা।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম বিভ্রান্তি!' একথার অর্থ— সে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার উপাসনা করা না করা সমার্থক। অর্থাৎ তার পূজা না করলেও সে যেমন কারো অপকার করতে পারে না, তেমনি পূজা করলেও করতে পারে না তার পূজকের কোনো উপকার। আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এভাবে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করা এক চরম পথভ্রষ্টতা বই অন্য কিছু নয়। এখানে 'দ্বলালুল বায়ীদ' অর্থ চরম বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা। 'দ্বলাল' অর্থ পথ ভুলে যাওয়া, পথ না পাওয়া বা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়া। যেমন বলা হয়— 'দ্বল্‌লা ফিত্‌ তীহ্‌ (সে অরণ্যে বা মরুভূমিতে পথ হারিয়েছে)।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা যার উপাসনা করে, তার উপাসনার অপকার তাদের কাল্পনিক উপকার প্রাপ্তির চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। এখানে 'নাফা' (উপকার) শব্দটির অর্থ সুপারিশের আশা। অর্থাৎ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করবে— এমতো আশা। যা পাওয়া অসম্ভব, আরববাসীরা তাকে বলে বা'দ। বলে— অমুক বস্তু দুস্প্রাপ্য, দূরবর্তী। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'জালিকা রজউ'ন বায়ীদুন্‌। (এটার প্রত্যাবর্তন দুরূহ)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— প্রতিমা পূজাজাত কল্যাণ অসম্ভব। প্রতিমা পূজার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'কতো নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কতো নিকৃষ্ট এই সহচর'। এখানে 'মাওলা' অর্থ বন্ধু, অভিভাবক। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে উপাস্য। আর 'আশীর ' অর্থ বন্ধু, সঙ্গী, সহচর অর্থাৎ প্রতিমা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইয়াদ্‌উ' (তারা ডাকে) শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতের প্রথমে উদ্ধৃত 'ইয়াদ্‌উ' (তারা ডাকে) এর তাগিদ ও পুনরুক্তি। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে পরের বাক্য শুরু হয়েছে 'লামান' (এমন কিছুকে) থেকে। কথাটি একটি সংগুপ্ত শপথের প্রতিধ্বনি এবং 'মান' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এভাবে মিলিত হয়ে কথাটি হয়েছে উদ্দেশ্য, আর বিধেয় হয়েছে 'লাবি'সাল মাওলা' (নিকৃষ্ট অভিভাবক)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'লিমান' এর 'লাম' ইয়াদ্‌উ' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি তাই হয়, তবে এখানকার 'ইয়াদ্‌উ' কথাটির অর্থ 'ডাকে' না হয়ে হবে 'ধারণা করে'।

এর পরের আয়াতে (১৪)বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্‌

যা ইচ্ছা তা-ই করেন'। একথার অর্থ— বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করা এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করাই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন অনিবার্য। এর প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোই নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝

❒ যে-কেহ মনে করে, আল্লাহ্ রসূলকে কখনই ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করিবেন না সে গৃহের ছাদে রশি ঝুলাইয়া নিজকে ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর দেখুক তাহার প্রক্রিয়া তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না।

❒ এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন; এবং স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

❒ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে, যাহারা সাবেয়ীন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যাহারা অংশীবাদী হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর রসুলকে নিশ্চয় সাহায্য করবেন— তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট কেউ যদি একথা বিশ্বাস না করে তবে সে আকাশের দিকে একটি দীর্ঘ রশি ঝুলিয়ে দিক, আর সেই রশি ধরে আকাশে উঠে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিক প্রত্যাদেশের শৃঙ্খল। তারপর দেখুক তার এমতো প্রচেষ্টা তার বিদ্বেষ ও রোষের কারণ বিদূরিত করে কি না। উল্লেখ্য, ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই নবী-রসুলগণ আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত হন। তাঁদেরকে এমতো সাহায্য থেকে বিচ্যুত করার সাধ্য কারোরই নেই। যারা এমতো প্রচেষ্টা করে, ব্যর্থতার গ্লানি ও নিষ্ফল আক্রোশ তাদের জন্য অবধারিত।

'ইয়াক্তা' অর্থ গলা টিপে ধরুক, সম্পর্ক ছিন্ন করুক। 'কৃতায়া' অর্থ সে তার গলা চেপে ধরেছে। আর 'মুখান্নাক' অর্থ ওই লোক যে তার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস গমনাগমনের পথসংযোগ কর্তন করে। মর্মার্থ— ক্ষোভে দুঃখে দাঁতে দাঁত ঘষে। শেষে আত্মাহুতি দেয় হিংসার আগুনে। তাই হিংসুক ব্যক্তিকে বলা হয়— সহ্য করতে পারো করো, না হয় মরো। এখানকার বক্তব্যভঙ্গি এরকমই। তাই এই আয়াত হচ্ছে আমরে তা'জীয্ (অজেয় আদেশ)।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'আকাশ' বলে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে। এভাবে বলা হয়েছে— যারা রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশিত সাহায্যপ্রবাহের অবসান চায় তারা যেনো কোনো রশির সাহায্যে নিকটবর্তী আকাশে উঠে যায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয় প্রত্যাদেশপ্রবাহ।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে গাত্ফান ও আসাদ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে। গোত্র দু'টো ইহুদীদের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। তারা বললো, আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমরা মনে করি আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন না। আবার এরকম করলে ইহুদীদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায় পড়বে আমাদেরই উপর। তারা আমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তখন আমাদের দাঁড়াবার কোনো জায়গা থাকবে না। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

মুজাহিদ বলেছেন, 'নসর' অর্থ রিজিক বা জীবনোপকরণ। যেমন আরববাসীরা বলে— 'মান নাসারনী নাসারাহুল্লহ্' (যে আমাকে দিবে, তাকে দিবেন আল্লাহ্)। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, 'আরদ্বি মানসুরা' অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ভূমি। অর্থাৎ বৃষ্টিসিক্ত জমিন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানকার 'ইয়ানসুরাহু' কর্মপদীয় সর্বনামটি 'মান'এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে এবং মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে এবং বলে, মুসলমান হলে আল্লাহ্ তাদেরকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন না, তারা যেনো তাদের গৃহের ছাদে রশি বেঁধে সেই রশির ফাঁসে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তারা যেনো একটি ঝুলন্ত রশির সাহায্যে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে উঠে যায় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসে তাদের রিজিক।

এখানকার 'ফাল ইয়ানজুর' অর্থ গলা টিপে ধরা, পথ অতিক্রম অথবা রশি ঝুলানোর ইচ্ছা পোষণের পর গভীরভাবে পরিস্থিতি অনুধাবন করা।

'অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা' কথাটি এখানে নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক। তাই এর প্রকৃত অর্থ হবে— হিংসুকদের হিংসা

ও ক্রোধ যেমন রসুল স. এবং বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্‌র সাহায্যচ্যুত করতে পারবে না, তেমনি তাদের কুপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রও রুখতে পারবে না আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও বিধানকে। উল্লেখ্য, হিংসুকদের ষড়যন্ত্র ও কুপ্রচেষ্টাকে এখানে বলা হয়েছে 'কাইদা'।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি; আর স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— যে ভাবে এই কোরআনে আমি আমার আনুরূপ্যবিহীন এককত্ব, কিয়ামত, প্রত্যাদেশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ঘোষণা করেছি সেভাবেই আমি এর মাধ্যমে বিধৃত করেছি কোরআন ও আমার রসুলের রেসালতের প্রমাণ।

'আয়াতিম্ বাইয়্যিনাতিন্' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত বা নিদর্শন। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদে রয়েছে দুই ধরনের আয়াত — মুহকাম ও মুতাশাবিহাত (সুস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন)। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে তাহলে 'সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে' বলে এক ধরনের আয়াতের কথা বলা হলো কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে— 'বাইয়্যিনাত' শব্দটির মৎকৃত অর্থ গ্রহণ করলে এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আর থাকে না। আমি বলি, মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ রহস্যাচ্ছন্ন, কিন্তু তা মোজেজারূপে মুহকামাত আয়াতের মতোই প্রকাশ্যে পরিদৃশ্যমান। তাই মুতাশাবিহাতও এক অর্থে সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, এভাবে এখানকার 'সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে' কথাটির মধ্যে সংকুলান ঘটেছে সুস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন উভয় প্রকার আয়াতের।

'ওয়া আন্নাল্লহা ইয়াহ্দী মাঁইয়ুরীদ' অর্থ 'আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন'। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের বাক্যের 'আনযাল্নাহু' (আমি অবতীর্ণ করেছি) কথাটির সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের আর একটি অর্থ দাঁড়াবে— আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষের সংশোধনার্থে। এ কারণেও যে, এর মাধ্যমে আমি যাকে খুশি তাকে পথপ্রদর্শন করবো, অথবা প্রতিষ্ঠিত রাখবো হেদায়েতের পথে।

এর পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ীন, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসী ও ইহুদী-সাবেয়ীন-খৃষ্টান-অগ্নিপূজক-মূর্তিপূজক ইত্যাদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। বিশ্বাসীদেরকে ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রবেশ করাবেন যথাক্রমে জান্নাতে ও জাহান্নামে।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন'। একথার অর্থ— বিশ্বাসীদের অন্তর-বাহির এবং অবিশ্বাসীদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার আদিঅন্তহীন ও আনুরূপ্যবিহীন প্রত্যক্ষগোচরতার অধীন। সুতরাং সত্য ও মিথ্যা সংমিশ্রিত হবে— এমতো আশংকার অবকাশ মাত্র নেই।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ○ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ○ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ○ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

❒ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, —সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন তাহাকে কেহ সম্মানিত করিতে পারে না, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

❒ এই দুইটি দল, ইহারা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক; তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি

❒ যাহাতে উহাদিগের চর্ম এবং উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা গলিয়া যাইবে,

❒ এবং উহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদ্গর।

❒ যখনই উহারা যন্ত্রণা-কাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে; উহাদিগকে বলা হইবে 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে— সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা জীবজন্তু এবং সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল। দেখুন, আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়স্থিত চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র-বৃক্ষ-পর্বত-প্রাণীকুল তাদের স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত হয়। মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তারাও আল্লাহ্‌কে সেজদা করে।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির জন্য। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'আকাশমণ্ডলীতে' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে আকাশের ফেরেশতাকুল, আর 'পৃথিবীতে' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী বিশ্বাসী মানুষ ও জ্বিনের কথা। অবশ্য 'মান' বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। তবে আয়াতের পরবর্তী বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'মান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে কেবল বিশ্বাসীগণের ক্ষেত্রে। কারণ পরবর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে— 'আর অধিকাংশের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি'। কথাটির দ্বারা পৃথক করা হয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে। এহেতুই 'যারা পৃথিবীবাসী' কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদেরকে।

'মান' (যা কিছু, যে কেউ) আবার কখনো কখনো বিবেকবান— বিবেকহীন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে 'যা কিছু' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র ইত্যাদিকে। বায়যাবী লিখেছেন, 'মান' বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকবিহীন উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অথবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিবেকহীন অপেক্ষা বিবেকবানকে অধিক গুরুত্ব প্রদানার্থে। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞ বলেন, কেবল বাকশক্তিহীনের ক্ষেত্রে 'মান' প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু বাকশক্তিহীন ও বাকশক্তিসম্পন্নদের যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে এমতো প্রয়োগ সিদ্ধ। সুতরাং এখানে শব্দটি যদি যৌথ উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, মানুষ-ফেরেশতা-জ্বিন এখানে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-পর্বত ইত্যাদির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে বিশেষ ও সাধারণের তুলনার মতোই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে মানুষ- ফেরেশতা-জ্বিন ও সূর্য-চন্দ্রসহ অন্যান্য সৃষ্টিকে। আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রই মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। তাছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সেজদার সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্কই নেই।

প্রথম যুগের সাধুপুরুষবর্গ ও হাদিসশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেজদার কথা, বাধ্যগত সেজদার কথা এখানে বলা হয়নি। আর সূর্য-চন্দ্রসহ সকল সৃষ্টি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিরন্তর আল্লাহ্‌কে সেজদা করে চলে। কারণ সেগুলোরও রয়েছে তাদের আপনাপন সত্তানুগ চেতনা ও জ্ঞান। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. 'ক্বলাতা আতাইনা ত্বইয়ীন' তারা (চন্দ্র-সূর্য) বললো, আমরা এসেছি অনুগত হয়ে ২. প্রস্তরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন— 'ইন্‌না মিনহা লামা ইয়াহ্‌বিত্বু মিন খশ্‌ইয়াতিল্লাহ্' (অবশ্যই তার মধ্যে কিছু স্থানচ্যুত হয় আল্লাহ্‌র ভয়ে) ৩. 'ওয়া ইম্‌মিন্ শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহী ওয়া লাকিল্‌লা তাফ্‌ক্বহুনা তাস্‌বিহাহুম' (সকল বস্তুই তাঁর স্তুতিবাদ করে, কিন্তু তোমরা বোঝোনা তাদের স্তুতিবাদ)। রসুল স. বলেন, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডেকে বলে, তোমার উপরে কি এমন লোকের আগমন ঘটেছে, যে আল্লাহ্‌র জিকির করে? হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। বাগবী লিখেছেন, বর্ণিত তাফসীর অত্যুত্তম। এমতো ব্যাখ্যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি'। 'অনেকে' (কাছীর) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে দু'বার। শেষের উল্লেখটি অধিকতর দৃঢ়তা ও আধিক্য প্রকাশক। এমতো উল্লেখের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কস্মিনকালেও সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদ্বি'কথাটির 'মান' (যা কিছু) ব্যাপক অর্থে প্রয়োগিত। আর 'সেজদা' শব্দটির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের আনুগত্য। আল্লাহ্‌র এমতো নির্ধারণের অন্যথা করার ক্ষমতা কারোই নেই। কারণ সকল কিছু সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী ও কর্তৃত্বাগত। এভাবে সকলেই এবং সকল কিছুই হয়েছে তাঁর চিরদুর্জেয় অস্তিত্ব ও গুণবত্তার প্রমাণ।

'সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে' কথাটি এখানে উদ্দেশ্য আর এর বিধেয় রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বিধেয়টি এরকম— অধিকাংশ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর দরবারে রয়েছে পুণ্য। এরকমও বলা যায় যে, 'মানুষের মধ্যে 'অনেকে' কথাটি একটি লুপ্ত ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীদের অধিকাংশই মাটিতে ললাটদেশ স্থাপন করে। সেজদা করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে । যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেনো, উভয় অবস্থায় 'সেজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে' এবং 'আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি' হবে সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বাক্য।

কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা সিদ্ধ। এভাবে এক এক ব্যাখ্যা হবে এক এক উদ্দেশ্যের পরিপূরক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এখানকার 'কাছীরুম্ মিনান্নাস্' (মানুষের মধ্যে অনেকে) এর সম্পর্ক ঘটেছে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে। আর সেজদার অর্থ এখানে দু'রকম— ১. মাটিতে ললাট স্থাপন করা। ২. স্বভাবগতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিয়মাধীনে থাকা। এখানে সেজদার উভয় অর্থই প্রযোজ্য। মানুষের সঙ্গে সেজদার সম্পর্ক করা হলে গ্রহণ করতে হবে প্রথমোক্ত অর্থটি। আর অন্যান্য সৃষ্টিকে ধরা হলে গ্রহণীয় হবে দ্বিতীয় অর্থটি। এমতাবস্থায়ও 'কাছীরুন হাক্কা আ'লাইহিল আ'জাব' (আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি) হবে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আরো শুনুন, আল্লাহ্ যাকে অপদস্থ করেন, তাকে মর্যাদায়িত করার সাধ্য কারোই নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় সতত স্বাধীন, চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। তাই তিনি যা খুশি তা-ই করতে সক্ষম। কাউকে গৌরবান্বিত ও লাঞ্ছিত করার বিষয়টিও সম্পূর্ণতঃই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এই দু'টি দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে'। এখানে দু'টি দল বলে বোঝানো হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে এবং ইতোপূর্বে একত্রে উল্লেখিত ইহুদী-খৃষ্টান-সাবেয়ী-অংশীবাদী ও অগ্নিপূজককে। কারণ ইমানদারদের সঙ্গে ওই সকল কাফেরদের রয়েছে আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণাবলী সম্পর্কে প্রলম্বিত বিতর্ক।

হজরত আবুজর গিফারী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হামযা-হজরত আবু উবাইদা-হজরত আলী এবং উত্বা, শায়বা ও ওলীদ সম্পর্কে। উল্লেখ্য, প্রথমোক্ত তিন জন ছিলেন ইমানদার, আর পরের তিন জন ছিলো কাফের। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানে দু'টি দল বলে বোঝানো হয়েছে মক্কার বিশ্বাসী ও অংশীবাদীদেরকে। বর্ণিত পাঁচ শ্রেণীর অবশিষ্ট চারটি শ্রেণীকে নয়।

বোখারী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের সময়ের মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকবাহিনীকে লক্ষ্য করে। হাকেমের ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত

অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। এক পক্ষে ছিলাম হামযা, উবাইদা ও আমি। অপর পক্ষে শায়বা উত্‌বা ও ওলীদ।

কায়েস ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময় আমিই প্রথম হাঁটু মুড়ে দয়াল দাতা আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যহীন সকাশে উপবেশন করবো।

কায়েস বর্ণনা করেছেন, জঙ্গে বদরে যারা মুখোমুখি হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তখন একপক্ষে ছিলেন হজরত হামযা, হজরত আলী ও হজরত উবায়দা। আর অপর পক্ষে ছিলো উত্‌বা, শায়বা ও ওলীদ।

সম্মুখ সমরে হজরত হামযা ও হজরত আলীঃ মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শুরু হলো এভাবে— প্রথমে মুশরিকবাহিনীর দিক থেকে এগিয়ে এলো উত্‌বা, শায়বা ও ওলীদ— এই তিন জন। তারা উচ্চকণ্ঠে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালো। এদিক থেকে এগিয়ে গেলেন আনসারী তিন যুবক— আউফ, মুয়াজ ও মুয়াওবিজ। তাঁদের পিতার নাম ছিলো হারেছ এবং মাতার নাম আফরা। মুশরিকদের তিন যোদ্ধা বললো, তোমরা কারা? মুসলিম বীরেরা বললেন, আমরা আনসারী, বংশপরিচিতি ও আভিজাত্যে তোমাদের সমতুল। মুশরিকদের ত্রয়ী যোদ্ধার একজন চিৎকার করে বললো, মোহাম্মদ! আমাদের স্বজাতির বীরদেরকে প্রেরণ করো। অকুলীনেরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের যোগ্য নয়। রসুল স. উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু উবায়দা ইবনে হারেছ, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আলী ইবনে আবী তালেব অগ্রসর হও। নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ী বীর এগিয়ে গেলেন সামনে। প্রতিপক্ষরা বললো, তোমরা কারা? ত্রয়ী বীর তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। প্রতিপক্ষরা বললো, হ্যাঁ, তোমরা সম্মানিত, আমাদের সমপর্যায়ভূত। হজরত আবু উবায়দা ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মুখোমুখি হলেন উত্‌বার। শায়বার সামনে দাঁড়ালেন হজরত হামযা। আর হজরত আলী প্রতিপক্ষ হলেন ওলীদের। সংঘর্ষ শুরু হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হজরত হামযা ও হজরত আলী বধ করলেন তাঁদের শত্রুদ্বয়কে। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগলো হজরত উবায়দা এবং উত্‌বার মধ্যে। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন হজরত আলী ও হজরত হামযা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্‌বার উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই বধ করলেন তাকে। হজরত আবু উবায়দা মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর উরুদেশে। অনর্গল রক্ত ঝরছিলো সেখান থেকে। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো রসুল স. এর মহান সাহচর্যে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র

রসুল! আমি কি শহীদ নই? রসুল স. বললেন, অবশ্যই। তিনি পুনরায় বললেন, আবু তালেব বেঁচে থাকলে দেখতেন আমিই তাঁর কবিতার প্রতিভূ হবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য। তিনি যথার্থই বলেছেন—

কাজাব্‌তুম ওয়া বাইতুল্লাহি ইউব্‌জা মুহম্মদ
ওয়া লাম্‌মালা জআন দুনাহু ওয়া নুনাসিলু
ওয়ানুস্‌লিমুহু হাত্তা নুসাররিউ' হাউলাহু
ওয়া নাজহালু আন্‌ আব্‌নাইনা ওয়া হালাইলু

অর্থঃ কাবার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। আমি মোহাম্মদের পক্ষ অবলম্বন করে দৃঢ় ও যথার্থ অবস্থান থেকে যদি তোমাদের দিকে বর্শা ও তীর নিক্ষেপ না করি, তবে তোমরা তো তাকে পরাস্ত করবে। জেনে রাখো, পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শব হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের অধিকারভূত হতে দিবো না।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আউফি, ইবনে জারীর এবং হজরত কাতাদার উক্তিরূপে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে মুসলমান ও আহলে কিতাব সম্পর্কে। কিতাবীরা বলতো, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যভাজন। আমাদের কিতাব ও আমাদের নবীও তোমাদের কিতাব ও তোমাদের নবী অপেক্ষা অগ্রগামী। মুসলমানেরা বলতো, না, আল্লাহ্‌র অধিক নৈকট্যধারী আমরা। আমরা আমাদের নবীসহ পূর্বতন সকল নবীকে বিশ্বাস করি। সত্য বলে মানি আমাদের কিতাবসহ পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে। আর তোমরা একথাও জানো যে, আমাদের নবী ও কিতাব সত্য। কিন্তু হিংসাবশত তোমরা একথা স্বীকার করো না। এভাবে উভয় দলের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা লেগেই থাকতো। মুজাহিদ এবং আতা ইবনে রেবাহ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'এই দু'টি দল' বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুসলমানকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে'—এই আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে ছয় শ্রেণীর মানুষের কথা। তার মধ্যে এক শ্রেণী জান্নাতী এবং বাকি পাঁচ শ্রেণী জাহান্নামী। এভাবে নির্ধারিত হয়েছে জান্নাতী ও জাহান্নামী— দু'টি দল। এতে করে বুঝা যায় শ্রেণীগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামীরা মূলতঃ একটি দল। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাখ্যা দু'টো করা হয়েছে শাব্দিক বিশ্লেষণের ব্যাপক পটভূমিকায়, অবতরণের প্রেক্ষাপটে নয়। তাফসীর শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম ব্যাখ্যাও সিদ্ধ। এমতো ব্যাখ্যার ফলে একথাও

প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কোনো বিশেষ প্রেক্ষিতের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। নির্দেশনাটি এখানে সাধারণ।

ইকরামা বলেছেন, পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ বিতর্কে লিপ্ত হবে । দোজখ বলবে, আমিই উত্তম। কারণ অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের শায়েস্তার জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বেহেশত বলবে, দ্যাখো আমার কী রকম মর্যাদা। দুর্বল, সৎ ও নিঃসম্বলেরা ছাড়া অন্য কেউ আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ বেহেশতকে বলবেন, তুমি আমার রহমতের প্রতিভূ। আমার বান্দাদের কাউকে রহমত প্রদান করতে চাইলে তোমাকেই দান করবো আমি। আর দোজখকে বলবেন, তুমি আমার গজবের বিকাশ। যাকে আমি শাস্তি দিতে চাই, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তোমার মাধ্যমেই। শেষে বলবেন, তোমাদের দু'জনকেই পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে। এরপর আল্লাহ্ দোজখে স্থাপন করবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন কুদরতী কদম। বলবেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ! থেমে যাবে দোজখের ক্রমপ্রসরমান লেলিহানতা। পরিতৃপ্ত দোজখকে তখন বলা হবে, আল্লাহ্ কারো প্রতি জুলুম করেন না। (নিরপরাধকে শাস্তি দেন না এবং বেহেশত পূর্ণ করার জন্য অস্তিত্ব দান করেন না নতুন কোনো সৃষ্টিকে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক'। একথার অর্থ— প্রতর্কপ্রবণতার মাধ্যমে যারা সত্যের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে পরজগতে অবশ্যই পরিধান করানো হবে অগ্নিনির্মিত পরিধেয়। পূর্ববর্তী আয়াতে (১৭) যে ফয়সালার কথা বলা হয়েছে, এটাই হবে সেই ফয়সালা বা মীমাংসা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখীদের পরানো হবে উত্তপ্ত তাম্র নির্মিত পোশাক। আর ওই উত্তাপ হবে অভূতপূর্ব।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, দোজখীদেরকে পরানো হবে আগুনের পারা (পোশাক বিশেষ)। হজরত মুয়াবিয়া থেকে সর্বোত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যারা দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরিধান করবে, পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে আগুনের পরিচ্ছদ। হজরত আনাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বায্যার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে শয়তানকে। পোশাকটিকে সে দুই ভ্রূর উপর রাখতে চেষ্টা করবে। তার অনুসারীরা ওই পোশাক ধরে টানতে টানতে চলতে থাকবে তার পশ্চাতে। সে

তখন আর্তনাদ করে বার বার মৃত্যুকে ডাকবে। এভাবে সে ও তার সকল অনুসারী উপস্থিত হবে নরকাগ্নিতে। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মৃত্যুকে নয়, আহ্বান করো ধ্বংসাত্মক, মর্মবিদারক ও অফুরন্ত শাস্তিকে।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পোশাক পরানো হবে, কিন্তু পরিচ্ছদাবৃত হওয়া অপেক্ষা বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থাই হবে তাদের জন্য উত্তম। পুনর্জীবিতও করা হবে। কিন্তু সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হবে সমধিক অভিপ্রেত।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মৃত স্বজনের জন্য মাতমকারীরা তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলে পুনরুত্থানের পর তাদেরকে পরানো হবে তপ্ত আলকাতরার পোশাক। তলোয়ারের মরিচায় তৈরী জামা থাকবে তাদের দেহে। ইবনে মাজার বিবরণীতে হাদিসটি এসেছে এভাবে— মৃত আত্মীয়ের জন্য বিলাপকারিণীরা যদি তওবা করার পূর্বেই মারা যায়, তবে পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে পরানো হবে জমাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম্বলিত আলকাতরার পোশাক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি'। এখানে 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যাতে তাদের চর্ম এবং তাদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে'। একথার অর্থ—ওই ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়ার ফলে তাদের গাত্রচর্ম ও গাত্রভ্যন্তরের অস্থি-গোশত নাড়িভুঁড়ি সকল কিছু গলে গলে পড়বে। এভাবে সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শরীরের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তর উভয় অংশই দগ্ধীভূত হতে থাকবে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে উত্তম সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে তাদের মাথার উপর। ওই পানি প্রবেশ করবে তাদের উদরেও এবং তার ফলে অভ্যন্তরস্থিত সবকিছু দগ্ধীভূত হয়ে বেরিয়ে যাবে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে পুনঃ পুনঃ। এখানকার 'ইউস্হারু' কথাটির মাধ্যমে সেকথাই প্রকাশ পায়।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর'। এখানকার 'মাক্বামিউ' শব্দটি 'মাক্বমাআতুন' এর বহুবচন। শব্দটির অর্থ ওই হাতিয়ার বা অস্ত্র, যার আঘাতে কোনো কিছুকে করা হয় চূর্ণবিচূর্ণ। লাইছ বলেছেন, 'মাক্বমাআতুন' বলা হয় বড় হাতুড়ি, মুদ্গর বা গদাকে। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি এসেছে 'ক্বমআতুন রসাহূ' থেকে। ক্বমআতুন অর্থ আমি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছি।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নরকবাসীদেরকে হাতুড়ি দিয়ে বার বার প্রহার করা হবে। তখন তারা আর্তনাদ করতে করতে ডাকতে থাকবে মৃত্যুকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, কল্পনাতীত ওজনবিশিষ্ট হবে ওই হাতুড়ি। সকল মানুষ ও জ্বিন মিলেও ওই হাতুড়িটি উত্তোলন করতে পারবে না। হাতুড়িটির একটি আঘাতেই ধূলিসাৎ হবে পর্বতরাজি।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তার মধ্যে'। উল্লেখ্য, অসম্ভব জেনেও বারবার দোজখ থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যোগী হবে তারা। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে অনলাভ্যন্তরে। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সূত্রে ফুজাইল ইবনে আয়াজ বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! দোজখীরা দোজখ থেকে বের হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। কেননা তাদেরকে সেখানে বেঁধে রাখা হবে মজবুতভাবে। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত হুতাশন তাদেরকে উত্থিত করবে উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেরেশতাদের লোহার হাতুড়ির আঘাতে নিম্নে পতিত হবে তারা।

আমি বলি, অগ্নিতরঙ্গ যখন তাদেরকে উপরে ওঠাবে, তখন তারা মনে করবে এবার সম্ভবতঃ আমরা নিক্ষিপ্ত হবো বাইরে। কিন্তু পরক্ষণেই পড়বে হাতুড়ির বাড়ি। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ বলেছেন, কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তারা অতি দ্রুত পতিত হতে থাকবে তলদেশের দিকে। বলবে, আমাদেরকে কেউ বাধা দিয়ো না। তলদেশে উপনীত হওয়ার পর বীভৎস অগ্নিশিখা তাদেরকে উত্তোলন করতে থাকবে উপরের দিকে। তখন তাদের হাড়ের সঙ্গে গোশত-চামড়া কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু ভস্মীভূত হবে আগুনে। এভাবে কেবল কংকাল উপরে এলে তাদের উপর পড়বে ফেরেশতাদের বিশালাকৃতির হাতুড়ির আঘাত। সে আঘাতে পুনরায় নিম্নগামী হতে হতে পৌছবে তলদেশ পর্যন্ত। ক্রমাগত চলতেই থাকবে এমতো শাস্তির পুনরাবৃত্তি। বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার অতিরিক্ত সংযোজনটুকু এরকম— এভাবে তাদের উর্ধ্বারোহণ ঘটবে সত্তর বছর ধরে। আবার তাদের অবরোহণের সময়সীমাও হবে সত্তর বছরের।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদ করো দহন যন্ত্রণা'। এখানকার 'আলহারীক্ব' অর্থ দহন যন্ত্রণা। শব্দটি সদৃশ্য বিশেষণ, যা কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। এভাবে 'মুহরিক্ব' শব্দটির অর্থ হবে— দহন যন্ত্রণা দানকারী। যেমন 'আ'লীম' অর্থ 'মু'লিম'। 'ওয়াজীয়ুন' অর্থ মাউজিয়ুন্। জুজায বলেছেন, এতক্ষণ ধরে উল্লেখিত দুই দলের মধ্যে একটি দলের পরিণতির কথা আলোচিত হলো। পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু হবে অপর দলটির বিবরণ।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ○ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ○ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাহাদিগের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

❐ তাহাদিগকে সৎবাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল আল্লাহের পথে;

❐ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে আল্লাহের পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল-হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য করিয়াছি সমান তাহা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাহাদিগকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির এবং যে সীমালংঘন করিয়া মসজিদুল-হারামে পাপ কার্য করিতে ইচ্ছা করে তাহাকেও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত'। একথার অর্থ— যারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ্ এমন স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যেখানে থাকবে জলবতী নদী। উল্লেখ্য, এখানে আল্লাহ্ নিজে তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলেছেন। এভাবে ইমানদারগণকে এখানে করা হয়েছে সম্মানিত। তদুপরি, বাক্যের শুরুতে নিশ্চয়তা প্রকাশক শব্দ 'ইন্না' ব্যবহার করে বক্তব্যটিকে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ ও মর্যাদামণ্ডিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা'। আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে তিনটি করে কঙ্কন পরানো হবে— স্বর্ণের, রৌপ্যের ও মুক্তার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আলোচ্য আয়াত আবৃত্তি করে বললেন, জান্নাতীদের মাথায় থাকবে মুক্তানির্মিত মুকুট। ওই মুক্তার সামান্য ঝলকে আলোকিত হবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য।

তিবরানীর 'আওসাত' গ্রন্থে এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে উত্তম সূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী জান্নাতীর অলংকারও হবে পৃথিবীবাসীদের সকল অলংকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আবু শায়েখ তাঁর 'আলউজমা' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশে এক ফেরেশতা তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে জান্নাতীদের অলংকার নির্মাণ করে চলেছে। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে তার এমতো নির্মাণ। ওই আভরণসম্ভারের যে কোনো একটি পৃথিবীতে নিয়ে এলে সূর্যকিরণও হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তখন বিশ্বাসীর হাত ও পায়ের ওই পর্যন্ত অলংকারপত্র পৌছবে যে পর্যন্ত এখন পৌছানো হয় তার ওজুর পানি।

'আজ্জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, ইমরান ইবনে খালেদ সূত্রে জনৈক তাবেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, স্বর্ণালংকার পরিধানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে পৃথিবীতে তা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে অলংকৃত করবেন তার জান্নাতবাসকালে। আর মদ্যপানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে তা পরিহার করে, তাকে তখন পান করানো হবে শারাবান তহুরা। হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, যদি তোমরা বেহেশতের স্বর্ণালংকার ও রেশমী বস্ত্র চাও তবে এখানে তা পরিহার করো।

হজরত ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, বেহেশতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের'। হজরত জাবেরের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় আবু ইয়ালী, বায্যার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত মুরছাদ বলেছেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হবে রেশমী তন্তু। তাই দিয়ে নির্মাণ করা হবে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। ত্রুটিবিমুক্ত সূত্র পরম্পরায় নাসাঈ, তায়ালাসী, বায্যার ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জান্নাতের বৃক্ষের ফল ফেটে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে জান্নাতীদের পরিধেয় বস্ত্র।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য সেখানে প্রস্তুত রাখা হবে সত্তর কক্ষ বিশিষ্ট একটি শূন্যগর্ভ মুক্তা। শূন্যগর্ভ মোতির মধ্যবর্তী এক স্থানের বৃক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের পোশাক। তারা তাদের আঙুল দিয়ে সেখান থেকে এক একবার আনবে সত্তর জোড়া পরিধেয়। প্রতি জোড়া বস্ত্রে থাকবে জমরুদ ও মুক্তার মালা।

জান্নাতীদের অলংকার ও পোশাকঃ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত হুযায়ফা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এরকম আজ্ঞা করতে শুনেছি, তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান কোরো না, পানাহার কোরো না সোনা-রূপা নির্মিত পাত্রে। এগুলো কাফেরদের জন্য রাখা হয়েছে দুনিয়ায়, আর তোমাদের জন্য আখেরাতে। হজরত ওমর থেকে বোখারী-মুসলিম কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, যে পুরুষ এখানে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে এমতো বস্ত্রসম্ভার থেকে বঞ্চিত হবে পরজগতে। হজরত আনাস এবং হজরত যোবায়ের থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাঈ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে পুরুষ দুনিয়ায় রেশমী পরিচ্ছদ পরিধান করবে, সে আখেরাতে রেশমী বস্ত্র পাবে না। মদ্যপায়ীরাও সেখানে পাবে না পবিত্র শরাব। আর সোনা-রূপার পাত্রে পানাহারকারীও সেখানে বঞ্চিত হবে এমতো তৈজসপত্র থেকে।

যথাসূত্র পরম্পরায় তায়ালাসী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে নাসাঈ, ইবনে জান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে এখানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করবে সে সেখানে তা পাবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতের তুবা বৃক্ষের কাছে। ওই বৃক্ষের ফল ফেটে তখন বেরিয়ে আসবে তোমাদের রঙ বেরঙের পোশাক। পোশাকগুলি হবে গুলে লালার মতো নয়নাভিরাম। বরং তদপেক্ষা অধিক সুন্দর।

হজরত কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ায় কেউ জান্নাতের পোশাক পরিধান করলে তার প্রতি দৃষ্টিপাতকারীরা হয়ে যাবে বেহুঁশ। সাবুনী তাঁর 'আল মাতীন' গ্রন্থে লিখেছেন, বেহেশতী পোশাক থেকে প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে সত্তর রকমের রঙ। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, জান্নাতীরা লাভ করবে অনন্ত শান্তি। চির যুবক হবে তারা। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও কখনো পুরনো হবে না।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে,— 'তাদেরকে সৎবাক্যের অনুগামী করা হয়েছিলো এবং তারা পরিচালিত হয়েছিলো আল্লাহ্র পথে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'সৎবাক্য' কথাটির অর্থ পবিত্র কলেমা— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্। জান্নাতীরা সকলেই এই পবিত্র বাণীর অনুগামী। আল্লামা সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'সৎবাক্য' (তয়্যিবি মিনাল্ ক্বওলি) অর্থ কোরআন মজীদ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'অনুগামী করা হয়েছিলো' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে 'অনুগামী করা হবে'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— জান্নাতে তাদেরকে পবিত্র বাণীর অনুগামী করা হবে। অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন উচ্চারণ করবে— 'আল্হামদু লিল্লাহিল্লাজী সাদাক্বনা ওয়াদাহু'।

'সিরাত্বিল হামীদ' অর্থ আল্লাহ্র পথ। অর্থাৎ ইসলাম। 'হামীদ' আল্লাহ্র এক মহান নাম। এর অর্থ মহাপ্রশংসার্হ। 'সিরাত্বিল হামীদ' অর্থ জান্নাতের পথ— এরকমও বলা যায়। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— পরকালে তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাত গমনের সুযোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল হারামকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান, তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদেরকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাবো মর্মন্তুদ শাস্তির এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে তাকেও'। একথার অর্থ— যারা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্র পথে যেতে দেয় না এবং যে কাবাগৃহকে আমি স্থানীয়-অস্থানীয়, সকলের জন্য করেছি নিরাপদ তীর্থস্থল, সেই কাবা দর্শন থেকে যারা নিবৃত্ত করে তীর্থযাত্রীদেরকে, তাদেরকে আমি আস্বাদ গ্রহণ করাবো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। শাস্তিদান করবো তাকেও, যে সীমালংঘনপূর্বক ওই পবিত্র মসজিদে পাপকর্ম করতে চায়।

মসজিদুল হারাম বা মহাসম্মানিত মসজিদঃ ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মসজিদুল হারাম অর্থ কাবা মসজিদের প্রাঙ্গণ। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সমগ্র মক্কা শহর মসজিদুল হারামের অন্তর্ভূত। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে— সুবহানাল্ লাজী আস্‌রা বি আ'ব্‌দিহী লাইলাম্ মিনাল মাসজিদিল হারাম.....। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর মহারহস্যময় মেরাজ শুরু হয়েছিলো তাঁর পিতৃব্যপুত্রী হজরত উম্মে হানির বাসভবন থেকে। অতএব, তাঁর বাসভবনও হেরেমের অন্তর্গত। কিন্তু তা কাবার অন্তর্গত নয়। আর আলোচ্য আয়াতের মসজিদুল হারাম অর্থ মসজিদ প্রাঙ্গণ, সমগ্র মক্কা নয়। কেননা বলা হয়েছে 'আমি স্থানীয় ও বহিরাগত, সকলের জন্য করেছি সমান'। কারো বসতবাটিতে এমতো সার্বজনীয় অধিকার স্বীকৃত নয়। আবার অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত মসজিদুল হারাম অর্থ সমগ্র হেরেম শরীফের পরিসর। সে কথা ইমাম শাফেয়ীও স্বীকার করেন। আয়াতখানি এই—'ইন্‌নামাল মুশরিকূনা নাজাসুন ফালা ইয়াক্বরাবুল মাসজিদাল হারামা বা'দা আ'মিহিম হাজা'। ইমাম শাফেয়ী একথাও বলেন, সমগ্র হেরেম শরীফের সীমানায় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, শুধু মসজিদ প্রাঙ্গণে নয়।

এখানে 'আ'কিফ্' অর্থ স্থানীয়। আর 'আলবাদ ' অর্থ মুসাফির বা বহিরাগত। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'বাদ্‌উন্' 'বাদাওয়াতুন্' 'বাদাতুন' 'বাদীয়াত'— শব্দগুলোর মাধ্যমে বোঝানো হয় গ্রামবাসী, অরণ্যচারী, মরুচারী, যাযাবর ইত্যাদি অ-শহুরে মানুষকে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—সকলেই হেরেম শরীফে প্রবেশের সম-অধিকার প্রাপ্ত। সেখান থেকে কেউ কাউকে বহিষ্কার করতে পারবে না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা ও ইবনে জায়েদের অভিমত এরকমই। আবদুর রহমান ইবনে ছাবেতের বর্ণনায় এসেছে, হজযাত্রীরা যখন মক্কায় আগমন করে, তখন মক্কাবাসীদের তাদের আপনাপন আবাসের উপরে অগ্রাধিকার থাকে না। হজরত ওমর হজের মওসুমে মক্কাবাসীকে আপনাপন গৃহের দরজা বন্ধ রাখতে নিষেধ করতেন। এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন বাগবী।

আমি বলি, আবদুর রহমান ইবনে আবদে হামিদ হজরত ওমরের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন হজরত নাফে' হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে। 'ইজালাতুল খাফা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, একবার মারওয়া পাহাড়ের কাছে এক লোক হজরত ওমরকে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে দিন। হজরত ওমর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাকে পশ্চাতে রেখে যেতে যেতে বললেন, এ স্থান হচ্ছে আল্লাহ্‌র হেরেম। এখানে মুকিম মুসাফির সকলের অধিকার সমান।

মনসুর থেকে মুয়াম্মার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ওমর তখন ঘোষণা করেছিলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা কেউ তোমাদের ঘরের দরজা বন্ধ কোরো না। হজযাত্রীরা যেখানে খুশী সেখানে অবস্থান করতে পারবে।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আতা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে ঘোড়া প্রবেশ করাতে নিষেধ করতেন। আর আমার নিকট এরকম কথাও পৌছেছে, হজরত ওমর মক্কার গৃহসমূহের দরজা অর্গলবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, হজযাত্রীগণ যেনো গৃহাঙ্গণে অবস্থান নেয়ার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য, হজের মওসুমে হজরত সুহাইল সর্ব প্রথম তাঁর গৃহের দরজা অর্গলবদ্ধ করেছিলেন এবং এর জন্য হজরত ওমর সকাশে উপযুক্ত কৈফিয়তও দিয়েছিলেন।

কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর জেলখানা নির্মাণের জন্য সেখানে চার হাজার দীনার দিয়ে এক খণ্ড বাসগৃহ ক্রয় করেছিলেন। ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, তিনি ক্রয় করেছিলেন উম্মত-জননী হজরত সাওদার প্রকোষ্ঠ। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হাকিম ইবনে হাজাম বিক্রয় করে দিয়েছিলেন দারুন্নাদওয়া (সভাকক্ষ)। একথাও সত্য, মসজিদের সীমানা সম্প্রসারণার্থে হজরত ওমর ক্রয় করেছিলেন কয়েকটি বাসগৃহ। হজরত ওসমানও এরকম করেছিলেন। তখন সেখানে বহুসংখ্যক সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। এসকল তথ্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হেরেমের সীমানাভূত জমিন ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ।

আমি বলি, এ সকল ক্রয়-বিক্রয় ছিলো গৃহ বা ভবনের ক্রয়-বিক্রয়, জমিনের নয়। হেরেমের জমিন ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফা এবং সুদৃঢ় বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, মক্কার জমিন বিক্রয় করা এবং সেখানকার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। কারণ ওই শহরের জমিন ওয়াকফ বা মুক্ত। সেখানে কারো ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ছুম্মা মাহিল্লুহা ইলা বাইতিল আতীক্ব (অতঃপর উহা সম্প্রসারিত হলো মুক্ত গৃহ পর্যন্ত)। সুতরাং বায়তুল আতীক্ব অর্থ হেরেমের পুরো সীমানা। কোরবানীও সিদ্ধ কেবল হেরেমের সীমানার মধ্যেই। কেউ কেউ বলেন, একথার অর্থ ওই সকল স্থান, যা কাবার সন্নিকটবর্তী। কিন্তু এরকম মন্তব্য স্বকপোলকল্পিত, তাই অগ্রহনীয়। ইমাম মালেকও এরকম বলেন। কিন্তু তাঁর অভিমতের ভিত্তি ভিন্ন। তিনি বলেন, মক্কাবিজিত হয়েছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। এভাবে দখলে আনা ভূমি ওয়াকফ্ বলে বিবেচিত হয়। আর ওয়াক্ফ জমিন কেনাবেচা করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, মক্কার বাসভবন বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া জায়েয। কারণ বাসভবনের উপরে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। হাসান বসরী, তাউস, আমর ইবনে দীনার এবং আলেমগণের বিশিষ্ট এক দল এরকম অভিমতই পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'মাসজিদিল হারাম' অর্থ কাবা মসজিদ এবং এখানকার বক্তব্যটি হবে— আমি সকল মানুষের জন্য কাবাকে নামাজের কেবলা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এ বিষয়ে স্থানীয় ও বহিরাগত সমান। সেখানে সকলের নামাজ, তাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদতের ফযীলত একই রকম। আর মক্কা আবাদ করার উদ্দেশ্য— সেখানে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। নবী ইব্রাহিমের উক্তিরূপে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার কিছু সন্তানকে তোমার মহাসম্মানিতগৃহের পাশে অনুর্বর উপত্যাকার ভূমিতে অধিবাসী করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, তা শুধু নামাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে'।

আমি বলি, কেবল কাবাগৃহে মুকিম ও মুসাফিরের অধিকার সমান নয়, অন্য সকল মসজিদের ক্ষেত্রেও এরকম সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত। সেগুলোতেও স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের ইবাদতের ফযীলত সমান। আবার সর্বসাধারণের দৃষ্টিতেও সকল মসজিদ একইরূপ সম্মানার্হ। বাগবী লিখেছেন, আলেমগণের একটি দলের অভিমতও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত সদৃশ। আমি বলি, এরকম কোনো বর্ণনা তো পাওয়া যায় না। বরং মুজাহিদের বর্ণনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মক্কাভূমি প্রত্যেকের জন্য বৈধ। সেখানকার ভূমি বিক্রয় করা, ভাড়া দেয়া কোনোটাই সিদ্ধ নয়।

মক্কার জমিন ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গ ঃ মুজাহিদ সূত্রে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন, মক্কার বসতবাটি বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেয়া কোনোটাই জায়েয নয়। এমতো উক্তির সমর্থন রয়েছে ইমাম মোহাম্মদের কিতাবুল আছারে। সেখানে বলা হয়েছে, নাজিহি সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে জিয়াদের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন, আল্লাহ্ মক্কাকে করেছেন মহাসম্মানিত। মক্কার ভূমি বিক্রয় ও এর বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। আবার স্বসূত্রে ইমাম জাওজী তাঁর আত্তাহক্বক্বী গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন একটি সুপরিণত বিবরণ। বিবরণটি এই— মক্কা মহাসম্মানিত, মক্কার জমিন মর্যাদায়িত, মক্কার গৃহসমূহ ভাড়া দেয়াও হারাম। ইমাম দারাকুতনী লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা বর্ণিত এই হাদিসটির সুপরিণত

(মারফু) হওয়ার ব্যাপারটি নিঃসন্দিগ্ধ নয়। বর্ণনাটি প্রকৃতপক্ষে পরিণত (মাওকুফ) শ্রেণীর। কিন্তু তাঁর এমতো ধারণাপ্রসূত মন্তব্য ইমাম আবু হানিফার নির্ভরযোগ্যতার প্রতি এক ধরনের অস্বীকৃতি বটে। অথচ কে না জানে তিনি সেকাহ্ (বলিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য)। আর এমতো ব্যক্তিত্ব যদি কোনো বিবরণকে সুপরিণত বলেন, তবে তাকে সুপরিণত বলে মেনে নেয়াই দস্তুর। ইমাম মোহাম্মদও হাদিসটিকে বর্ণিত সূত্রপরম্পরায় সুপরিণতরূপে উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এরকম—রসুল স. বলেন, যে মক্কার বাসগৃহ ভাড়া দিয়ে তার অর্থ কিঞ্চিত পরিমাণ ভক্ষণ করলো, সে ভক্ষণ করলো আগুন।

স্বসূত্রে দারাকুতনী ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেন, মক্কা মোয়াজ্জমা মোবাহ্ (মক্কার ভূমি ও বসতবাটিসমূহে সকলের অধিকার সমান)। মক্কার জমিন বিক্রয় করা যাবে না। বাসগৃহসমূহও ভাড়া দেয়া যাবে না। আমি বলি, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাঈ ইসমাইলকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে অভিহিত করেছেন। আর তার পিতা ইব্রাহিমকে দুর্বল বলেছেন ইমাম বোখারী। আর আবু হাতেম বলেছেন তার হাদিস পরিত্যাজ্য (মুনকারুল হাদিস)। ইবনুল মদিনী ও নাসাঈ বলেছেন, তাঁর বিবরণ অদৃঢ়। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন ও মাহদী তাঁকে করেছেন ত্রুটিমুক্তদের দলভূত। ইমাম আবু বকর বায়হাকী বলেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, হাদিসটি পরিণত, সুপরিণত নয়।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ মক্কাভূমিকে সম্মানিত করেছেন। তাই এখানকার জায়গা বিক্রয় ও বাসগৃহ ভাড়া দেয়া সিদ্ধ নয়। বর্ণনাটি অপরিণত (মুরসাল)। কারণ এখানে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। আর আমাদের নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিসও দলিলরূপে গ্রাহ্য।

বাসগৃহসমূহের মালিকানা ঃ আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন— আল্লাজীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম (যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের দেশ থেকে)। রসুল স. মক্কা বিজয়ের পর ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে সে নিরাপদ। এভাবে কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফে ব্যক্তি বিশেষকে গৃহের মালিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া যে সকল সাহাবী হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকেও কোরআন মজীদে মজলুম (নিগৃহীত) বলা হয়েছে। যদি তাঁরা সেখানকার বাসগৃহের মালিক না হতেন তবে তাঁদেরকেও মজলুম বলা হতো না। স্বগৃহ থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন বলেই তো তাঁরা মজলুম।

এর জবাবে বলা যায়, তাঁরা সেখানকার জমিনের মালিক ছিলেন না। ছিলেন তাঁদের আপনাপন বসতবাটির নির্মাতা। তাই বুঝতে হবে তাঁদের মালিকানার সম্পর্ক ছিলো তাঁদের নিজ নিজ নির্মাণকর্মের সঙ্গে, সেখানকার জমিনের সঙ্গে নয়। যেমন বলা হয় মসজিদে নববী, মসজিদে ওমর ইত্যাদি। এমতোক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নাম জড়িত হয় প্রতিষ্ঠাতা বা নির্মাতা হিসেবে, ব্যক্তি মালিক হিসেবে নয়। আর স্বহস্তনির্মিত আবাস থেকে কাউকে উৎখাত করাকেও জুলুম বলা যায়, সে সেখানকার জমির মালিক না হলেও। তাই মক্কাবাসীদের বিতাড়নকে জুলুম বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, মসজিদে হারাম থেকে তাড়িয়ে দেয়াকেও জুলুম বলা হয়েছে। অথচ মসজিদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মুহাজিরগণও ছিলেন কাবা মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করার হকদার। কিন্তু তাদের সে অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছিলো। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে'।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উমামা ইবনে যায়েদ বলেছেন, হজের সময় আমি রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! আগামীকাল আপনি কোথায় যাত্রাবিরতি করবেন? তিনি স. বললেন, আমরা কি সে স্থান পেরিয়ে এসেছি? ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীকাল আমরা যাত্রা স্থগিত করবো বনী কেনানার বসতির নিকটে। তারপর বললেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের উত্তরাধিকারী নয়। কোনো মুসলমানও নয় কোনো কাফেরের ওয়ারিশ। ইবনে জাওজীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত উমামা বর্ণনা করেছেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আপনি কি আপনার বাসভবনে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন? তিনি স. বললেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। ইমাম জুহুরী বলেছেন, আবু তালেব তনয় হজরত আলী ও হজরত জাফর ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর সঙ্গে বসবাস করতেন মদীনায়। আর তাঁদের ভ্রাতা মক্কাবিজয় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই ওয়ারিশ হয়েছিলেন তাঁর পিতা আবু তালেবের সম্পত্তির। কাফের ও মুসলমানের পারস্পরিক উত্তরাধিকারিত্ব নেই। তাই রসুল স. তখন 'আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি' এরকম বলেছিলেন। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন যে বাসগৃহ বা জমিনের কথা বলেছিলেন, তার প্রকৃত অধিকারী ছিলো হাশেম ইবনে আবদুল মান্নাফ। তার মৃত্যুর পরে ওই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন রসুল স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। মৃত্যুকালে তিনি ওই বসতবাটি ও তৎসংলগ্ন জমিন বণ্টন করে দেন তাঁর পুত্রগণের মধ্যে। আর রসুল স. তাঁর অংশ লাভ করেন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে। ওই পিত্রালয়েই ভূমিষ্ঠ হন তিনি। পরিণত বয়সে তিনি স. মদীনায় হিজরত করলে তাঁর বসতবাটিটি দখলে চলে যায় আবু

তালেবপুত্র তালিব ও আকীলের। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে বদর যুদ্ধে তালিব নিহত হলে বসতবাটিটি আকীলের একক অধিকারভূত হয়। তিনি তখন সম্পূর্ণ বাড়ি বিক্রয় করেন অন্য লোকের কাছে।

ফাকেহানীর বর্ণনায় এসেছে, আকীল ওই বাসগৃহ বিক্রয় করেননি। তাঁর পরলোকগমনের পর ওই বাড়ির অধিকার পেয়েছিলেন তাঁর সন্তানেরা। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাই মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ওই বাড়ী ক্রয় করে একলক্ষ দীনারের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে, আকীল যদি কাফের থাকা অবস্থায় ওই বাড়ী বিক্রয় করে থাকেন, তবে তাতো ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ হবে না। কিন্তু আমি বলি, বিবরণটির মর্মার্থ এরকম— ওই বাড়ী বিক্রয়ের পূর্বে ছিলো আকীলের অধিকারভূত। আর বিক্রয়ের পরে সে অধিকার পেয়েছিলো ওই বাড়ীর ক্রেতা। অর্থাৎ ওই বাড়ী কখনো জনমানব শূন্য ছিলো না। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি। আর রসুল স. এর এমতো উক্তি শ্রবণ করে বর্ণনাকারী নিজে থেকে মন্তব্য করেছেন। আকীল হয়েছেন আবু তালেবের ওয়ারিশ। আরো বলেছেন, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের এবং বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকারী নয়। তাছাড়া মনে হয় এমতো মন্তব্যের সম্পর্ক অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আকীলের ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সংশ্রব নেই। বর্ণনাকারী সমপ্রকৃতির দু'টো ঘটনাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন। অতএব, একথা নিশ্চিত যে, এই হাদিসের মাধ্যমে মক্কার বাসগৃহের উপর কারো ব্যক্তি মালিকানা প্রমাণিত হয় না। প্রমাণিত হয় কেবল নির্মাণজনিত অধিকার। বসবাসের অনুমতি ও ব্যক্তিমালিকানা নিশ্চয় এক কথা নয়। তাছাড়া মক্কার মর্যাদাপ্রকাশক হাদিসসমূহে সেখানকার জমিন বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম নিষিদ্ধতা ইঙ্গিতময়তা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। তাই বর্ণনা দু'টোকে সমগুরুত্বসম্পন্ন মনে করা হলেও এক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার নিষিদ্ধতার কথাটি মেনে নিতে হবে। কারণ হালাল ও হারামের মধ্যে শেষোক্তটিই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ হালাল হারাম সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে হারামের বিধানই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। রীতিটি সুস্বীকৃত। এমতো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মক্কার জমিন ও বাসগৃহ বিক্রয় মাকরূহে তাহরিমা (প্রায় হারাম)। পুরোপুরি হারাম— একথা তিনি বলেননি। আর সম্ভবতঃ রসুল স. এর পিতার সূত্রে প্রাপ্ত ঘর দখল করে নিয়েছিলো আকীল। এরকম বেদখল অবস্থা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোনো কাফের কোনো মুসলমানের সম্পত্তি দখল করে নিলে ওই সম্পত্তিতে মুসলমানের মালিকানা আর থাকে না। ইমাম শাফেয়ী আবার এমতো অভিমতের প্রবক্তা নন।

আর একটি কথা, আকীল যদি রসুল স. এর উত্তরাধিকার দখল করে নেয়, তবে 'মুমিন কাফেরের এবং কাফের মুমিনের ওয়ারিশ নয়' কথাটির কোনো অর্থই আর অবশিষ্ট থাকে না। আবার সম্পূর্ণ বাসভবন যদি আবু তালেবের হয়, তবে রসুল স. এর উত্তরাধিকার সেখানে থাকেই না। সন্তানের বর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্রের ওয়ারিশ হওয়ার বিধানই যে নেই। তাই বলতে হয় 'আকীল তো কোনো ঘর খালি রাখেনি' কথাটির অর্থ হবে— ঘরগুলো তো জনমানব শূন্য নয়। খালি না পেলে আমরা উঠবো কোথায়? কারণ ঘর যারই হোক রসুল স. সেখানে গৃহকর্তার অনুমতিক্রমে অবশ্যই অবস্থান গ্রহণ করতে পারতেন। ওয়ারিশ হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন নিশ্চয় সেক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতো না।

শেষে বলা হয়েছে, — 'ওয়ামাঁয়্যুরিদ্ ফীহি বি ইলহাদিম্ বি জুল্‌মিন্ নুজিক্বহু মিন আ'জাবিন আলীম' অর্থ— এবং যে সীমালংঘন করে মসজিদুল হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে, তাকেও আমি আস্বাদন করাবো ব্যথাদায়ক শাস্তি'। এখানে 'ফীহি' (সেখানে) সর্বনামটি সম্বন্ধিত হবে সমগ্র হেরেম অথবা কেবল কাবা মসজিদের সঙ্গে। আর এখানকার 'ইলহাদ' (পাপকার্য) কর্মপদ হওয়ার কারণে রয়েছে সম্বন্ধপদের স্থানে। শব্দটির পূর্বের 'বি' এখানে অতিরিক্ত অব্যয়রূপে সংযোজিত । যেমন— 'তুমবিতু বিদ্‌দুহ্‌নি'। এখানেও 'বি' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। কেননা ইন্‌বাত নিজেই এখানে মুতাআদ্দি (সকর্মকক্রিয়া) । কবি আ'মাশের এক কবিতায় বলা হয়েছে— দ্বমিনাত্ বি রিজক্বিন ইয়ালিনা আরমাহনা। এখানেও 'বি' সংযুক্ত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। আবার আলোচ্য আয়াতের 'বিজুলমিন' (সীমালংঘন) এর সম্পর্ক ঘটেছে 'ইউরিদ' (ইচ্ছা করে) এর সঙ্গে।

হেরেম শরীফে পাপকার্য ও তার পরিণাম : হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট তিন শ্রেণীর লোক সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট— ১. হেরেমের অভ্যন্তরের ধর্মদ্রোহী ২. ইসলামের অভ্যন্তরে মূর্খতার যুগের রীতিনীতির প্রচলনকারী ৩. অন্যায় হত্যার সংকল্পক।

রযীনের স্বরচিত গ্রন্থে, বায়হাকীর আলমুদখালে এবং উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ছয় প্রকার লোকের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র ও আমার অভিসম্পাত। আর আবেদন গ্রাহ্য নবীগণেরও। ওই লোকেরা হচ্ছে— ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করে ২. যে তাকদীর অস্বীকার করে

৩. বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও সম্মানিতদেরকে করে যথাক্রমে সম্মানিত ও অপমানিত ৪. হেরেম শরীফের সম্মানহানিকে যে মনে করে হালাল ৫. আমার বংশধর ও নিকটজনকে বধ করা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম জেনেও যে এরকম করাকে মনে করে বৈধ এবং ৬. যে পরিত্যাগ করে আমার প্রদর্শিত পথ। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। সুপরিণতরূপে হজরত আলী থেকেও তিনি অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে ও বাইরে সকল অবস্থায় সীমালংঘন ও অন্যান্য পাপকর্ম হারাম।

'ইলহাদ' শব্দটির আসল অর্থ বক্রতা, একগুঁয়েমি, হঠকারিতা, একদেশদর্শিতা, পদস্খলন। মুজাহিদ ও কাতাদার মতে শব্দটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদিতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইলহাদ অর্থ বচনগত ও কর্মগত উভয় প্রকার নিষিদ্ধ কর্মে বিজড়িত ব্যক্তি সকল। পরিচারকের প্রতি কটুবাক্যবর্ষণও এর অন্তর্ভূত।

আতা বলেছেন, ইলহাদ বলে ইহ্রামবিহীন অবস্থায় হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করাকে এবং সেখানে হেরেমের মর্যাদাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে, যেমন— শিকার করা, বৃক্ষকর্তন ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হেরেমাভ্যন্তরের পাপকর্ম হচ্ছে— যে তোমাকে বধ করেনি তাকে বধ করা, যে তোমার উপর জুলুম করেনি তার উপরে জুলুম করা। জুহাকের অভিমতও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন, মক্কায় পাপকার্যের শাস্তি অন্যান্য স্থানে সম্পাদিত পাপকার্যের শাস্তি অপেক্ষা অধিক। যেমন, অন্যস্থানের পুণ্যকর্মের বিনিময় অপেক্ষা মক্কায় সম্পাদিত পুণ্যকর্মের বিনিময় বেশী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, হেরেমের বাইরে কোথাও পাপকার্যের সংকল্প করলেও পাপ হবে না। যতক্ষণ না তা কার্যকর হয়। কিন্তু হেরেমের অভ্যন্তরে কাউকে হত্যার ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবেন, যাকে হত্যা করতে চাওয়া হয়, সে এডেনের মতো দূরবর্তী স্থানে থাকলেও। অর্থাৎ মক্কাভ্যন্তরের পাপসংকল্প সংঘটিত পাপকর্মের মতোই। সুদ্দী বলেছেন, কিন্তু সে যদি তৎক্ষণাৎ তওবা করে ফেলে, তবে তাকে আর অভিযুক্ত করা হবে না।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমরের তাঁবু ছিলো দু'টি— একটি হেরেমের ভিতরে, অপরটি বাইরে। পরিবার পরিজন অথবা পরিচারক

পরিচারিকাকে শাসন করতে চাইলে তিনি গমন করতেন হেরেমের বাইরের তাঁবুতে। লোকেরা এরকম করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমরা কথা প্রসঙ্গে বলি 'কাল্লা ওয়াল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র শপথ কক্ষনো নয়) বালা ওয়াল্লাহি (আল্লাহ্‌র শপথ হ্যাঁ) এসকল কথাও হেরেমের মধ্যে ইলহাদের অন্তর্ভূত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

❒ এবং স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য স্থির করিয়া দিয়াছিলাম কাবা গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, 'আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তওয়াফ করে এবং যাহারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজ্‌দা করে।

❒ এবং মানুষের নিকট হজ-এর ঘোষণা করিয়া দাও উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, উহারা আসিবে দূর দূরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া,

❒ যাহাতে উহারা উহাদিগের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আল্লাহের নাম, উহাদিগকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন আনয়াম হইতে, তাহার জবহ্‌েকালে সুতরাং তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং স্মরণ করো আমি ইব্রাহিমের জন্য স্থির করে দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান'। এ কথার অর্থ—হে আমার রসুল! স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি আমার নবী ইব্রাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কাবাগৃহের স্থান। জুজাযও এরকম অর্থ করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লি ইব্‌রাহীম' কথাটির 'লি' অতিরিক্তরূপে সংযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে — যখন আমি ইব্রাহিমকে পবিত্র কাবার স্থানে অবস্থান করিয়েছিলাম।

কামুস নামক অভিধানগ্রন্থে রয়েছে 'বাওয়ানাহু মানজিলা' এবং 'ফিল মানজিল' অর্থ তাকে জায়গা করে দেয়া। আর 'আলমাবআতু মানজিলিন্' অর্থ অবতরণস্থল বা অবস্থানস্থল। বর্ণিত হয়েছে, হজরত নুহের মহাপ্লাবনের সময় 'কাবা' কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। বহুকাল গত হবার পর হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কা গমন করেন ও কাবাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ পান। কিন্তু তিনি কাবাগৃহ ঠিক কোথায় ছিলো তা ঠাহর করতে পারছিলেন না। তখন আল্লাহ্র হুকুমে শুরু হলো প্রবল বাতাস। সে বাতাসে উড়ে গেলো বিলুপ্ত কাবার উপরের ধূলোবালি। ভিত্তির চিহ্ন প্রকাশিত হলো। সেই ভিত্তির উপরেই পুনঃনির্মিত হলো কাবা। এরকম বলেছেন বাগবী।

বায়হাকীর দালায়েলে এবং ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তখন সেখানে ঘটালেন রিহে খুজুজ্ (ঘূর্ণিঝড়)। ওই রিহে খুজুজের ছিলো দু'টি ডানা ও একটি মস্তক। আর তার আকার ছিলো সাপের মতো। ওই অদ্ভুদাকৃতির বায়ু মাটি সরিয়ে ফেলে কাবার বিলুপ্ত ভিত্তিচিহ্ন উন্মোচন করে দেয়। কালাবীর উক্তিরূপে বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক তখন সেখানে প্রেরণ করলেন এক প্রকার বায়ুপ্রবাহ। প্রবাহটি এক স্থানে স্থির হয়ে বললো, ইব্রাহিম! এই এখানে কাবা। এখানেই নির্মাণ কার্য শুরু করো। তখন হজরত ইব্রাহিম সেখানেই শুরু করলেন তাঁর নির্মাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোনো শরীক স্থির কোরো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে'। এখানকার 'বাওয়ানা' শব্দটির মধ্যে রয়েছে 'বলেছিলাম' কথাটি। আর 'বলেছিলাম' অর্থ এখানে— নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে নির্দেশ এরকম— প্রতিমা অথবা অন্য কাউকে, কোনো কিছুকে আমার সত্তা-গুণাবলী এবং কার্যাবলীর অংশীদার নির্ধারণ কোরো না। আর নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী, রুকু-সেজদাকারী এবং তাওয়াফকারীদের জন্য এই কাবাকে পবিত্র রেখো।

এখানে 'আমার গৃহ' বলে কাবাগৃহকে সম্মানিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র গৃহ বলে সম্বোধিত হওয়ার কারণেই কাবা শরীফ হয়েছে আল্লাহ্র নূরের বিশেষ অবতরণ স্থল।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, কাবা দৃশ্যতঃ আকৃতিবিশিষ্ট হলেও আকারাতীত এবং তা আনুরূপ্যবিহীনতার রঙে রঞ্জিত। তাই স্থান বা পরিসর এক্ষেত্রে গণনাযোগ্য কিছু নয়। তাই কাবা গৃহের দেয়াল, ছাদ, উর্ধ্ব ও অধঃ সীমানা— এসব কিছু কাবা নয়। এসকল কিছুকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেও কাবা কাবাই থাকে। তার কোনো মর্যাদাহানি ঘটে না। আর কাবার দেয়াল ছাদ

অন্যত্র স্থাপন করলে সে স্থান কাবা হয়ে যায় না। তাই কাবা হচ্ছে চিররহস্যময় ও আকার প্রকারবিহীন এক কেন্দ্র, যেখানে সতত সন্নিপাত ঘটে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিচ্ছটার।

দণ্ডায়মানতা, রুকু ও সেজদা করার অর্থ নামাজ— এই তিন অবস্থা হচ্ছে নামাজের অঙ্গ। আর প্রত্যেক অঙ্গের জন্য পবিত্রতা অবধারিত। তাই এই তিন অবস্থাকে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শরিয়তের বিচারে সেজদা ব্যতীত শুধু রুকু ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই এখানে রুকু ও সেজদার মধ্যে কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়নি। বলা হয়েছে 'রুক্কাইস্ সুজুদ'। শিয়া পন্থীরা বলে, নামাজের মধ্যে শুধু কপাল স্থাপনের স্থানটুকু পবিত্র হলেই যথেষ্ট।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও'। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন হজরত ইব্রাহিমকে হজের ঘোষণা করতে বলা হলো তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! দূরদূরান্তরের মানুষ কীভাবে আমার আওয়াজ শুনবে? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তোমার দায়িত্ব ঘোষণা দেয়া, পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হজরত ইব্রাহিম তখন বর্তমানে 'মাকামে ইব্রাহিম' নামে পরিচিত প্রস্তরখণ্ডটির উপরে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো প্রস্তরখণ্ডটি। হজরত ইব্রাহিম তাঁর দুই কানে হাতের অঙ্গুলি স্থাপন করে দক্ষিণে, বামে ও পুব দিকে মুখ করে উচ্চকণ্ঠে বললেন, শোনো হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর গৃহ সৃজন করেছেন। আর ওই গৃহের হজ তোমাদের উপরে ফরজ করে দিয়েছেন। তখন কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল মানুষ তাদের আপনাপন পিতৃপুরুষের পৃষ্ঠদেশ অথবা তাদের জননীদের উদর থেকে বলে উঠলো, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক (হে আমার প্রভুপালয়িতা! এই তো আমি, এই তো আমি)। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, সর্বপ্রথম 'এই তো আমি' বলেছিলো ইয়েমেনবাসীরা। তাই হজযাত্রীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে উল্লেখিত আন্নাস (মানব সকল) থেকে সম্বোধ্য হবেন কেবলার অনুসারীগণ।

বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন, 'মানুষের জন্য হজের ঘোষণা করে দাও' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। হজরত ইব্রাহিমকে এখানে সম্বোধন করা হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে রসুলপাক স.কে । এভাবে তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে— হে আমার রসুল! আপনার বিদায় হজ উপলক্ষে সকল মানুষকে হজ করতে বলুন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন, হে জনতা! তোমাদের উপর হজ ফরজ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা হজ পালন করো। মুসলিম, আহমদ, নাসাঈ। দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে'। কথাটি পরবর্তী ঘটিতব্য বিষয়ের বর্ণনা। কারণ পরক্ষণেই উল্লেখ এসেছে উটের। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, বাহনের সুবন্দোবস্ত ব্যতিরেকে হজ ফরজ। আর একথা দাউদ জাহেরী ও তাঁর সমমনা আলেমগণের অভিমতের পক্ষের কোনো দলিলও নয়। তাঁরা এবং মালেকী মতাবলম্বীগণের নিকটে বাহনবিহীন ব্যক্তির উপরেও হজ ফরজ। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে যথাস্থানে আমি হজের বাহন ও পাথেয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মাসআলা ঃ পদব্রজে হজ করা উত্তম কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যারা পদব্রজে গমন করতে সক্ষম তাদের জন্য পদব্রজে হজ সমাধা করাই উত্তম। কেননা আলোচ্য আয়াতে বাহনের পূর্বে পদব্রজের উল্লেখ এসেছে। পায়ে হেঁটে হজ করা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। তাই এমতো হজযাত্রায় প্রকাশ পায় নম্রতা ও বিনয়বনতা। কেউ যদি পায়ে হেঁটে হজ পালন করার মানত করে তবে তাকে সেভাবেই হজ করতে হবে— এরকম সাব্যস্ত করে দিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং। আরো বলেছেন, সে এরকম না করতে পারলে তার উপরে ওয়াজিব হবে একটি কোরবানী। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পায়ে হেঁটে হজ করাই উত্তম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যানবাহনে আরোহণ করে হজ পালন করাই উত্তম। কারণ পদযাত্রা ক্লেশকর বলে মূল ইবাদতে শৈথিল্য অথবা ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ইসলামে বৈরাগ্যের প্রশ্রয় নেই।

'ওয়া আলা কুল্লি দ্বমিরিন্' অর্থ সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে। 'দ্বমিরিন্' এর শাব্দিক অর্থ কৃশকায়। এরকম উটই দূরগামী ও দীর্ঘ সফরের উপযোগী। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, হজযাত্রায় অনীহদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশ। পরে আবার তাদেরকে পথ খরচ সঙ্গে নেয়ার এবং হজের সফরে ব্যবসা করার অনুমতিও দিয়েছেন আল্লাহ্।

'ইয়াতীনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব' অর্থ তারা দূরদূরান্তরের পথ অতিক্রম করে। পূর্বের বাক্যের 'দ্বমিরিন্' পুংলিঙ্গ হলেও অর্থগত দিক থেকে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। 'কুল্লি (সর্বপ্রকার) শব্দটি তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আর সে কারণেই 'ইয়াতীনা' শব্দরূপটিও হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক।

এর পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা তাদের কল্যাণ লাভ করে'। এখানকার 'মানাফিয়া' শব্দটির অর্থ পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণ, যা অর্জিত হয় হজের মাধ্যমে। ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, শব্দটির অর্থ ক্ষমা করার স্থান পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ করে ও হজ সম্পাদনকালে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে সে প্রত্যাবর্তন করে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে। বোখারী, মুসলিম। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মানাফিয়া' অর্থ বেসাতি। ইবনে জায়েদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসেরও এমতো অভিমত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, শব্দটির অর্থ বাণিজ্য কেন্দ্র বা বাজার। মুজাহিদ বলেছেন, 'বাণিজ্য'ও শব্দটির একটি অর্থ। সামগ্রিক অর্থ— ওই সকল জাগতিক ও ধর্মীয় কাজ, যা আল্লাহ্পাক পছন্দ করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে স্মরণ করে আল্লাহ্র নাম'। একথার অর্থ— এবং কোরবানীর জন্য নির্ধারিত দিনগুলোতে কোরবানীর পশু জবাইকালে তারা যেনো স্মরণ ও উচ্চারণ করে আল্লাহ্র নাম। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার কথা বলে এখানে কোরবানী করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— জবেহের মাধ্যমে হোক, অথবা হোক নহরের মাধ্যমে। আরো উল্লেখ্য, আল্লাহ্র নাম স্মরণ ও উচ্চারণ ব্যতিরেকে জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ হালাল নয়। একথার মাধ্যমে এই বিষয়টিও প্রমাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নাম স্মরণ অত্যাবশ্যক।

'আইয়ামে মা'লুমাত' অর্থ নির্দিষ্ট দিনগুলি। অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিলহজ মাসের দশ দিনকে। 'মা'লূমাত' বলে ওই দিবসগুলো গণনা ও বিবেচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা ওই দিবসগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজও এসে হয়ে যায়। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আইয়ামে মা'লূমাত' বলে বুঝানো হয়েছে আরাফার কোরবানীর দিবস এবং আইয়ামে তাশরিককে। মুকাতিল কেবল আইয়ামে তাশরিককে (তকবীর পাঠের দিবসসমূহকে)ই আইয়ামে মা'লূমাত বলেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, এখানে 'নির্দিষ্ট দিনগুলির' অর্থ কোরবানীর দিন ও তার পরের তিনদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তিনি যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন আনয়াম থেকে, তার জবেহকালে'। এখানে 'আনয়াম' অর্থ ওয়াজিব মোস্তাহাব সকল প্রকার কোরবানীর পশু যা প্রেরণ করা হয় কাবাগৃহের দিকে। উল্লেখ্য, এখানে ওয়াজিব

ও মোস্তাহাব কোরবানীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। সাধারণভাবে সকল প্রকার কোরবানীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর সে সময় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে 'স্মরণ করো আল্লাহ্‌র নাম'।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'দমুল ইহসার' ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে কোরবানীর দিন ও তার পরের তিন দিন। উল্লেখ্য, ইহ্‌রাম পরিহিত হজযাত্রী পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে হজের সংকল্প স্থগিত রেখে সেখানেই কোরবানীর পশু জবাই করতে হয়। এরকম কোরবানীকেই বলে 'দমুল ইহসার'।

আমরা বলি, সর্বসম্মত অভিমতানুসারে 'আইয়ামে মা'লূমাত' হচ্ছে হজের সময়ের কোরবানীর দিবসসমূহ। এর বিপরীত অভিমতের পরিপোষক আমরা নই। অবশ্য এ ব্যাপারে হজরত আলী ও হজরত ইবনে আব্বাসের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের মতে নফল, মানত ও কাফফারার কোরবানী ওই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে হওয়া জরুরী নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বছরে রসুল স. ওমরা করার উদ্দেশ্যে জিলকদ মাসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো সত্তরটি কোরবানীর উট। মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে তিনি ওই উটগুলো জিলকদ মাসেই হুদায়বিয়ায় কোরবানী করেছিলেন। জিলহজ মাসের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিবসসমূহের অপেক্ষা করেননি। সুতরাং নফল কোরবানী জিলকদ মাসেও জায়েয। আবার মানত করলে নফল ইবাদত হয়ে যায় ওয়াজিব। আর এ ধরনের ওয়াজিব কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময় করা যায়। অনুরূপ হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করার কাফফারা ও অন্যান্য পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে সকল কোরবানী করতে হয়, সে সকল কোরবানীও কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক কাফফারার কোরবানী সম্পর্কে বলেছেন 'হাদিয়্যান বালিগাল কা'বাতি'। সেখানে কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখই করেননি। স্মর্তব্য, আল্লাহ্‌র কিতাব যদি কোনোকিছুকে সুনির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে কেউই তা সুনির্দিষ্ট করে নেয়ার বা দেয়ার অধিকার রাখে না। তাই আমরা নফল, মানত, কাফফারা ইত্যাকার কোরবানীকে হজের সময়ের কোরবানীর নির্দিষ্ট দিনসমূহের অন্তর্ভূত বলার পক্ষপাতি নই। তবে তামাত্তু ও কিরান প্রকৃতির হজের কোরবানী আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'নির্দিষ্ট দিবসে'র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। অন্য সময় এ ধরনের কোরবানী সিদ্ধ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফা বলেন, অবরোধের কারণে স্থগিত কোরবানীও 'নির্দিষ্ট দিবসসমূহে'র অন্তর্গত। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ আবার এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন। সুরা বাকারার তাফসীরে যথাস্থানে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি। প্রয়োজনবোধে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা তা থেকে আহার করো'। আলেমগণের ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, এখানে 'আহার করো' বলে নিজের কোরবানী করা পশুর গোশত আহার করা যে মোস্তাহাব (অভিপ্রেত) সে কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটি অত্যাবশ্যক কোনো আদেশ নয়। ইমাম শাফেয়ী কেবল বলেছেন, কথাটি বলা হয়েছে বৈধ (মোবাহ) প্রমাণার্থে, মোস্তাহাব বা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) অর্থে নয়। আলেমগণ আরো বলেন, মূর্খতার যুগের মানুষ মনে করতো, নিজের কোরবানী করা পশুর গোশত ভক্ষণ নিজের জন্য অবৈধ। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তাদের ওই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। অনুমতি দেয়া হয়েছে গোশত ভক্ষণের ।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য জায়েয। এর প্রমাণ রয়েছে বিদায় হজের বিবরণসমৃদ্ধ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে। সেখানে বলা হয়েছে, হজরত আলী কিছুসংখ্যক উট এনেছিলেন ইয়েমেন থেকে। আর রসুল স. সঙ্গে নিয়েছিলেন আরো একশত উট। রসুল স. নিজ হাতে জবাই করলেন তেষট্টিটি। তারপর তাঁর নির্দেশে অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন হজরত আলী। এরপর তিনি স. প্রতিটি উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়ে একত্র করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন রান্নার। রান্না শেষে ওই গোশত থেকে রসুল স. নিজে আহার করলেন। হজরত আলীও হলেন তাঁর আহার সঙ্গী। তাঁরা দু'জনে ওই গোশতের শুরুয়াও পান করলেন। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নিজের নফল কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা মোস্তাহাব। তাই রসুল স. সবগুলো উট থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়েছিলেন। মোস্তাহাব না হলে দুই একটি উট থেকে গোশত নেয়াই ছিলো যথেষ্ট।

মাসআলা ঃ হজের কোনো ত্রুটির কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, অথবা যা স্থিরীকৃত হয় ইহ্রাম অবস্থায় শিকারজনিত কাফ্ফারারূপে, তার গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য নাজায়েয। কাফ্ফারার কোরবানী হচ্ছে বধকৃত কোরবানীর বদলা। এক আয়াতে বলা হয়েছে — ফাজ্বামাউ মিছলু মা ক্বাতালা মিনান্নায়ামে' (চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যে যা বধ করেছে, বস্তুতঃ এটাই তার বিনিময়)। এই আয়াতে বলা হয়েছে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অথবা মূল্যমানগত সাদৃশ্যের কথা। সুরা মায়েদার যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহ্রাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশত শিকারীর জন্য হালাল নয়। তাই তার কাফ্ফারা বা বদলা পশুর গোশতও তার জন্য নাজায়েয। অর্থাৎ মূল যেহেতু হারাম, সেহেতু তার বদলাও হারাম। রসুল স. বলেছেন, ইহুদীদের উপরে আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

আল্লাহ্ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা চর্বি গলিয়ে বিক্রয় করতো এবং ভক্ষণ করতো ওই চর্বির বিক্রিত অর্থ। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। মানতের কোরবানী সম্পর্কেও একই হুকুম। কেবল ইমাম মালেকের মতে হালাল হলেও অন্য সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, মানত পূরণকারী ব্যক্তি তার মানতের পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে না।

হজ পালনকালে বিভিন্ন অপরাধের কারণে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়াও কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। এই অভিমতটিও ইমামগণের ঐকমত্যসঞ্জাত। হজ ভঙ্গ করার জন্য যে কোরবানী অত্যাবশ্যক হয়, তার বিধানও অনুরূপ।

ইসহাকের অভিমত ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতরূপে এসেছে, মানতের কোরবানী এবং শিকারের বদলারূপে কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত ছাড়া অন্য সকল প্রকার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা ভক্ষণ করতে পারবে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেন, মানতের এবং সকল প্রকার অপরাধের কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য অসিদ্ধ। শিকারজনিত কাফ্ফারার কোরবানীর গোশত সিদ্ধ নয়। কারণ বিধানগতভাবে সকল প্রকার কাফ্ফারাই কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ বা বদলা)। সকল কাফ্ফারা প্রাপ্য হকদারের। আর কোরবানীদাতা তো হক পরিশোধকারী।

মানতের কোরবানী কোনো অপরাধের কাফ্ফারা নয়। কিন্তু মানতকে ইহ্রাম অবস্থায় শিকারের কাফ্ফারার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এরকমও বলা যায় যে, মানতের কোরবানীও হকদারকে পুরোপুরি পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক। তাই এমতোক্ষেত্রেও মানত পূরণকারী তার কোরবানীর পশুর গোশত খেতে পারবে না।

মাসআলাঃ সাধারণ কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা খেতে পারবে। অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানী হচ্ছে আনুগত্যের প্রকাশ। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, কোরবানীর গোশত তোমরা নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। প্রয়োজনবোধে জমাও করতে পারো। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য আলেমও এমতো বৈধতার প্রবক্তা। ওয়াজিব, নফল, মাসনুন, মোস্তাহাব— এসকল কোরবানীর ক্ষেত্রে এ বৈধতা প্রযোজ্য।

মাসআলা ঃ তামাত্তু ও কিরান প্রকৃতির হজযাত্রীদের কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতারা খেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা

রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে এমতো কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতার জন্য সিদ্ধ। কারণ এ ধরনের কোরবানী অবশ্যই ইবাদত ও আনুগত্যের প্রকাশ। ইতোপূর্বে আমি হজরত জাবেরের হাদিসে উল্লেখ করেছি রসুল স. প্রতিটি জবেহকৃত উট থেকে কিছু কিছু করে গোশত নিয়ে পাক করিয়ে খেয়েছিলেন। ওই গোশতের শুরুয়াও পান করেছিলেন। হজরত আলীকেও করে নিয়েছিলেন তাঁর ওই পানাহারের অংশীদার।

ইবনে জাওজী তাঁর সুনান পুস্তকে আবদুর রহমান ইবনে আবী হাতেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে আজ্ঞা করলেন, তামাত্তু কোরবানীর গোশতগুলো খেয়ে নাও। আমি তাই করলাম। তারপর যা কিছু অবশিষ্ট রইলো, তা খয়রাত করে দিলাম। এই হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তামাত্তু কোরবানীর গোশত খাওয়া সর্বৈবরূপে বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, তামাত্তু ও কিরান জাতীয় কোরবানীর গোশত ভক্ষণ কোরবানী দাতার জন্য অসিদ্ধ। বরং কোনো কোনো ওয়াজিব কোরবানীর গোশত এরকমও অসিদ্ধ, চাই তা মানতের কারণে ওয়াজিব হোক, অথবা অন্য কোনো কারণে। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে তিনটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন— ১. ওই হাদিস যা হুদায়বিয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন হজরত নাজিয়া খাজায়ী। ২. হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। ৩. হজরত ইবনে তালহা বর্ণিত হাদিস। আমি সুরা বাকারার যথাস্থানে হাদিসগুলোর উল্লেখ করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও লিপিবদ্ধ করেছি। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে 'আহার করো'। অতএব কোরবানীর গোশত ভক্ষণ বৈধ— চাই সে কোরবানী ওয়াজিব হোক, যেমন তামাত্তু ও কিরান, অথবা হোক নফল। এখানে ওয়াজিব-নফলের ভেদাভেদ রাখা হয়নি। কেবল ঐকমত্যসম্ভূত বলেই মানতের কোরবানীকে এই বৈধতা থেকে আলাদা করা হয়েছে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানতের কোরবানীর জায়েয নাজায়েযের মাসআলা হজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয় নয়। তবে ইহ্রাম অবস্থায় শিকারের কাফ্ফারার কোরবানী হজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ওই ধরনের কাফ্ফারার কথা বলাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতের 'আহার করো' নির্দেশটি দেয়া হয়েছে কেবল ওই সকল হজযাত্রীকে যারা সম্পূর্ণরূপে শরিয়তানুগত, যারা তাদের হজকে রাখে নিষ্কলুষ। ত্রুটিযুক্তদের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আহার করাও দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে'। এখানে 'আল বায়িসা' অর্থ অভাবগ্রস্ত। আর 'বাউসুন' অর্থ অত্যন্ত অভাবী।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২৯

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

❒ অতঃপর তাহারা যেন তাহাদিগের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদিগের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যেনো তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে'। একথার অর্থ— তারপর তারা যেনো মস্তক মুণ্ডন করে, হাত-পায়ের নখ কাটে এবং পরিষ্কার করে ফেলে বগল ও নাভির নিচের পশম। তাফসীরকারগণ বলেছেন, আরাফাতের অবস্থান শেষে মুজদালিফা হয়ে মিনায় ফিরে আসার পর ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে বর্ণিত কাজগুলো করা যাবে। কিন্তু স্ত্রী-সহবাস তখনো বন্ধ থাকবে। স্ত্রী-গমন সিদ্ধ হবে তাওয়াফে জিয়ারতের পর।

এখানে 'কৃদ্বা' অর্থ আদায় করা, সুসম্পন্ন করা, পূর্ণ করা। যেমন বলা হয়— কৃদা দাইয়ানাহু (সে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে)। এক আয়াতে এসেছে— ওয়া ইজা কৃদ্বাইতুম মানাসিকাকুম (আর যখন তুমি হজের আরকান সমূহ আদায় করবে)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— কৃদ্বাহুন্না সাব্‌আ' সামাওয়াত (তাকে পরিণত করে দিয়েছেন সাতটি আকাশে)। উল্লেখ্য, কোনো কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর তা থেকে অবসর নেয়া হয়। এখানেও তেমনি হজ থেকে অবসর নেয়ার জন্য বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'তাফাছা' অর্থ হজের রোকনসমূহ। যেমন— মস্তক মুণ্ডন, নখ কর্তন, বগল ও নাভির নিচের পশম উৎপাটন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তাফাছা' অর্থ কংকর নিক্ষেপণ। জুজায বলেছেন, শব্দটি আমি জানতে পেরেছি কোরআনের মাধ্যমেই। আরবী ভাষায় শব্দটি সুপ্রচল নয়।

মাসআলা ঃ কিরান হাজীদের জন্য কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী, মস্তক মুণ্ডন এবং তাওয়াফ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি প্রয়োগের কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তক মুণ্ডন ও তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে কোরবানী করার পর। এটাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতের অনুকূল দলিল। কংকর নিক্ষেপণ এবং কিরান হাজীদের জন্য কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (প্রথমে কোরবানী, পরে মস্তক মুণ্ডন) ওয়াজিব।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা, হাসান ও ইব্রাহিম নাখয়ী এরকমই বলেছেন। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলক্রমে এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি পশু কোরবানী করা তার উপরে হয়ে পড়বে ওয়াজিব। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে হজের রোকনসমূহের তারতীব (ধারাবাহিকতা) খর্ব করা হলে (ক্ষতিপূরণের) কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইবনে আবী শায়বা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রপরম্পরায়। আর এমতো পরিস্থিতিতে অপরিণত হাদিসও সুপরিণত হাদিসের সমতুল। কারণ বিষয়টি ক্ষতিপূরণ বিষয়ক। এ ধরনের শাস্তিমূলক বিধান হজরত ইবনে আব্বাস নিশ্চয় রসুল স. এর কাছ থেকে না শুনে বলেননি।

একটি সন্দেহ ঃ বর্ণিত হাদিসটির সূত্রসংযুক্ত এক বর্ণনাকারী ইব্রাহিম ইবনে মুহাজিরের হাদিস পরিত্যজ্য বলেছেন আবী হাতেম। আর ইবনে মদিনী ও নাসাঈর নিকট তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইবনে মদিনী বলেছেন, তার বর্ণনাকৃত হাদিস শিথিল সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের অন্তর্ভূত করা হয়েছে।

সন্দেহের নিরসন ঃ ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির ছিলেন একজন মহামর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ী। ইমাম মুসলিমও তাঁর বর্ণনার আনুকূল্যকে মান্য করেছেন। তাছাড়া তাঁকে ক্রটিমুক্ত বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আহমদ ও তিরমিজি। উপরন্তু ভিন্ন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির যার সূত্রপরাম্পরাভূত নয়। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, আমি হাদিসটি শুনেছি ওয়াহাব থেকে, তিনি শুনেছেন আইয়্যুব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে এবং তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

ইমাম আহমদ বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভেঙে ফেললেই কেবল কোরবানী ওয়াজিব হবে। ভুলবশতঃ অথবা নিরুপায় হয়ে করলে হবে না। তাঁর এই অভিমতটির কথা আছরামও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারীর মাধ্যমেও একথা অবগত হওয়া যায়। অভিমতটি আমারও মনঃপুত। কারণ ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তরতীব রক্ষা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

ইমাম মালেক বলেন, কোরবানী ও কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মস্তক মুণ্ডন সিদ্ধ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. কে একবার কোরবানী, কংকর নিক্ষেপণ ও মস্তক মুণ্ডনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই। বোখারী ও মুসলিম। বোখারীর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোরবানীর দিবসে মিনায়। তিনি স. তখন বলেছিলেন, কোনো ক্ষতি নেই। এক লোক বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল!

আমি তো কোরবানী করার আগে মুণ্ডিতমস্তক হয়েছি। তিনি স. বলেছিলেন, অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও। বোখারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স. এর মহান সংস্পর্শে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই জিয়ারত (তাওয়াফে জিয়ারত) করেছি। তিনি স. বললেন, বিপত্তির কিছু নেই। তিনি পুনরায় বললেন, আর আমি তো কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানীও করে ফেলেছি। তিনি স. বললেন, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই কাবা তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি স.বললেন, ঠিক আছে। এবার কংকর নিক্ষেপণ সমাধা করো। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, কোরবানীর পূর্বে তাওয়াফ করার বিষয়ে রসুল স. সকাশে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন হজরত আলী স্বয়ং। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তরতীব রক্ষা করা যদি ওয়াজিব হতো, তবে রসুল স. নিশ্চয় তাঁকে পুনরায় হজের আরকানসমূহ পুনরায় ধারাবাহিকভাবে সম্পাদনের নির্দেশ দিতেন। কারণ তখনও কোরবানীর দিবস অবশিষ্ট ছিলো। অথবা দিতেন তরতীব ভঙ্গ করার ক্ষতিপূরণের (কোরবানীর) নির্দেশ। কিন্তু তিনি স. এরকম করেননি। আর ওই জনসমাবেশটি ছিলো তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। সকলেই ছিলেন তখন হজের যথাযথ বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে একান্ত আগ্রহী। সুতরাং কোনো বর্ণনাতেই যেহেতু এ ব্যাপারে পুনরায় রোকনসমূহ ধারাবাহিকভাবে পালন অথবা কোরবানীর নির্দেশ আসেনি এবং কেউই এ সম্পর্কে কোনো আলোচনার সূত্রপাত করেননি, সেহেতু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তরতীব ওয়াজিব নয়। ওয়াজিব হলে রসুল স. অবশ্যই তা জানাতেন। অতএব, একথা বলতেও আর কোনো বাধা নেই যে, বর্ণিত বিষয়ে তরতীব ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করলেও কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, উপরোক্ত ঘটনাবলীর একজন প্রধান বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁর নিকট থেকে আবার বিপরীতধর্মী বক্তব্যও এসেছে। তিনি বলেছেন, হজের আরকান প্রতিপালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। এখন কথা হচ্ছে বর্ণনাকারীর বক্তব্য যদি তাঁর বর্ণনাকৃত বিষয়ের বিপরীত হয়, তবে তাঁর বর্ণনাও হয়ে যায় ত্রুটিযুক্ত, স্ববিরোধী। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরকম নয়। এখানে স্ব স্ব স্থানে তাঁর বর্ণনা ও অভিমত সঠিক। অভিমতটিও আবার সুপরিণত বর্ণনার সমতুল। সুতরাং বুঝতে হবে তাঁর আগের বর্ণনা পরের কোনো এক বর্ণনা দ্বারা রহিত হয়েছে। আর সেই রহিতকারী বর্ণনার প্রেক্ষিতেই তিনি সরাসরি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, হজের আরকান পালনে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী দিতে হবে। সমস্যাটিকে এভাবে গ্রহণ করলে ইমাম শাফেয়ীর মতামতকেও ভুল বলা যায় না। কারণ তাঁর বিচারে

বর্ণনাকারীর অভিমতবিরোধী বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ নয়। বরং ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থার বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ, যদি বর্ণনাকারীর অভিমত সুপরিণত পর্যায়ের হয়। এরকম অভিমত হয় তাঁর ইতোপূর্বের বর্ণনার রহিতকারী। কিন্তু এখানকার বিষয়টি সেরকম নয়। অর্থাৎ এখানে তাঁর অভিমত পরিণত পর্যায়ের, সুপরিণত পর্যায়ের নয়।

আমি বলি, দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী হাদিসের কোনো একটিও পরিহরণীয় নয়। বরং এ ধরনের বৈপরীত্যের সমন্বয়ন আবশ্যক। তাই আমার অভিমত হচ্ছে, সুপরিণত হাদিসের পর্যায়ভূত ও উত্তমসূত্র বিশিষ্টতার মর্যাদাপ্রাপ্ত হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতটিকে প্রয়োগ করতে হবে ইচ্ছাকৃত তরতীব ভঙ্গের ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ীর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টিকে প্রয়োগ করতে হবে অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গের বেলায়। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তরতীব ভঙ্গ করলে কোরবানী ওয়াজিব হবে, কিন্তু ভুলবশতঃ এরকম করলে হবে না। যেমন ইমাম আবু হানিফা বলেন, পরিত্যক্ত নামাজের ওয়াক্তের তরতীব রক্ষা করা এবং নিয়ত করা ওয়াজিব। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে ভুলবশতঃ তরতীব ভঙ্গ হলে দোষের কিছু নেই। আবার রোজা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোজা ভাঙে না। ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ভাঙে। হজের আরকানের তরতীব রক্ষার ব্যাপারটিকেও এরকম মনে করতে হবে।

মাসআলা ঃ মস্তক মুণ্ডন ইহ্‌রামের জন্য ওয়াজিব, কিন্তু তা হজের কোনো রোকন নয়। অর্থাৎ হজের সঙ্গে মস্তক মুণ্ডনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকী মতাবলম্বী আলেম বলেন, কাজটি মোবাহ্ (অনুমোদিত)। একটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গেও এমতো অভিমতের সম্পর্কায়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমার দলিল হচ্ছে আলোচ্য আয়াত। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করার কথা। আর 'তাফাছা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মস্তক মুণ্ডনকে। আর এখানকার বক্তব্যটিও নির্দেশসূচকতার মতো। সুতরাং মস্তক মুণ্ডন হজের একটি আবশ্যকীয় রোকন (ওয়াজিব)। আর এখানে এমতো সন্দেহ ও উত্থাপিত হতে পারে না যে, তাহলে নির্দেশটিকে ফরজ বলা যাবে না কেনো? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আয়াতের নির্দেশনা এখানে স্পষ্ট হলেও ব্যাখ্যাগত দিক থেকে নির্দেশটি অকাট্য নয়, বরং সম্ভাব্য। অতএব, মস্তক মুণ্ডন হজের রোকন হিসেবে ওয়াজিব বলে অভিহিত হতে পারে, এর অধিক নয়।

ইমাম শাফেয়ী মস্তক মুণ্ডনকে এ কারণে হজের রোকন বলে গণ্য করেছেন যে, এর মাধ্যমে ইহ্‌রামের বিধান শেষ হয়ে যায়। আর ইহ্‌রাম হচ্ছে হজের সরাসরি রোকন। তাই সরাসরি রোকনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ও রোকন বলে গণ্য। যেমন

তাঁর মতে সালাম (উচ্চারণের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা) নামাজের রোকন। কেননা সালাম উচ্চারণের ফলে নামাজের রোকনসমূহের সমাপ্তি ঘটে। আমাদের মতে মস্তক মুণ্ডন হজের শর্ত বা রোকন হোক আর না হোক, কোনো অবস্থাতেই তা এমন শর্ত বা রোকন নয়, যার মাধ্যমে ইহ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আমাদের মতে 'সালাম'ও নামাজের রোকন নয়। ইহ্রামের সঙ্গে তুলনীয়ও নয়। কেননা রসুল স. সালামকে নামাজের তাহ্রীমার (পার্থিব কর্মের নিষিদ্ধতার) সমাপ্তি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি স. বলেছেন, তাকবির (প্রথম আল্লাহু আকবার ধ্বনি) নামাজের তাহরীমা (নিষিদ্ধতা আরোপক) আর সালাম নামাজের তাহ্লীল (নিষিদ্ধতা বিলোপক)। অর্থাৎ নামাজ শুরু হয় 'আল্লাহু আকবার' সহযোগে, আর শেষ হয় 'সালাম' দ্বারা। সালামের আগেও অবশ্য নামাজ বিনষ্টক বাক্য ও আচরণ দ্বারা নামাজ শেষ বা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তাহরীমাকে শর্ত বা রোকন বলা হলেও কিন্তু হজের ইহ্রাম এরকম নয়। নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা সত্ত্বেও হজের ইহ্রাম ভঙ্গ হয় না। লক্ষ্য করুন ইহ্রাম অবস্থায় আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীগমন করলেও ইহ্রাম বিনষ্ট হয় না। ইহ্রাম বলবৎ থাকে কিন্তু হজ পণ্ড হয়ে যায়। অর্থাৎ পরের বছরে ওই হজের কাজা আদায় করে নিতে হবে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, হজ ঠিক থাকবে। অথচ ইহ্রাম বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ মস্তক মুণ্ডনের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। অধিকাংশ আলেম এরকম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সময় শুরু হয় অর্ধরাত্রির পর থেকে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে (ফজরের) নামাজ মুজদালিফায় পড়েছে এবং তার আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ পূর্ণ হয়েছে এবং সে দূর করেছে তার অপবিত্রতা (হয়েছে মুণ্ডিত মস্তক)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি সকল হাদিসবেত্তাগণের শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বোখারী ও মুসলিম হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি। কারণ হাদিসটি ছিলো তাঁদের নির্বাচনবিধির মূলনীতির পরিপন্থী। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল শো'বা। আমি আবার হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরিছের নামের স্থলে পেয়েছি হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের নাম। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ সহ অধিকাংশ আলেমের মতে মস্তক মুণ্ডনের শেষ সময়সীমা বলে কিছু নেই। কিন্তু এই বিষয়টি বিতর্কমণ্ডিত যে, মস্তক মুণ্ডনের স্থান কি হেরেম শরীফের ভিতরে হতেই হবে, না বাইরে হলেও চলবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার হেরেম শরীফকে মস্তক মুণ্ডনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়

স্থান বলে মনে করেন না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, মস্তক মুণ্ডনের রয়েছে দু'টি দিক— ১. মস্তক মুণ্ডন ইহ্রাম ভঙ্গ হওয়ার মাধ্যম ২. মস্তক মুণ্ডন আরকানে হজের অন্তর্ভূত একটি ওয়াজিব রোকন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং শেষোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুণ্ডনকর্মের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ তা সম্পাদিত হতে হবে হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যেই। কারণ তা হজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি ইবাদত যার মধ্যে কিয়াসের (তুলনামূলকতার) অবকাশ মাত্র নেই। সুতরাং বিষয়টি শরিয়ত প্রবর্তক রসুল স. এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়াই সমীচীন। আর তাঁর সাব্যস্তানুসারে মস্তক মুণ্ডনের সময় হচ্ছে কোরবানীর দিন এবং স্থান হেরেমের অভ্যন্তর। প্রথমোক্ত অবস্থায় অবশ্য কিয়াসের অবকাশ রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ও স্থানে মস্তক মুণ্ডন করলেও ইহ্রাম মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তা শরিয়তের পরিপন্থী হওয়ার কারণে গণ্য হবে বাতিল বলে। তাই ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটি কোরবানী হবে ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণিত হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কোরবানী করার আগেই মস্তক মুণ্ডন করলে কোনো অসুবিধে হবে না, কিন্তু তাকে দিতে হবে ক্ষতিপূরণের কোরবানী।

আমরা বলি, হাদিসটির ব্যাখ্যা এরকম— তখনও কোরবানীর দিবস বাকি ছিলো, বাকি ছিলো মস্তকমুণ্ডনের সময়ও। তাই রসুল স. কোরবানীর আগে মস্তক মুণ্ডনকারীকে বলেছিলেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখন কোরবানী করে নাও।

এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি প্রসঙ্গ। তা হচ্ছে— রসুল স. হুদায়বিয়ায় কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইমাম আজম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. তখন হয়েছিলেন বাধাগ্রস্ত। তাই নিরুপায় অবস্থায় তাঁকে হুদায়বিয়াতেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে হয়েছিলো। তিনি আরো বলেছেন, এরকম পরিস্থিতিতে মস্তক মুণ্ডন ওয়াজিব নয়। আমি বলি, কাউকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে এভাবে ঠেকিয়ে রাখলে, তাকে বলতে হবে অপারগ (মাজুর)। এরকম অপারগতা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অপারগ ব্যক্তি যেখানে সম্ভব হবে সেখানেই কোরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করতে পারবে।

আমরা হেরেমের অভ্যন্তরে মস্তক মুণ্ডনের যে শর্ত আরোপ করেছি, সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যের (এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের) তাফসীরে আরো ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুরা আল ফাতাহের ২৭ সংখ্যক আয়াতেও মস্তকমুণ্ডন ও চুল কর্তনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে হেরেম শরীফের অভ্যন্তরভাগকে। যেমন— 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে— কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে'।

ইসলামের প্রথম যুগের সাধুপুরুষগণের রীতি ছিলো, তাঁরা সব সময় হেরেমের অভ্যন্তরভাগে মস্তক মুণ্ডন করতেন। কারণ রসুল স. স্বয়ং এরকম করতেন। তাঁর অনুসৃত আদর্শই প্রতিপালিত হয়ে চলেছে, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের যুগে এবং তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে। ওমরার সময় মস্তক মুণ্ডন করতেন মারওয়ার নিকট আর হজের সময় মুণ্ডন করতেন মীনাতে। মীনা ও মারওয়া হেরেমের সীমানাভূত।

মাসআলা ঃ মস্তক মুণ্ডন ও কেশ কর্তনের সীমা-পরিসর সম্পর্কেও ইমামগণের মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কামিয়ে ফেলা অথবা কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে একটি অথবা তিনটি চুল কামানো অথবা কর্তন করাই যথেষ্ট। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেন, মুণ্ডন অথবা কর্তন করতে হবে সমস্ত মাথার চুল।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'তারা যেনো তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে', —এই নির্দেশনানুসারে মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি ওয়াজিব। কিন্তু আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ দূর করা আবশ্যক বটে, কিন্তু অত্যাবশ্যক নয়। কেননা এমতোক্ষেত্রে হ্রাস (কছর) করার অনুমতি রয়েছে। আর এরকম হ্রাসের পরিসর সুনির্দিষ্ট নয়। তাই একটি অথবা তিনটি চুল মুণ্ডন অথবা কর্তনের মাধ্যমেও কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরববাসীগণ একটি অথবা তিনটি কেশ কর্তন করাকে মুণ্ডন বলে গণ্য করেন না। তাই মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তনের একটি সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সে কারণেই বলা যেতে পারে কর্তন করতে হবে মস্তকের এক চতুর্থাংশ অংশের চুল। কারণ এক চতুর্থাংশকে সমস্ত অংশের স্থলাভিষিক্ত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই কোরআন মজীদের তাফসীরেই। ওজুর সময় মস্তকের চারভাগের এক ভাগ প্রোঞ্ছনকেই করা হয়েছে সমস্ত মস্তক প্রোঞ্ছনতুল্য। সুরা মায়েদার যথাস্থানে বিষয়টির উপর ইতোপূর্বে ব্যাপক ভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেহেতু ওজুর সময় মস্তকের চার ভাগের এক ভাগ মসেহ করা সম্পূর্ণ মস্তক মসেহ করার স্থলাভিসিক্ত, তাই তিনি মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারেও তেমনি বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম মোহাম্মদ ওজুর সময় এক চতুর্থাংশ মস্তক মসেহ করাকে যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি বলেন, সমস্ত মাথা মসেহ করতে হবে। তাই তারা মস্তক মুণ্ডনের ক্ষেত্রে বলেন, সমস্ত মাথার চুল মুণ্ডন অথবা কর্তন করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, সাহাবায়ে কেরাম এরকমই করতেন। পরবর্তী সময়ের মুসলমানেরাও এরকম আমল করে চলেছেন।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্যসম্ভূত অভিমত এই যে, কর্তন অপেক্ষা মুণ্ডন উত্তম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দয়া করে বলুন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্! রহমত বর্ষণ করো মুণ্ডিত মস্তকদের উপর। সাহাবীগণ আবারো বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অনুগ্রহ করে বলুন কেশকর্তনকারীদের উপরেও। তিনি স. এবারেও বললেন, হে আমার আল্লাহ্! দয়া বর্ষণ করো মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি। সাহাবীগণ বললেন, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। তিনি স. এবার বললেন, হ্যাঁ, কেশকর্তনকারীদের প্রতিও। এক বর্ণনায় এসেছে, 'কেশকর্তনকারীদের প্রতিও' এরকম বলেছিলেন তিনি চতুর্থবার। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদিস বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদের মানত পূর্ণ করে'। আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে 'এবং তাদের মানত পূর্ণ করে'। কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মানত পূর্ণ করার দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে হজের সময়ের সকল ওয়াজিব আমলসমূহকে— মানত করুক অথবা না করুক। অর্থাৎ সে আমল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হোক অথবা মানতের মাধ্যমে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়া হোক। কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল আমল সম্পাদনের কথা, যা মানুষ মানত করার মাধ্যমে নিজেই নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়।

মানতের প্রকারভেদ ঃ মানত দুই প্রকার। ১. শর্তহীন মানত— যেমন কেউ প্রতিজ্ঞা করলো, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুই রাকাত নামাজ পড়বো। ২. শর্ত সাপেক্ষ মানত— যেমন কেউ বললো, যদি আমার এই অভিলাষ পরিপূরিত হয় তবে আমি একটি রোজা প্রতিপালন করবো। এমতোক্ষেত্রে শর্ত আবার দুই ধরনের— ১. অভিপ্রেত ২. অনভিপ্রেত। অভিপ্রেত বা পছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত এরকম— আল্লাহ্পাক আমাকে রোগমুক্ত করলে আমি চারটি রোজা পালন করবো। আর অনভিপ্রেত বা অপছন্দনীয় শর্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— কেউ বললো, যায়েদের সঙ্গে যদি আমি কথা বলি, তবে এক মাস ধরে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব।

শরিয়ত যাকে অত্যাবশ্যক বলে নির্ধারণ করেনি সেরকম কোনো কিছুকে নিজের উপরে অত্যাবশ্যক করে নেয়ার নাম মানত। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াজিব কেউ নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিতে চাইলেও তা মানত বলে গণ্য

হবে না। বরং তা হবে এক ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশক বাক্য। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে নিরাময় করেন, তবে আমি সারা রমজান মাস রোজা রাখবো, অথবা সারা বছর ধরে জোহরের নামাজ পড়বো। বলাবাহুল্য যে, রমজানের রোজা, জোহরের নামাজ ইত্যাদি আগে থেকেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যক। সুতরাং এরকম কথাকে মানত বলা যাবে না। আবার এরকম শপথকেও মানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যার মাধ্যমে শরিয়ত পরিবর্তনের উপক্রম হয়। শরিয়তের বিধানাবলী চুল পরিমাণ এদিক ওদিক করার অধিকার কারো নেই। এমতোক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিযোজন, পরিবিয়োজন অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ যদি আমাকে বিপদমুক্ত করে দেন, তবে আমি আমার সম্পদের জাকাত দিবো এক পঞ্চমাংশ হারে। অথবা বললো, তাহলে আমি জোহরের চার রাকাত নামাজ পাঠ করবো ছয় রাকাত করে। কিংবা বললো, নতুন নতুন ওজু দ্বারা পাঠ করবো প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, অথবা জামাত ছাড়া কোনো নামাজই পড়বো না। এরকম মানতের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। কারণ জাকাত হচ্ছে জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং জোহরের নামাজ চার রাকাত ফরজ। আর নতুন ওজু ছাড়াও নামাজ পাঠ সিদ্ধ (যদি পূর্বের ওজু অটুট থাকে)। আবার জামাত ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে নামাজ পাঠের অনুমতি রয়েছে। এ সকল কিছু হচ্ছে শরিয়তের অপরিবর্তনীয় বিধান। সুতরাং কারো প্রতিজ্ঞা, শপথ বা মানত এগুলোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে না। তাই এ ধরনের শরিয়তবিরুদ্ধ মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ। অবশ্য এমতো ক্ষতিপূরণের বিশেষ কোনো পদ্ধতি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি। অথচ মানত পুরা করা ওয়াজিব। তবে ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী করা একটি সুপ্রসিদ্ধ আমল। যেমন কেউ মানত করলো, আমি হজ করবো পদব্রজে। এরপর যদি সে কোনো বাহনে আরোহণ করে তার হজ সম্পন্ন করে তবে কাফফারা স্বরূপ তাকে দিতে হবে একটি কোরবানী।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর মধ্যে আবার একটি অসুবিধা বিদ্যমান। যেমন, অন্যান্য মানত পূরণ না করা গেলেও 'জাকাত দিবো এক পঞ্চমাংশ'— এই মানতটি শরিয়ত সম্মতভাবে পূরণ করা সম্ভব। এমতোক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের একভাগ জাকাত হিসেবে আদায় করার পর অবশিষ্ট অংশ পরিপূরিত হতে পারে মানত হিসেবে। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

যে আমল শরিয়ত ওয়াজিব করে দেয়নি, নিজের উপর সে ধরনের ওয়াজিব করে নেয়া আমল তিন ধরনের— ১. ওই সকল কাজ, যা পুণ্যার্জক। ২. ওই সকল কাজ, যা পাপার্জক। ৩. ওই সকল কাজ যা পাপপুণ্যের সম্পর্কবিবর্জিত

(মোবাহ)। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, প্রথমোক্ত প্রকার মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর আলোচ্য আয়াতকেই তাঁরা গণ্য করেন তাঁদের এমতো অভিমতের প্রমাণরূপে।

আলোচ্য বাক্যে উদ্ধৃত মানত ফরজে আইন (অবধারিত ফরজ), না ওয়াজিবে জন্নী (অনুমান ভিত্তিক ওয়াজিব) সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপ্রভেদ ঘটিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিধান এই যে, সাধারণ নির্দেশনা দ্বারা কখনো সুস্পষ্ট ফরজ প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য বক্তব্যটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। এখানে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মানত পূর্ণ করে'। কিন্তু পাপার্জক আমলের মানত পূর্ণ করা নাজায়েয। তাই বলতে হয়, আলোচ্য নির্দেশনা থেকে মানত সম্পর্কীয় সঠিক ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু এই হুকুমটি ফরজ নয়, ওয়াজিব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফার নীতিমালা অনুসারেই এখানকার নির্দেশনাটি অকাট্য ফরজ। কারণ মানত পূরণ করার কথা এখানে সাধারণভাবে বলা হলেও মানতের বিধানটি এজমা বা ঐকমত্যসম্মত। আর পুণ্যার্জক আমলের মানত যদি শর্তহীন এবং তা পূরণ করা সাধ্যাতীত না হয়, তবে তা পালন করা ফরজ। এমতাবস্থায় মানত পরিত্যাগ করে কাফ্ফারা আদায় করা সর্বসম্মত অভিমতানুসারে নাজায়েয। কারো কারো মতে এমতোক্ষেত্রে শপথভঙ্গ করে শপথভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা যাবে এবং তা যদি শর্তযুক্ত মানত হয়, আর শর্ত যদি উপস্থিত থাকে, তবে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— এমতাবস্থার বিধান হবে শর্তহীন মানতের মতো। যেনো শর্তযুক্ত মানতের অর্থ এই যে, শর্ত উপস্থিতির সময় আল্লাহ্ই এরূপ কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা পরলোকগমনের সাতদিন পূর্বে তাঁর বর্ণিত অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শর্তসাপেক্ষ মানতের ক্ষেত্রে মানতকারীর এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে তার মানত পূর্ণ করবে, অথবা প্রদান করবে কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। ইমাম মোহাম্মদও এরকম বলেছেন।

যদি কেউ মানত করে, আল্লাহ্ আমাকে এই পীড়া থেকে মুক্তি দিলে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে একটি হজ পালন করবো, অথবা সারা বছর রোজা রাখবো, তবে তার এমতো স্বাধীনতা রয়েছে— সে হজও করতে পারবে অথবা দিতে পারবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো ক্ষতিপূরণ। আর রোজার মানত পূরণের বেলায় অপারগ হলে (ফিদিয়া দিতে অসমর্থ হলে) সারা বছর ধরে রোজা পালন করবে। অথবা রোজা রাখবে মাত্র তিন দিন। কেননা অপারগদের কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে তিন দিন রোজা পালন।

ইমাম আবু হানিফার প্রথমোক্ত অভিমতই হচ্ছে তাঁর প্রকাশ্য মাজহাব, যা বর্ণিত হয়েছে ইমাম মোহাম্মদের গ্রন্থ ষষ্ঠকের যে কোনো একটিতে। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমত, যাতে দেয়া হয়েছে কসমভঙ্গের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা প্রদানের অবকাশ, তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থ ষষ্ঠক বহির্ভূত অন্য একটি গ্রন্থে। আলোচ্য আয়াত তাঁর প্রথমোক্ত অভিমতের প্রমাণ। বিভিন্ন হাদিস দ্বারাও অভিমতটি পরিপুষ্ট। আর তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটির প্রথম বর্ণনাকারী হজরত উকবা ইবনে আমের। তিনি বলেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, কসমের কাফ্ফারাই মানতের কাফ্ফারা। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, কাফ্ফারা আদায় করলে মানত রহিত হয়ে যায়। এই হাদিস আবার অন্য হাদিসের সঙ্গে দৃশ্যতঃ বিপরীত বক্তব্য প্রকাশক। তাই উভয় হাদিসের সমন্বয়নার্থে আমরা বলি, কাফ্ফারা শর্তহীন মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ শর্ত বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত শর্তযুক্ত মানত তো মানতই নয়। কসমের ব্যাপারটাও এরকম। ভঙ্গ না করা পর্যন্ত কসমের কাফ্ফারা প্রদানের প্রশ্নই তো ওঠে না। কিন্তু শর্তহীন মানতের মধ্যে এরকম ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার কোনো অবকাশই নেই। তাই সেখানে কাফ্ফারার সুযোগও অনুপস্থিত।

হেদায়া রচয়িতা ও বিশিষ্ট হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, মানত পূরণ ও কাফ্ফারা আদায়ের স্বাধীনতা লাভ হতে পারে কেবল অহেতুক মানতের ক্ষেত্রে। কেননা অযথার্থ মানতকারী তো শর্ত উপস্থিতির দাবিই করতে পারে না। তাই তার ওয়াজিব মানতের সংকল্পই উৎপন্ন হয় না। আর কোনো মানুষই কামনা করে না যে, সকল সময় তার উপরে ইবাদত অত্যাবশ্যক থাকুক, সে ইবাদত যতোই পুণ্য-উপার্জক হোক না কেনো। ইবাদত পরিত্যক্ত হওয়ার সার্বক্ষণিক দুঃশ্চিন্তা অবশ্যই পরিহরণীয়। তাই একটি যথাসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মানত করতে নিষেধ করেছেন। একথাও বলেছেন যে, মানত কল্যাণার্জনের মাধ্যম নয়। বিশেষ করে কঠিন ইবাদতের অঙ্গীকার অবশ্যই কল্যাণহীন। যেমন— হজ্জ প্রতিপালনের মানত, সারা বছর রোজা রাখার মানত ইত্যাদি।

অবশিষ্ট রইলো সংশয়যুক্ত মানত প্রসঙ্গে। এর বিধান শর্তহীন মানতের মতো। অর্থাৎ কৃত মানত পূর্ণ করতেই হবে। কাফ্ফারার মাধ্যমে এ ধরনের মানত প্রত্যাহৃত হবে না। কারণ শর্তযুক্ত নিয়ত অবশ্যই মানত সাব্যস্ত হওয়ার দাবি রাখে। মোটকথা শর্তহীন ও প্রত্যাহৃত মানত পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক। আর অহেতুক মানত পূরণ করা না করা মানতকারীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। হয় পূরণ করবে, অথবা দিবে ক্ষতিপূরণ। ইমাম আহমদও এরকম বলেন। হেদায়া রচয়িতা

এসকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রকাশ্যতঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর আরো দু'টো অভিমত পরিলক্ষিত হয়— ১. অনভিপ্রেত মানতের কাফ্ফারা দেয়া অত্যাবশ্যক (কাফ্ফারা দ্বারা মানত প্রত্যাহৃত হয় না)। ২. যথাকৃত মানত পূরণই অত্যাবশ্যক।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে মানতরূপে ওই সকল আমল ওয়াজিব, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে ওয়াজিব হিসেবে। যেমন— নামাজ, হজ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি। এসকল মানত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। অথবা দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। কেননা আল্লাহ্‌পাক এগুলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা, জানাযায় সহগমন ইত্যাদিকে আল্লাহ্ ওয়াজিব করেননি। তাই এগুলো সওয়াবের কাজ হলেও মানতের যোগ্য নয়। মিনহাজ গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতরূপে এসেছে, সকল প্রকার ইবাদতের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও তা আল্লাহ্ কর্তৃক অত্যাবশ্যকরূপে নির্ধারিত ইবাদতের অনুরূপ না হয়। যেমন— পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অনুগমন, প্রারম্ভে সালাম প্রদান ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের উপরে কিছু জটিলতার উৎপত্তি হয়। যেমন— ইতেকাফের মানতের ক্ষেত্রে ইতেকাফ আদায় করা আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে ওয়াজিব। অথচ ইতেকাফ আল্লাহ্ কর্তৃক সাব্যস্তকৃত ওয়াজিব সমূহের তালিকাভূত নয়। যদি বলা হয়, রোজা ইতেকাফের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত, আর রমজানের রোজা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াজিব এবং মানতের রোজা ও ইতেকাফের রোজা সমপ্রকৃতির— তবে তার জবাব এই যে, ইতেকাফ রোজা ছাড়াও হতে পারে। আর ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত— একথা মেনে নিলেও আল্লাহ্ কর্তৃক অবশ্যপালনীয় হুকুম সমূহের সঙ্গে ইতেকাফের তো কোনো মিল নেই। কিন্তু মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, তা যে কোনো ইবাদতের হোকনা কেনো। আর তা অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে ইসলাম ও এখলাস (বিশুদ্ধ সংকল্প) সহযোগে। প্রত্যেক ইবাদত কবুলের শর্তই হচ্ছে ইসলাম ও এখলাস— তা ইবাদতের উদ্দেশ্য বা সহায়ক— যাই হোক না কেনো। যেমন ইবাদতের উদ্দেশ্য ইসলামে দৃঢ় হওয়া এবং যেমন ওজু হচ্ছে নামাজের সহায়ক। আর ইসলাম ও এখলাস তো অবধারিতরূপে ফরজ। তাছাড়া মানতের ওয়াজিব ইতেকাফ যদি রমজানের রোজার অনুগামী করা হয়, তবে তখন নফল রোজা রাখার তো কোনো অবকাশই পাওয়া যাবে না। ফরজ রোজার উপস্থিতিতে নফল রোজার অস্তিত্ব যে অসম্ভব। এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার অভিমত জনিত জটিলতার বিবরণ।

মাসআলা ঃ ইবাদতনির্ভর মানত ও কসমের কাফ্ফারা কি ওয়াজিব? এ সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন— কেউ যদি 'রোগমুক্ত হলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখবো' এরকম মানত করার পর সুস্থ হয়, তারপর নির্ধারিত তারিখে রোজা পালন না করতে পারে, তবে অধিকাংশের ঐকমত্যানুসারে অন্য তারিখে হলেও তাকে মানতের রোজা পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে কাফ্ফারাও দিতে হবে কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, তার জন্য মানতের কাজা ও কাফ্ফারা দু'টোই ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কসমের নিয়ত না করে এবং মানতের শব্দই কেবল মুখে উচ্চারণ করে, তবে সে মানতের নিয়ত করুক আর না করুক, সর্বাবস্থায় মানতের কাজা আদায় করা তার উপরে ওয়াজিব, কিন্তু কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি কেবল কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। আবার যদি কসমের নিয়ত করে, মানতের নিয়ত না করে, মানতের ব্যাপারে অন্তরে কোনো নিয়তের উৎপত্তিই না হয়, অথবা কসমের সঙ্গে মানতেরও নিয়ত করে, তবে মানতের কাজা ও কসমের কাফ্ফারা দু'টোই হবে ওয়াজিব।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যদি কেউ কসমের নিয়ত করে এবং মানতের নিয়ত না করে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কেবল কাফ্ফারা, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা সে মানতের রূপক অর্থ গ্রহণ করেছে এবং নিয়ত করেছে কসমের। আর যদি সে মানতের নিয়ত করে, কসমের নিয়ত না করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে কাজা, কাফ্ফারা নয়। কেননা সে এমতোক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে মানতের প্রকৃত অর্থ। আর সে যদি মানত ও কসম— দু'টোরই নিয়ত করে, তথাপিও তাকে আদায় করতে হবে মানতের কাজা, কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা প্রকৃত অর্থের উপস্থিতিতে রূপক অর্থ অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ হকিকত ও মাজায কখনো সমান্তরালরূপে উপস্থিত হতে পারে না। সেহেতু মাজায্ অপেক্ষা হকিকত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সুফিয়ান সওরী তাঁর অভিমত প্রত্যয়নার্থে বলেন, 'মানত' শব্দটি নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের নিয়ত না করেও যদি মুখে মানতের কথা উচ্চারণ করে তবু মানত বিলোপিত হয় না। কারণ, মানত একটি সম্ভাব্য বিষয়। আর সম্ভাবনাময় বাক্য ব্যবহার করলেও তত্ত্বার্থ বিলোপ হয় না । মানতের অবস্থা বিবাহবিচ্ছেদ ও গোলাম স্বাধীন হওয়ার মতোন। রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যা সজ্ঞানে অথবা কৌতুকবশতঃ উভয় অবস্থায় কার্যকর হয়— বিবাহ, তালাক ও দাসমুক্তি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু জর গিফারী থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে তালাক উচ্চারণ করবে, তার তালাক কার্যকর হবে। আর যে ঠাট্টা করেও দাসমুক্তির কথা বলবে, তার কথাও কার্যকর হবে। ইবনে আদী তাঁর 'আলকামিল' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয়ে পরিহাস-কৌতুক চলে না (পরিহাসচ্ছলে বললেও তা কার্যকর হয়)। বিষয় তিনটি হচ্ছে— তালাক, গোলাম আজাদ ও শাদী। পরিণত সূত্রে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর এবং হজরত আলী বলেছেন, তিনটি বিষয়ে খেল তামাশার কোনো অবকাশ নেই— বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও দাস-দাসী মুক্তির ঘোষণা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে চারটি বিষয়ের কথা। চতুর্থটি হচ্ছে মানত। আর কসম হচ্ছে মানতের সতীর্থ অথবা অনুগামী। অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে মানত হচ্ছে কসম। কেননা যে বিষয় শরিয়তের বিধানানুসারে হারাম নয়, তাকে কসমকারীরা নিজেদের উপর হারাম করে নেয়। এভাবে যা হারাম নয়, তা হারাম করে নেয়াই কসম। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— 'হে আমার নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করেছেন কেনো? আপনি আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি চাইছেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ আপনাদের শপথ থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন' (সুরা তাহরীম)। এতক্ষণের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানত কসম বা শপথ হওয়ার জন্য নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। মানতের মধ্যেই রয়েছে শপথের অর্থ। তাই নিয়ত না করলেও কসম রহিত হবে না। বিষয়টি এরকম— যেমন কেউ তার পিতা-মাতা অথবা সন্তান-সন্ততিকে ক্রয় করে নিলো, এমতো ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি মুক্ত হয়ে যাবে— সে তাদেরকে মুক্তিদানের নিয়ত করুক অথবা না করুক।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হারাম নয় এমন কোনো কিছুকে হারাম করে নেয়া সকল ক্ষেত্রে কসম নয়। যেমন— তালাকের পর স্ত্রী, মুক্ত করে দেয়ার পর ক্রীতদাসী, বিক্রয়ের পর বিক্রিত বস্তুও হারাম হয়ে যায়, অথচ পূর্বে তা হারাম ছিলো না। সুতরাং এরকম করা হারাম নয়। কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় হারামের নিয়ত করা হয়, তবে হারাম নয় এমন কিছুও হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন একবার মধু, রসুল স. তাঁর নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে কসমের নিয়ত করেছিলেন। সুরা তাহরীমের উপরোল্লিখিত আয়াতে সে ধরনের কসমের কথাই বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতের কসম হচ্ছে সাংকল্পিক, আবশ্যিক হারাম নয়। সুতরাং যে পর্যন্ত কসমের নিয়ত করবে না, সে পর্যন্ত তা মানতই হবে—

মানতের নিয়ত করুক আর না করুক। কেননা এটাই প্রকৃত অর্থ। আর প্রকৃত অর্থ কখনো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। আর মানতকে পরিত্যাগ করে কসমের নিয়ত করলে, তখন তা কসমই হবে। অর্থাৎ মানতের রূপক অর্থ কসম। আর রূপক অর্থ কসমের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ

পাপযুক্ত মানত, তার হুকুম ও প্রকার ঃ পাপযুক্ত মানত দুই প্রকার ঃ ১. এরূপ মানত যার কোনো একটি দিকও পাপমুক্ত নয়— যেমন মদ্যপান, অবৈধ যৌনচরিতার্থতা ইত্যাদি। এরকম কসম সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরূপ মানতে কসমের নিয়ত থাকলে কসম ধর্তব্য হবে এবং কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর কসমের নিয়ত না থাকলে মানত ধর্তব্য হবে না। বরং তা গণ্য হবে 'অনর্থক শপথ' বা বেহুদা কসম হিসেবে। আলোচ্য আয়াতেও এ ধরনের মানত পূর্ণ করার কথা বলা হয়নি। আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও এরকম। কারণ আল্লাহ্পাক কখনো অশ্লীলতা ও পাপকর্মের নির্দেশ প্রদান করেন না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এমতো অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম মানত ধর্তব্য। এমতাবস্থায়ও কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক— কসমের নিয়ত থাক আর না থাক। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, অধিকাংশ হানাফী আলেম এই অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, যদি কেউ তার মানতকে পাপকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, বলে আমি মানত করছি, আমার এই কাজ সফল হলে আমি যায়েদকে হত্যা করবো— তবে তা কসম বলে গণ্য হবে এবং তা ভেঙে ফেলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

আমি বলি, ইমাম তাহাবীর এমতো বক্তব্যের কারণ এরকম— শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রূপক অর্থের দিকে। রসুল স. বলেছেন, পাপকর্মের মানত হয় না। আর পাপসম্পৃক্ত ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। এই হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। ইমাম আবু হানিফার নিকট এই হাদিসে শপথভঙ্গের যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ওই কাফ্ফারা, যা নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পাপসংশ্লিষ্ট মানত জায়েযই নয়। তবু এ ধরনের অসিদ্ধ মানতের সঙ্গে যদি কেউ কসমের নিয়ত করে তবে পরিশোধ্য হবে কেবল ক্ষতিপূরণ।

২. পাপযুক্ত মানতের আর একটি অবস্থা এরকম— যে বিষয়ে মানত করা হয়েছে, তা গোনাহ্, কিন্তু মানতের কিছু অংশ আবার পাপ থেকে পবিত্র, এবং তা ইবাদতও। যেমন— ঈদুল ফিতরের দিন রোজা পালনের এবং সূর্যোদয়কালে

নামাজ পাঠের মানত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম মানত ধর্তব্য। এমতোক্ষেত্রে মানতকারীকে ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য যে কোনো দিন রোজা রাখতে হবে। ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে না। আর ওই মানতকারী যদি ঈদের দিন রোজা রাখে, তবু তার মানত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নিষিদ্ধ দিবসে রোজা রাখার পাপও তার অবশ্যই হবে। মানতের সঙ্গে এমতো নিষিদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি সে মানত ত্যাগ করে শপথের নিয়ত করে তবে তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। আবার যদি মানত পরিত্যাগ না করে, মানতের নিয়ত না করে নিয়ত করে কেবল শপথের, তবে অত্যাবশ্যক হবে মানতের কাজা এবং শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ— দু'টোই, যেমন হয়ে থাকে ইবাদত সম্পর্কিত মানতের বেলায়।

ইমাম আহমদ বলেন, যদি ওই ব্যক্তি ঈদের দিন রোজা না রেখে অন্য দিন রোজা রাখে, তবে তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণও। কেবল রোজা রাখলে চলবে না। ভিন্ন বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, ঈদের দিন রোজা রাখলে মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, পাপযুক্ত মানত শেষোক্ত প্রকারের অন্তর্ভূত নয়, যেমন পাপমুক্ত মানত অন্তর্গত নয় প্রথমোক্ত প্রকারের। দু'টোর মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। এটাও পাপ, ওটাও পাপ। মানুষ নিজে থেকে পাপ গ্রহণ করতে চাইলেও, তার এমতো ইচ্ছার পরিপূরণ অত্যাবশ্যক নয়।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর বর্ণিত অভিমতকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে — ১. যা অস্তিত্বগত পাপ, তা সর্বাবস্থায় পাপ। ২. যা অস্তিত্বগতভাবে পাপ নয়, অর্থাৎ যা অন্য কোনো কারণবশতঃ রূপান্তরিত হয় হালাল অথবা হারামে। যেমন রোজা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধ নয়, বরং তা ইবাদত। কিন্তু তা ঈদের দিবসে পালন করা পাপ। অর্থাৎ তা পাপে পরিণত হয়েছে ঈদের দিনের কারণে। তাই ঈদের দিন রোজা রাখার মানত করলে তা ধর্তব্য হবে এবং নিষিদ্ধতার কারণে তা ঈদের দিন সম্পাদন করা যাবে না। এমতাবস্থায় মানতের রোজা পালন করতে হবে ঈদ ছাড়া অন্য কোনো দিনে। আর যদি সে ঈদের দিনেই রোজা রাখে তবে তার মানত পূরণ হবে যা পূরণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিলো। এ বিষয়ে ইমামগণের মতপ্রভেদ বিভিন্ন নীতিমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, শরিয়তসম্মত কর্ম পালন করতে যদি নিষেধ করা হয়, তবে ওই কর্মসমূহ হয় সত্তাগতভাবে ক্রটি সংযুক্ত, ফলে তাতে সত্তাগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় শরিয়তের বিধান। আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, শরিয়তের বিধান পালনে যদি অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়, তবে সত্তাগতভাবে ওই আমল হয়ে যায় শরিয়তের পরিপন্থী।

ইমাম আহমদ বলেন, রোজা ইবাদত, সে কারণেই রোজার মানত গৃহীতব্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা পাপসংশ্লিষ্ট বলে ধর্তব্য হবে না। তাই ঈদের দিন রোজা রাখলে মানত আদায় হবে না। কেননা তা পাপসংশ্লিষ্ট। আবার প্রকৃত সময়ে পালন করা হারাম এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে শরিয়তে। যেমন ঋতুবতী নারীর উপরে রমজান মাসে রোজা পালন হারাম। ঋতুকালীন বাদ পড়ে যাওয়া রোজা তাকে পালন করতে হয় অন্য কোনো সময়ে।

৩. অনুমোদিত (মোবাহ্) কাজ পরিত্যাগ করার মানত ধর্তব্য নয়। তবে যদি এমতোক্ষেত্রে কসম করে, তবে কসম ভঙ্গ করার কারণে দিতে হবে কাফ্ফারা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সর্বাবস্থায় মানত হবে না। তবে এমতো মানতকারীর উপরে শপথের বিধান অবশ্যই বর্তাবে সে শপথের নিয়ত করুক, অথবা না করুক। আর শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ করাও হবে তার উপরে অত্যাবশ্যক। এটাই ইমাম শাফেয়ীর প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমতই। আর আমিও একথা বলতে চেয়েছি যে, যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য অনির্ণেয় হয়, তবে গ্রহণ করতে হবে রূপক অর্থ। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে কসম বা শপথকে। কেননা যা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক নয়, তা নির্ধারণ করা তাহরিমী মোবাহ্ (নিষিদ্ধ অনুমোদন)। আমি বলি, এই প্রমাণ তিনিই উপস্থাপন করেছেন, যিনি তাহরিমী মোবাহ্ কসমের প্রবক্তা।

আনুসাঙ্গিক হাদিসসমূহ ঃ জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতের মানত করে, সে যেনো তা পূর্ণ করে, আর অবাধ্যতার মানতকারী যেনো তা পূর্ণ না করে। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যা আল্লাহ্র পরিতোষ কামনার উদ্দেশ্যসম্বলিত, তা-ই মানত বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, একথা বলা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি মানত করেছিলো রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে। আহমদ। বায়হাকী আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অন্য একটি ঘটনা সম্পর্কে। আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন রসুল স. এর এমতো উক্তি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ ইবাদত বিষয়ক মানত সকল অবস্থায় গ্রাহ্য— ওই ইবাদত আল্লাহ্ কর্তৃক বিধিবদ্ধ ওয়াজিব হোক (যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি), অথবা না হোক (যেমন পীড়িত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রুষা ইত্যাদি)।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাপায়িত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই মানতও সিদ্ধ নয়, যা স্বাধিকার বহির্ভূত (যেমন জায়েদ মানত করলো আমি ওমরের ক্রীতদাসকে মুক্ত করে

দিবো)। মুসলিম। আবু দাউদ আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, স্বাধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত কোরো না। ইবনে হুম্মাম এই হাদিসের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, বিষয়টি এরকম ঃ যেমন কেউ বললো, আমি যদি এ কাজ করতে পারি তবে এক হাজার দিরহাম দান করে দিবো, অথচ তার নিকটে একশত দিরহামের বেশী নেই। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় তাকে ওই একশত দিরহামই দান করতে হবে। অধিকার বহির্ভূত বিষয়ে মানত সাব্যস্ত হবে না। আবার কেউ যদি অন্যের কোনো পশুর দিকে ইঙ্গিত করে বলে, ওই পশুটিকে আমি কোরবানীর জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রেরণ করবো, তবে এমতো মানত পূর্ণ করা তার উপরে অত্যাবশ্যক হবে না।

হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানতের ক্ষতিপূরণই শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। মুসলিম। তিবরানীর বর্ণনায় হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— মানতই কসম। আর মানতের কাফ্ফারাই কসমের কাফ্ফারা। এই হাদিসটিও ব্যাপক অর্থবহ। অর্থাৎ সকল প্রকার মানতই এই হাদিসের বক্তব্যভূত।

মাসআলা ঃ কসমের নিয়ত করুক আর না করুক কসমের কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব, এরকম ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে— ১. মানত পূর্ণ করতে অক্ষম হলে, পাপযুক্ত হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণেঃ যেমন প্রতিদিন রোজা রাখার মানত, কিংবা ২. মানত পূরণ করতে সক্ষম বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার ক্ষতিপূরণ আদায়ে সমর্থ হয়নি— এ কারণে যে, তার উপরে মানত পরিত্যাগ করা মোবাহ্ (অনুমোদিত) ছিলো, অথবা মানত তো করেছে বটে, কিন্তু কী মানত করেছে, তা নির্দিষ্ট করেনিঃ যেমন বলেছিলো, আল্লাহ্ আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিলে আমি আল্লাহ্র নামে মানত প্রদান করবো ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মানত করা সত্ত্বেও কী মানত করেছে তা নির্দিষ্ট করেনি, তার ক্ষতিপূরণ হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের অনুরূপ। আর মানত করেছে কিন্তু তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছে পাপ, তবে তার ক্ষতিপূরণও হবে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণের মতো। আর যে লোক অসিদ্ধ বিষয়ে মানত করে, তার কাফ্ফারাও হবে কসমের কাফ্ফারা তুল্য। এবং যদি সে ইবাদত সম্পর্কিত মানত করে, তবে তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা। কোনো কোনো হাদিসবেত্তা বর্ণিত হাদিসকে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাদিসটি অবশ্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসসমূহের পর্যালোচনা।

ইবাদতনির্ভর মানতের বিবরণ ঃ ইবাদতনির্ভর মানত যে করে এবং তা পূরণ করার সামর্থ্যও যার আছে, তাকে মানতই পূর্ণ করতে হবে। কাফ্ফারা দিলে চলবে না। কেননা হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বিধান দিয়েছেন, পাপযুক্ত মানত বৈধ নয় এবং তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

এই হাদিসের মাধ্যমে 'এরকম মানতের বেলায় কসমের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব'— ইমাম আহমদের এমতো অভিমতটি প্রমাণিত হয়ে যায়। তবে এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানযালা বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নন। তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীদের মধ্যেও বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অসামঞ্জস্য রয়েছে। আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা যোবায়ের সূত্রে। হাফেজ ইবনে হাজার কর্তৃক আবার ভিন্ন সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রটি বিশুদ্ধ, কিন্তু অবিন্যস্ত। আহমদ, বায়হাকী ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ জুহুরী সূত্রে আবু সালমার বরাত দিয়ে হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরা কর্তিত। আবু সালামা থেকে জুহুরীর হাদিস শোনার ব্যাপারটি প্রমাণিত নয়। দু'জনের মধ্যে সংযোজ্য বর্ণনাকারীর নাম সেখানে বাদ পড়েছে।

আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা, সুলায়মান ইবনে বেলালের বর্ণনাক্রমে মুসা ইবনে উকবা ও মোহাম্মদ ইবনে আতিকের বরাত দিয়ে জুহুরী থেকে, সুলায়মান আরকাম থেকে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর থেকে, আবু সালমা থেকে জননী আয়েশা কর্তৃক এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ লিখেছেন, সুলায়মান ইবনে আরকাম হাদিস পরিত্যাজক। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের অধিকাংশ শিষ্য তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের হানজালার বর্ণনাক্রমে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইমরান থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সূত্রপরম্পরা প্রথমোক্ত হাদিসটির সূত্রপরম্পরার মতো।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর সূত্রে মুয়াম্মার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া আবু সালমা এবং বনী হানাফিয়ার আরো একজন লোকের বরাত দিয়ে অপরিণতরূপে হাদিসটিকে রসুল স. এর নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাকেম বলেছেন, বনী হানাফিয়ার ওই লোকটির নাম মোহাম্মদ ইবনে যোবায়ের এবং একথাও বলেছেন যে, তাঁকে বনী হানাফিয়ার অন্তর্ভূত মনে করা ভুল। বরং তিনি ছিলেন বনী হানজালার অন্তর্ভূত।

অপর আর একটি সূত্রে সুপরিণতরূপে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশার মাধ্যমে। দারাকুতনি, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাসাঈ গালেব ইবনে আবদুল্লাহিল জাওজীর বর্ণনাক্রমে, তিনি আতা থেকে এবং তিনি জননী আয়েশা থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপযুক্ত মানত নিজের উপরে ওয়াজিব করে নিবে, তার উপরে ওয়াজিব হবে শপথভঙ্গের কাফ্ফারার মতো কাফ্ফারা। গালেব ইবনে আবদুল্লাহ্ আবার হাদিস ত্যাজক।

ভিন্ন একটি সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কুরাইবের মাধ্যমে আবু দাউদও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাভূত রয়েছেন আবার প্রতর্কাহত বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া।

ইমাম নববী লিখেছেন, লা নাজরা ফি মাঈ'সাতিন্ ওয়া কাফ্ফারাতুহু কাফ্ফারাতু ইয়ামীন অর্থাৎ পাপকর্মে কোনো মানত হয় না। তার প্রায়শ্চিত্ত শপথের প্রায়শ্চিত্ত সদৃশ — এই হাদিসটি শিথিলসূত্র বিশিষ্ট। হাদিসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এরকম মন্তব্য অসঙ্গত। ইমাম তাহাবী ও আবু আলী ইবনে সাস্কান্ হাদিসটিকে আখ্যা দিয়েছেন 'যথাসূত্রসম্বলিত' বলে। আমি বলি, আল্লামা সুয়ূতী তাঁর জামে' সগীর গ্রন্থে হাদিসটির বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা পাপযুক্ত মানতের (যা সত্তাগতভাবে হারাম) কাফ্ফারাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি। সাব্যস্ত করেছেন 'অযথার্থ উক্তি' বলে। আর তিনি এই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মানত দুই প্রকার— ১. অনুগত এবং ২. অননুগত। অনুগত মানত করা হয় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পাপযুক্ত মানত করা হয় শয়তানের উদ্দেশ্যে। তাই তা পূর্ণ করা অনুচিত। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে— কাফ্ফারা তো ওই সময় পূর্ণ করা সম্ভব, যখন মানত পূর্ণ করা হয় ওয়াজিব। এমতোক্ষেত্রে কাফ্ফারা আদায় করলে মানত পূর্ণ না করার পাপ মোচন হয়। আর যদি মানত পূর্ণ করা ওয়াজিবই না হয়, তবে তার কাফ্ফারা কীভাবে ওয়াজিব হবে? কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা নসের (কোরআন ও হাদিসের) উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। তাই তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে— পাপযুক্ত মানত পূর্ণ না করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি ওয়াজিব তার বিপরীত করা ও কাফ্ফারা প্রদান করা, যেনো আল্লাহ্র নামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

হজরত ছাবেত ইবনে জুহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় এক লোক মানত করলো, সে বুয়াতাহ্ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে উট কোরবানী

করবে। রসুল স. সকাশে একথা বলতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মূর্খতার যুগে ওই স্থানে কি কোনো প্রতিমা ছিলো, যাকে তোমরা পূজা করতে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. তখন লোকটিকে বললেন, তবে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। নিশ্চয় পাপ সম্পৃক্ত মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। ওই বিষয়ের মানতও বিশুদ্ধ নয়, যা মানতকারীর অধিকার বহির্ভূত। যথাসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— একবার এক রমণী নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি মানত করেছি আমি আপনার মাথার উপর দফ (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) বাজাবো। তিনি স. বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। আবু দাউদ। এক বর্ণনায় এসেছে, রমণীটি তখন বললো, আমি অমুক অমুক স্থানে উট কোরবানী করবো বলে মানত করেছি। রসুল স. বললেন, ইসলামপূর্ব সময়ে কি ওই সকল স্থানে মূর্তিপূজা করা হতো? রমণী জবাব দিলো, না। তিনি স. বললেন, মূর্খতার যুগে কি সেখানে কোনো মেলা বসতো? সে বললো, না। তিনি স. তখন বললেন, তা হলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করতে পারো। আমি বলি, রসুল স. এর এই নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর এমতো ঐকমত্যকে মেনে নিলে এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মধ্যে আর বৈসাদৃশ্য থাকে না। কারণ রসুল স. তো একথা বলেই দিয়েছেন যে, ওই মানতই মানতরূপে গণ্য যার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন। আর একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, যে মানত এরকম নয়, তা পূর্ণ করা ওয়াজিবও নয়। তাই আমি বলি, এখানে কথাটি এসেছে বৈধতা প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ পাপ পরিত্যাগ যখন অত্যাবশ্যক, তখন পাপযুক্ত মানত পূর্ণ করাও নাজায়েয।

মাসআলাঃ অনুগত মানতকে শর্তায়িত করার বিষয়টি এরকম— এক লোক অনুগত মানত করেছে, কিন্তু সে তার ওই মানতের সঙ্গে কিছু শর্ত অথবা কোনো বিশেষত্ব সংযুক্ত করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— তার সংযুক্ত শর্তগুলো গ্রহণীয় কিনা? শর্তগুলো যদি আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের ও সওয়াব লাভের মাধ্যম হয়, তবে মানত পূরণ করতে হবে তৎসংশ্লিষ্ট শর্ত ও বৈশিষ্ট্য সহযোগে। এমতোক্ষেত্রে শর্তসমূহকে উপেক্ষা করা যাবে না। আর শর্তগুলো যদি আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ ও সওয়াব অর্জনের সহায়ক না হয় তবে সেগুলো পালন করা যাবে না। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এমতাবস্থায় যদি কৃত মানতে আল্লাহ্র সন্তোষ ও সওয়াব বিরোধী কোনো শর্তই না থাকে, তা হলে কী হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, এরকম মাসআলায় ওই রকম মতপ্রভেদই দেখা দিবে, যা সাধারণতঃ দেখা যায় বৈধ

মানতের ক্ষেত্রে। যেমন— কেউ বললো 'আমি বাজারে নামাজ পড়বো' 'শনিবার দিন নামাজ পড়বো', 'রোজা রাখবো, কিন্তু বসবো না', 'রোজা অবস্থায় কথা বলবো না', অথবা 'গাছের ছায়ায় যাবো না', কিংবা মানত করলো 'আমি এই টাকা দান করবো এই শহরের অমুক গরীবকে'— এসকল অবস্থায় তার উপর রোজা রাখা, নামাজ পড়া, যে কোনো স্থানের মিসকিনকে টাকা দান করা হবে ওয়াজিব। শর্তাবলী এমতোক্ষেত্রে রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া যে কোনো দিনে সে নামাজ পড়তে পারবে। যে কোনো স্থানে রোজা রাখতে পারবে। নিশ্চুপ থাকা, দণ্ডায়মান না হওয়া, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি শর্তপালন করা তখন তার জন্য জরুরী কিছু হবে না। আর যে কোনো শহরের গরীবকে টাকা দান করলেও তার চলবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার ভাষণদানকালে দেখতে পেলেন এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সেখানে উপবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ বললেন, লোকটির নাম আবু ইসরাইল। সে দাঁড়িয়ে থাকার মানত করেছে। আরো মানত করেছে, রোজা অবস্থায় সে কোনো প্রকার ছায়ায় গমন করবে না এবং কারো সঙ্গে কথা বলবে না। রসুল স. বললেন, তাকে বলে দাও, সে যেনো তার মানতের রোজা পালন করে কিন্তু দণ্ডায়মান হওয়া, কথা না বলা, ছায়ায় না যাওয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। বোখারী। লক্ষণীয়, এই হাদিসে শর্ত পরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু তার জন্য কাফ্ফারা প্রদানের নির্দেশনা নেই। কিন্তু কেউ যদি পর পর তিন দিন রোজা রাখার এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নিয়ত করে, তবে তাকে পর পর তিন দিনই রোজা রাখতে হবে। আবার বসে নামাজ পড়লেও তার মানত পুরা হবে না। কারণ বসে নামাজ পড়ার মান দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানের অর্ধেক। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। ইবনে মাজা আবার এককভাবে বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইব এবং হজরত মুতলব ইবনে আবী ওয়াদিয়াহ্ থেকে। আর আহমদ ও আবু দাউদ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে এবং মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হজরত ইবনে ওমর থেকে। উল্লেখ্য, পরস্পরসংলগ্ন রোজা আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়। তাই বিভিন্ন প্রকার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা : দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনের শর্তযুক্ত মানতের নামাজ পাঠের বিবরণ— যদি কেউ কেবল নামাজ পাঠের মানত করে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে

নামাজ পড়ার শর্ত না করে, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা হবে ওয়াজিব। কেননা নামাজ দাঁড়িয়েই পড়তে হয়। আর যদি সে বসে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে সে দাঁড়িয়ে অথবা বসে যে কোনো ভাবেই নামাজ পাঠ করুক না কেনো, তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ চিৎ অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠের মানত— যদি কেউ চিৎ অথবা কাত হয়ে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দাঁড়িয়ে অথবা বসে। কেননা অপারগ অবস্থা ব্যতীত শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠ করা শরিয়ত সমর্থিত নয়। তবে উপবিষ্ট অবস্থার নামাজ সর্বাবস্থায় বৈধ। শায়িত অবস্থায় কেবল ওই পীড়িত ব্যক্তি নামাজ পাঠ করতে পারবে, যে উপবিষ্ট অবস্থায় নামাজ পাঠ করতে অক্ষম। এরূপ পীড়িত ব্যক্তি যদি শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের মানত করে, তবে সে শায়িত অবস্থায় তা পাঠ করতে পারবে। কিন্তু মানত পুরা করার পূর্বে যদি সে বসে নামাজ পড়ার সামর্থ্য ফিরে পায়, তবে তাকে নামাজ পড়তে হবে দাঁড়িয়ে, আর দাঁড়াতে সমর্থ না হলে বসে।

মাসআলাঃ কাবা শরীফে নামাজ পাঠ করার মানত— ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম মানতকারী যে কোনো স্থানে নামাজ পাঠ করলেও তার মানত পুরা হয়ে যাবে। ইমাম জোফার ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, কেউ যদি বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানত করে এবং কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করে নেয়, তবে তার মানত পুরা হয়ে যাবে। আবার মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি কাবা শরীফে নামাজ পড়ে তবুও তার মানত পূর্ণ হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় মসজিদে নববী ও কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে নামাজ পাঠ করার মানত করবে, সে কাবা ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পাঠ করলে তার মানত পুরা হবে না। তাকে মানত আদায় করতে হবে কাবার অভ্যন্তরে।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মানত করেছি আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি বায়তুল মাকদিসে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করবো। রসুল স. বললেন, এখানেই পড়ে নাও। লোকটি তার নিবেদনের পুনরুক্তি করলো। রসুল স.ও পুনরায় বললেন, এখানে পড়লেই চলবে। সে পুনরায় একই কথা বললো। তখন রসুল স. বললেন, তোমার ইচ্ছা। আবু দাউদ, তাহাবী, দারেমী।

কাবা, মসজিদে নববী ও বসতবাটি সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পাঠের সওয়াবঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম জোফার বলেন, আমরা বলি, বায়তুল মাকদিসে নামাজ পাঠ করার মানতকারী যদি কাবায় নামাজ পড়ে, তবে তা জায়েয। কারণ উপরে বর্ণিত হাদিসে একথার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি কাবায় নামাজ পড়ার মানত করবে, তার জন্য বায়তুল মাকদিসে অথবা মসজিদে নববীতে নামাজ পাঠ করলে কীভাবে তা যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে? কারণ রসুল স. বলেছেন, স্বগৃহের নামাজের রয়েছে একটি পুণ্য, পাড়ার মসজিদের পঁচিশটি, জামে মসজিদের পাঁচশতটি, মসজিদে আকসার এক হাজার, আমার মসজিদের পঞ্চাশ হাজার এবং কাবা শরীফের এক লক্ষ। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য স্থানের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত আয়েশা, হজরত মায়মুনা এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাবী। তিনি আবার হজরত আতা ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদের এক নামাজ কাবা ব্যতীত অন্য মসজিদের এক হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং কাবার এক নামাজ এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা একলক্ষ গুণ উত্তম। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের একটি পরিণত বর্ণনায় এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র সুপরিণত বর্ণনায়ও এরকম কথা এসেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বর্ণিত হাদিসসমূহে বলা হয়েছে কেবল ফরজ নামাজের কথা। সুতরাং উল্লেখিত সওয়াবের তারতম্য প্রযোজ্য হবে কেবল ফরজ নামাজের বেলায়। নফল নামাজের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কারণ নফল নামাজ পাঠের স্থান হিসেবে আপনগৃহই সর্বোত্তম। হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বোখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ স্বগৃহেই সর্বোত্তম।

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত থেকে আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের আপনাপন ঘরের নামাজ আমার এই মসজিদের নামাজ অপেক্ষা উত্তম, যদি তা ফরজ নামাজ না হয়। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণত সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকটে নিজের ঘরের নামাজ মসজিদে নামাজ পাঠ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয়।

মাসআলাঃ অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি শর্তযুক্ত রোজার মানতের বিবরণ— যদি কোনো পীড়িত ব্যক্তি অথবা কোনো মুসাফির 'আমি সুস্থ হলে' অথবা 'সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে' এরকম শর্ত সহযোগে এক মাস রোজা রাখার মানত করে, তবে শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবল মানত পূরণ করা তার উপরে ওয়াজিব হবে। শর্ত পূরণের পূর্বে এরকম করলে তার মানত পূরণ হবে না। এমতাবস্থায়, শর্ত পূরণ হওয়ার পর পুনরায় তাকে এক মাস রোজা রাখতে হবে। কেননা শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী শর্ত পূরণের পূর্বেও রোজা রাখলে মানত পূরণ হবে বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে শর্ত এখানে মানত পূরণের প্রতিবন্ধক নয়। যেমন— বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যদি কেউ তার সম্পদের জাকাত প্রদান করে, তবে তার জাকাত আদায় হয়ে যায়।

মাসআলাঃ সময় ও কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানতের বিবরণ— যদি কেউ বলে 'আল্লাহ্ আমাকে এই মোকদ্দমায় বিজয়ী করলে আমি তাঁর নামে রজবের পূর্ণ এক মাস রোজা রাখবো' অথবা 'আগামী বৎসর হজ করবো' তবে নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্বেও সে তার মানত পূর্ণ করতে পারবে। অর্থাৎ রজব মাস আসার পূর্বের যে কোনো মাসে সে রোজা রাখতে পারবে। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো। তাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। শায়েখাইন বলেন, সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানত শর্তযুক্ত মানতের মতো নয়। এরকম মানত শর্তবিযুক্ত। সময়ের সঙ্গে তার এরকম সম্পর্ক ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। যেমন, যদি কেউ বাজারে নামাজ পাঠ করার মানত করে, তবে যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়লেও তার মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সময়সম্পৃক্ত মানত পূরণ করা যায়। আবার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও এরকম রোজা ও হজ আদায় করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

ইমাম জোফার বলেন, যে সময়ের সঙ্গে মানতকে সম্পৃক্ত করা হয়, সেই সময় যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত হয়, তবে ওই সময় আগমনের পূর্বের অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে মানত পুরা করলে তা আদায় হবে না। নির্ধারিত সময়ের আগমন ঘটলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত সময় ও তার পূর্বের সময়ের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো তারতম্য না থাকে, তবে নির্ধারিত সময় আগমনের আগেও মানত পূরণ করা যাবে। আমার মতে এ অভিমতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ আরাফার দিবসে, অথবা আশুরার দিনে, কিংবা মহররম মাসে রোজা রাখার মানত

করলো। এমতাবস্থায় মানতকারী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার মানত পূর্ণ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ বর্ণিত দিবসসমূহ তাদের পূর্ববর্তী দিবসসমূহের তুলনায় অধিকতর ফযীলতময়। এভাবে কেউ যদি মধ্যরাত্রিতে নামাজ পড়ার মানত করে, তবে রাত্রি আগমনের আগের দিন অথবা পরবর্তী দিনে নামাজ পড়লে মানত পূরণ হবে না। কারণ মধ্যরাত্রি দিবস অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতপূর্ণ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, কখন কার মৃত্যু হয় তা বলা যায় না— এই আশংকায় কেউ যদি মধ্যরাত্রি আগমনের পূর্বেই নামাজ পড়ে নেয়, তবু কি তার মানত শুদ্ধ হবে না? এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, এমতোক্ষেত্রে আমল করতে হয় সাধারণ জ্ঞানানুসারে। মানতকারী যদি মৃত্যুরোগাক্রান্ত না হয় অথবা সহসা মৃত্যুর কোনো চিহ্ন তার মধ্যে বর্তমান না থাকে, তবে মানতের আমল অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাপূর্ণ সময়ে নিয়ে আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্র নিকট এমতো সওয়াবের আশা রাখি যে, আরাফার দিবসের রোজা হয়ে যাবে বিগত ও আগামী বৎসরের পাপের ক্ষতিপূরণ। আর আশুরার রোজা হচ্ছে বিগত বৎসরের গোনাহের কাফ্ফারা। হাদিসটি হজরত আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম, ইবনে হাব্বান, তিরমিজি ও ইবনে মাজা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও ইবনে মাজা কর্তৃক এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি কাতাদা ইবনে নোমান থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। এইমর্মে তিবরানী কর্তৃক আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত ইবনে ওমর থেকে এবং আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে জননী আয়েশা থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আনাস প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

রসুল স. একবার বললেন, ওই দিবসসমূহে (আইয়ামে তাশরীকের দিবসসমূহে) পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়। একথা শুনে উপস্থিত সহচরবৃন্দ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আল্লাহ্র পথে জেহাদ করাও কি ওই দিবসসমূহের পুণ্যকর্ম অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়? তিনি স. বললেন, না। তবে ওই জেহাদ স্বতন্ত্র যে জেহাদে নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে কেউ প্রত্যাবর্তন করতে না পারে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদের মাধ্যমে। রসুল স. আরো বলেছেন, জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ইবাদত আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়। ওই দিবসসমূহের এক দিবসের রোজা অন্য দিবসসমূহের এক বৎসর রোজার সমতুল। আর ওই সময়ের একটি রাত শবে কদর তুল্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা। অবশ্য হাদিসটি শিথিল সূত্র বিশিষ্ট।

রসুল স. বলেছেন, রমজান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা আল্লাহ্‌র মাসের অর্থাৎ মহররমের। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ রাতের নামাজ। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। মারো রদ্‌ইয়ানী তদীয় মসনদে এবং তিবরানী তদীয় জুনদুবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হজ করার বিবরণ— পদব্রজে হজ সম্পাদনের মানতকারী পদব্রজে অথবা বাহনারোহী হয়ে উভয় অবস্থায় হজ করতে পারবে। মাবসুত গ্রন্থে এরকম অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা থেকে। তাঁর কথার মর্মার্থ হচ্ছে— এমতাবস্থায় মানতকারীর উপরে পদব্রজে হজ যাত্রা করা ওয়াজিব নয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে অনুগত মানতের সঙ্গে এমতো শর্ত সংযোজন করা হলে, তা পূরণ করা আবশ্যিক নয়। ইমাম আবু হানিফা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন এই নীতিমালার আলোকেই।

কুদুরী গ্রন্থেও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইমাম সাহেবের অভিমতে বলা হয়েছে পদব্রজে গমন করার কথা, আরোহী অবস্থায় নয়। আর এরকম সম্পর্কহীনতা বলবৎ থাকে তাওয়াফে জিয়ারত পর্যন্ত।

পদব্রজে হজ যাত্রা করলে কোথা থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে ব্যাপারে মতপ্রভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পদব্রজে যাত্রা করতে হবে মিকাত থেকে। কেননা মিকাত থেকেই হজ শুরু হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, পদব্রজে হজ যাত্রার অর্থ নিজের বসতবাটী থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করা। অবশ্য পথিমধ্যে যে কোনো স্থান থেকে পদব্রজে যাত্রার নিয়ত করা যায়। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, কুদুরী গ্রন্থের অভিমতে এই ইঙ্গিতটি রয়েছে যে, মানতের কারণে পদব্রজে যাত্রা হবে ওয়াজিব। তাহাবী বলেছেন, এটাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত।

যারা যানবাহনে হজ করতে যাওয়াকে পদব্রজে হজে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম বলেন তাদের দলিল সুস্পষ্ট। তারা বলেন, হজই এখানে মূল উদ্দেশ্য। আর পদব্রজে হজ গমন উত্তমতার পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা সক্ষমতাকে হজের একটি শর্ত নিরূপণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারাও সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। তাই যানবাহনে হজ গমন করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেউ পদব্রজে হজযাত্রার মানত করলে যদি তা তার পক্ষে সহনীয় হয়, তবে পদব্রজে গমনই উত্তম। কিন্তু এরকম করা ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে এরকম করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি।

পদব্রজে হজ করার মানতের ক্ষেত্রেও যানবাহনে গমন করা যে উত্তম, সে কথা হাদিস শরীফের মাধ্যমেও প্রমাণিত। হজরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনায়

এসেছে, এক বৃদ্ধ তার দুই পাশে দুই ছেলের উপর ভর দিয়ে চলছিলো। রসুল স. সেদিকে লক্ষ্য করে উপস্থিত সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, সে পদব্রজে হজ করার মানত করেছে। রসুল স. বলেন, এভাবে সে নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়ে চলেছে। অথচ আল্লাহ্‌র নিকটে এরকম কষ্ট নিরর্থক। রসুল স. তখন ওই বৃদ্ধকে ডেকে যানবাহনে গমন করতে নির্দেশ দিলেন। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. তখন তাকে বললেন, তোমার এমতো মানত ও শ্রমের প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। মুসলিম।

হজরত উকবা ইবনে আমের জুহুনী বর্ণনা করেছেন, আমার ভগ্নি পদব্রজে কাবাগৃহে গমনের মানত করলো এবং এ সম্পর্কিত বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য প্রেরণ করলো রসুল স. এর নিকটে। আমার কথা শুনে তিনি স. বললেন, এটা তার ইচ্ছা। পদব্রজে অথবা যানবাহনে যেভাবে খুশী সে হজযাত্রা করতে পারে। বোখারী , মুসলিম।

মানত করলে পদব্রজে যাওয়া হজযাত্রা করাকে যারা আবশ্যিক মনে করেন তাদের দলিল এরকম— যেহেতু মানত পূরণ আবশ্যিক, তাই এমতো মানতকারীকে পদব্রজেই হজ যাত্রা করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকে কেবল শরিয়তের প্রমাণাদি। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতো মানতকারীর জন্য তাওয়াফে জিয়ারত পদব্রজে করা ওয়াজিব। কারণ এই ইবাদতটি একটি মূল ইবাদত। তাই মানতকারী পদব্রজে তাওয়াফের মানত করতে পারে। আর মানত পূরণ করা তার জন্য অত্যাবশ্যকও হয়ে যায়।

এবার দৃকপাত করা যেতে পারে পদব্রজে হজে গমনকারী বৃদ্ধের বিবরণের প্রতি। রসুল স. তাকে যানবাহনে গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন একারণে যে, সে ছিলো অসামর্থক। আর হজরত উকবার ভগ্নির ঘটনাটিও ছিলো এরকম। অর্থাৎ সামর্থ্যহীনতা ছিলো তার ক্ষেত্রেও। আবু দাউদের বর্ণনায় বিষয়টির অধিকতর সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এসকল হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় না যে, পদব্রজে হজযাত্রা মানতকারীর জন্য পদব্রজে গমন ওয়াজিব নয়। বরং এতে করে এতটুকুই কেবল প্রমাণ হয়ে যায় যে, ওজর বা অক্ষমতার কারণে পদব্রজে হজযাত্রার মানতকারী যানবাহনে আরোহণ করে হজ করতে যেতে পারবে।

মাসআলাঃ পদব্রজে হজের মানত করে ওজর অথবা ওজর ছাড়া যানবাহনে হজ করার বিবরণ— আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পদব্রজে হজের মানতকারী যদি কোনো কারণ বা কারণ ছাড়া বাহনারোহী হয়ে হজ করে, তবে পুনরায় পদব্রজে হজ্জ করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার

অভিমতানুসারে এরকম বলাই উচিত ছিলো যে, এ ধরনের মানতকারীর উপরে পুনরায় পদব্রজে হজ করা ওয়াজিব— যেমন, একাধারে রোজা রাখার মানত অথবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মানতের ক্ষেত্রে পুনরায় রোজা ও নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই নিয়মটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ, বাহনারোহী হয়ে হজ যাত্রা করার অনুমতি হাদিস শরীফে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে কিয়াস বা তুলনামূলক অনুমানের অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে কেবল এতটুকু প্রমাণ হয় যে, পদব্রজে হজগমনের মানতকারী কেবল শারীরিকভাবে অসমর্থ হলেই যানবাহনযোগে হজ যাত্রা করতে পারবে। তাহলে যারা শারীরিকভাবে সমর্থ তাদের জন্য পদব্রজে গমন করেই মানত পূর্ণ করা উচিত নয় কি?

উত্তরঃ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, রসুল স. যখনই আমাদেরকে উপদেশ দিতেন তখনই বলতেন দান করতে এবং মুছলা (মৃত বা নিহত ব্যক্তির নাক কান কর্তন) না করতে। আর একথাও বলতেন যে, পদব্রজে হজযাত্রার মানত করাও মুছলা করার মতো। তাই যে এরকম মানত করে সে যেনো একটি কোরবানী দেয় এবং যানবাহনযোগে হজে যায়। হাকেম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত।

এখন একথা প্রণিধাননীয় যে, ক্ষেত্রসাধারনের উপরেই শরিয়তের অধিকাংশ বিধান নির্ভরশীল। আর যানবাহন ছাড়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষে হজ যাত্রা সম্ভব নয়। তাই আলেমগণ বলেছেন, পাথেয় ও যানবাহন হজের আবশ্যকীয় উপকরণ। এসব ছাড়া হজযাত্রা সাধারণতঃ সম্ভবই নয়। সে কারণেই আমরা যানবাহনযোগে হজযাত্রার সমীচীনতার প্রবক্তা। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইনের উপরোক্ত হাদিসে এই অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। আরো একটি কথা এই যে, শরিয়তসম্মত কোনো কারণ অথবা কারণ ব্যতিরেকে যদি ওয়াজিব পরিত্যক্ত হয়, তবে তা পুনরায় আদায় করতে হয়। এখন দেখতে হবে পদব্রজে গমন হজের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি তা মূল উদ্দেশ্যভূত হয় তবে তা পরিত্যক্ত হলে পুনরায় আদায় করতে হবে। আর একে মূল উদ্দেশ্যভূত করার অধিকার রয়েছে কেবল শরিয়ত প্রণেতার। এমতোক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা বা তুলনা অনুমানের অবকাশ নেই। যেমন, নামাজের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে সোহ্ সেজদার মাধ্যমে তা সংশোধন করার কথা বলেছেন শরিয়ত প্রণেতা স্বয়ং। তাই ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে নামাজ পুনরায় পাঠ করতে হয় না। এই নিয়মটির অনুকূলে তাই আমরা বলি, একাধারে রোজা রাখার মানতকারী রোজার

বিরতিহীনতা এবং দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারী যদি নামাজের দণ্ডায়মানতা পরিত্যাগ করে তবে তাদেরকে পুনরায় মানত অনুসারে রোজা ও নামাজ পড়তে হবে। কারণ এক্ষেত্রে শরিয়ত প্রবর্তক রসুল স. 'সোহ্ সেজদা' ধরনের কোনো সংশোধক আমল নির্ধারণ করে দেননি। আবার পদব্রজে মানতকারীর জন্য রসুল স. স্বয়ং যানবাহনে হজযাত্রা করতে বলেছেন এবং পদব্রজে যাত্রা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে সংশোধক হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কোরবানী। পুনরায় হজ করার কথা বলেননি। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত অজুহাত অথবা অজুহাতহীনতার প্রশ্ন অবান্তর। মুজদালিফায় অবস্থান করা না করার বিষয়টি অবশ্য স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে— বিনা ওজরে মুজদালিফায় অবস্থান না করা অবৈধ। আর শরিয়তসম্মত ওজর থাকলে বৈধ। তবে উভয় অবস্থায় একটি কোরবানী হবে ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ পদব্রজে মানতকারী যানবাহনযোগে হজ করলে তার উপরে কোরবানী কি ওয়াজিব ? প্রশ্নটির জবাব এরকম— হ্যাঁ। এরকম মানত ভঙ্গকারীর উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব। মানত ওজরবশতঃ ভঙ্গ করা হোক অথবা ওজর ছাড়া। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ) বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে মানতকারীকে কমপক্ষে কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। আর যদি মানতের সঙ্গে সে কসমও করে থাকে, তবে শপথভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করাও হবে তার উপরে আবশ্যিক। ইমাম তাহাবীও এমতো অভিমতের সমর্থক। কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেবল শপথভঙ্গের, কোরবানী করার প্রয়োজন নেই।

'পদব্রজে হজের মানতকারী যদি যানবাহনযোগে হজে যায় তবে তাকে কোরবানী দিতে হবে' একথা বলা হয়েছে হজরত উকবা ইবনে আমেরের ভগ্নি সম্পর্কিত হাদিসে। আবু দাউদের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স. তাঁকে বাহনসহযোগে হজ করতে বললেন। আরো বললেন একটি কোরবানী দিতে। এরকম বর্ণনা দিয়েছেন কেবল আবু দাউদ। আর আবু দাউদের বর্ণনা হাদিসবেত্তাগণের নিকটে গ্রহণযোগ্য। আবার বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। সেখানে কোরবানী করার কথাটি নেই। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত কথাটি বর্জনীয়। কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা অবশ্যই গ্রহণীয়। যেহেতু তাঁর বর্ণনায় কোরবানী করার কথা রয়েছে, আর কোরবানী হয় কমপক্ষে ছাগল, তাই ইমাম আবু হানিফার 'ছাগল কোরবানী করতে হবে' কথাটি বিশুদ্ধ।

আমরা বলি বর্ণিত কোরবানীর জন্য হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে 'বুদনাহ' শব্দটি। উল্লেখ্য, বুদনাহ্ বলা হয় উট অথবা গরু-মহিষকে। কামুস রচয়িতার মতে বুদনাহ বলতে বোঝায় কেবল উট। অর্থাৎ ছাগলকে বুদনাহ বলা হয় না। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত উকবা ইবনে আমের জানিয়েছেন, তাঁর ভগ্নির প্রতি রসুল স. এর নির্দেশ ছিলো দু'টি— বাহনযোগে যাত্রা করবে এবং বুদনাহ কোরবানী দিবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ কর্তৃক যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেই হাদিসেও এসেছে বুদনাহ্ কোরবানীর নির্দেশ। বর্ণনাটি এরকম— হজরত উকবার ভগ্নি পদব্রজে হজযাত্রার মানত করলেন, কিন্তু পদব্রজে গমনের সামর্থ্য তার ছিলো না। তখন রসুল স. হজরত উকবাকে বললেন, তোমার বোনের পদব্রজে হজযাত্রার প্রয়োজন আল্লাহ্র নেই। সে যাত্রা করবে বাহনোপরি সওয়ার হয়ে এবং দিবে একটি কোরবানী। আমি বলি, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। এর সূত্রপরম্পরা এরকমঃ আবু দাউদ—ঈসা ইবনে ইব্রাহিম—আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম—মাতরাল ওয়ারাক—ইকরামা—হজরত ইবনে আব্বাস। শেষোক্ত দু'জন ছাড়া অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরা তাঁদের বর্ণনার শুরুতে উল্লেখ করেছেন 'শুনেছি' শব্দটি।

সূত্রপরম্পরাগত সন্দেহ ঃ বর্ণনাকারী হিসেবে আবদুল আযীয ইবনে মুসলিম অপ্রসিদ্ধ। আর ইবনে সা'দ মাতরাল ওয়ারাককে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে— এমতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, ইমাম জাহাবী আবদুল আযীযকে বলেছেন প্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিতে অপ্রসিদ্ধ হলেও তিনি তা নন। আর মাতরাল ওয়ারাক মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তিনি দুর্বল নন। ইমাম জাহাবী বলেছেন, তিনি বলিষ্ঠ। অবশ্য ইমাম আহমদ ও ইবনে মুঈনের মতে তিনি দুর্বল। কিন্তু তাঁরা এরকম বলেছেন; তিনি আতা থেকে বর্ণনা করেছেন বলে। কিন্তু বর্ণিত হাদিসটি মাতার বর্ণনা করেছেন সরাসরি ইকরামা সূত্রে।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ছাগল কোরবানীকে যথেষ্ট মনে করেছেন, উট কোরবানীর কথা বলেননি। এরকম বলেছেন তিনি একারণে যে, তাঁর সূত্রভূত বর্ণনাকারী শক্তিমান। 'বুদনাহ্'র বর্ণনাকারী তত্তুল্য শক্তিমান নয়।

আমি বলি, সাধারণ কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসকে সুনির্দিষ্ট কোরবানী সম্পর্কিত হাদিসের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করবার অবকাশ থাকবে তখন, যখন উভয় হাদিসের মধ্যে দেখা দিবে পরস্পরবিরুদ্ধতা। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। উভয় বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু— একটি

নির্দেশনা সাধারণ এবং অপরটি সুনির্দিষ্ট। আর উভয় বর্ণনা আবার একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই সাধারণ নির্দেশনাকে এখানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া যাবে। হজরত আলী এবং কোনো কোনো সাহাবী অবশ্য বলেছেন, এখানে বিশেষভাবে 'বুদনাহ্'র কথাই বলা হয়েছে। সাহাবীগণের বক্তব্য যদিও পরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদা রাখে, কিন্তু তাঁরা এখানে নির্দেশনাটিকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। যদি করতেন, তবে বর্ণনাটি সুপরিণত সূত্রবিশিষ্ট হাদিসের মর্যাদাও লাভ করতো। ইমাম শাফেয়ী সা'দ ইবনে আবী ওরুবাহের মাধ্যমে কাতাদা থেকে হাসানের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী একবার পদব্রজে হজযাত্রার কসমকারী এক লোক সম্পর্কে বলেছিলেন, সে যদি পদব্রজে যেতে অক্ষম হয়, তবে যাত্রা করবে বাহনারোহী হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি বুদনাহ্।

বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন 'পদব্রজে কাবাগৃহে গমনের মানতকারীর করণীয় কী'— হজরত আলীর নিকটে একবার এমতো প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি বললেন, পদব্রজেই যাবে। অসমর্থ হলে যাবে বাহনে সওয়ার হয়ে এবং কোরবানী দিবে একটি উট। এরকম বক্তব্য এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং হাসান বসরী থেকেও।

মাসআলা ঃ 'হজ' ও 'ওমরা'র উল্লেখবিহীন পদব্রজে কাবাগৃহে গমন সম্পর্কিত মানতের বিবরণ— এরকম মানতকারীর জন্য মুসতাহাসান (সমীচীন) হিসেবে পদব্রজে হজ ও ওমরা প্রতিপালন করা আবশ্যক। কিন্তু বুদ্ধিগত সিদ্ধান্ত বলে, এরকম মানতকারীর উপর হজ, ওমরা কোনোটাই ওয়াজিব হয় না। কাবাগৃহে গমনের উদ্দেশ্য হয় সাধারণতঃ হজ বা ওমরা পালন। তাই এমতোক্ষেত্রে হজ বা ওমরা করাকে 'সমীচীন' বলা হয়েছে। আর যদি কেউ পদব্রজে হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার মানত করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ হেরেম পর্যন্ত যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ হজ ও ওমরা করা নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, সতর্কতা অবলম্বনার্থে এরকম মানতকারীর জন্য হজ অথবা ওমরা করা প্রয়োজন। তবে কেউ যদি সাফা, মারওয়া, আরাফা, মুজদালিফা, মিনা অথবা মাকামে ইব্রাহিমে গমনের মানত করে তবে ইমামগণের ঐকমত্যানুসারে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ পদব্রজে যাওয়ার কথা যদি উচ্চারণ না করে, বরং বের হওয়া অথবা কাবাগৃহ পর্যন্ত সফর করার কথা বলে এবং এ সম্পর্কে মানতও করে, তবুও তার

উপরে কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে বিষয়টির ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ জ্ঞাতব্যের উপর। সাধারণ ধারণানুসারে কোনো শব্দ যদি ইবাদতবোধক মানত হয়, তবে ওই ইবাদত ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না।

যদি কেউ বলে, আল্লাহ্‌র গৃহে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব এবং এরকম কথা বলার সময় যদি উদ্দেশ্য করে মদীনার মসজিদ অথবা বায়তুল মাকদিসের তবে তার উপরেও কোনোকিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রতিটি মসজিদই কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মাসআলা ঃ কোনো ইবাদত মানত করলে ওই ইবাদত সংশ্লিষ্ট করণীয়সমূহ পালন করাও ওয়াজিব হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ ওজু ছাড়া এবং কোরআন পাঠ ব্যতিরেকে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করার মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে ওজু ও কোরআন আবৃত্তি সহযোগে। আবার কেউ এক অথবা তিন রাকাত নামাজের মানত করলেও তাকে নামাজ পাঠ করতে হবে দুই রাকাত। এক রাকাতের স্থলে দুই রাকাত এবং তিন রাকাতের স্থলে দুই দুই করে চার রাকাত। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ওজুবিহীন নামাজ পাঠের মানত জায়েযই নয়। কারণ ওজু ছাড়া নামাজ ইবাদত রূপে গণ্যই নয়। তবে কোরআন পাঠবিহীন নামাজ কখনো কখনো ইবাদত রূপে গণ্য হতে পারে। যেমন— এমতো মূর্খের নামাজ, যে কোরআনের কোনো আয়াতই স্মৃতিস্থ করতে পারে না। অন্য তিন ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম জোফার বলেন, কেউ তিন রাকাত নামাজ পাঠের মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে দুই রাকাত নামাজ। আর ওজু বিহীন ও কোরআন পাঠবিহীন নামাজ যেমন নামাজ নয়, তেমনি এক রাকাত নামাজও নামাজ নয়। সুতরাং এধরনের মানতই বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু আমরা বলে থাকি, কোনো বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল উপকরণ পরিপূরণও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যে গুলোর উপরে বিষয়টি নির্ভরশীল।

মাসআলা ঃ পদব্রজে হজের মানতের বিপরীত আমল করে কোরবানী দিলে কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে? ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ কেউ পদব্রজে হজ যাত্রার মানত করার পর ওজরবশতঃ অথবা ওজর ছাড়াই যানবাহনযোগে যদি হজে যায় এবং একটি কোরবানী দেয়, তবে তাকে কাফ্ফারারূপে আর কিছু দিতে হবে না। তবে এরকম মানতকারী যদি কসমের নিয়তও করে, তাহলে তার উপরে কাফ্ফারা প্রদান করা হবে অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য, এই মাসআলাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রকৃত মানত ভঙ্গ করার মাসআলার মতো মতদ্বৈততাদীর্ণ।

মাসআলা ঃ ইতেকাফের মানত করলে ইতেকাফকালে রোজা রাখা ওয়াজিব কিনা?— এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেন, এরকম মানতকারীর উপর রোজা ওয়াজিব। কারণ তাদের মতে রোজাবিহীন ইতেকাফ বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, শুধু ইতেকাফের মানতকারীর উপরে রোজা ওয়াজিব নয়। তাঁদের মতে রোজা ইতেকাফের শর্তভূত নয়। আর ইতেকাফ এক রাত্রির জন্য হতে পারে। কমপক্ষে হতে পারে এক ঘণ্টার জন্যও। এক বর্ণনায় অবশ্য ইমাম আহমদের অভিমত এসেছে ইমাম মালেকের অনুকূলে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা বলেন, ওয়াজিব ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত, নফল ইতেকাফের জন্য নয়। ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম।

ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত হওয়ার কথা এসেছে দারাকুতনী—সুয়াইদ ইবনে আবদুল আযিয—সুফিয়ান ইবনে হোসাইন—জুহুরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, রোজা ব্যতিরেকে ইতেকাফ হবে না। দারাকুতনী বলেন, এই বর্ণনাপরম্পরাভূত এক বর্ণনাকারীর নাম সুয়াইদ সম্পর্কহীন। আর ইমাম আহমদ বলেন, সুয়াইদ পরিত্যক্ত। বোখারী বলেন, সুয়াইদের বর্ণনায় কিছু কথা আছে। ইয়াহ্ইয়া বলেন, সে অপদার্থ। ইমাম আহমদ বলেন, দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনে হাব্বান বলেন, অপরাপর বর্ণনায় সুফিয়ান যোগ্য বর্ণনাকারীরূপে বিবেচিত হয়েছেন। কিন্তু জুহুরীর বর্ণনায় তারতম্য ঘটান। আমি বলি, ইমাম জাহাবী তাঁকে অত্যন্ত সৎ ও প্রসিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর মুসলিমও গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণনাকে। ইবনে হুম্মাম তাঁর 'আল কামাল' গ্রন্থে লিখেছেন, হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমি সুফিয়ান সম্পর্কে হোসাইনের নিকটে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্যই করেছেন। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, সুফিয়ানের বর্ণনা সঠিক, কিন্তু কেবল জুহুরীর বর্ণনা যে ত্রুটিমুক্ত একথা তিনি বলেননি। আর বর্ণিত হাদিস তিনি যেহেতু জুহুরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাই তা সঠিক নয়। জুহুরী থেকে এরকম অযথার্থ বর্ণনা করেছেন সুবীদ এবং সুফিয়ানও।

এসম্পর্কে আর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ—আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক—জুহুরী—ওরওয়াহ্— এই সূত্রে। হাদিসটি এই— জননী আয়েশা জানিয়েছেন, রসুল স. এর রীতি (সুন্নত) এই যে, ইতেকাফ পালনকারী কোনো পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না, কারো জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে না, আপন স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং তাঁদের কারো সঙ্গে সহবাসও করবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে ইতেকাফ স্থল পরিত্যাগ করবে না। আর রোজা ছাড়া ইতেকাফও হবে না। আর তাঁর ইতেকাফ স্থল হবে কেবল মসজিদ, যেখানে নামাজের জামাত হয়।

একটি সন্দেহ ঃ আবু দাউদ ছাড়া অন্য কেউই বর্ণিত হাদিসে 'সুন্নত' (রসুল স. এর রীতি) শব্দটির উল্লেখ করেননি, যার ফলে ধরে নেয়া যায় হাদিসটি পরিণত। আবার দারাকুতনীও এই হাদিসের সূত্রভূত আবদুর রহমানকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে।

সন্দেহভঞ্জন ঃ এই হাদিসকে 'সুপরিণত' শ্রেণীভুক্ত করতে গেলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তবে বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনাও গ্রহণীয়। আর আবদুর রহমান হচ্ছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। অবশ্য তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত। আবু দাউদও এরকম বলেছেন। ইবনে মুঈনও তাঁকে বলিষ্ঠ বলে মানেন। ইমাম আহমদ তাঁকে চিহ্নিত করেছেন শুদ্ধ বর্ণনাকারীরূপে। আবার মুসলিমও তাঁর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন।

আমি বলি, এই হাদিস বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত হলেও প্রামাণ্য নয়। কেননা হাদিসে এসেছে 'সুন্নত' শব্দটি। কাফ্ফারা প্রসঙ্গেও তো হাদিসটি বর্ণিত হয়ে থাকতে পারে। ইতেকাফের জন্য রোজা যে সুন্নত, সে ব্যাপারে তো কোনো মতোবিরোধ নেই। মতোবিরোধ রয়েছে শর্ত হওয়ার ব্যাপারে। ইমাম আবু হানিফা ইতেকাফের জন্য রোজাকে শর্তরূপে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদিসে শর্ত হওয়ার প্রমাণ নেই। প্রমাণ রয়েছে কেবল সুন্নতের।

ইবনে জাওজী তাঁর 'আততাহ্কীক' গ্রন্থে দারাকুতনীর বরাত দিয়ে জুহুরীর বর্ণনাসূত্রে সা'দ, ইবনে মুসাইয়্যেব ও ওরওয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করতেন এবং ইতেকাফকারীর জন্য সুন্নত হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে বের না হওয়া, কারো জানাজার সঙ্গে গমন না করা, কোনো রোগীকে দেখতে না যাওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং স্ত্রী সহবাস না করা। নিয়মিত নামাজের জামাত হয় এমন স্থান ছাড়া অন্যত্র ইতেকাফ হয় না। আর রসুল স. ইতেকাফ্কারীকে রোজা রাখতে বলতেন।

ইবনে জাওজী এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাগত বিশুদ্ধতাকে মেনে নেননি। কেননা এর সূত্রসংযুক্ত ইব্রাহিম ইবনে মুহসারকে ইবনে আদী বলেছেন হাদিস বেত্তাগণের নিকট সে অস্বীকৃত। দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদিসের বক্তব্যটি রসুল স. এর বক্তব্য নয়, বক্তব্যটি জুহুরীর, যিনি বক্তব্যটিকে হাদিস বলেই জেনেছেন। এটা তাঁর ভ্রান্তি।

আবু দাউদ আবদুর রহমান ইবনে বুদাইল সূত্রে আমর ইবনে দিনারের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে হজরত ওমর এই মর্মে মানত করেছিলেন যে, তিনি কাবা শরীফে একদিন একরাত ইতেকাফ করবেন। পরবর্তীতে ইসলামী যুগে তিনি এ সম্পর্কে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলে তিনি স. বললেন, ইতেকাফ করে নাও। রোজাও রাখো। নাসাঈর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— রসুল স.

তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন ইতেকাফ করতে ও রোজা রাখতে। এই বর্ণনা সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, এর সূত্রসংযুক্ত আবদুর রহমান ইবনে বুদাইল একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আবার হজরত ইবনে ওমর থেকে নাফে কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রোজার উল্লেখ নেই। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। দারাকুতনী বলেছেন, আমি আবু বকর নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি, হাদিসটি অসমর্থিত। কেননা আমর বিন দিনারের কোনো নির্ভরযোগ্য ছাত্রই তার নাম উল্লেখ করেন নি। না ইবনে জুরাইজ, ইবনে উয়াইনা, না হাম্মাদ ইবনে সালমা। অবশ্য ইবনে হুম্মাম তাঁকে বলিষ্ঠ বলেছেন। একথাও বলেছেন যে, ইবনে মুঈন হাদিস শাস্ত্রে তাঁকে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে হাব্বানও তাঁকে করেছেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি, ইমাম জাহাবী সুফিয়ানের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বর্ণিত হাদিসে ইতেকাফের সঙ্গে রোজা রাখার নির্দেশ হজরত ওমরকে দেয়া হয়েছিলো বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তবুও বলা যেতে পারে— হজরত ওমর হয়তো রোজাসহ ইতেকাফের মানত করেছিলেন। তাই তাঁকে দু'টোই করতে বলা হয়েছিলো। কিন্তু বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন কেবল ইতেকাফের মানতের কথা। অধিকাংশ বর্ণনায় অবশ্য বলা হয়েছে কেবল ইতেকাফের মানতের কথা, রোজাসহ ইতেকাফের মানতের কথা সেগুলোতেও আসেনি।

স্বসূত্রে দারাকুতনী সাঈদ ইবনে বশীরের মাধ্যমে নাফেয়ের বরাত দিয়ে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর মূর্খতার যুগে ইতেকাফ করার এবং রোজা রাখার মানত করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ সম্পর্কে রসুল স. এর নিকটে জানতে চেয়েছিলেন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, কৃত মানত পূর্ণ করো। শায়েখ আবদুল হক বলেছেন, সাঈদ ইবনে বশীর এই হাদিসের অসম্পৃক্ত বর্ণনাকারী। ইবনে জাওজী, ইয়াহ্ইয়া এবং ইবনে নুমাইর বলেছেন, সাঈদ একজন অনভিপ্রেত ব্যক্তি। আমরা বলি, হাফেজ ইবনে হাজার তাঁকে বলেছেন বিতর্কাহত। জাহাবী লিখেছেন, কাতাদার ছাত্র সাঈদ ইবনে বশীরকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন শো'বা। বোখারী বলেছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি সমালোচনাহত। এরকমও বলা হয়েছে যে, তিনি কাদরিয়া সম্প্রদায়ভূত। আমি বলি, ইবনে বুদাইল অপেক্ষা সাঈদ অধিক দুর্বল নন। একথার প্রমাণস্বরূপ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইতেকাফকারীর জন্য রোজা অত্যাবশ্যক নয়। যদি না সে রোজা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নেয়। হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। ইবনে জাওজীও এই বর্ণনার মধ্যে দূষণীয় কিছু দেখেননি।

বোখারী বলেন, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি— হজরত ওমর একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মূর্খতার যুগে মানত করেছিলাম, এক রাত্রি মসজিদুল হারামে ইতেকাফ করবো। রসুল স. বললেন, মানত পূর্ণ করো। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিসে দেখা যায়, হজরত ওমর মানত করেছিলেন রাত্রিকালীন ইতেকাফের। আর রাতে তো রোজা রাখার হুকুমই নেই। আবার মুসলিমের এক বর্ণনায় 'রাত্রি'র স্থলে এসেছে 'দিনে'র কথা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে শো'বা থেকে ওবায়দুল্লাহ্র বর্ণনা সূত্রে। এখন বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের রাত ও দিনের দ্বন্দ্ব নিরসনার্থে বলা যেতে পারে 'রাত' অর্থ পূর্ণ দিবস ও রাত্রি। আর 'দিন' অর্থ পূর্ণরাত্রি ও দিবস। অর্থাৎ একরাত একদিন। 'দিন' শব্দসম্বলিত বর্ণনাটি বিরল। অথচ অধিকতর সঠিক বলে মনে করা হলেও এক কথায় বলার অবকাশ রয়েছে যে, হজরত ওমর দিনের ইতেকাফের কথাই বলেছিলেন, তবুও রসুল স. তাঁকে রোজা রাখার কথা বলেননি কেবল বলেছিলেন, মানত পূর্ণ করো। এতে করে বুঝা যায়, ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়।

রাত্রিকালীন ইতেকাফ যে রোজাবিহীন হয় তার স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে এই হাদিসটি— হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আলহামদুলিল্লাহ আমি মরুবাসী । আমি সেখানকার মসজিদে নামাজও পড়ি। আমি ওই মসজিদে অবস্থানের অনুমতি পেতে পারি কি? রসুল স. বললেন, তিরিশ তারিখের রাতে সেখানে অবস্থান গ্রহণ কোরো। পরবর্তীতে লোকেরা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীসের পুত্রকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার পিতা তারপর কী করলেন? তিনি বললেন, আমার পিতা ওই মসজিদে প্রবেশ করতেন আছরের পরে। আর সেখান থেকে বের হতেন ফজরের পর। মসজিদের বাইরে তাঁর ঘোড়া বাঁধা থাকতো। তিনি ওই ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতেন তাঁর বসতবাটিতে। আবু দাউদ। এই বিবরণটির মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, কেবল রাত্রিকালীন ইতেকাফও জায়েয। যদি কেউ বলেন, আমরা একে ইতেকাফ বলতে পারি না। তবে তার উত্তরে আমরা বলবো, এতে দোষেরও কিছু নেই। পারিভাষিক মতবিরোধের অবকাশও এখানে অনুপস্থিত। একে ইতেকাফ না বললেও এতটুকু তো স্বীকার করতে হবে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাও ইবাদত। আর মানতের কারণে মোস্তাহাব ইবাদতও ওয়াজিব হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ রমজান মাসে ইতেকাফের মানত— এরকম মানত করলে তা রমজান মাসেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ইতেকাফ অন্য মাসে করলে হবে না। কেননা অন্য কোনো মাসের ইবাদতে রমজানের ইবাদতের তুল্য সওয়াব নেই।

রসুল স. বলেছেন, রমজানে নফল পুণ্যকর্ম অন্যান্য মাসের ফরজ পুণ্যকর্মের মতো। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটি ফরজ পালন করে সে পায় অন্য মাসে ওই ফরজের সত্তর গুণ অধিক পালনের সওয়াব। এই দীর্ঘ হাদিসটি হজরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ।

সাধারণভাবে রমজানে ইতেকাফের মানত করলে যে কোনো রমজান মাসে তা আদায় করা যাবে। কিন্তু কোনো এক রমজানের কথা নির্দিষ্ট করে যদি কেউ উল্লেখ করে, তবে তাকে ওই রমজানেই তা সম্পাদন করতে হবে। ইবনে হুম্মাম বলেন, কিন্তু এই অভিমত ওই বিধানের মতো নয়, যেখানে বলা হয়েছে, যে শর্তের মাধ্যমে এক ইবাদতের মর্যাদা অন্য ইবাদতের উপরে প্রমাণিত হয় না, সে শর্ত পরিপূরণ অবশ্যপালনীয় নয়। বলা বাহুল্য যে, এক রমজান অন্য রমজানের তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠ নয়। তাই ইতেকাফের জন্য কেউ যদি প্রথম রমজানকে নির্দিষ্ট করে, তবে যত দ্রুত সম্ভব তাকে তা সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন, 'ইউসারিউনা ফীল খইরতি ওয়াহুম লাহা সাবিকুন' (আর তারা যথাশীঘ্র করে পুণ্যকর্ম। আর সেজন্য তারা অগ্রসূরী।)। আবার কেউ যদি পরবর্তী বছর সমূহের কোনো এক রমজানকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবু তার জন্য সামনে যে রমজান পড়বে সেই রমজানেই মানত পুরা করে নেয়া প্রয়োজন। কারণ জীবন অতি অনিশ্চিত।

মাসআলা : যদি কেউ কোনো রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যদি তা পালন না করে, তবে তাকে অন্য সময়ে হলেও ওই মানত পূর্ণ করতে হবে। আর ওই ইতেকাফ অবশ্যই করতে হবে রোজা সহযোগে। কারণ তার মানত পূরণের নির্ধারিত সময় ছিলো রমজান। এটাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের অভিমত। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতও এরকম। অন্য বর্ণনানুসারে তাঁর মত হচ্ছে— এমতাবস্থায় ওই লোককে আর ইতেকাফ করতে হবে না। যেহেতু মানত পরিপূরণের নির্ধারিত সময় বিগত হয়েছে, তাই তার ক্ষতিপূরণ করা অসম্ভব। ইমাম জোফারের মতও এরকম। এর কারণরূপে বলা যেতে পারে, রমজানের ইতেকাফ সর্বোত্তম। এমতো ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ অন্য মাসে সম্ভব নয়। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানত করার পর বসে নামাজ পড়লে তার মানত পুরা হবে না। মানত পূর্ণ করা এমতোক্ষেত্রে অসম্ভব, তাই তা পরিহরণীয়।

আমরা বলি, যুক্তিটি ঠিক নয়। কারণ রমজান গত হয়ে গেলে ফিরে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু ইতেকাফ করাতো অসম্ভব নয়। তাই এরকম মানতকারী ব্যক্তি যদি রমজানের পরেও ইতেকাফ করে, তবুও তার ইতেকাফের মানত পুরা হবে। কিন্তু রমজানের ফযীলত সে পাবে না। এখন অবশিষ্ট রইলো আর একটি কথা। তা

হচ্ছে— পরবর্তী রমজান পর্যন্ত ইতেকাফকে বিলম্বিত করা যাবে কিনা। এরকম করাও ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কারোরই নেই। বিষয়টিকে দেখতে হবে কাজা নামাজ ও রোজা আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। ওয়াক্ত মতো নামাজ এবং রমজানের রোজা ফরজ। এই ফরজ বাদ পড়ে গেলে পরবর্তীতে তার কাজা আদায় করে নেয়া যায়। এতে করে সঠিক সময়ে নামাজ রোজা আদায়ের ফযীলতের ক্ষতিপূরণ হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ তো সম্ভব। দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠের মানতকারীর বসে নামাজ পাঠ করার বিষয়টি এরকম নয়। কারণ পুনরায় দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠ করা সম্ভব। এভাবে বসে নামাজ পাঠ করার ভুলের ক্ষতিপূরণও সম্ভব।

সন্দেহ ও সন্দেহভঞ্জন ঃ রমজানে ইতেকাফের মানত করার পর যথাসময়ে তা পালন না করলে পরবর্তী রমজানেই তো তার কাজা আদায় করা উচিত। কিন্তু ততোদিন বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা নেই বলেই যত দ্রুত সম্ভব অন্য মাসে রোজাসহ মানত পুরা করার কথা বলা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মানতকারী যদি পরবর্তী রমজান পায়, তবে তাকে পুনরায় মানতের ইতেকাফ পূর্ণ করা উচিত। কারণ, ওজরবশতঃ কেউ হজে না যেতে পারলে তার পক্ষ থেকে কাউকে হজে পাঠাতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময় ওজর দূর হয়ে গেলে, অর্থাৎ হজযাত্রার সক্ষমতা ফিরে পেলে পুনরায় তাকে হজ করতে হয়। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে তার পূর্বের বদলী হজ বাতিল হয় এবং নতুন করে হজ করা হয়ে যায় ওয়াজিব।— এই সিদ্ধান্তটি কি ঠিক নয়?

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আল্লাহ্র সরাসরি হুকুমে ইতেকাফে রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হলে তো রমজানে ইতেকাফ করা শুদ্ধই হবে না। কারণ ইতেকাফের ওয়াজিব রোজা পালন করলে রমজানের ফরজ রোজা তাহলে রাখবে কীভাবে? আবার মানতের ওয়াজিব রোজাই বা রমজানের রোজা দ্বারা পূরণ হবে কী করে? রমজানের রোজা আবার মানতের রোজার উপরে নির্ভরশীলও নয়। কারণ পূর্ব থেকেই তা ফরজ। তাই বুঝতে হবে, রমজানের মর্যাদার কারণেই রমজান মাসে ইতেকাফের মানতকে জায়েয করা হয়েছে। এরকম করা হয়েছে কেবল প্রয়োজনবশতঃ। তাই রমজানে ইতেকাফের মানত পূর্ণ না করতে পারলে রমজানের ফযীলত হস্তচ্যুত হবে বটে, কিন্তু মূল মানত ঠিকই থাকবে। আর তা রোজাসহ অন্য সময়ে পালনও করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেন। কারণ তাঁর নিকট ইতেকাফের জন্য রোজা শর্ত। আর যাঁরা এ শর্ত মানেন না, তাঁরা বলেন, বাদ পড়ে যাওয়া রমজানের ইতেকাফের মানত পূর্ণ হয়ে যাবে রোজা ব্যতিরেকেই এবং পরবর্তী রমজানেও এই বাদ পড়ে যাওয়া ইতেকাফ আদায় করা যাবে। আর এরকম না করে কেউ যদি রমজানের পর কেবল কাফ্ফারার রোজাও

রাখে তবু তা হবে তার মানতের ক্ষতিপূরণ। অর্থাৎ এমতো মানতকারী রমজানের পরে ইতেকাফ করতে পারবে রোজাসহ, অথবা রোজা ব্যতিরেকে। অথবা এর ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কেবল মানতভঙ্গের কাফ্ফারা স্বরূপ রোজা রেখে। পরবর্তী রমজান পেলেও আর তাকে ইতেকাফ করতে হবে না। যেমন— পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে কেউ যদি তার ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে নেয়, তবে ওয়াক্ত শেষে পানি পাওয়া গেলেও তাকে আর ওজু করে নামাজ পড়তে হয় না। আবার বস্ত্রহীন ব্যক্তি নগ্ন হয়ে ওয়াক্তিয়া নামাজ পাঠের পর বস্ত্র লাভ করলেও বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আর তাকে করতে হয় না নামাজের পুনরাবৃত্তি।

কাফের অবস্থার মানতঃ ইসলাম গ্রহণের পরেও কাফের অবস্থার ইবাদতমূলক মানত পূরণ করা ওয়াজিব— এরকম বলেন ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। কারণ হজরত ওমরের কাফের অবস্থার মানত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ীর মতে কাফের জীবনের মানত ইসলাম গ্রহণের পর পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কেননা কাফের কখনোই ইবাদত করার উপযুক্ত নয়। ইমান ছাড়া ইবাদত করার উপযুক্ততা অর্জন করা যায় না। কাফেরের ইবাদত গোনাহ্। আর গোনাহ্ সম্পৃক্ত মানত পূরণের উপযোগী নয়। রসুল স. হজরত ওমরকে প্রকৃতপক্ষে কাফের অবস্থার মানত পূরণ করতে বলেননি। ইতেকাফের অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেই তিনি তাঁকে এমতো নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর এরকম নির্দেশ দ্বারা কাফের অবস্থার মানত পূরণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

মাসআলা ঃ আনুগত্যমূলক মানত পূরণ করার পূর্বে কেউ যদি ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায়, তারপর আবার যদি সে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে, তবে তাকে আর তার মানত পূরণ করতে হবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কারণ ইবাদতের মানত অবশ্যই ইবাদত, আর ইবাদতের এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় ধর্মত্যাগ করলে।

মাসআলা ঃ সব সময় রোজা রাখার মানত করার পর কেউ যদি পার্থিব বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মাঝে মাঝে রোজা বাদ দিতে বাধ্য হয়, তবে তাকে বাদ পড়ে যাওয়া প্রতি রোজার বদলে দান করতে হবে এক সা (প্রায় চার সের) গম। ইবনে হুম্মামও একথা লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে যদি সে এরকম করতে না পারে তবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমতোক্ষেত্রে এরকম অভিমতও এসেছে যে, সে ইচ্ছা করলে রোজা রাখবে, অথবা প্রতি রোজার বদলে দান করবে চার সের গম। এ ধরনের অসহনীয় আমলের ক্ষেত্রেও এরকম অভিমত দেয়া হয়েছে। আর যাঁরা এভাবে কাফ্ফারা বা

ক্ষতিপূরণের কথা বলেন তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন এই হাদিসটি— হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, যারা অস্বাভাবিক মানত করে বসে, তাদের কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মতো।

মাসআলা : দশ অথবা একশত হজ করার মানত যে করবে, তাকে সবকটি হজ পালন করতে হবে। অথবা যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে প্রতি বছর হজ পালন করে যেতে হবে। 'খোলাসা' প্রণেতা গ্রহণ করেছেন প্রথমোক্ত অভিমতটিকে। অন্যান্য ইমামগণ দ্বিতীয়োক্ত বক্তব্যটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন সাহেবাইনের সঙ্গে। ইমাম সারখ্সীর নিকটেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে দ্বিতীয় বক্তব্যটি।

যদি একই বছরে ওই ব্যক্তি দশটি হজের মানত করে, তবে তার উপরে ওয়াজিব হবে দশ বছরে দশটি হজ পালন করা। 'খোলাসা' গ্রন্থের বক্তব্যানুসারে, তাকে ওই বছরেই দশজনকে দিয়ে বদলী হজ করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি সে এর পর দশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবে প্রতি বছর হজ পালন করে যেতে হবে। বদলী হজ দ্বারা তার মানত পূরণ হতে পারবে কেবল তখন, যখন সে ওই বছরের হজের পরে মরে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, সে পরের দশ বছর বেঁচে থাকলেও হজ করার সামর্থ্য যদি হারিয়ে ফেলে, তখন কী হবে? এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আদায় করাই যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে মতদ্বৈধ্তা বিদ্যমান।

মাসআলা : কেউ বললো ' আমি হজ করবো'— এটা কি মানত? না, এরকম কথা বলে অঙ্গীকার বা শপথ করা হয়, মানত করা হয় না। তবে এমতো অঙ্গীকার পূরণ মোস্তাহাব।

মাসআলা : 'আল্লাহ্ আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিলে আমি হজ করবো' এরকম বললে তা হবে মানত। তখন ইসলামের নির্ধারিত ফরজ হজ ছাড়াও তাকে আর একটি হজ করতে হবে মানতরূপে। এমতাবস্থায় ওই লোক যদি সুনির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়াই হজ করে তবে সমাধা হবে তার ফরজ হজ। এরপর নিয়ত ছাড়া আর একটি হজ যদি করে তবে তার সেই হজ হবে নফল। এতে করে তার মানতের ওয়াজিব হজ আদায় হবে না। পরে তাকে আর একটি হজ করতে হবে সুনির্দিষ্ট মানতের নিয়ত করে। মানতের হজের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ত অত্যাবশ্যক। কেউ কেউ এরকম অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

মাসআলা : কেউ বললো 'জায়েদ যদি ইচ্ছা করে তবে আমার হজ আমার উপরে ওয়াজিব'— একথা শুনে জায়েদ বললো, হ্যাঁ আমি ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব হবে একটি মানতের হজ। তবে এমতোক্ষেত্রে এরকম করা জরুরী নয়, যে মজলিশে জায়েদ 'আমি ইচ্ছুক' বললো, সেই মজলিশেই ওই

ব্যক্তি তার হজের অভিলাষ ব্যক্ত করবে। তালাকের ক্ষেত্রে আবার অভিলাষ প্রকাশের নিয়ম এর বিপরীত। এদু'টো অবস্থার পার্থক্য এরকম— তালাকের মধ্যে থাকে তালাকদাতার কর্তৃত্ব এবং তা দেয়া হয় বুঝে শুনে। আর হজের ক্ষেত্রে অভিলাষ প্রকাশের সম্পর্ক জায়েদের ইচ্ছার উপর— যা একটি শর্ত।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'আমি আমার সমস্ত সম্পদ দান করে দিবো'— এমতাবস্থায় পছন্দনীয় ও উত্তম হচ্ছে, দান করতে হবে ওই পরিমাণ সম্পদ, যার উপরে জাকাত ফরজ। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপরেই জাকাত ফরজ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে তুলনীয় করা হয়েছে বান্দার মানতকে। এরকম অভিমতও এসেছে যে, এ ধরনের বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় অতিরিক্ত সম্পদ দান করাই এখানে উদ্দেশ্য। আর জাকাতের নেসাবই হচ্ছে অতিরিক্ত সম্পদ। অছিয়তের বিধান আবার আলাদা। কারণ অছিয়ত তখনই করা হয়, যখন সম্পদের প্রয়োজন আর থাকে না। তবে কেউ যদি 'আমি আমার অধিকৃত সকল সম্পদ দান করবো' এরকম বলে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মত হচ্ছে, এরকম মানতকারীর উপরে ওয়াজিব হবে তার্ সকল সম্পদ দান করে দেয়া। আর ইমাম আহমদ, ইমাম জোফার ও ইমাম শাফেয়ী বলেন 'সমস্ত সম্পদ' এবং 'অধিকৃত সম্পদ' কথা দু'টোর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। তাই উভয় অবস্থায় সকল সম্পদ দান করে দেয়া হবে ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেন, উভয় অবস্থায় দান করতে হবে সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। রযীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু লুবাবা একবার রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার কৃত অপরাধের তওবারূপে আমার ওই গৃহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই, যেখানে বসে আমি অপরাধ করেছি। আর দান করে দিতে চাই আমার সকল সম্পদ। রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমার পক্ষ থেকে এক তৃতীয়াংশ দান করাই যথেষ্ট। আমি বলি, এই হাদিসে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই, যাতে করে বুঝা যায় যে, হজরত লুবাবা তাঁর সকল সম্পদ দান করার মানত করেছিলেন। বরং এতটুকু বুঝা যায়, তিনি এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর রসুল স. তাঁকে এক তৃতীয়াংশ দান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র, যাতে করে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণিত এক হাদিসেও এরকম পরামর্শ দানের কথা এসেছে। যেমন— তিনি বলেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমি আমার তওবার ব্যবস্থারূপে আমার সমস্ত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই এবং তা পেশ করতে চাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের খেদমতে। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য উত্তম। বোখারী, মুসলিম। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বরের সম্পত্তি আমি নিজের জন্য রেখে দিবো।

মাসআলা : 'আমার সম্পদ দরিদ্রদের জন্য দানকৃত'— এরকম বললে বক্তার ওই সম্পদ তাঁর এমতো বাক্যের বহির্ভূত হবে, যা অন্যের।

মাসআলা : কেউ বললো, 'আমি আমার বর্তমান সম্পদ এবং ভবিষ্যতে যে সম্পদ আমার অধিকারে আসবে তার সকল কিছু দান করার মানত করলাম'— এমতাবস্থাতেও সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তার উপরে রয়েছে সে সকল সম্পদ দান করতে পারবে না। যেমন— কেউ সব সময় রোজা রাখার মানত করলেও রমজানের রোজা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এ জন্য তাকে কোনো কাফ্ফারাও দিতে হবে না। কেননা রমজানের রোজা তো সরাসরি আল্লাহ্র হকের অন্তর্ভুক্ত। এরকম মানতকারী যদি রমজানের রোজা ছাড়া অন্যান্য মাসে রোজা না রাখে তবে ওই রোজাগুলির জন্য তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

মাসআলা: কেউ বললো 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করবো'— এমতাবস্থায় এটা হবে তার মানত। তখন তাকে একটি ছাগল অথবা গাভী অথবা উট জবাই করতেই হবে। আর যদি সে এর সঙ্গে কোনো শর্ত জুড়ে দেয় তবে তাকে জবাই করতে হবে শর্ত পূরণের পর। যেমন বললো 'আমার ভাই সুস্থ হলে আমি এরকম করবো' তবে তাকে জবাই করতে হবে ভাইয়ের সুস্থতার পর। এরকম পশু সে যে কোনো স্থানে জবাই করতে পারবে। কিন্তু গোশত বণ্টন করে দিতে হবে দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে।

'নাওয়াদির ইবনে সুমায়া' গ্রন্থে রয়েছে, এরকম বললে মানত হয় না। তাই জবাই করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি 'দান করে দিবো' এরকম বলে তবেই কেবল তা বিবেচিত হবে মানতরূপে। আমি বলি, একথার দ্বারা বুঝা যায়, সে দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার 'জবাই করবো' কথাটির অর্থ হবে 'কোরবানী করবো' এবং তার গোশত বণ্টন করে দিবো দরিদ্র ও দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে। অর্থাৎ কেবল জবাই করার নিয়ত করলে গোশত বণ্টন করা ওয়াজিব হবে না। তখন তার বক্তব্যকে মানতরূপেও গণ্য করা যাবে না। আর যদি কেউ এরকম বলে 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে হাদী (কোরবানী) ওয়াজিব, তবে জবাই করতে পারবে ভেড়া, বকরী, উট, গাভী ইত্যাদি যে কোনো বৈধ কোরবানীর পশু। আবার কোন পশুকে যদি নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে কোরবানী করতে হবে ওই নির্দিষ্ট পশুকেই। এমতাবস্থায় কোরবানী করতে হবে হেরেমের সীমানার মধ্যে। কারণ 'হাদী' উচ্চারণ দ্বারা হেরেমে কোরবানী করাই বুঝায়। কোরবানীর দিবস সমূহে যদি এরকম মানত করা হয় তবে কোরবানী করতে হবে মিনায়। এরকম করা সুন্নত। আবার এরকম কোরবানী করা যেতে পারবে মক্কার যে কোনো

স্থানেও অর্থাৎ হেরেমের সীমানায়। আর যদি 'হাদী' উচ্চারণের সাথে উচ্চারণ করে 'জায্ওয়ার' তবে হেরেমের মধ্যে উট জবাই করা হবে ওয়াজিব। আর 'জায্ওয়ার' এর সাথে 'হাদী' উচ্চারণ না করে, তদস্থলে 'জবেহ্' অথবা তার সমার্থক কোনো শব্দ উচ্চারণ করে, তবে কোরবানী করতে হবে উট— হেরেমের অভ্যন্তরে, অথবা বাইরে। আর যদি উচ্চারণ করে 'বুদনাহ্', তবে যেহেতু 'বুদনাহ্' বা উট হাজী সাহেবগণ পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে থাকেন, সেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এমতাবস্থায় হেরেমের ভিতরেই কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন 'বুদনাহ্' মানত করলে হেরেমের ভিতরে উট কোরবানী করা ওয়াজিব হবে না। যদি উচ্চারণ করে 'আলাইয়া বাদানাতু মিন শাআ'ইরিল্লাহ্', তবে ওই উট হেরেমের ভিতরে জবাই করা ওয়াজিব হবে। কারণ 'শাআ'ইরিল্লাহ্' বলে ওই উটকে যাতে থাকে বিশেষ চিহ্ন, যা বলে দেয়— এই পশু কোরবানীর জন্য পাঠানো হচ্ছে হেরেমে। আর হেরেমের সীমানায় জবাই কৃত পশুর গোশত বণ্টন করে দিতে হবে হেরেমে অবস্থিত মিসকিনদের মধ্যে। আবার ইচ্ছে করলে ওই গোশত হেরেমের বাইরের মিসকিনদের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়া যাবে।

যদি কেউ 'হাদী'র মানত করার পর ওই 'হাদী'র মূল্য হেরেমে প্রেরণ করে সেখানকার মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে এসেছে দু'টি অভিমত। আবু সুলায়মানের বর্ণনানুসারে প্রথমটি এরকম— পশুর জাকাত যেমন ওই পশুর মূল্য বণ্টনের মাধ্যমে আদায় করা যায়, তেমনি 'হাদী'র মূল্যও বণ্টন করা যাবে। আবু হাফসের বর্ণনানুসারে বলা হয়েছে, এরকম করা নাজায়েয। কারণ 'হাদী'র ক্ষেত্রে জবাই করা শর্তটি বিদ্যমান, যা জাকাতের মধ্যে নেই। এমতোক্ষেত্রে গোশত বণ্টনের প্রসংগটি আসে জবাইয়ের পর। জাকাতের সঙ্গে গোশত বণ্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই পশু অথবা পশুর মূল্য বণ্টন করলেই জাকাত আদায় হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ কেউ ছাগল মানত করার পর যদি উট জবাই করে, তবে তার মানত আদায় হয়ে যাবে এবং তা হবে উত্তম। কারণ উটের মূল্যমান ছাগলের মূল্যমান অপেক্ষা বেশী। কিন্তু কেউ যদি দু'টি ছাগল মানত করার পর চারটি ছাগলের মূল্যমানের সমান একটি ছাগল কোরবানী করে, তবে তার মানত পূর্ণ হবে না। একটি ছাগলকে সবসময় একটি ছাগলই ধরতে হবে, তার মূল্য যত বেশীই হোক না কেনো।

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোনো একটি ছাগলকে মানত হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে তাকে ওই ছাগলটিই জবাই করতে হবে। জবাইয়ের আগে ছাগলটি যদি মরে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়, তবে আর তাকে অন্য কোনো ছাগল জবাই করতে হবে

না। অনুরূপ কেউ যদি তার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ দান করার মানত করে, তবে ওই অর্থ দান করাই হবে তার উপর ওয়াজিব। ওই অর্থ যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায় তবে তাকে আর অন্য কোনো অর্থ দান করতে হবে না। আবার ওই অর্থ মজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি সে ওই অর্থের সমপরিমাণ অন্য অর্থ দান করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তেমনি রুটি দানের মানত করার পর যদি কেউ ওই রুটির সমপরিমাণ অর্থ দান করে দেয় তবে তাও জায়েয।

মাসআলা : বস্ত্রদানের মানতকারী যদি কাবাগৃহের দরিদ্র প্রহরীদেরকে বস্ত্রদান করে, তবে তা জায়েয । কিন্তু দরিদ্র নয়, এমন প্রহরীকে দান করলে তার মানত পূর্ণ হবে না। আবার ওই বস্ত্র দ্বারা কাবা গৃহের অথবা দেয়ালের গেলাফ অথবা অন্য কিছু যদি তৈরী করে দেয়, তবুও মানত অপূর্ণই থাকবে।

মাসআলা : কেউ বললো 'আমি এই পশুটি বায়তুল্লায় অথবা কাবায় অথবা মক্কায় জবাইয়ের জন্য প্রেরণ করবো' এমতাবস্থায় তাকে তার মানত পূর্ণ করতেই হবে। আর এরকম না বলে যদি 'হেরেম' অথবা 'মসজিদে হারামে' প্রেরণের কথা বলে, তবে তার উপরে মানত ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থায় মানত ওয়াজিব হবে এবং ওই মানত পূর্ণ করা হবে ওয়াজিব। কিন্তু যদি বলে 'সাফায় প্রেরণ করবো' সম্মিলিত অভিমতানুসারে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

একটি সন্দেহ : 'হাদী' উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু এর সঙ্গে 'হেরেম' অথবা 'সাফা' উচ্চারণ করলে হেরেমে জবাই করা ওয়াজিব হয় না— এর কারণ কী?

সন্দেহ ভঞ্জন : শুধুমাত্র 'হাদী' উচ্চারণ করলে মনে করতে হবে এর সঙ্গে রয়েছে বায়তুল্লাহ্ অথবা মক্কার গোপন এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু এর সঙ্গে 'হেরেম' অথবা 'মসজিদ' উচ্চারণ করলে এরকম গোপন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না। তাই তা আর হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরী নয়।

মাসআলা : কেউ বললো 'আমার এই কাপড় দ্বারা আমি বায়তুল্লাহ্র পর্দা বা গেলাফ তৈরী করবো, অথবা হাতীমে লাগাবো', —এমতাবস্থায় উত্তমতার দৃষ্টিতে তার এই বাক্যকে মানত বলে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা হাদিয়া প্রেরণ করাই এমতো বাক্যের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ।

মাসআলা : কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির ছাগলের প্রতি ইশারা করে বললো 'এই ছাগল যদি আমি ক্রয় করি, তবে তা কাবার হাদিয়া করবো'— ইমাম শাফেয়ীর মতে এরকম মানত অনর্থক মানতের পর্যায়ভূত। কারণ যা নিজের অধিকারে নেই, তার সঙ্গে মানতের সম্পর্ক করা সিদ্ধ নয়। রসুল স. বলেছেন, যা নিজের মালিকানায় নেই, তা মানত করা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন,

ম্যালিকানায় না থাকার কারণ এখানে বিদ্যমান বলেই এরকম মানতকে মানত বলা হয়নি কিন্তু এই কারণেই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হলে মানত পূরণ করা হবে ওয়াজিব। অর্থাৎ ওই ছাগলটি ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে তা কোরবানী করে মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং এধরনের মানত নিরর্থক মানতের পর্যায়ভূত নয়।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'আমি নিজেকে অথবা আমার ছেলেকে কিংবা আমার ক্রীতদাসকে জবাই করবো' তবে তা হবে পাপযুক্ত মানত। তাই এধরনের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, সে একটি ছাগল কোরবানী করবে। আর যদি একাধিক ছেলেমেয়েকে জবাই করার মানত করে তবে এক এক জনের জন্য কোরবানী করবে একটি করে ছাগল। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, ছেলেমেয়ে জবাই করার কথা বললে ছাগল কোরবানী করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু নিজেকে অথবা নিজের গোলামকে জবাইয়ের মানত করলে তা হবে নিরর্থক মানত। তাই এমতোক্ষেত্রে তার উপরে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

হজরত ইব্রাহিমের উপরে তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে কোরবানী করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু অন্য কারো জন্য আত্মহত্যা অথবা সন্তান হত্যা ওয়াজিব করা হয়নি। তাই এমতোক্ষেত্রে নিজের অথবা সন্তানের পরিবর্তে ছাগল কোরবানী করাকে উত্তম বলা হয়েছে। মোহাম্মদ ইবনে মুনতাশীর বর্ণনা করেন, এক লোক নিজেকে কোরবানী করার মানত করলো। বললো, শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি নিজেকে কোরবানী করবো। এরপর সে হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে গিয়ে এ বিষয়ে করণীয় কি তা জানতে চাইলো। তিনি বললেন, তুমি মাসরুকের নিকটে গিয়ে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখো। তাই করলো সে। মাসরুক বললেন, এরকম করলে তুমি হয়ে যাবে মুমিনকে হত্যাকারী। এবং অনতিবিলম্বে পৌঁছে যাবে জাহান্নামে। সুতরাং তুমি একটি দুম্বা ক্রয় করে জবাইয়ের পর দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। হজরত ইসমাইল ছিলেন তোমার চেয়ে উত্তম। তাঁর ক্ষেত্রে এরকমই করা হয়েছিলো। লোকটি হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে মাসরুকের অভিমতের কথা জানালো। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আমিও এরকম বলতে চেয়েছিলাম। ইবনে রযীন।

মাসআলা ঃ কেউ বললো 'তোমার সম্পদের মাধ্যমে আমার যে মুনাফা হবে, তা খয়রাত করে দেয়া আমার উপরে ওয়াজিব' এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তিকে কথিত

মুনাফা খয়রাত করে দিতেই হবে। কিন্তু যদি ওই মুনাফা তাকে আমন্ত্রণ করে আহার করানো হয়, অথবা আহার্যরূপে প্রদান করা হয়, তবে খয়রাত করা আর ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা : কেউ মানত করলো ' আমি যা আহার করি তার সমপরিমাণ দান করবো' অথবা 'দান করবো ততটুকু যতটুকু আমি পান করি' তবে তা পূর্ণ করা হবে তার উপরে ওয়াজিব। প্রথমাবস্থায় প্রতিটি লোকমা বা গ্রাসের বিনিময়ে এক দিরহাম এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিটি চুমুক বা ঢোকের পরিবর্তে এক দিরহাম দান করতে হবে । কিন্তু প্রয়োজনীয় পানাহারের পরিমাণ কম করে দিয়ে এরকম করা যাবে না।

মাসআলা : কেউ বললো 'জায়েদ যেদিন আসবে, সেদিন আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোজা রাখা হবে আমার উপরে ওয়াজিব'— এরকম বাক্য বিবেচিত হবে কসমরূপে। এমতাবস্থায় জায়েদ যদি রমজান মাসের কোনো এক দিবসে আগমন করে তবে তাকে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে, মানতের কাজা করতে হবে না। কারণ তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক রোজা পালনের কোনো সুযোগই থাকবে না। কিন্তু রোজার নিয়তের পূর্বেই যদি জায়েদ চলে আসে, তারপর যদি সে শুকরিয়ার রোজার নিয়ত করে, এবং তখনো যদি সে রমজানের নিয়ত না করে থাকে, তবে তার কসম পুরা হয়ে যাবে এবং তার রমজানের রোজাও আদায় হয়ে যাবে, মানতের কাজা ওয়াজিব হবে না। রমজানের রোজা তো তার উপরে আগে থেকেই ফরজ ছিলো তাই তার রোজার মানত গৃহীত হবে না। আর কাফ্‌ফারা দিতে হবে না একারণে যে, কসমের নিয়ত সে করেনি। আর মানতের কাজার প্রয়োজনও একারণে নেই যে মানত এখানে সঠিকই হয়নি।

মাসআলা : কোনো পীড়িত ব্যক্তি বললো 'আমি এক মাস রোজা রাখার মানত করলাম'— এমতাবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর পরই যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপরে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

মাসআলা : যদি কেউ কোনো মাস অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে রোজা রাখার মানত করে, তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট তারিখসমূহে রোজা রাখা তার উপরে ওয়াজিব হয়েই থাকবে।

মাসআলাঃ যদি কেউ সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে, তবে এক সোমবার অথবা এক বৃহস্পতিবার রোজা রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি সে প্রতি সোমবার অথবা প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখার মানত করে তবে সারা জীবন ধরে ওই নির্দিষ্ট দিনসমূহে তাকে রোজা পালন করে যেতে হবে।

মাসআলাঃ সারা বছর রোজা রাখার মানত— মানতের বাক্যাবলী যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারিত হয়, তবু এমতো বাক্য উচ্চারণকারীকে মানত পূরণ করতে হবে। কারণ মানত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোনো সংবাদ নয়, যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর 'ইনশা' বাক্যে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় মূলসহ পবিত্র। অর্থাৎ ওই তিনটি বিষয়কে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যাবে এবং তার কার্যকারিতাও থাকবে অটুট। আর তার আস্বাদও পবিত্র। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাঃ চলমান বৎসরে রোজা রাখার মানত— কেউ বললো 'চলতি বছর আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার রোজা'— এমতাবস্থায় তখন থেকে একাধারে বারো মাস তাকে রোজা রাখতে হবে। কিন্তু 'ফতোয়ায়ে কাজী খান' এবং 'খোলাসা' গ্রন্থে রয়েছে, সুন্নত নিয়ম, তা হলো— রোজা শুরু করবে মহররম মাসে এবং শেষ করবে জিলহজে। আর চলমান বৎসরের প্রতি যদি তার ইঙ্গিত থাকে, তবে তখন থেকে জিলহজ পর্যন্ত। বৎসরের বিগত দিনগুলোতে রোজা রাখা তার উপরে আর ওয়াজিব থাকবে না। এভাবে 'আমি গতকাল রোজা রাখবো' যদি কেউ বলে, তবে তা হবে তার নিরর্থক মানত। এরকম অসার বাক্য কখনোই মানত নয়। আবার যদি কেউ বলে 'আমি এ মাসে রোজা রাখার মানত করলাম', তবে তাকে তখন থেকে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখতে হবে। বিগত দিনগুলো তখন হবে নিরর্থক মানতের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ কেউ বললো 'গতকালের রোজা রাখা আজ আমার উপরে ওয়াজিব'— এমতাবস্থায় তাকে ওই দিনই রোজা রাখতে হবে। গতকালের রোজার কাজা তার উপরে ওয়াজিব হবে না।

মাসআলাঃ কেউ বললো ' আমি সারা বছর রোজা রাখবো' এমতাবস্থায় তাকে সারা বছর রোজা রাখতে হবে নিষিদ্ধ দিবসসমূহ বাদ দিয়ে। আর মেয়েদেরকে রোজা রাখতে হবে ঋতুকালীন দিবসগুলো বাদ রেখে। এই বাদ পড়া দিবসের কাজাও তাদেরকে করতে হবে না।

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ সময়ের রোজার মানত— যদি কোনো রমণী হায়েজের দিবসসমূহে রোজা রাখার মানত করে, তবে সে মানত সঠিক হবে না। এ জন্য তাকে রোজার কাজাও করতে হবে না। আবার কেউ রাতে রোজা রাখার মানত করলেও তা হবে অবিশুদ্ধ। কারণ রাতে রোজা রাখার বিধান শরিয়তে নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল ইয়াত্ তাওয়াফু বিল বাইতিল আ'তীক্ব' (এবং যেনো সে তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের)।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত যোবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদার বরাত দিয়ে ইমাম বাগবী লিখেছেন, 'আতীক্ব' অর্থ মুক্ত। ইদৃশ নামকরণের স্বার্থকতা হচ্ছে, অত্যাচারী সম্রাটের জবর দখল বা প্রভাব থেকে আল্লাহ্ কাবা গৃহকে চিরমুক্ত রেখেছেন। সে কারণেই এ পর্যন্ত কোনো সম্রাটই কাবা গৃহকে স্ব-অধিকারে রাখতে পারেনি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, খর্ব উরুসন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবা ধ্বংস করবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অগুরু উরুসন্ধির অধিকারী এক হাবশী কাবাগৃহের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত ওই হাবশী তোমাদেরকে পরিহার করে চলবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিরোধ বাধিয়ো না। কেননা কাবাগৃহের সম্পদ ওই হাবশী ব্যতীত অন্য কোনো হ্রস্ব উরুসন্ধির অধিকারী লুণ্ঠন করতে পারবে না। আবু দাউদ, হাকেম, সিহাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ কাবাকে হজরত নূহের সময়ের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হতে দেননি। কাবাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন উর্ধ্বাকাশে। কাবাকে আ'তীক্ব বলা হয় একারণেই। ইবনে জায়েদ ও হাসান বলেছেন, আ'তীক্ব অর্থ প্রাচীন। এটা মানুষের তৈরী সর্ব প্রথম গৃহ; যা মহা মর্যাদাসম্পন্ন, প্রাচীন ও স্থায়ী।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আ'তীক্ব অর্থ সম্মানিত, শ্রেষ্ঠ, সুস্বীকৃত। ই'তাক্বুল খাইল অর্থ উচ্চ অশ্ব। ইত্‌ক্বুর রক্বীক্ব অর্থ গোলামীর লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সম্মান অর্জন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, কোনো মানুষ কাবাগৃহকে ব্যক্তি অধিকারে আনতে পারেনি এবং পারবেও না। এর চতুস্পার্শ্ব এবং হেরেমের অধিবাসীরাও অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— স্থানীয় ও অস্থানীয়দের জন্য বরাবর।

সতর্কবাণী ঃ তাওয়াফ বলে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে। তাওয়াফে কুদুম অর্থ প্রারম্ভিক তাওয়াফ। তাওয়াফ তিন প্রকার— ১. ফরজ তাওয়াফ। এই তাওয়াফ হজ ও ওমরার একটি স্তম্ভ ও অত্যাবশ্যকীয়। ২. ওয়াজিব তাওয়াফ। এই তাওয়াফ আগমনী ও প্রস্থানিক। অর্থাৎ তাওয়াফ করতে হয় প্রথম কাবাদর্শন ও কাবাগৃহ থেকে বিদায়কালে। ৩. বর্ণিত দুই প্রকারের তাওয়াফ ছাড়া বাকী সকল প্রকারের তাওয়াফ নফল। নফল তাওয়াফের জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, হে আবদে মান্নাফের উত্তর পুরুষেরা! তোমাদের মধ্যে

যে জননেতা হবে, সে যেনো দিন ও রাত্রির কোনো সময়ে কাউকে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে বাধা না দেয়। হাদিসটি ইমাম শাফেয়ী, সুনান প্রণেতাবৃন্দ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান, দারা কুতনী, হাকেম, তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যোবায়ের ইবনে মুতয়ীম থেকে। বিশুদ্ধায়ন করেছেন ইমাম তিরমিজি। দারা কুতনীও এই হাদিসটি অপর এক সূত্রপরম্পরায় হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরা ত্রুটিযুক্ত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও দারা কুতনী ভিন্ন সূত্রে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম তাঁর 'তারীখে ইসপাহান' গ্রন্থে এবং খতীব বাগদাদী তাঁর 'তাখলীস' নামক সংকলনে। কিন্তু এগুলোর সূত্রপরম্পরাও ত্রুটিমুক্ত নয়। হাদিসটির আরেকটি সূত্রপরম্পরা এরকমঃ ইবনে সাদী—সাঈদ ইবনে রাশেদ—আতা— হজরত আবু হোরায়রা।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের নিকটে আগমনী তাওয়াফ সুন্নত। ইমাম মালেকের মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু সাওর শাফেয়ীও এমতো অভিমত পোষণ করেন। অর্থাৎ এই তাওয়াফ পরিত্যাগ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তাওয়াফে কুদুম পরিত্যক্ত হলেও হজ আদায় হয়ে যায়।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, আমার নিকটে জননী আয়েশা রসুল স. এর হজের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে— রসুল স. মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথমে ওজু করে তাওয়াফ করেছেন। এরপর কোনো ওমরা পালন করেননি। হজরত আবু বকর হজ করেছেন এবং হজের সময় সর্ব প্রথমে তাওয়াফ করেছেন কাবা। এরপর তিনিও ওমরা করেননি। ওমরা করেছেন পরবর্তী সময়ে। এরপর হজরত ওসমানও এরকম করেছেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম হজ ও ওমরার তাওয়াফ করেছেন এভাবে— প্রথম তিন প্রদক্ষিণ বীরত্বব্যঞ্জকতার সঙ্গে দ্রুত এবং অবশিষ্ট চার প্রদক্ষিণ বিলম্বিত পদবিক্ষেপে। তারপর সেজদা করেন দুটি। শেষে সায়ী করেন সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের থেকে ইমাম মালেক বর্ণনা করেন, রসুল স. হজ করেছিলেন একা। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, তারপর ওমরা ছিলো না। আর তাওয়াফে কুদুমের কথা উপরে বর্ণিত দুটি হাদিসেই বলা হয়েছে। একথাও বিশুদ্ধসূত্রে এসেছে যে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিক্ষা করো। তাঁর এমতো আজ্ঞার কারণে তাওয়াফে কুদুম ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে একথাও সুপ্রমাণিত যে, তাওয়াফে

কুদুমের পর সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা জায়েয। এই সায়ী আবার ওয়াজিবও। বিষয়টি ঐকমত্যসঞ্জাত। সায়ী করা উচিত তাওয়াফের পর। তাই তাওয়াফও ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ওয়াজিব কখনো সুন্নত বা নফলের অনুগামী হতে পারে না। সেকারণেই মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্বে সায়ী করা জায়েয নয়। কেননা তাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম নেই এবং তাওয়াফের পর নফল সায়ীও জায়েয নয়। আর রসুল স. ইফরাদ হজ করেননি, করেছিলেন কিরান হজ। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনি নিয়ত করেছিলেন হজ ও ওমরার। একথার প্রমাণ রয়েছে অধিকাংশ হাদিসে। হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স. কে হজ ও ওমরার তালবিয়া উচ্চারণ করতে শুনেছি এভাবে— লাব্বায়িকা ওমরাতাও ওয়া হাজ্জান। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন, রসুল স. হজ ও ওমরা পালন করেছিলেন একসঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, বিদায় হজে রসুল স. ওমরা করার পর হজ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করেছিলেন এবং কোরবানী করেছিলেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পশু। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস এবং এরকম অন্যান্য হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম আহমদ বলেন, রসুল স. 'ইফরাদ' অথবা কিরান কোনোটাই করেননি। করেছিলেন 'তামাত্তু' হজ। আমরা বলি, এই হাদিসে উল্লেখিত 'তামাত্তু' অর্থ 'কিরান'। কেননা অভিধানানুসারে 'তামাত্তায়া বিল উ'মরাতি ইলাল হাজ্জ' অর্থ একই বছরে হজের মাসে ওমরা ও হজ দু'টোই সম্পাদন করা। এরকম হজ একবার ইহরাম বেঁধে যেমন করা যায়, তেমনি করা যায় পৃথক পৃথক ভাবে দুইবার ইহরাম বেঁধে। সুরা বাকারার ১৯৬ সংখ্যক আয়াতে এরকমই বলা হয়েছে। তবে ফকীহ্গণের পরিভাষায় 'তামাত্তু' ও 'কিরান' পৃথক প্রকৃতির। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যপ্রকরণ এরকম নয়। তাছাড়া উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, রসুল স. মক্কায় উপস্থিত হয়ে একটি তাওয়াফ করেছিলেন, অথবা করেছিলেন দুইটি তাওয়াফ— একটি তাওয়াফে কুদুম এবং অপরটি তাওয়াফে ওমরা। জমহুর বলেন, তিনি তখন একটি তাওয়াফই করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনি তখন তাওয়াফ করেছিলেন দু'টি। জমহুরের বক্তব্যের সমর্থনে রয়েছে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. মক্কায় আগমন করলেন, তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে সায়ী করলেন। পুনরায় তিনি তাওয়াফের জন্য কাবার নিকটবর্তী হননি। পরে তাওয়াফ করেছিলেন আরাফা থেকে ফিরে এসে। বোখারী ও মুসলিম এই হাদিসটি হজরত ইবনে ওমরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

হাজ্জাজ বাহিনীর দ্বারা যে বছর খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বছর হজ যাত্রার সংকল্প করেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। তাঁকে তখন বলা হয়েছিলো, মানুষ এখন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। আশংকা হয়, আপনি বাধাগ্রস্থ হবেন। তিনি তখন পাঠ করলেন 'তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'। তারপর বললেন, রসুল স. যা করেছিলেন, আমি তাই করবো। তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি ওমরাকে ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। বায়দার বাইরে যখন পৌছলেন তখন বললেন, হজ ও ওমরা একই প্রকৃতির। তোমরা আরো সাক্ষী থেকো যে, আমি ওমরার সঙ্গে হজকেও ওয়াজিব করে নিলাম। একথা বলে তিনি ক্রয়কৃত একটি কোরবানীর পশুও সঙ্গে নিলেন। ওই পশু তিনি কোরবানীর দিবসের পূর্বে কোরবানী করেননি। ইহরামও পরিত্যাগ করেননি। করেননি মস্তক মুণ্ডন অথবা কেশ কর্তন। আর এমন কাজও করেননি যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। শেষে কোরবানীর দিবস যখন এলো, তখন তিনি কোরবানী করলেন, মস্তক মুণ্ডন করলেন এবং ধারণা করলেন প্রথম তাওয়াফেই তাঁর হজ ও ওমরা সম্পন্ন হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বলেন, রসুল স. এরকমই করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যিনি হজ এবং ওমরা একত্রে আদায় করেন, তাঁর জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। তাঁর একথার অর্থ হচ্ছে, ইহ্রাম একবার বেঁধে হজ ও ওমরা একত্রে সমাপনের পর তা খুলে ফেলতে হবে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন মক্কায় গিয়েছিলেন, তখন কাবা প্রদক্ষিণ করেছিলেন সাত বার এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন সাত বার। এর অধিক কিছু করেননি এবং ধারণা করেছিলেন এরকম করাই যথেষ্ট।

হানাফীগণ তাদের অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন হজরত আলীর আমল থেকে। তিনিও হজ ও ওমরা আদায় করেছেন একসঙ্গে। কিন্তু উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে তাওয়াফ করেছেন দু'বার । সায়ীও করেছেন দু'বার এবং বলেছেন, আমি রসুল স. কে এরকম করতে দেখেছি। দারা কুতনী, নাসাঈ। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আছারে আবু হানিফার বর্ণনাক্রমে পরিণত শ্রেণীর বিবরণরূপে বর্ণনা করেন, হজরত আলী বলেছেন, যখন হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধবে তখন উভয়ের জন্য পৃথক পৃথকরূপে সম্পন্ন করবে দু'টি তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করবে দু'বার। স্বসূত্রে ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কিরান হজ সম্পাদনকারীকে তাওয়াফ করতে হবে দু'বার এবং সায়ীও দু'বার। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত এই

হাদিস সুপরিণত শ্রেণীরূপে দুর্বল। তবে পরিণত শ্রেণীর হাদিসরূপে ইমাম তাহাবী বিভিন্ন সূত্র সহযোগে বর্ণনাটিকে হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যরূপে সাব্যস্ত করেছেন, যা সামগ্রিকরূপে গ্রহণযোগ্য। আর এতে কোনো দুর্বলতাও নেই।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিস যথাসূত্রসম্বলিতরূপে প্রমাণিত হলেও এতে করে একথা সাব্যস্ত হয় না যে, রসুল স. মক্কায় পৌছবার পর মিনায় গমনের পূর্বেই দু'টি তাওয়াফ করেছিলেন— একটি কুদুমে হজের, অপরটি ওমরার। বরং হাদিসের মর্ম এই যে, রসুল স. ওমরা সম্পাদনার্থে কাবা তাওয়াফ করেছিলেন এবং সায়ীও করেছিলেন। আর তিনি এরকম করেছিলেন মীনা যাত্রার পূর্বে। পরবর্তীতে তিনি কোরবানীর দিবসসমূহে হজের জন্য পুনরায় তাওয়াফ ও সায়ী করেছিলেন। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্যও এরকম। অর্থাৎ রসুল স. তখন পৃথক পৃথক সময়ে তাওয়াফ করেছিলেন দুইটি এবং সায়ী করেছিলেন দু'বার। দারা কুতনী।

কোনো বিবরণেই এ কথা আসে নি যে, রসুল স. তাওয়াফে ওমরার পর তাওয়াফে কুদুম করেছেন। কেবল মসনদে আবু হানিফায় এসেছে, জবী ইবনে মা'বাদ বলেছেন, আমি জজিরা থেকে হজে কিরান সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে সুলায়মান ইবনে রবীয়া এবং জায়েদ ইবনে সাওহানের পাশাপাশি গমনকালে আমি উচ্চারণ করছিলাম 'লাব্বায়িকা বিহাজ্জাতিন ওয়া ওমরাতিন'। বর্ণিত বুজর্গদ্বয় আমার এমতো উচ্চারণ শ্রবণ করলেন। একজন বললেন, এলোক যে উটের চেয়েও অধিক পথভোলা। অন্যজনও একই কথা বললেন। কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলাম না। এভাবেই হজ সম্পন্ন করলাম। এরপর আমাকে উপস্থিত হতে হলো বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকটে। এখানে বর্ণনাকারী বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারপর বলেছেন, হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে হজ সম্পাদন করেছো? আমি নিবেদন করলাম, আমি সব সময় লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করেছি। তারপর ওমরার জন্য তাওয়াফ ও সায়ী করেছি। হজের জন্য দ্বিতীয় বারও আমি এরূপ করেছি। ইহ্রাম অবস্থায় হাজীসাহেবরা যা করেছেন, আমিও তা করেছি। এভাবে পূর্ণ করেছি হজের সকল রোকন। তিনি বললেন, তুমি লাভ করেছো রসুল স. এর সুন্নত। মসনদে ইমাম আবু হানিফার এই বিবরণটি অনির্ভরশীল ও অগ্রহণীয়। গ্রন্থকার ও ইমাম আবু হানিফার মাঝের সূত্রপরম্পরাভূত অনেক বর্ণনাকারী অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ওই সকল বর্ণনাকারীকে বোখারী কর্তৃক উপস্থাপিত হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনার

বিপরীতে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আর সেখানে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে, রসুল স. আরাফা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পুনরায় কাবার নিকটবর্তী হননি। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত যে, রসুল স. করেছিলেন কিরান হজ এবং তাওয়াফে ওমরা ব্যতীত হজের তাওয়াফে কুদুম তিনি করেননি। সুতরাং বুঝা গেলো, তাওয়াফে কুদুম হজের রোকন নয়। আর এই তাওয়াফ সার্বক্ষণিক ওয়াজিবও নয়। বরং এই আমলটি তাহ্ইয়াতুল মসজিদের নামাজের ন্যায় সুন্নত। আর ওয়াজিব ও সুন্নতের মাধ্যমে এই সুন্নত পূর্ণ হয়ে যায়। রসুল স. যখন মক্কায় পৌঁছেন ও ওমরার জন্য তাওয়াফ করে নেন, তখন তাওয়াফে কুদুমের স্থলে এই তাওয়াফই যথেষ্ট হয়ে যায়।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াফ নফল নামাজের মতই মানতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর আলোচ্য আয়াতে আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে তাওয়াফ দ্বারা হজের তাওয়াফে যিয়ারতের কথা বলা হয়েছে, যা হজের রোকনসমূহের অত্যাবশ্যকীয় রোকন। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর উপরেই। সুতরাং অন্য কোনো তাওয়াফ হজের রোকন নয়।

মাসআলাঃ তাওয়াফে সদর অর্থ তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। উম্মতের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফে সদর হজের রোকন নয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও সাহেবাইনের মতে এই তাওয়াফ ওয়াজিব। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। ইমাম আবু হানিফা এই তাওয়াফকে হজের ওয়াজিবগুলির মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ইমাম মোহাম্মদ একে চিহ্নিত করেছেন পৃথক ওয়াজিব হিসেবে। যদি কেউ তাওয়াফে বিদা করার পর আরো কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে মক্কা ত্যাগ করার সময় তার আর বিদায়ী তাওয়াফ করার দরকার নেই। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ বলেন পুনরায় তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এরকম করা ওয়াজিব।

ইমাম মালেকের নিকটে তাওয়াফে সদর সুন্নত। এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তাওয়াফে সদর আবার কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে অথবা নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের কারণে ঐক্যমত্যানুসারে রহিত হয়ে যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজের পর লোকজন যে বিভিন্ন নিয়মে প্রত্যাবর্তন করতেন। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, বায়তুল্লাহ্র সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করা পর্যন্ত মক্কা থেকে বের হয়ো না। আহমদ। দারাকুতনীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— লোকজন মিনা থেকে বের হয়ে আপনাপন গন্তব্যস্থলে চলে

যেতো। রসুল স. তাদেরকে বলতেন, প্রত্যেকের বিদায়ী সাক্ষাত বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে হওয়া উচিত। আর তিনি স. এই বিধান থেকে ঋতুবতী নারীদেরকে অব্যাহতি দিতেন। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তোমরা কেউ বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে শেষ সাক্ষাত না করে মক্কা থেকে বের হয়ো না। কিন্তু তিনি ঋতুগ্রস্তা নারীদের জন্য এই বিধান শিথিল করে দিয়েছিলেন। বোখারী মুসলিমে সঙ্কলিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. জনগণকে আদেশ দিলেন, তারা যেনো পরিশেষে বায়তুল্লাহ্‌র জিয়ারত করে।

হজরত ইবনে ওমর বলেন, যে ব্যক্তি কাবায় হজ করবে তার শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত । ঋতুগ্রস্তা নারীরা এই বিধানের বাইরে। রসুল স. তাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছেন। তিরমিজি, সিহাহ্‌। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আউসের বর্ণনায় এসেছে, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যে কাবাগৃহে হজ ও ওমরা করবে, তার বিদায়ী সাক্ষাত হতে হবে এই গৃহেরই সঙ্গে। তিরমিজি। শেষোক্ত হাদিসের মাধ্যমেই ইমাম আবু হানিফা প্রমাণ করেন যে, তাওয়াফে সদর ওয়াজিব। কারণ এখানে স্পষ্ট করে হজ ও ওমরার উল্লেখ এসেছে। আমি বলি, তাহলে তো ওমরার ক্ষেত্রেও তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু এরকম কথা কেউই বলেননি।

ইমাম আহমদ বলেন, 'লা ইয়ানফিরু আহাদ' (কেউ যাত্রা করবে না) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। তাই তাওয়াফে সদর ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইমাম আবু হানিফার মতানুসারে এই চূড়ান্ত অর্থবোধককে সীমিত অর্থবোধক করার আবশ্যক করে না। কেননা সীমিতকরণ এখানে কারণের উপরে নির্ভরশীল। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করো। অন্য হাদিসে এসেছে, 'প্রত্যেক মুসলমান আজাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করো। শেষোক্ত হাদিসে রয়েছে 'মুসলমান' শব্দটি। এভাবে সাধারণ বিধানকে করা হয়েছে সীমিত। সুতরাং এরকম করা যায়। কিন্তু তাওয়াফে সদরের হাদিসে এধরনের কিছু নেই। শর্ত এখানে জড়িত রয়েছে কারণের উপর। সুতরাং হজের পর মক্কা থেকে চূড়ান্ত বিদায়কালে তাওয়াফ ওয়াজিব।

তাওয়াফের শর্ত, ওয়াজিব রোকন সমূহ এবং সুনানের বিবরণঃ তাওয়াফের কিছু রোকন ফরজ, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু সুন্নত। আবার মোস্তাহাব রূপেও রয়েছে কিছু কিছু আদব।

১. তাওয়াফের শর্তসমূহঃ তাওয়াফের জন্য নিয়ত শর্ত যেমন সকল মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যাবশ্যক। শরিয়ত দ্বারা এই মাসআলাটি প্রমাণিত। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য সাধারণ তাওয়াফের নিয়তই যথেষ্ট। 'ফরজ তাওয়াফ করছি' এরকম সুনির্দিষ্টভাবে বলা জরুরী নয়।

প্রশ্নঃ উকুফে আরাফাত (আরাফা প্রান্তরে অবস্থান) এবং তাওয়াফে জিয়ারত হজের অত্যাবশ্যক রোকন। উকুফে আরাফাতের নিয়ত অবশ্য অত্যাবশ্যক নয়। কেউ যদি আরাফা প্রান্তরে অবস্থান করে নিদ্রিত বা সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, অথবা বিভিন্ন পর্বতবাসীদের সাথে অবস্থান করে যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরাফার পর্বতবাসীও, অবস্থানকারী জানেই না যে, এরা আরাফার পর্বতবাসী; তবুও সকলের উকুফে আরাফাতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। হজরত ওরওয়া ইবনে মুফরাস একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এসেছি বনী তাঈয়ের পাহাড় থেকে। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে আমার উট দুর্বল । আমিও পরিশ্রান্ত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো পাহাড়ীর সঙ্গ ত্যাগ করিনি। আমার হজ কি হবে? রসুল স. বললেন, যে আমাদেরকে সমাবেশস্থলে ফজরের নামাজের সময় পেয়েছে, আগের রাতে অথবা দিবসে আরাফায় পৌঁছেছে, তার হজ সম্পন্ন হয়েছে। আবু দাউদ।

এখন কথা হচ্ছে, তাওয়াফে জিয়ারতের নিয়তকে যদি হজের শর্ত বলা হয়, তবে নির্ধারিত ফরজ ছাড়া সাধারণ তাওয়াফের নিয়ত যথেষ্ট হওয়ার কী অর্থ হতে পারে? ফরজ নিয়তের নির্ধারণ তো ওই সকল ফরজ আদায়ের জন্য শর্ত, যার জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়— যেমন নামাজ।

উত্তরঃ প্রকৃত কথা এই যে, ইহ্‌রাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে হজের সকল রোকনের নিয়ত হয়ে যায়। অন্য কোনো নিয়ত এর পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত প্রথম নিয়ত সকল রোকন সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ এমতো ধারণা রাখতে হবে যে, প্রতিটি রোকনের নিয়ত ওই প্রারম্ভিক নিয়তের অনুগামী। রোকনসমূহ পালনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের আর প্রয়োজন নেই। যেমন নামাজ পাঠের জন্য নিয়ত করতে হয় প্রথমেই। এরপর ক্বেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদির জন্য নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, কোনো রোকন যদি পৃথক ইবাদতের যোগ্যতা রাখে, তবে তা আদায়ের জন্য নতুন নিয়ত আবশ্যক। যেমন তাওয়াফ ও তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ। এই রোকনদ্বয় শুরুর পূর্বে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট নয় আবশ্যক হয় নতুন নিয়ত। নামাজ ও তাওয়াফ দু'টোরই দু'টি অবস্থা রয়েছে— ১. পৃথক একটি ইবাদত এবং ২. ইবাদতের অংশ হওয়া। প্রথম অবস্থায় নিয়ত করতে হবে তাওয়াফ ও নামাজের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইহ্‌রামের সময়ের নিয়তই যথেষ্ট। আমরা উভয় অবস্থাকে সংরক্ষণ করি। তাই বলি পৃথক ইবাদতের বেলায় করতে হবে পৃথক নিয়ত, আর মূল ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে ইহ্‌রামকালীন সাধারণ নিয়ত। আরো বলি, তাওয়াফে জিয়ারত মূল ইবাদত হজ নয়, বরং হজের অংশ। যেমন অংশ আরাফায় অবস্থান, সাফা-মারওয়ায় সায়ী ইত্যাদি। এ সকল রোকনের জন্য নতুন নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই। ইহ্‌রামকালীন নিয়তই যথেষ্ট।

মাসআলাঃ কেউ অন্য কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে তাওয়াফ করলে এমতোক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। যেমন— ১. বহনকারী ইহ্‌রামবদ্ধ নয়, আরোহী ইহ্‌রামবদ্ধ এবং বহনকারী আরোহীর তাওয়াফের নিয়ত করেছে, সাথে সাথে আরোহীও তাওয়াফের নিয়ত করেছে— এমতাবস্থায় আরোহীর তাওয়াফ হয়ে যাবে। ২. বহনকারী ইহ্‌রামবদ্ধ, কিন্তু আরোহী ইহ্‌রামবদ্ধ নয়— এমতাবস্থায় বহনকারী যদি তার নিজের তাওয়াফের নিয়ত করে, তবে তার তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত। ৩. বহনকারী ও আরোহী দুজনেই ইহ্‌রামবদ্ধ, কিন্তু বহনকারী নিয়ত করেছে আরোহীর জন্য— এমতাবস্থায় কেবল আরোহীর তাওয়াফ আদায় হবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজের জন্য নিয়ত করে, তবে তারও তাওয়াফ হয়ে যাবে। আর যদি সে একসঙ্গে উভয়ের জন্য নিয়ত করে, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবল বহনকারীর তাওয়াফ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইহ্‌রামবদ্ধ বহনকারী যদি নিজ তাওয়াফের নিয়ত করে, অথবা নিজের নিয়তের সঙ্গে আরোহীর নিয়তও করে এবং একই সঙ্গে যদি আরোহীও তার নিজের নিয়ত করে, তবে উভয়েরই তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ আপন আপন স্থানে উভয়ের নিয়ত বিদ্যমান। এমতোক্ষেত্রে উভয়ের নিয়তের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

মাসআলাঃ তাওয়াফের শর্তসমূহের মধ্যে লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকাও একটি শর্ত। শরীর, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতাও জরুরী। আর জমহুরের নিকট গুপ্তাঙ্গ আবৃত থাকাও আবশ্যক। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে ওজু করলেন, তারপর সম্পাদন করলেন তাওয়াফ। এরপর বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে হজের বিধান শিক্ষা করো।

জননী আয়েশা বললেন, আমি মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলাম ঋতুবতী অবস্থায়। রসুল স. আমাকে বললেন, হাজীরা যা করে, তুমিও তা করো। কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবা তাওয়াফ কোরো না। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. তখন বললেন, তাওয়াফ করবে না, যতক্ষণ না গোসল করবে। জননী আরো বলেন, মক্কা থেকে যাত্রা শুরুর সময় সাফিয়্যার রজঃস্রাব শুরু হলো। একথা জানতে পেরে রসুল স. বললেন, সে কি কোরবানীর দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত করেছে? বলা হলো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, তাহলে রওনা হয়ে যাও। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, বিদায় হজের পূর্বে হজরত আবু বকরের অধিনায়কত্বে যে হজের কাফেলা প্রেরণ করা হয়, ওই হজ সম্পাদনকালে

কোরবানীর দিন হজরত আবু বকর আমাকে জনগণের নিকট এই ঘোষণা করার জন্য প্রেরণ করলেন যে, এই বছরের পর আর কোনো অংশীবাদী হজ করতে পারবে না। আর এখন থেকে উলঙ্গ হয়েও কেউ কাবা তাওয়াফ করতে পারবে না। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সতর আবৃত করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন— 'আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে' (আয়াত ২৬)। এই ঘোষণার মাধ্যমে স্থানের পবিত্রতার অত্যাবশ্যকতা সুপ্রমাণিত। আর পোশাক ও শরীর পবিত্রতার কথা তো আরো অধিক প্রামাণ্য। বিশেষতঃ লঘু ও গুরু অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টি আরো অধিক সুস্পষ্ট। কেননা প্রকৃত অপবিত্রতা অপেক্ষা বিধানগত অপবিত্রতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন পরিস্থিতিগত কারণে কখনো অপবিত্রতার সঙ্গেও নামাজ পাঠ করা যায়, কিন্তু ওজু বা তায়াম্মুম ছাড়া কখনোই নামাজ পাঠ করা যায় না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলের প্রতি নির্দেশ করেছেন— 'এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্য এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে'। এই আয়াতেও নামাজের পূর্বে এসেছে তাওয়াফের কথা। প্রকৃত পক্ষে তাওয়াফ নামাজের মতোই। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, তাওয়াফকালে কথা বলা যায়। কিন্তু নামাজ পাঠকালে কথা বলা যায় না। সুতরাং তাওয়াফরত অবস্থায় যে কথা বলতে চায়, সে যেনো পুণ্য কথা বলে। হাকেম, সিহাহ্, তিবরানী, বায়হাকী। তিরমিজি, হাকেম, দারাকুতনী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ হচ্ছে নামাজ। পার্থক্য কেবল এই যে, আল্লাহ্ তাওয়াফে কথা বলাকে বৈধ করে দিয়েছেন। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বলেছেন ইবনে সাকান।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রকৃত অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকিকি) থেকে পবিত্র হওয়া সুন্নত এবং বিধানগত অপবিত্রতা (নাজাসাতে হুকমী) থেকে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব। আর সতর আবৃত করাও ওয়াজিব। এগুলোকে পরিত্যাগ করলে গোনাহ্‌গার হতে হবে। উলঙ্গ হয়ে অথবা গোসল ফরজ হয়েছে এমন অবস্থায় যদি কেউ তাওয়াফ করে, তবে তার উপরে একটি গাভী অথবা উট কোরবানী করা হবে ওয়াজিব। ওজুবিহীন অবস্থায় কেউ ফরজ তাওয়াফ করলে তার উপরেও কমপক্ষে একটি ছাগল কোরবানী ওয়াজিব হবে। অনুরূপ ফরজ ব্যতীত অন্য তাওয়াফ যদি কেউ নির্বস্ত্র হয়ে অথবা অপবিত্র অবস্থায় আদায় করে তবে ছোট অথবা বড় যে কোনো প্রকার কোরবানী দিলেই চলবে। আর ফরজ ছাড়া অন্য তাওয়াফ ওজুবিহীন অবস্থায় করলে কাফ্‌ফারা স্বরূপ তাকে মিসকিনকে দান করতে হবে অর্ধ 'সা' গম।

ইমাম আবু হানিফার নিকট উপরোল্লিখিত বিষয়াদির কোনোটাই তাওয়াফের অত্যাবশ্যক শর্ত নয়। কারণ তাওয়াফের নির্দেশ এসেছে সরাসরি কোরআন মজীদের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ্‌র কিতাবের উপরে অতিরিক্ত করা এক অর্থে কোরআনের বিধানকে রহিত করে দেয়া। আর তাঁর নিকটে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানকে রহিত করা সিদ্ধ নয়। তাই তিনি বলেন, আমরা শর্তকে অত্যাবশ্যক ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত করি না। তবে হ্যাঁ, হাদিস শরীফের উপরে আমল করাও যেহেতু ওয়াজিব, সেহেতু আমরা বলি, উপরোল্লিখিত কর্মসমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

মাসআলাঃ তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য সময়ও একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। তাই এই তাওয়াফ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করা যায় না। আবার নির্ধারিত সময়ের পর তা কাজা করাও অত্যাবশক। এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐকমত্য। আর যদি কোনো ক্ষতির আশংকায় কেউ নির্ধারিত সময়ের পরে এই তাওয়াফ সম্পাদন করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে কোরবানী ওয়াজিব হবে। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। আর যদি ঋতুগ্রস্তা হওয়া অথবা কোনো শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি শরিয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে কেউ নির্ধারিত সময়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে না পারে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাওয়াফে জিয়ারতের সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন সুবহে সাদেক থেকে। আর জমহুর বলেন, সময় শুরু হয় কোরবানীর দিন অর্ধরাত্রি থেকে। কেননা জননী আয়েশা বলেন, রসুল স. আমাকে কোরবানীর রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ফজরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেছি। তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত করেছি। দারা কুতনী। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা শিথিল। কারণ এই সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী জুহাক ইবনে ওসমানকে ব্যক্তিত্বহীন বলে সাব্যস্ত করেছেন কাত্‌তান। তদুপরি এই বর্ণনাটি হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের বিপরীত বক্তব্য প্রকাশক, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. তাঁর পরিবার পরিজনদের মধ্যে যারা দুর্বল তাঁদেরকে পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ কোরো না। তিরমিজি। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাসান গারাবী সূত্রে। হাসান, তিরমিজি এবং তাহাবীও হাদিসটির সংকলক। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও ইবনে হাব্বানও বিভিন্ন সূত্রপরম্পরা যোগে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এভাবে সূত্রগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে হাদিসের বক্তব্যকে দিয়েছে শক্তিমানতা। এছাড়া হাদিসটিতে বলা হয়েছে 'ফা রমাতিল জুমরাতা', এরপর বলা হয়েছে 'ছুম্মা মাদ্বত ফাআফাদ্বত'। সুতরাং একথা বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে, রসুল স. এর নির্দেশে কংকর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো ফজরের পূর্বে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারত করা হয়েছিলো সূর্যোদয়ের পর। মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটিই এর প্রমাণ।

তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, শেষ সময় কোরবানীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমি সুরা বাকারার এতদসংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে লিখেছি যে, জমহুরের নিকট তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ সময় কেবল কোরবানীর দিনই। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটি সুপরিণত শ্রেণীর হাদিসও একথার সাক্ষ্যবাহী। আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, এক বর্ণনানুসারে হজরত আলীর অভিমতও এরকম। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'ইয়াওমিল হাজ্জিল আকবর' অর্থ মিনার দিবসসমূহ। অর্থাৎ কেবল কোরবানীর দিন নয়। সুফিয়ান সওরীর বক্তব্যও এরকম। তিনি একথাও বলেছেন, 'ইয়াওমুন' এর অর্থ সময় এবং কালও হয়। যেমন ইয়াওমুস সিফ্ফীন, ইয়াওমুল জামাল, ইয়াওমুল কিয়ামাহ্ ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ যথাক্রমে সিফ্ফীন যুদ্ধের সময়, জামাল যুদ্ধের সময়, কিয়ামতের সময়।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, তরতীব (ধারাবাহিকতা)ও তাওয়াফের একটি শর্ত। ইমাম মোহাম্মদের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এক্ষেত্রে তরতীব কোনো শর্ত নয়। অর্থাৎ ফরজ নয়। আর অধিকাংশ হানাফী আলেমগণের নিকটে তরতীব সুন্নত, যা পরিত্যাগ করা মাকরূহ (অনভিপ্রেত)। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম মহোদয়ের নিকট তরতীব ওয়াজিব, যা পরিত্যাগ করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ রসুল স. সব সময়ে তাওয়াফের তরতীব রক্ষা করেছেন। একথাও তিনি স. বলেছেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধান শিখে নাও। তবে তরতীবকে ফরজ বলা হলে তা হবে অতিরঞ্জিত। তরতীব রক্ষা করতে হবে এভাবে— প্রথমে দাঁড়াতে হবে হাজরে আসওয়াদের নিকটে, তারপর সামনের দিকে মুখ করে শুরু করতে হবে তাওয়াফ। এভাবে কাবাকে বাম দিকে রেখে শুরু করতে হবে পদবিক্ষেপ। এর বিপরীত করা নাজায়েয।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফ করতে হবে কাবা চত্বরে, মসজিদের সীমানার মধ্যে। এর বাইরে এদিকে ওদিকে তাওয়াফ করা যাবে না। রসুল স. এর জামানা থেকেই চলে এসেছে এই নিয়মটি।

তাওয়াফে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা একটি অত্যাবশ্যক রোকন। এটাই সুপ্রসিদ্ধ ও চলমান রীতি। উত্তম সূত্রসম্বলিত হাদিসের মাধ্যমেও এ কথা এসেছে যে, প্রদক্ষিণের গাণিতিক হিসাব নামাজের রাকাতের গাণিতিক হিসাবের মতো অবশ্য পালনীয়।

এরকম সন্দেহ অনুচিত যে, 'ওয়াল ইয়াত্তাওয়াফ্ফু' (তাওয়াফ করে), কথাটি নির্দেশসূচক। আর এমতো নির্দেশসূচকতার দাবীও এরকম হতে পারে না যে, নির্দেশকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সুতরাং একবার তাওয়াফ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে। বরং এরকম নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, সে আমলের পুনরাবৃত্তিকে গ্রহণ করে না। এবং পুনরাবৃত্তিবিহীনতাকেও নয়। কিন্তু পুনরাবৃত্তি প্রমাণিত হয়েছে প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহের দ্বারা। অতএব, সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করা কোরআনের আয়াতের পরিপন্থী নয়।

মাসআলাঃ তাওয়াফ অর্থ সাতবার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ। ইমাম আবু হানিফা বলেন, চারবার কাবা প্রদক্ষিণ করলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু তাওয়াফে জিয়ারতে এরকম করা হলে পরিত্যক্ত প্রদক্ষিণত্রয়ের জন্য একটি কোরবানী করতে হবে। আর অন্যান্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে কিছু সদ্কা খয়রাত করা হবে ওয়াজিব। কারণ অধিকাংশ সমষ্টির তুল্য। তাই চার বার প্রদক্ষিণ করলেই তাওয়াফ হয়ে যাবে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত তিন প্রদক্ষিণের ক্ষতিপূরণ করতে হবে কোরবানী অথবা সদ্কা খয়রাতের দ্বারা।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, সাতবারের কম প্রদক্ষিণ করলে তাওয়াফ পূর্ণ হবে না। যেমন নামাজের এক বা একাধিক রাকাত পরিত্যাগ করলে নামাজ হয় না, তেমনি যে কোনো এক বা একাধিক প্রদক্ষিণ পরিত্যাগ করলে তাওয়াফ হবে না।

মাসআলাঃ হাতিম কাবাগৃহের অংশ। তাই প্রদক্ষিণের সময় কাবাগৃহসহ হাতিমকেও প্রদক্ষিণ করতে হবে। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, (হাতিমের) এই দেয়াল কি কাবার অংশ? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম তাহলে এই স্থানকে কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত করা হলো না কেনো? তিনি স. বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের তখন পূর্ণাঙ্গ গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য ছিলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই গৃহের দরজা রাখা হয়েছে কেনো? তিনি স. বললেন, যাতে জনসাধারণের ব্যাপক অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। তোমাদেরকে মূর্খতার যুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যদি পেতাম তবে আমি হাতিমকে মূলগৃহের সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম। দরজাকেও মিশিয়ে দিতাম মৃত্তিকার সঙ্গে। কিন্তু আমার আশংকা হয় সর্বসাধারণ এ পরিবর্তনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবে না। বোখারী, মুসলিম।

তিরমিজি ও নাসাঈর বর্ণনায় জননী আয়েশার বর্ণিত হাদিসটি এসেছে এভাবে— জননী বলেন, আমি কাবাগৃহের অভ্যন্তরভাগে নামাজ পড়বার আকাংখা পোষণ করতাম। তাই রসুল স. আমাকে হাতে ধরে হাতিমে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখানে নামাজ পড়ে নাও। এ স্থান কাবার অংশ। আবু দাউদের বর্ণনাও এরকম।

তাত্ত্বিকগণ লিখেছেন, হাতিম কাবারই অংশ আর হাতিমের দৈর্ঘ্য তিন গজের কিছু বেশী। জননী আয়েশা থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন,

তোমাদের সম্প্রদায় যদি পৌত্তলিকতার যুগসংলগ্ন না হতো (ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা যদি না থাকতো) তবে আমি কাবা গৃহকে মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিতাম। নির্মাণ করতাম নতুন করে। হাতিমের তিন গজ নিয়ে আসতাম গৃহসীমানায়। আর দরজা বানাতাম দুটি— একটি পূর্বে, আর একটি পশ্চিমে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হাতিমের স্থান প্রায় সাড়ে তিন গজ। বোখারী সূত্রে জারীর ইবনে হাজেম থেকেও এরকম কথা এসেছে।

ইয়াজিদ ইবনে রুম্মান বর্ণনা করেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের যখন কাবা গৃহ ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি হাতিমকে মূলগৃহের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আমি তখন (পুনঃনির্মাণের পূর্বে) হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত উটের কুজ সদৃশ ভিত্তি দর্শন করেছি। দেখেছি হাতিমের স্থান প্রায় তিন গজ।

মুজাহিদ বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের হাতিমের তিন গজ জমিন বায়তুল্লাহ্র সীমানাভূত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অর্ধহাত এবং তিন গজ।

মাসআলাঃ তাওয়াফের সময় হাতিমকে কেউ প্রদক্ষিণের বাইরে রাখলেও তার তাওয়াফ হয়ে যাবে, কিন্তু এর জন্য একটি কোরবানী দিতে হবে— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কেননা হাতিম যে কাবার অংশ, তা প্রমাণিত হয়েছে খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) দ্বারা। তাই তাকে কোরবানীর মাধ্যমে ওয়াজিব পরিত্যাগের ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে। সরাসরি হাতিমকে কাবার অংশ প্রমাণ করা যায় না। কারণ এরকম কথা কোরআনে নেই। তাই হাতিমকে প্রদক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত করা ফরজ নয়। এর পরেও যদি এরকম করাকে ফরজ বলা হয়, তাহলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দিতে হয়, যা অসিদ্ধ। জমহুরের অভিমত এর বিপরীত। তাঁরা বলেন খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয।

আমি বলি, হাতিমকে তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত ফরজ মনে করলে খবরে আহাদকে কিতাবুল্লাহ্র উপরে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। কেননা আল্লাহ্ 'বায়তুল আতিক্ব' তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর 'আলআতিক্ব' এর আলিফ লাম হচ্ছে সীমিত। অর্থাৎ 'আল বাইত' অর্থ ওই ঘর যা নির্মাণ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আর তাঁর নির্মিত কাবার মধ্যে হাতিমও ছিলো। আয়াতের বক্তব্যের প্রকৃতিই এর প্রমাণ। যেমন এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজ্ বাওয়া'না লি ইব্রাহীমা মাকানাল বাইত'(আর আমি যখন ইব্রাহীমের জন্য তৈরী করেছিলাম গৃহের স্থান)। সুতরাং হাতিমকে তাওয়াফের বাইরে রাখলে পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফে দেখা দেয় সন্দেহ। আর তাওয়াফ অর্থ পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফ। এরকম পূর্ণাঙ্গ তাওয়াফই ফরজ, আংশিক তাওয়াফ নয়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম যে কাবা নির্মাণ করেছিলেন, হাতিমও ছিলো তার সীমানাভূত। সংক্ষিপ্ত একটি হাদিসেও একথা এসেছে।

মাসআলাঃ ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অক্ষম ব্যক্তি অন্য কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। সক্ষম ব্যক্তি যদি কারো উপরে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে, তবে তাকে পুনরায় পদব্রজে তাওয়াফ করতে হবে। এরকম না করলে দিতে হবে কোরবানী।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, পদব্রজে তাওয়াফ সুন্নত, ওয়াজিব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. উটে চড়ে তাওয়াফ করেছেন। রোকনের নিকট পৌঁছে ইশারা করতেন হাতের ছড়ি অথবা লাঠি দিয়ে এবং বলতেন আল্লাহু আকবার। বোখারী, মুসলিম। হজরত জাবের বর্ণনা করেন, রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে সাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করতেন, যেনো মানুষ সহজে তাঁকে দেখতে পান। সকলের চোখের সামনে তিনি অবতরণ করতেন। আর লোকজন তাঁকে বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। মুসলিম।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বিদায় হজে কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। প্রত্যেক চক্রেই তিনি চুমো দিতেন রোকনে।

হানাফীগণ বলেন, রসুল স. এরকম করেছিলেন অসুস্থতার কারণে। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. মক্কায় আগমন করেছিলেন কিছুটা অসুস্থ হয়ে। তাই তিনি তাওয়াফ করেছিলেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। যখন রোকনে উপস্থিত হতেন, তখন রোকন স্পর্শ করতেন ছড়ি দ্বারা। তাওয়াফ শেষে উপবেশন করাতেন উটকে। তারপর অবতরণ করে পাঠ করতেন দুই রাকাত নামাজ। আবু দাউদ।

অন্যান্য ইমাম, হানাফীগণের এই জবাবের প্রেক্ষিতে বলেছেন, রসুল স. যে তখন অসুস্থ ছিলেন, তা অনুমান মাত্র। বিষয়টি সুপ্রমাণিত নয়। বাকী রইলো আবু দাউদের বর্ণনাটির কথা। তাঁর বর্ণনাসূত্রভূত ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিমান নয়। তাই বর্ণনাটিকে প্রামাণ্য বলা যায় না। ইমাম শাফেয়ী আবার এ সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আমি জানিনা ওই হজে রসুল স. পীড়িত ছিলেন কিনা।

আমি বলি, রসুল স. তখন অসুস্থ থাকলে আগমনী তাওয়াফ পদব্রজে করতে পারতেন না। অথচ হজরত জাবের প্রমুখের বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আগমনী তাওয়াফ চার চক্কর দিয়েছেন তেজব্যঞ্জকতার সঙ্গে এবং

অবশিষ্ট তিন চক্কর সাধারণভাবে পদব্রজে। হজরত জাবের থেকে আর একটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী করেছিলেন এবং ঘর্মাক্ত হয়েছিলো তাঁর বসন। একথায় প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থতার কারণে তিনি উষ্ট্রারোহণ করে তাওয়াফ করেননি। করেছিলেন একথা জানিয়ে দিতে যে, এরকম করা সিদ্ধ। আর এভাবে হজের নিয়ম শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বাহনারোহী হয়ে নফল তাওয়াফ করা মাকরূহ— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। জমহুর বলেন, সিদ্ধ। জমহুরের পক্ষে রয়েছে বোখারীর একটি বর্ণনা, যা আমি উল্লেখ করেছি সুরা ফাতাহ্ এর তাফসীরে। বর্ণনাটি এই— রসুল স. যখন মক্কা জয় করেন, তখন তাওয়াফে কুদুম করেন উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করে।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, তাওয়াফে বিরতিহীন চক্রাবর্তন ফরজ নয়। বরং সুন্নত। সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে ওমর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় নামাজের ইকামত হলো। তিনি জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে পূর্ণ করে নিলেন অবশিষ্ট চক্রাবর্তন। ইবনে আবু বকর সূত্রে আবদুর রহমান এবং আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় আরো এসেছে, আতা বলেন, তাওয়াফের কিছু অংশ সম্পন্ন করার পর কেউ যদি কারো জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করে, তবে তাকে জানাজা শেষে বাকী অংশ পূর্ণ করে নিতে হবে। নতুন করে তাওয়াফ শুরু করতে হবে না।

নাফে বলেছেন, তাওয়াফরত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বেদাত। হাসান বলেছেন, তাওয়াফরত অবস্থায় যদি কেউ নামাজের ইকামত শোনে, তবে তাকে তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে নামাজের জামাতে শরীক হতে হবে। নতুনভাবে তাওয়াফ করতে হবে নামাজের পর।

মাসআলাঃ ফরজ তাওয়াফ ফরজ নামাজের জন্য স্থগিত রাখা হলেও তা হবে মাকরূহ। জননী উম্মে সালমার বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা আগমনী তাওয়াফ করেছিলেন এবং ওই তাওয়াফের মধ্যবর্তীতে রসুল স. ফজরের নামাজ পাঠ করেছিলেন।

মাসআলাঃ নফল তাওয়াফ পালনকালে ফরজ নামাজের ইকামত হলে, অথবা জানাজার নামাজ বাদ পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তাওয়াফ স্থগিত রেখে নামাজ অথবা জানাজায় শরীক হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নফল কোনো ইবাদতের কারণে নফল তাওয়াফ স্থগিত রাখা যাবে না। তবে বিতির নামাজে শরীক হওয়ার জন্য নফল তাওয়াফ স্থগিত রাখা উত্তম। একথার প্রমাণ রয়েছে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হজরত আবু বকরের আচরণে।

মাসআলাঃ সাতবার কাবা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এরকম। তাওয়াফের পরের এই দুই রাকাত নামাজ যে পরিত্যাগ করবে তার উপরে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা উপস্থাপন করেছি 'ওয়াততাখিজু মিম্ মাক্বমি ইব্রাহীমা মুসল্লা' আয়াতের তাফসীরে।

তাওয়াফের মোস্তাহাবসমূহঃ কাবা শরীফের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লহ্। তারপর করতে হবে দোয়া। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, কাবা শরীফ দেখলে দোয়া করা মোস্তাহাব। হাজরে আসওয়াদের নিকটে উপস্থিত হলে চুম্বন করতে হবে হাজরে আসওয়াদ নামক ওই প্রস্তর খণ্ডটি, যদি অন্য লোককে কষ্ট না দিয়ে তা করা সম্ভব হয়। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতেন এবং তাতে চুম্বন দান করতেন। সুপরিণত সূত্রসহযোগে ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি দীর্ঘ সময় হাজরে আসওয়াদের উপরে ওষ্ঠদ্বয় রাখতেন। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, তিনি অনেকক্ষণ তাঁর দুই ওষ্ঠ হাজরে আসওয়াদের উপরে রাখতেন এবং ক্রন্দন করতেন। হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেতেন এবং মস্তকও স্থাপন করতেন তার উপরে।

এভাবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা যদি সম্ভব না হয়, তবে কী করতে হবে, তা বলা হয়েছে উপরে বর্ণিত একটি হাদিসে। বলা হয়েছে, রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে তাওয়াফ করেছেন এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন ছড়ি দ্বারা। এরকম করাও যদি সম্ভব না হতো, তবে তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থামতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেন রসুল স. আমাকে নির্দেশ করেছেন, তুমি একজন শক্তিমান পুরুষ। সুতরাং হাজরে আসওয়াদের নিকটে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গমন করবে না, যাতে দুর্বল লোকেরা কষ্ট পায়। যখন লোকজন সরে যাবে, তখন স্পর্শ করবে হাজরে আসওয়াদ। নয়তো সেদিকে মুখ করে পাঠ করবে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্)। আহমদ।

মাসআলাঃ জমহুর বলেন, যখন রোকনে ইয়ামিনের নিকট দিয়ে গমন করবে তখন তাকে স্পর্শ করবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম করা মোস্তাহাব, সুন্নত নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেন, আমি দেখেছি রসুল. স. হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামিন উভয়কে স্পর্শ করেছেন (অথবা চুম্বন করেছেন)। সুপরিণত সূত্রসহযোগে দারাকুতনীর বর্ণনায়

এসেছে, রসুল স. রোকনে ইয়ামিনকে চুমু দিয়েছেন এবং তার উপরে স্থাপন করেছেন তাঁর পবিত্র গণ্ডদেশ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে সুপরিণত সূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রোকনে ইয়ামিনে রয়েছে সত্তর জন মোয়াক্কেল ফেরেশতা। যখন কেউ সেখানে উপস্থিত হয়ে পাঠ করে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফীদ্ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি রব্বানা আতিনা ফীদ্ দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফীল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বীনা আ'জাবান্নার' তখন ওই ফেরেশতারা বলে 'আমীন'।

মাসআলাঃ ইহ্রামের উর্ধদেশের বস্ত্রখণ্ড ডান বগলের নিচে দিয়ে বুক ঢেকে নিয়ে স্থাপন করতে হবে বাম স্কন্ধে, ডান কাঁধ থাকবে খোলা— এরকম অবস্থায় বীরত্বব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে আগমনী তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর। চক্রাকারে প্রদক্ষিণ শুরু করতে হবে হাজরে আসওয়াদের অবস্থান স্থল থেকে। সেখানে এসেই সমাপ্ত হবে প্রতিটি প্রদক্ষিণ। এরকম করাই সুন্নত। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণ বীরের মতো তেজব্যঞ্জকতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত। অবশিষ্ট চারটি প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতেন স্বাভাবিক পদবিক্ষেপে। প্রতি প্রদক্ষিণ শুরু হতো হাজরে আসওয়াদের চুম্বন অথবা স্পর্শনের মাধ্যমে। এটাই বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরাগত রসুল স. এর আমল। এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমের নিকটে সম্পাদন করতেন দুই রাকাত নামাজ। ওই নামাজের দুই রাকাতে পাঠ করতেন সুরা কাফিরূন ও সুরা এখলাস। এরপর পুনরায় চুম্বন করতেন হাজরে আসওয়াদ এবং পাঠ করতেন আল্লাহু আকবার এবং লাইলাহা ইল্লাল্লহ্। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত নামাজ পাঠ কালে সম্মুখে রাখতেন মাকামে ইব্রাহিম এবং কাবা শরীফ। আর নামাজের প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলহুয়াল্লহু আহাদ'। তারপর চুম্বন করতেন হাজরে আসওয়াদ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩০, ৩১

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝ حُنَفَاۗءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۗءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

❒ ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদিগের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদিগের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা-কথন হইতে,

❒ আল্লাহের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাহার কোন শরীক না করিয়া; এবং যে-কেহ আল্লাহের শরীক করে তাহার অবস্থাঃ সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শুরুতে 'জালিকা' (ইহাই বিধান) উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আলোচিত বিধানাবলীর প্রতি। অর্থাৎ বলা হয়েছে— এতক্ষণ ধরে যে বিধানগুলোর উল্লেখ করা হলো, সেই বিধানগুলোই হজের আবশ্যকীয় বিধান। অবশ্য পালনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া মাঁইইয়ুআজজিম হুরুমাতিল্লাহি ফাহুয়া খইরুল লাহু ই'নদা রব্বিহী' (এবং যে কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করবে তার প্রতিপালকের নিকটে তার জন্য তা-ই উত্তম)। এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহ। উল্লেখ্য, পবিত্র অনুষ্ঠানসমূহে রয়েছে কিছু কিছু নির্দেশ ও কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা। এগুলো সম্মানার্হ। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞাসমূহকে পরিত্যাগ করতে হবে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে। কেননা বিশ্বাসীগণের নিকটে পাপ মস্তকোপরি পতনশীল পাহাড়ের মতো ভয়াবহ। আর কপটচারীদের নিকটে পাপ হচ্ছে নাসিকার উপরে পতিত মক্ষিকা সদৃশ, যে মক্ষিকা সামান্য হস্ত সঞ্চালন করলেই উড়ে চলে যায়। মুমিন ও মুনাফিকের তুলনা হাদিস শরীফে এভাবেই করা হয়েছে।

ফকীহ্ লাইছ বলেছেন, 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ ওই সকল কাজ, যার প্রতিপালন অবধারিত। অর্থাৎ আল্লাহ্র সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাই 'হুরুমাতিল্লাহ্' এর অন্তর্গত।

জুজায বলেন, 'হুরুমাত' হচ্ছে ওই আমল যা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পাদন করা ওয়াজিব। ন্যূনতা বা অপূর্ণাঙ্গতার সুযোগ যে আমলে একেবারেই। নিষিদ্ধ।

কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ হজের আদব। ইবনে জায়েদ বলেন, এখানে 'হুরুমাতিল্লাহ্' অর্থ সম্মানিত শহর, সম্মানিত গৃহ এবং সম্মানিত মাস। অর্থাৎ মক্কা, কাবা শরীফ এবং ওই সকল মাস যেগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আর 'তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম' অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটাই তার জন্য শ্রেষ্ঠ সওয়াব।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে'। একথার অর্থ— কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন বিভিন্ন পশু ও প্রাণী— স্থলভাগের ও সমুদ্রের। আর বাহিরা, সায়েবাহ্, ওয়াসিলা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোকেও আল্লাহ্ করে দিয়েছেন হালাল, যদিও পৌত্তলিকেরা ওগুলোকে হারাম বলে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে'। এ কথার অর্থ— সুতরাং হে মানুষ! তোমরা জীবনযাপন করো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বৈধতার সীমানায়। আর বর্জন করো প্রতিমা পূজার মতো ঘৃণ্য অপবিত্রতাকে। নিঃসন্দেহে পৌত্তলিকতা নাপাক। তাই যারা জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ, তারা প্রতিমা পূজা থেকে এমনভাবে নিজেকে রক্ষা করে, যেমনভাবে সর্ব সাধারণ পরিহার করে চলে অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা।

'ফাজ্বতানিবূ' অর্থ বর্জন করো অর্থাৎ বিরত থাকো। এভাবে এখানে শব্দটির মাধ্যমে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার জোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমতো নিকৃষ্টতম অপবিত্রতা যে তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষেধ। কেউ কেউ এখানকার 'রিজ্বসুন্' (অপবিত্রতা) শব্দটির অর্থ করেছেন 'রিজ্যুন' (শাস্তি)। অর্থাৎ মূর্তিপূজা শাস্তিযোগ্য। তাই বুঝতে হবে, রূপক অর্থে মূর্তিকেই এখানে শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

'ক্বওলায্ যূর' অর্থ মিথ্যা কথন। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'যাওরুন' থেকে। এর অর্থ ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া, যেমন মিথ্যা কথা সত্য থেকে ফিরে যায় বা প্রত্যাবর্তন করে। যেমন 'ইফ্ক্' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ইফ্কুন' থেকে। এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া বা ঘুরিয়ে দেয়া। সত্য কথাও তেমনি মিথ্যা কথাকে ঘুরিয়ে দেয় বা ফিরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, 'যূর' শব্দটির মধ্যে সকল প্রকার মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল পৌত্তলিকদের কতিপয় সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বুঝাতে। যেমন তারা বলে, 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' 'মূর্তি আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে' (তালবিয়া পাঠের সময়ের) 'তোমার কোনো শরীক নেই, কেবল ওই শরীক ছাড়া, যার মালিক তুমি, যে তোমার মালিক নয়' ইত্যাদি।

মিথ্যা সাক্ষ্য শিরিকতুল্যঃ হজরত হুজায়েম ইবনে ফাতিক থেকে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিবরানী ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ফজরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান আল্লাহ্র সঙ্গে অংশী স্থাপনের নামান্তর। এ

কথা তিনি উচ্চারণ করলেন তিনবার। তারপর পাঠ করলেন, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কসম থেকে, আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোনো শরীক না করে'।

কাতাদা বলেন, অংশীবাদিতার যুগে মানুষ নিজেরা হজ করতো, কিন্তু তাদের মাতা, কন্যা ও ভগ্নীদেরকে হজ করতে দিতো না। আবার নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতো 'হানীফ' (হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাধিষ্ঠিত বলে)। তাদের ওই মূর্খজনোচিত বক্তব্য ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। নির্দেশ দেয়া হয়— হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপরে যদি তোমরা প্রতিষ্ঠিত বলতে চাও, তবে বর্জন করো মূর্তিরূপ অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করে'। এখানকার 'হানীফ' শব্দটি এসেছে 'হানাফা' থেকে। কামুস গ্রন্থে এসেছে 'হানাফ' অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ সত্যের উপরে সুদৃঢ়। এরকম সুদৃঢ় থাকার অর্থই হচ্ছে, আপন উপাসনাকে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য বিশুদ্ধ করে নেয়া এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর উপাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাওয়া। সুতরাং বুঝতে হবে যারা হানীফ তারাই হজরত ইব্রাহিমের সত্যিকার অনুসারী এবং তারা কস্মিনকালেও অংশীবাদী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে তার অবস্থা ঃ সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।'

আল্লাহ্‌র ইবাদতই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্বোচ্চ মর্যাদার সঙ্গে যখন কেউ অংশীবাদিতাকে মিশ্রিত করে, তখন সে হয়ে যায় ওই অনুল্লেখ্য বস্তুর মতো, যা ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পতিত হয় মাটিতে, তারপর কোনো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। কিংবা ক্ষিপ্রবাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত কোনো স্থানে। এটাই আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ।

'তাহ্‌বী বিহির্ রীহু' অর্থ বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। 'ফী মাকানিন্ সাহীক্ব' অর্থ নিক্ষেপ করে অজ্ঞাত স্থানে বা দূরবর্তী স্থানে। প্রকৃত অর্থে শয়তানই মানুষকে নিক্ষেপ করে এরকম অপপরিণতিতে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মতো সুউচ্চ আকাশ থেকে অংশীবাদীরা যখন তাদের পতনকে তরান্বিত করে, তখন শিকারী পাখির মতো শয়তান ছিনিয়ে নেয় তাদের হৃদয়ের শান্তি ও পরিতৃপ্তি , তাদেরকে নিক্ষেপ করে ইমান থেকে বহুদূরের দুর্ভাগ্য ও ভ্রষ্টতায়।

এখানে 'আও' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শূন্যে মিলিয়ে না যাওয়ার অর্থে, একত্রিত না হওয়ার অর্থে নয়। অর্থাৎ এখানে পাখির ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া এবং বাতাসে উড়িয়ে নেয়া ইত্যাদি বাস্তব অর্থে বলা হয় নি। বলা হয়েছে রূপক অর্থে, উপমারূপে।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আও' শব্দটি এসেছে প্রকরণের জন্য। কেননা অংশীবাদীদের অবস্থা হতে পারে দু'ধরনের— ১. যে কখনোই শিরিক ত্যাগ করে না, অথবা অংশীবাদিতা পরিহার করা তার পক্ষে সম্ভবই হয় না— সে যেনো শিকারী পাখির নখরদংশিত, যে পাখি তাকে ছিড়ে ফেঁড়ে ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংস করে দিয়েছে। ২. সে তওবা করে, ফলে মুক্তিলাভ করে অংশীবাদিতার স্থায়ী আগ্রাসন থেকে, যেনো ঝোড়োবাতাস তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেও অবশেষে সে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে স্বগৃহে।

প্রকৃত কথা এই যে, এখানে অংশীবাদীদেরকে তুলনা করা হয়েছে আকাশ থেকে পতিত সহায়হীন ব্যক্তি বা বস্তুর মতো, যে নিজেকে কোনো প্রকারেই রক্ষা করতে পারেনি। ধ্বংস তার জন্য অবধারিত, যেনো মাঝপথে কোনো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে অথবা তুফান তাকে নিক্ষেপ করেছে দূরে, বহু দূরে।

হাসান বর্ণনা করেছেন, এখানে অবিশ্বাসীদের আমলকে আকাশ থেকে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এভাবে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের আমল নিষ্ফল। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই তাদের নেই।

সুরা আরাফের 'লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস্ সামায়ি'— এই আয়াতের তাফসীরে আমি হজরত বারা বিন আজীব কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের কিয়দংশের বিবরণ দিয়েছি, যার সারমর্ম এরকম; রসুল স. একবার অবিশ্বাসীদের মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ফেরেশতারা তাদের রুহ্ কবজ করে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে যায় এবং আকাশের দরজা উন্মোচনের অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা হয় না। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন 'লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস্ সামায়ি'। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তখন নির্দেশ দেন, তার আমলনামা সর্বনিম্ন স্তরে (সিজ্জিনে) নিয়ে যাও। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো.......'।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

❒ ইহাই আল্লাহের বিধান, এবং কেহ আল্লাহের নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসঞ্জাত।

❒ এই সমস্ত আন্‌য়ামে তোমাদিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর উহাদিগের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

এখানে 'শাআ'ইরাল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ উট ও অন্যান্য পশু যা কোরবানীর জন্য প্রেরণ করা হয়। 'শাআর' শব্দটি এসেছে 'আশআর' থেকে। 'আশআর' অর্থ চিহ্নিত করে দেয়া। যাতে করে বুঝা যায় — এগুলো কোরবানীর পশু। আর কোরবানীর পশুকে সম্মান করার অর্থ পশুকে সুঠামদেহী করে তোলা। বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় এসেছে, রসুল স. কোরবানী করেছিলেন একশ'টি উট। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর কোরবানী দিয়েছিলেন একটি তেজী উট, যার মূল্যছিলো তিন শত দিনার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো তার হৃদয়ের ধর্মনিষ্ঠাসঞ্জাত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে ধর্মানুরাগরঞ্জিত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদের আমলসমূহের মধ্যে একটি উত্তম আমল।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এই সমস্ত আনয়ামে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।' উল্লেখ্য যে, কোরবানীর উদ্দেশ্যে হেরেমে প্রেরিত পশুর উপরে আরোহণ করা, সেগুলোকে দিয়ে বোঝা বহন, সেগুলোর দুগ্ধদোহন ও পান ইত্যাদি সিদ্ধ।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত কোরবানীর পশু থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। আতা ইবনে রিবাহ্, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাক আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ চিহ্নিত করেছেন এভাবেই। তবে তাঁরা শর্ত আরোপ করেন, এতে করে যেনো পশুগুলোকে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া না হয়।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দেখলেন এক লোক তার কোরবানীর পশু নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলছে। তিনি স. বললেন, পশুর উপরে আরোহণ করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! এটাতো কোরবানীর পশু। তিনি স. পুনরায় বললেন, আরোহণ করো। সে আবারো বললো, এটা যে কোরবানীর উট। তিনি স. বললেন, সওয়ার হওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার তিনি স. বললেন, তোমার ক্ষতি হোক। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকেও বোখারী এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর একবার এক লোককে কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর উপর আরোহণ করে যাও। দ্যাখো, রসুল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধান অপেক্ষা অন্য কোনো বিধানকে সহজ বলে মনে কোরো না। (কোরবানীর পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা সুন্নত)। তাহাবী।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোরবানীর পশুর উপরে আরোহণ করা, তাকে বোঝা টানার কাজে ব্যবহার করা অথবা সেগুলোর দুগ্ধদোহন অসিদ্ধ। কারণ সেগুলোকে উৎসর্গ করা হয়েছে কেবল আল্লাহ্র জন্য। তাঁর অভিমতে একথাই প্রতিভাত হয় যে, কোনো অবস্থাতেই কোরবানীর পশু থেকে উপকার গ্রহণ সিদ্ধ নয়। কারণ এতে কোরবানীর পশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। আর এরকম করা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। কিন্তু যেহেতু হাদিস শরীফের মাধ্যমে এরকম উপকার গ্রহণ সুন্নত প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমরা বলি, প্রয়োজনবশতঃ এরকম করা সিদ্ধ, যাতে একটি সুন্নত আমল পরিত্যক্ত না হয়। তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও একথার প্রমাণ রয়েছে। দুই সূত্রে হামীদুত্ তা'বীল গ্রন্থের বরাত দিয়ে হজরত আনাস থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দেখলেন, এক লোক পায়ে হেঁটে তার কোরবানীর পশুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটিকে পরিশ্রান্ত দেখে রসুল স. আজ্ঞা করলেন, সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এটা যে কোরবানীর পশু। তিনি স. বললেন, সওয়ার হও। অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বললেন, কোরবানীর পশু হলেও তার উপরে সওয়ার হয়ে যাও।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর দেখলেন, এক লোক তার কোরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পদব্রজে চলতে চলতে সে হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। তিনি তাকে বললেন, সওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাটি ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবু যোবায়ের বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্কে একবার কোরবানীর উটের উপর আরোহণ সম্পর্কিত মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, যখন তুমি অন্য কোনো বাহন না পেয়ে অপারগ হয়ে পড়বে, তখন নিয়মানুযায়ী কোরবানীর পশুর উপরে আরোহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'নানাবিধ উপকার রয়েছে' কথাটির ব্যাখ্যা এরকমই।

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, তোমাদের জন্য পশু থেকে ওই সময় পর্যন্ত উপকার গ্রহণ অনুমোদিত যতক্ষণ না ওই পশুকে কোরবানী হিসেবে নির্ধারণ না করা হয়। নির্ধারণ শেষে ওই পশু থেকে আর কোনো প্রকার উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ছুম্মা মাহিল্লুহা ইলাল বাইতিল আতীক্ব' (অতঃপর তাদের কোরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট)। 'মহল' অর্থ এখানে কোরবানীর

স্থান অথবা কোরবানীর সময়। আর 'ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি এসেছে এখানে সময়ের অগ্রপশ্চাত বুঝানোর জন্য। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কোরবানী করা হয় পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কোরবানীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোরবানীর পশু থেকে নানাবিধ উপকার গ্রহণ করা সিদ্ধ। তারপর নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে কোরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর যে সওয়াব লাভ হবে, তার দ্বারা উপকার লাভ হবে আখেরাতে।

এখানে 'ইলাল বায়তিল আতীক্ব' (প্রাচীনগৃহের নিকটে) বলা হয়েছে হেরেমের সমগ্র পরিসরকে যা মানুষের আধিপত্য থেকে মুক্ত। কোনো মানুষ হেরেমের জমিন ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। উল্লেখ্য, সমগ্র হেরেমই প্রাচীনগৃহের (বায়তুল আতীক্বের) বিধানভূত। আরববাসীরা বলে, 'বালাগতুল বালাদা'। এর অর্থ— আমি শহর পর্যন্ত পৌঁছেছি। এরকম বললে শহরাভ্যন্তরে প্রবেশ করা জরুরী হয় না।

কেউ কেউ বলেন, এখানকার 'কোরবানীর স্থান' কথাটির অর্থ হেরেমের সীমানা থেকে বায়তুল আতীক্ব বা কাবা পর্যন্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে হেরেমের সীমানাভূত যে কোনো স্থানে কোরবানী করা জায়েয।

ইমাম মালেক বলেন, হাজী সাহেবগণ কেবল মিনায় এবং ওমরাকারীরা কেবল মারওয়ায় কোরবানী করতে পারবে। এর অন্যথা করা নাজায়েয। কারণ রসুল স. এরকমই করেছেন। আমরা বলি, রসুল স. মিনায় কোরবানী করলেও এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, হেরেমের অন্যান্য স্থানে কোরবানী নিষিদ্ধ। আর কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নত দ্বারা হেরেমের অন্যান্য স্থানেও কোরবানীর বৈধতা প্রমাণিত। রসুল স. বলেছেন, সমগ্র মিনা কোরবানীর স্থান, মক্কার সকল পাহাড়ী রাস্তা কোরবানীর স্থান, আর সমগ্র আরাফা ও মুজদালিফা অবস্থানের স্থান। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'শায়াইরিল্লাহ্' অর্থ ধর্মের বিশেষ নিদর্শন। আর ধর্মের বিশেষ নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুত্তাকিগণের জন্য একটি অনির্ণেয় বিধান। 'লাকুম ফিহা মানাফীউ' (তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে) — এই আয়াতের ব্যাখ্যা 'ওয়া উহিল্লাত লাকুমুল আনয়ামু ইল্লা মা ইউত্লা আ'লাইকুম' (তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া অন্যান্য আনয়াম তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে)। এভাবে এর সঙ্গে সংযোজিত 'আজালিম্ মুসাম্মা' (এক নির্দিষ্টকালের জন্য) কথাটির অর্থ হবে মৃত্যু। আর মাহিল্লুহা (কোরবানীর স্থান) এর উদ্দেশ্য হবে শেষ গন্তব্য স্থল এবং 'আলবাইত' (গৃহ) এর উদ্দেশ্য হবে উচ্চ স্থান, যে উচ্চ স্থানে পুণ্যকর্মসমূহ

পৌঁছে যায়, অথবা পুণ্যকর্মের বিনিময় অর্জিত হয়। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে— আনয়ামে (চতুষ্পদ জন্তুতে) তোমাদের জন্য রয়েছে পার্থিব উপকার, যা মৃত্যু পর্যন্ত লাভ করা যেতে পারে, শেষে ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে স্থানে পৌঁছে সকল পুণ্যকর্ম অথবা যে স্থানে লাভ হয় পুণ্যকর্মসমূহের সওয়াব।

কেউ কেউ বলেছেন, 'শায়াইর' অর্থ হজের ফরজসমূহ এবং সেখানে উপনীত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান, যেখানে রয়েছে পার্থিব বানিজ্যিক প্রাপ্তি। অর্জিত হয় মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য। আর 'ছুম্মা মাহিল্লুহা' অর্থ ইহ্রাম খুলে ফেলা। আর 'বায়তিল্ আ'তীক্ব' অর্থ কাবায় পৌঁছে কোরবানীর দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত সমাপন করা।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

❑ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ আন্য়াম দিয়াছি সেগুলি জবেহ্ কালে আল্লাহের নাম লয়। তোমাদিগের ইলাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে, —

❑ যাহাদিগের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহের নাম স্মরণ করা হইলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ-আপদে ধৈর্য-ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকান' (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি)। 'মানসাকুন' এর শাব্দিক অর্থ উপাসনালয়। শব্দটি স্থান বা কালবাচক বিশেষ্য। 'মানসাক'কে যদি মূল শব্দ ধরা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য হবে রক্ত প্রবাহিত করা, কোরবানীর পশু জবেহ্ করা, অথবা ওই কোরবানীর পশু যা মানুষ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার আশায়।

জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র জিকির অত্যাবশ্যক। এ সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো স্মরণ ও উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্র স্মরণই কোরবানীর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্র নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো বা কোনোকিছুর নাম নিয়ে জবেহ্ করলে তা হালাল হবে না।

'বাহীমাতুল আনয়াম' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তু বাকশক্তিহীন। তাই সেগুলোকে বলা হয় 'বাহীমাহ্'। আর 'আনয়াম' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে উট, গাভী, বলদ, মহিষ, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি হালাল পশুকে। অন্যান্য পশু যেমন ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে আনয়াম বলা যায় না। এখানে 'বাহীমাহ্' এর পরে অতিরিক্তরূপে 'আনয়াম' উল্লেখ করে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর আনয়াম দ্বারা এখানে যে গৃহপালিত পশুর কোরবানী জায়েয করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিশ্বাসীগণ একমত। সুতরাং বুঝতে হবে নীল গাই, বন্য গরু ও ছাগল ইত্যাদির কোরবানী অসিদ্ধ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়মের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের ইলাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তাঁরই নিকটে আত্মসমর্পণ করো'। এ কথার অর্থ— হে শেষ রসুলের উম্মত! তোমরা তোমাদের সংকল্পকে কেবল আল্লাহ্র জন্য বিশুদ্ধ করে নাও। অন্য কাউকে তাঁর অংশীদার বানিয়ো না— না কোরবানীর কালে, না জিকিরের সময়। কারণ তিনিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া বাশ্শিরিল মুখবিতীন' (এবং সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে)। 'খাবাত' অর্থ মূল্যহীন, হীন। আল্লাহ্কে যে ভয় করে এবং সে কারণে নিজেকে মূল্যহীন ও হীন বলে জানে, সে-ই 'মুখবিত্'। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে, 'আখবাত্' অর্থ অক্ষম, সম্বলহীন। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, 'মুখবিতীন' অর্থ বিনয়ীগণ। আখফাশ অর্থ করেছেন ভীত, ত্রস্ত, অক্ষম। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'খাবাত' বলে নিম্নভূমিকে। তাই মুজাহিদ 'মুখবিতীন' মর্মার্থ করেছেন, আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন ব্যক্তিবর্গ। ইমাম নাখয়ী অর্থ করেছেন— বিশুদ্ধাচারী। কালাবী অর্থ করেছেন— বিনম্র, দয়ার্দ্র। ওমর বিন আওস বলেন, 'মুখবিত্' সে, যে কারো উপরে অত্যাচার করে না। এবং অত্যাচারিত হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। সার কথা হচ্ছে, 'মুখবিতীন' অর্থ ওই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গ, যাদের হৃদয়ে সতত প্রতিভাসিত হয় আল্লাহ্র মহামর্যাদার জ্যোতি। তাই তাদের হৃদয়ে জেগে থাকে আল্লাহ্র সকম্প ভীতি। এসকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৩৫)।

বলা হয়েছে— 'যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।'

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৬

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❑ এবং উষ্ট্রকে তোমাদিগের জন্য করিয়াছি আল্লাহের নিদর্শনগুলির অন্যতম; তোমাদিগের জন্য উহাতে মংগল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদিগের জবেহ্‌কালে তোমরা আল্লাহের নাম লও। যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রার্থী নহে তাহাকে এবং প্রার্থীকে; এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং উষ্ট্রকে তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আমি উটকে করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধর্মের নিদর্শন।

এখানে 'বুদনা' অর্থ উট, উটনী, বলদ, গাই, মহিষ ইত্যাদি। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, 'বাদাতুন'। যেমন 'খাশাবাতুন' এর একবচন 'খুশবুন'। শব্দটি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উট বা উটনী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ আকারের জন্যই উটকে সাধারণতঃ এরকম বলা হয়।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, বুদনা অর্থ উষ্ট্রী, গাভী, মহিষ। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। আতা ও সুদ্দী বলেছেন, উট ও গাভী বুদনা, কিন্তু ছাগল নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন বিশেষভাবে উট ও উটনীকেই বলা হয় বুদনা। বায়যাবী লিখেছেন, বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই উটের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। ইমাম বাগবী বলেন, বড় ও মোটা হওয়ার কারণে উটকে বলা হয় বুদনাহ্‌। দীর্ঘ ও স্থূলকায় মানুষকেও তাই বলা হয় 'বাদানার রজুলু বাদানাতান'। আর অধিক বয়সী বৃদ্ধকে বলা হয় 'বাদ্‌দানার রজুলু তাবদীনা'।

যাঁরা বুদনাহ্ শব্দটি কেবল উটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পক্ষপাতি তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন একটি হাদিসের মাধ্যমে। হাদিসটি এই— হজরত জাবের বলেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় কোরবানী করেছি— সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী এবং সাতজনের পক্ষ থেকে একটি বুদনা। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি। তিনি একথাও বলেছেন, এর সূত্রপরম্পরা উত্তম ও বিশুদ্ধ।

আমরা বলি, মুসলিমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— হজরত জাবের বলেন, আমরা মক্কায় পৌঁছলে রসুল স. নির্দেশ করলেন, যার সঙ্গে কোরবানী নেই, সে যেনো ইহ্রাম খুলে ফেলে। আর যাদের সঙ্গে কোরবানী রয়েছে, তারা সাতজন সাতজন করে এক একটি বুদনায় শরীক হয়ে যাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে'। একথার অর্থ— তোমাদের জন্য এই অন্যতম নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের জবেহ্কালে তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র নামে তোমরা উট জবাই করো দণ্ডায়মান অবস্থায়, সারিবদ্ধভাবে। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উট জবাই করবে উটকে দাঁড় করিয়ে এবং জবাইয়ের পূর্বে বলবে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা'। এরপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে কণ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করবে বল্লম দিয়ে।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, সুপরিণত সূত্রসহযোগে হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উট জবাইকালে পাঠ করতেন— 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব আ'লা মিল্লাতি ইব্রহীমা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন— ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— লা শরীকালাহু ওয়া বি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন'।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'সাওয়াফ্ফুন' (সারিবদ্ধ ভাবে) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে ফাওয়াউল ওজনে। অর্থাৎ শব্দটি কর্মপদ এবং বহুবচনবোধক। এর একবচন 'সফ্' (সারি)। শব্দটি আবার কর্তৃকারক অর্থেও ব্যবহার্য। আবার 'মুসাফ্ফাফ'ও কর্তৃকারক, যা কর্মপদরূপেও ব্যবহৃত হয়। আর এখানে 'দণ্ডায়মান

অবস্থায়' অর্থ উটকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর— দু'টি পিছনের এবং একটি সামনের। আর সামনের বাম পা বেঁধে রাখতে হবে রশি দিয়ে, যাতে উটটি পালিয়ে যেতে না পারে। এভাবে দাঁড় করিয়ে তার বুকে আঘাত করতে হবে বর্শা দিয়ে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক উটকে বসিয়ে রেখে তার কণ্ঠদেশ বর্শাবিদ্ধ করলো। হজরত ইবনে ওমর এ দৃশ্য দেখে বললেন, উটটিকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং পা বেঁধে নাও। এটাই রসুল স. এর বিধান।

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবু জুব্ইয়ান বলেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে 'সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের জবেহ্কালে তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও'— কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, উট কোরবানী করতে চাইলে তাকে দাঁড় করাতে হবে তিন পায়ের উপর। তারপর এক পা বেঁধে বলতে হবে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার মিনকা ওয়া লাকা।' প্রলম্বিত সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস সাওয়াফ্ফা (সারিবদ্ধভাবে) কথাটির অর্থ করেছেন 'ক্বীয়ামান্' (দণ্ডায়মান অবস্থায়)। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর তাফসীরে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনাসূত্রে একথাই বলেছেন। সাঈদ ইবনে মনসুরের বক্তব্যও এরকম।

মুজাহিদ বলেছেন, উটকে যখন তিনপায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং পিছনের বাম পা বেঁধে ফেলা হয়, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে সাওয়াফ্ফা। হজরত ইবনে মাসউদ শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন সাওয়াফ্ফান্। সাওয়াফ্ফান্ হচ্ছে ওই সকল পশু, যেগুলোকে তিন পায়ের উপরে দাঁড় করানো হয় এবং বেঁধে রাখা হয় সামনের একটি পা। হজরত ইবনে উবাইয়ের উচ্চারণরীতি অনুসারে মুজাহিদ ও হাসান শব্দটিকে পড়তেন 'সাওফ্ফী'। এর অর্থ— কেবল আল্লাহ্র জন্য। এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা কাৎ হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে আহার করো এবং আহার করাও যে প্রার্থী নয় তাকে এবং প্রার্থীকে'। উল্লেখ্য, এই নির্দেশটি বৈধতা প্রকাশক, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ নিজের কোরবানীর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয। অপরকে আহার করানোও জায়েয।

ইকরামা, কাতাদা ও ইবরাহিম নাখয়ী বলেছেন, এখানে 'যে প্রার্থী নয়' অর্থ যে অক্ষম হলেও যাচ্ঞাবিমুখ। অর্থাৎ যে যাচ্ঞা ব্যতিরেকে যা পায় তাতেই তুষ্ট থাকে। আর 'প্রার্থী' অর্থ ওই ব্যক্তি যে যাচ্ঞা করে। আউফী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ক্বনিয়'(যে প্রার্থী নয়) বলে ওই লোককে, যে কারো কাছে কিছু চায় না এবং কেউ কিছু দিলে তা প্রত্যাখ্যানও করে না। আর

মু'তার (প্রার্থী) অর্থ ওই লোক, যে দাতার সামনে নিজেকে উপস্থিত করে, কিন্তু কিছু চায় না। দু'টো শব্দই উৎসারিত রয়েছে 'কানায়াত'(অল্পে তুষ্টি) থেকে। এভাবে 'প্রার্থী নয়' 'প্রার্থী' শব্দ দু'টির অর্থ দাঁড়ায়— ওই যাচ্ঞাবিমুখ ও যাচ্ঞাকারী, যে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান এবং কালাবী বলেছেন, 'ক্বনিয়' অর্থ দরিদ্র যাচ্ঞাকারী। আর মু'তার অর্থ দরিদ্র, কিন্তু যাচ্ঞাবিমুখ, দাতার সম্মুখে প্রাপ্তির আশা নিয়েও যে থাকে নির্বাক। এরকম অর্থ করা হলে বুঝতে হবে 'ক্বনিয়' শব্দটি এসেছে কুনুয়ান' থেকে, যার অর্থ চাওয়া। ইবনে যায়েদ বলেছেন, 'ক্বনিয়' অর্থ মিসকিন। আর মু'তার অর্থ মিসকিন নয় কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার কারণে কোরবানী করতে অক্ষম, অথচ যে গোশত লাভের আশায় কোরবানী দাতার সম্মুখে উপস্থিত হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— আমিই তোমাদেরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় উষ্ট্রের কোরবানীর অধিকার দিয়েছি। সেগুলোকে করে দিয়েছি তোমাদের অনুগত। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হও, কোরবানী করো বিশুদ্ধ সংকল্পের সঙ্গে।

ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মূর্খতার যুগে মানুষ কোরবানীর রক্ত কাবায় ছিটিয়ে দিতো এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতো গোশতের টুকরা। ইসলামের আগমনের পর সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো এরকম করতে পারি। তাঁদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৌত্তলিকেরা কোরবানী করার পর জবেহ্কৃত পশুর রক্ত নিয়ে উপস্থিত হতো কাবা গৃহের সম্মুখে এবং ওই রক্ত তারা ছুঁড়ে মারতো কাবায়। সাহাবীগণও এরকম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

❒ আল্লাহের নিকট পৌঁছায় না উহাদিগের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদিগের ধর্মনিষ্ঠা। এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া

দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্ম পরায়ণদিগকে।

❒ আল্লাহ্ রক্ষা করেন বিশ্বাসীদিগকে। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকট পৌঁছায় না তাদের মাংস এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা'। একথার অর্থ— কোরবানীকারীরা শোনো, তোমাদের জবেহ্কৃত পশুর গোশত ও রক্ত কিছুই আল্লাহ্তায়ালা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করেন তোমাদের বিশুদ্ধ পুণ্যাভিলাষ। সুতরাং কোরবানী করতে হবে অংশীবাদিতার সংমিশ্রণবিবর্জিত বিশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে, কেবলই আল্লাহের উদ্দেশ্যে। এর ভিত্তি হচ্ছে সাবধানতা বা তাক্ওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন'। একথার অর্থ— সুতরাং তোমরা প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য আল্লাহ্র এককত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কারণ তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্যভাজন হওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, হজের নিদর্শন ও হজের নিয়মাবলী জানিয়ে দিয়েছেন এবং এসকল পশুকে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এদেরকে জবেহ্ করতে সক্ষম হও।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'তাকবীর' শব্দটির উদ্দেশ্য ইহ্রাম পরিত্যাগ করা এবং জবেহ্কালে 'আল্লাহু আকবার'- বলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'মু'মিনীন' কথাটির মর্মার্থ একত্ববাদীগণ।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ রক্ষা করেন বিশ্বাসীগণকে। তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না'। এখানে 'খাওয়ানিন্' অর্থ খেয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক। আর 'কাফুর' অর্থ আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

জুজায বলেছেন, যে ব্যক্তি জবাই করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে এবং জবেহ্কৃত পশু প্রতিমার সামনে উপস্থিত করে প্রতিমাগুলোর সান্নিধ্যকামী হয়, তাকেই বলে 'খাওয়ানিন কাফুর' (বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ)।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, সুদ্দী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কাভূমি ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হজরত আবু বকর বললেন, হায়! এসকল লোক তাদের নবীকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করলো, এদের ধ্বংস অনিবার্য। তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

❒ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম;

❒ তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে তাহারা বলে 'আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃষ্টান সংসারবিরাগীদিগের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদিগের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহের নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহার দ্বীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী'।

মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। প্রথমে বলা হয়েছে— যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা সাহাবীগণকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিলো। সাহাবীগণ প্রায়শঃই প্রহৃত ও আহত অবস্থায় রসুল স. এর দরবারে হাজির হতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দেখুন আমাদের কী হাল। রসুল স. তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে

যেতেন এবং বলতেন, ধৈর্যধারণ করো। এখনো আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর একসময় রসুল স. হিজরত করলেন মদীনায়। সেখানেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বায্যার, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা এনেছেন। তিরমিজি বলেন, বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। আর একে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত বলেছেন হাকেম। উল্লেখ্য, সত্তরের অধিক আয়াতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবদুর রাজ্জাক এবং জুহরী সূত্রে ইবনে মুনজিরও একথা বলেছেন। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে যাঁরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে বাধাগ্রস্ত হন মক্কার মুশরিকদের প্রস্তরাক্রমণ দ্বারা। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ওই সকল অত্যাচারিতদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে।

'বিআন্নাহুম জুলিমু' অর্থ কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারকে এখানে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একথার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল অবিশ্বাসীর অত্যাচার করার ক্ষমতা নেই, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাই ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, অবিশ্বাসী মহিলাদেরকে হত্যা করা নাজায়েয। কিন্তু যদি তারা মুসলমানদের বিপক্ষে পরামর্শ দেয়, অথবা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ, তাদেরকে হত্যা করাও জায়েয। এই নীতির প্রেক্ষিতে বিধর্মী বৃদ্ধ, সাধু সন্যাসী, অন্ধ, অচল ও বিকলাঙ্গকে হত্যা করাও নাজায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন, হত্যা নাজায়েয হবে কেবল তখন, যখন তারা বিরত থাকবে কাফের যোদ্ধাদেরকে পরামর্শ প্রদান, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় ইত্যাদি সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড থেকে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মহিলা মুরতাদকে (ধর্মত্যাগিনীকে) হত্যা করা যাবে না। বরং তাদেরকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে, এভাবে তার মৃত্যু হলেও।

হজরত রিবাহ্ ইবনে রবী বর্ণনা করেছেন, আমরা এক যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। নিকটে এক স্থানে দেখা গেলো লোকজনের ভীড়। রসুল স. কী ঘটেছে

তা জানার জন্য সেখানে একজনকে প্রেরণ করলেন। প্রেরিত ব্যক্তি ফিরে এসে জানালেন, লোকেরা ভীড় জমিয়েছে এক নিহত মহিলাকে কেন্দ্র করে। তিনি স. বললেন, সে তো যুদ্ধ করেনি। সে সময় অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালেদ বিন ওলীদ। রসুল স. তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন কোনো মহিলা ও শ্রমিককে হত্যা করা যাবে না। আবু দাউদ। এই হাদিসের 'আসিফ' শব্দটির আর এক অর্থ— অক্ষম বৃদ্ধ। আর 'ইম্‌রাআতুন' অর্থ সাধারণ রমণী— সে যে কেউ হোক না কেনো— কাফের অথবা মুরতাদ। হাদিসটিতে রমণীবধ করার কারণ দেখানো হয়েছে এই যে, তারা যুদ্ধ করে না। অর্থাৎ তারা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয়।

হানাফীগণ বলেন, পৃথিবী কর্মক্ষেত্র। আর কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে পরকালে। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্‌দীন' (ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই)। সুতরাং বুঝতে হবে অন্যায় হত্যা, চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদির শাস্তিবিধানের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। এমতো বিধান সংশোধনমূলক। জীবন, সম্পদ, সম্মান, বংশরক্ষা ও জ্ঞানের রক্ষাকবচ।

মুরতাদকে হত্যা করা ওই সময় ওয়াজিব হবে, যখন সে হবে যুদ্ধংদেহী এবং মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য হুমকি। এটা তার কুফরীর (অবিশ্বাসের) শাস্তি নয়। কুফরীর শাস্তি তো আরো ভয়াবহ, যা দেয়া হবে আখেরাতে। সুতরাং যে মুরতাদ যোদ্ধাদের দলভূত, তার অনিষ্ট থেকে রক্ষাকল্পে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু নিরীহ নারী এরকম নয়, তাই তাকে হত্যা করা যাবে না, যদিও সে কাফের হয়, অথবা হয় মুরতাদ। রসুল স. তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন একারণেই। উল্লেখ্য, শাস্তি অপরাধকে মুছে দেয়। কিন্তু কাফেরকে হত্যা করলেও তার কুফরীর পাপ মোচন হয় না। আখেরাতে তার প্রাপ্য শাস্তি সুনির্ধারিত।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগিনীদেরকেও হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে স্বধর্মত্যাগ করবে, তাকে হত্যা কোরো। এখানে তিনি স. পুরুষ-মহিলার পার্থক্য করেননি। বাহায ইবনে হাকীম সূত্রে তিবরানীর মুআ'জ্জামে কবীর গ্রন্থে এবং জননী আয়েশা থেকে আল আওসাত পুস্তকেও এরকম সমার্থবোধক হাদিস এসেছে। সেখানেও পুরুষ বা মহিলার উল্লেখ আসেনি। বলা হয়েছে কেবল স্বধর্মত্যাগীদের কথা, যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, এই হাদিসে বলা হয়েছে আংশিক নির্দিষ্ট নীতির বা বিধানের কথা। কিন্তু অন্য হাদিসে রমণীদের বিধানকে আলাদা করা হয়েছে। অতএব এখানকার বিধানটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে কেবল পুরুষের বেলায়। যদি এই হাদিসের সাধারণ অর্থই গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, কোনো

কাফের মুসলমান হলে, অথবা কোনো ইহুদী খৃষ্টান হয়ে গেলে তাকেও বধ করতে হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার সেরকম নয়। সুতরাং 'মান্ বাদ্দালা দীনাহু' (যে স্বধর্ম ত্যাগ করবে) কথাটি সাধারণ অর্থবোধক নয়। অন্যান্য হাদিসই এর প্রমাণ।

আমি বলি, হানাফীগণের অভিমত অবশ্যই প্রণিধাননীয়। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদিসটির বর্ণনা এসেছে এভাবে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যে আপন ধর্ম পরিত্যাগ করবে, তাকে হত্যা কোরো। এখানে ধর্মপরিত্যাগকারী মুসলমানকে বধ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং কাফেরের মুসলমান হওয়া এবং ইহুদীর খৃষ্টান হওয়ার ক্ষেত্রে বধ করার বিধান প্রয়োগের সন্দেহ সৃষ্টি হয় না।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী হাফস ইবনে ওমর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কোনো কোনো আলেম তাকে ত্রুটিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, ধর্মত্যাগীদেরকে বধ করা জায়েয (সিদ্ধ)। কারণ, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, উম্মে মারওয়ান নাম্নী এক রমণী ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলো। রসুল স. তার সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন, তাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাও। যদি সে তওবা করে, তবে উত্তম, নতুবা তাকে সংহার করো। দারাকুতনী হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন দুটি সূত্রে। একটি সূত্রে একথাও এসেছে যে, ওই স্ত্রীলোকটি মুসলমান হতে অস্বীকার করে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির উভয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরা দুর্বল যথাক্রমে ওমর ইবনে রওয়াহা এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আওনীয়াহ্ এর কারণে। ইবনে হাব্বান বলেন, হাদিসটি থেকে দলিল গ্রহণ করা যাবে না।

জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিসে এসেছে, উহুদ যুদ্ধের দিন এক মহিলা ইসলাম বর্জন করলো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, তাকে তওবা করতে বলো, যদি অস্বীকার করে, তবে হত্যা করো। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত মোহাম্মদ বিন আবদুল মালেক সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ মন্তব্য করেছেন, সে নিজে নিজে হাদিস বানায়। আবার এ হাদিসগুলি অন্য হাদিসগুলির বিপরীত যেমন— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ দিয়েছেন, মহিলা মুরতাদের সংহার সিদ্ধ নয়। দারাকুতনী আবার এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত আবদুল্লাহ্ ইবনে আলীস জযরীকে অসত্যভাষী ও হাদিস প্রস্তুতকারী বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে আদী তাঁর 'আল কামিল' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর জামানায় এক রমণী ধর্মত্যাগিনী হয়েছিলো। তিনি স. তাকে বধ করতে বলেননি। হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে এর এক বর্ণনাকারী হাফস ইবনে সুলায়মানের কারণে।

তিবরানীর 'মুআ'জ্জাম' পুস্তকে এসেছে, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমাকে ইয়ামেনের প্রশাসকরূপে নিযুক্তি দানের প্রাক্কালে রসুল স. নির্দেশ করেছিলেন, যে পুরুষ ধর্মত্যাগী হবে, তাকে পুনরায় ইসলামের দিকে ডাক দিয়ো, যদি সে তোমার ডাকে সাড়া দেয়, তবে তাকে গ্রহণ কোরো, বধ কোরো সাড়া না দিলে। আর যে রমণী ধর্মত্যাগিনী হবে, তাকেও আহ্বান জানিয়ো প্রত্যাবর্তনের । যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাকে ছেড়ে দিয়ো তার অবস্থার উপর, (হত্যা কোরো না)।

ইমাম আবু ইউসুফ— ইমাম আবু হানিফা— আসেম বিন আবীন্‌নুযুদ— আবু রযীন— এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ধর্মপরিত্যাগিনীকে হত্যা করা যাবে না। তাকে বন্দী করতে হবে এবং পুনঃ আহ্বান জানাতে হবে ইসলামের দিকে। বাধ্য করতে হবে ইসলামে ফিরে আসতে (মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া যাবে না, কিন্তু প্রহার করা যাবে না, অথবা বন্ধ করে দেয়া যাবে না তার পানাহার)। 'বালাগাতে মোহাম্মদ' পুস্তকেও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, এক রমণী খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলো। হজরত ওমর তার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, এমন কোনো স্থানে নিয়ে গিয়ে তাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করে দাও। এমন স্থানে বিক্রয় কোরো না, যে স্থানে তার স্বধর্মীদের বসতি বিদ্যমান। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাকে বিক্রয় করে দেয়া হলো দু'মাতুল জন্দল নামক এক স্থানে।

দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, মহিলা মুরতাদকে তওবা করাতে হবে, তাকে মেরে ফেলা যাবে না। এর সূত্রপ্রবাহভূত জাল্লাসের কারণে সূত্রটি দুর্বল।

মাসআলাঃ মুসলিম সেনাপতি যুদ্ধরত কাফের সৈনিকের স্ত্রীকে বধ করার নির্দেশ দিতে পারবে, সে অবিশ্বাসিনী, অথবা ধর্মত্যাগিনী, যেই হোক না কেনো। সুরা ফাতাহের এক আয়াতের তাফসীরে আমি লিখেছি, মক্কাবিজয়ের দিন রসুল স. তাঁর সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে তোমাদের দিকে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হবে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করবে না। এরপর কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে বললেন, এদেরকে অবশ্যই হত্যা করবে, কাবাগৃহের আচ্ছাদনের

নিচে আশ্রয় নিলেও। তাঁর এই নির্দেশের অন্তর্গত ছিলো কতিপয় রমণীও। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্তাল -এর দু'জন ক্রীতদাসী গায়িকা— কারীনা ও কারনা। কারীনাকে হত্যা করা হয়েছিলো। আর কারনা লাভ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। এরকম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন আরো দু'জন নারী। তাঁরা ধর্মত্যাগিনী ছিলেন না, ছিলেন অবিশ্বাসিনী, আমর বিন হাশেমের ক্রীতদাসী ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদা। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্নাল্লহা আ'লা নাসরিহিম লাক্বদীর' (আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম)। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে বিজয়ের অঙ্গীকার।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে, 'তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'। একথার অর্থ— 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' হচ্ছে চরমতম সত্যের স্বীকৃতি। সুতরাং তা কস্মিনকালেও অপরাধ নয়। অথচ মিথ্যাপ্রেমিকেরা এটাকেই গর্হিত অপরাধ বিবেচনা করলো। আর এ কারণে সত্যপ্রেমিকদেরকে বাধ্য করলো দেশত্যাগী হতে। তাই সন্দেহ মাত্র নেই যে তারা অত্যাচারী। মহান্যায়বিচারক আল্লাহ্ই অত্যাচারিতদের রক্ষক। সে কারণেই তো তিনি তাদেরকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বার অনুমতি দিলেন।

আরববাসীরা বলে, অমুক ব্যক্তির কোনো গুণ নেই, কেবল এই গুণটি ছাড়া— সে উপকারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ করে (ক্ষতি করে তার, যে উপকার করে)। উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' বাক্যটি মহাকল্যাণময়, সুতরাং তা চিরপ্রশংসিত। তাই একারণে কাউকে বিতাড়ন করা অন্যায়। অথচ অবিশ্বাসীরা তাই করলো। সত্যোচ্চারণকারীদেরকে বের করে দিলো তাদের ঘরবাড়ী থেকে। অন্য আয়াতেও অবিশ্বাসীদের এমতো অত্যাচারের বিবরণ রয়েছে। যেমন— ওয়ামা তানক্বিমু মিন্না ইল্লা আন আমান্না' (শুধুমাত্র ইমান গ্রহণের কারণে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে আমাদের উপর)।

জনৈক কবি বলেছেন— ওয়া বালদাতিন লাইসা বিহা আনীসুন ইল্লাল ইয়াআ'ফীরু ওয়া ইল্লাল ই'সু।

অর্থঃ এবং এমন শহর, যেখানে হরিণ ও মেটে রঙের উট ছাড়া অধিক চিত্তহারক আর কিছু নেই।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানকার 'ইল্লা আঁইয়াকুলু' (তারা শুধু বলে) কথাটির 'ইল্লা' ইসতিস্নায়ে মুনকাতে (বিকর্তিত)। এভাবে 'ইল্লা' এর অর্থ দাঁড়াবে 'লাকিন্না'(কিন্তু)। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ হবে— একারণে

তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা কেবল বলে 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক'। অথচ এটাই পরম সত্যোচ্চারণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'মুসতাসনা মিনহু' (ব্যতিক্রমী বাক্য) এখানে লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি, বহিষ্কার করা হয়েছে কেবল একারণে যে, তারা বলে ' আল্লাহ্ আমাদের রব'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি মুসলমানদেরকে শক্তিমান না করতেন, তবে ধ্বংস হয়ে যেতো সকল ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস করে ফেলতো অপর সম্প্রদায়ের ধর্মালয়।

মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, এখানকার 'সাওয়ামি' শব্দটির অর্থ পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত সন্যাসীদের উপাসনাগৃহ, খানকা। কাতাদা বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য সাবেয়ীনদের উপাসনাগার। 'বিয়াউন' শব্দটি 'বিয়াতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ— খৃষ্টানদের গীর্জা। 'সালাওয়াতুন' অর্থ ইহুদীদের উপাসনাস্থান। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনাস্থানকে 'সালাওয়াতুন'ই বলা হয়। আর 'মাসজিদ' অর্থ মুসলমানদের মসজিদ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত করেন। যদি এরকম না করতেন তবে তারা প্রত্যেক নবীর যুগে তাঁদের উম্মতগণের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করে ফেলতো। বিধ্বস্ত করে দিতো হজরত মুসার যুগে সাবেয়ীনদের ইবাদতখানা, হজরত ঈসার যুগে খৃষ্টানদের গীর্জা, সাবেয়ীনদের ইবাদতখানা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর যুগে মসজিদসমূহ।

'ইয়াজ্‌কুরুফীহাস্ মুল্লাহি কাছীরা ' অর্থ— যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। একথা বলে বুঝানো হয়েছে বর্ণিত চার ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাগারসমূহকে, অথবা কেবল মসজিদসমূহকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের জন্য যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আল্লাহ্ তাকেই করেন অজেয়। তার অগ্রযাত্রা কেউ রোধ করতে পারে না। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বিজয়ের অঙ্গীকার।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সর্বশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী, সেহেতু আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারীদের বিজয় সুনিশ্চিত। তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেনই।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❐ আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহের এখ্তিয়ারে।

❐ এবং লোকে যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে উহাদিগেব পূর্বে তো নূহ, আদ এবং সামূদের সম্প্রদায়,

❐ ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,

❐ মাদ্য়ানবাসীরা তাহাদিগের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল এবং মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল মূসাকেও। আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম ও পরে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে 'আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করবো' বলে মুসলমানদেরকে ঐক্য, সংহতি ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। বাহ্যত বাক্যটি একটি শর্তবাচক বাক্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞপ্তি প্রদায়ক।

এখানে বিশ্বাসীগণের যে সকল গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো রসুল স. এর পরবর্তী চার প্রতিনিধি বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে। এই আয়াত তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের প্রমাণ। অপরাপর মুহাজিরগণকে এরকম পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়নি। তাই এই

আয়াত তাঁদের ক্ষমতালাভের প্রমাণও নয়। উল্লেখ্য, হজরত মুয়াবিয়া মুহাজির (হিজরতকারী) ছিলেন না। তাই আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। কারণ ক্ষমতালাভের যোগ্যতা হিসেবে এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে ধরা হয়েছে, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু একারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' কথাটিকে। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন আলোচ্য আয়াতটির সম্পৃক্তি রয়েছে পরবর্তী বাক্য 'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন' এর সঙ্গে। এভাবে পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। এভাবে আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে তারা হবে রাষ্ট্রনায়ক। কায়েম করবে সালাত, প্রদান করবে জাকাত। নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করবে যথাক্রমে সৎ ও অসৎ কাজের।

একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। সম্মানিত খলিফা চতুষ্টয়ের মাধ্যমে পরাজিত করেছেন আরবের অত্যাচারী গোত্রীয় নেতাদেরকে এবং অনারবদের সম্রাটদেরকে। উল্লেখ্য, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর উৎখাত করেছিলেন জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতদেরকে। পরবর্তী খলিফাত্রয়ও আল্লাহ্র দ্বীনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উপায়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছাময়। তিনি যা খুশী তাই করেন। সকল পরিণতিই তার অভিপ্রায়ভূত। সুতরাং তাঁর মনোনীত ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদেরকে তিনি বিজয় দান করবেনই।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ে (৪২, ৪৩, ৪৪) রসুলপাক স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনার বাণী। জানানো হয়েছে, বিগত যুগের নবী-রসুলগণকেও অসত্যভাষী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। আর আল্লাহ্তায়ালাও ওই প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িক অবকাশদানের পর নিপতিত করেছিলেন ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে।

উল্লেখ্য, পূর্বের সকল নবী-রসুলকে তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। কিন্তু হজরত মুসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীরা। তারা হজরত মুসার নিজ সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ছিলো না। তাই এখানে হজরত নুহের সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত লুতের সম্প্রদায় ও মাদিয়ানবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা তাদের নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। আর হজরত মুসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো মুসাকেও'। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন

হয়েছিলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত মুসার মোজেজা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। আর সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো বিভিন্ন গোত্র ও দল। তাই তাঁর কথা এখানে বলা হয়েছে বিশেষভাবে, আলাদা করে।

'ফাকাইফা কানা নাকীর' অর্থ কী ভয়ংকর ছিলো আমার শাস্তি। বাক্যটির রূপ প্রশ্নবোধক মনে হলেও এখানে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করা হয়নি। বরং এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এক ধরনের বিস্ময়, অথবা শাস্তির ভয়াবহতা। সুনিশ্চিত শাস্তির ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ এরকম বিস্ময়বোধক বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ— যাহাদিগের বাসিন্দারা ছিল সীমালংঘনকারী, এই সকল জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ হইয়াছে জনমানব শূন্য।

❒ যাহাতে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তাহারা দেশ ভ্রমণ করে নাই? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছি কতো জনপদ, যাদের বাসিন্দারা ছিলো সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— আমি অনেক জনপদ জনশূন্য করে দিয়েছি। কারণ, ওই জনপদবাসীরা ছিলো সীমালংঘনকারী। এখানে 'জালেম' অর্থ সীমালংঘনকারী। অর্থাৎ যে শুভবুদ্ধি ও ন্যায়ানুগতার সীমানা অতিক্রম করে, প্রকৃত বস্তুকে স্থাপন করে অযথার্থ স্থানে। যেমন— ইবাদত করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র। অথচ তারা ইবাদত করে প্রতিমার। অথবা প্রতিমাপূজাকে সংমিশ্রিত করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সাথে। এভাবে হয়ে যায় সীমালংঘনকারী, মুশরিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওই সকল জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র আযাবে ধসে পড়েছিলো তাদের গৃহের ছাদ ও দেয়াল।

অর্থাৎ প্রথমে ধসে পড়েছিলো দেয়াল, তারপর ছাদ। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হবে এখানে 'আ'লা উ'রুশিহা' শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'খবীয়াতুন্' এর সঙ্গে। 'খবীয়াতুন্' অর্থ ধসিত, পতিত। অথবা 'খওইয়াতুন' এর অর্থ হবে ফাঁকা, বিরান, জনশূন্য। এমতাবস্থায় 'আ'লা উরুশিহা' সম্পৃক্ত হবে একটি উহ্য শব্দ 'কুয়িমাতুন' অথবা 'কায়িআতুন' এর সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে— জনপদগুলো হয়ে গিয়েছিলো জনমানবশূন্য, সেখানে দণ্ডায়মান ছিলো কেবল গৃহসমূহের ছাদ। এবার এরকম অর্থও হওয়া সম্ভব যে— সেখানকার জনশূন্য বসতবাটিগুলোর ছাদগুলো গিয়েছিলো ধসে, দাঁড়িয়ে ছিলো কেবল দেয়ালগুলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিলো ও কতো সুদৃঢ় প্রাসাদ হয়েছিলো জনমানবশূন্য'। একথার অর্থ— সেখানকার পানিপূর্ণ কূপগুলোও হয়ে গিয়েছিলো পরিত্যক্ত, পানি উত্তোলনের জন্য কেউ আর সেখানে অবশিষ্ট ছিলো না। আর সেখানকার সুদৃঢ় প্রাসাদগুলোতেও ছিলো না কোনো মানুষের পদচারণা।

কাতাদা, জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'মাশীদ' শব্দটির অর্থ সুউচ্চ, বৃহৎ। যেমন বলা হয়— 'শাদা বিনাহু' (সে তার প্রাসাদকে উচ্চ করেছে)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আতা এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'শাঈদ' অর্থ পাকা মেঝে। তাই মাশীদ অর্থ হবে চুন সুড়কি নির্মিত পাকা মেঝে।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতে বর্ণিত 'পরিত্যক্ত কূপ' ও 'সুদৃঢ় প্রাসাদ' ছিলো ইয়েমেনে। পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো প্রাসাদ এবং পাদদেশে ছিলো কূপ। ওই সকল কূপ ও প্রাসাদের মালিকেরা ছিলো বড়ই আরামপ্রিয়। আল্লাহ্‌র অবাধ্যও ছিলো তারা। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে সমূলে বিনাশ করেছিলেন। ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিলো তাদের জলাধার সমূহ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকা।

জুহাক সূত্রে আবু রওক বর্ণনা করেছেন, ওই কূপগুলো ছিলো হাজরামাউত নামক এলাকায়। আর বিনাশপ্রাপ্ত জনপদটির নাম ছিলো হাসুরা। ওই শহরে বাস করতেন নবী সালেহ্ ও তাঁর চারহাজার বিশ্বাসী অনুসারী। ওই শহরেই ঘটে তাঁর মহাতিরোধান। শহরটিকে হাজরা মাউত বলা হয় সেকারণেই। উল্লেখ্য, ওই স্থান হজরত সালেহের জন্মভূমি ছিলো না, ছিলো কর্মভূমি। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র সমাধির চারপাশে লোকেরা একটি বেষ্টনী তৈরী করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর কূপের পাশে। নেতা ও বিচারক নির্বাচন করে দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করতে থাকে তারা। জনসংখ্যা বেড়ে যায় অনেক গুণ। অনেকেই স্খলিত হয়ে পড়ে সত্য ধর্ম থেকে। শুরু করে বিগ্রহবন্দনা। আল্লাহ্ তখন তাদের

পথপ্রদর্শনের জন্য নবী করে পাঠান হজরত হানজালা ইবনে সাফওয়ানকে। তিনি ছিলেন শ্রমিক। বাজারে গিয়ে লোকের বোঝা বহন করতেন। আর মানুষকে আহ্বান জানাতেন সত্য ধর্মের দিকে। কিন্তু মূর্তিপূজকেরা তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং একদিন বাজারেই তাঁকে বধ করে ফেললো। আল্লাহ্ তাঁর শহীদ নবীর হন্তারকদের উপরে অবতীর্ণ করলেন আযাব। ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হলো তারা। পড়ে রইলো তাদের পরিত্যক্ত কূপ ও জনমানবশূন্য সুউচ্চ প্রাসাদ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এই উদ্দেশ্যে কি তারা দেশভ্রমণ করেনি?' একথার অর্থ— ওই সকল অর্বাচীন আল্লাহ্র নিদর্শনরাজি প্রত্যক্ষ ও অনুভব করার মানসিকতা নিয়ে দেশভ্রমণে বের হয় না কেনো? কেনো বোঝেনা যে, এরকম অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজনার ফলে লাভ হতে পারে জ্ঞানবুদ্ধিপূর্ণ হৃদয় এবং সত্যশ্রবণপ্রবণ শ্রুতি? হায়! এরকম যদি তারা করতো, তবে লাভ করতে পারতো আল্লাহ্র এককত্ব অনুধাবনের প্রবৃত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি, আর অর্জন করতে পারতো সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বানের আওয়াজ।

শেষে বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়'। একথার অর্থ— তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ নয়, কিন্তু তারা কল্যাণ-দর্শন থেকে বঞ্চিত। তাই তারা ভ্রমণকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিরান জনপদসমূহকে আল্লাহ্র অসন্তোষের নিদর্শনরূপে দেখে না, দেখলেও দেখে বাহ্যিকভাবে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নয়। কারণ তাদের বক্ষাভ্যন্তরস্থিত হৃদয় দৃষ্টিহীন, বিশ্বাসবিচ্যুত।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, চোখের অন্ধত্ব প্রকৃত অন্ধত্ব নয়, অন্তরের অন্ধত্বই আসল অন্ধত্ব। কাতাদা বলেছেন, চোখের দৃষ্টি পতিত হয় দ্রষ্টব্যের আকারের প্রতি, যা উপকার আহরণের একটি মাধ্যম। কিন্তু দ্রষ্টব্যের তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে কেবল অন্তর্দৃষ্টি, যা উপকার প্রদায়ক।

রসুল স. বলেছেন, অন্তরের অন্ধত্ব নিকৃষ্টতম অন্ধত্ব। আবু দাউদ তাঁর 'দালায়েল' নামক পুস্তকে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো বর্ণনা করেছেন উকবা ইবনে আমের জুহুনী থেকে ইবনে আসাকের, আবী দারদা থেকে আবু নসর সঞ্জরী এবং পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম শাফেয়ী।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'অন্ধ হচ্ছে তাদের বক্ষস্থিত হৃদয়' একথা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ওই সকল অবিশ্বাসীদের অন্তর সত্যবোধবর্জিত, আর 'শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী' কথাটির অর্থ এখানে অন্তর্দেশ কর্তৃক সত্য-শ্রবণের অধিকারী অর্থাৎ তারা ছিলো সত্যশ্রুতিবঞ্চিত।

বায়যাবী লিখেছেন, 'মান কানা ফী হাজিহী আ'মা ফাহুয়া ফীল আখিরাতি আ'মা' (যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ) —এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন দৃষ্টিহীন সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাকতুম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমিও কি তবে আখেরাতে অন্ধ হবো? তাঁর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, এ ব্যাপারে ইবনে আবী হাতেম ও কাতাদার বক্তব্যও সাদৃশ্যপূর্ণ। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদা এবং হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে লক্ষ্য করে।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

❒ তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে অথচ আল্লাহ্ তাহার প্রতিজ্ঞা কখনও ভংগ করেন না, তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদিগের গণনার সহস্র বৎসরের সমান;

❒ এবং আমি অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল সীমালংঘনকারী; অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে তোমাকে' অবিশ্বাসীদের ইদৃশ উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের হৃদয়। যারা শাস্তি কবলিত হওয়ার জন্য ত্বরা করে তারা অন্ধ নয়তো কী?

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেছকে লক্ষ্য করে। সে বলেছিলো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যা বলে তা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমার উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। এভাবে সে কামনা করেছিলো ত্বরিৎ শাস্তি। তাই প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে নির্ভয়। তাই তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। কিন্তু তারা একথা জানেনা যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে অতি অবশ্যই কার্যকর হবে। কারণ

তিনি কস্মিনকালেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নন। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা অন্তর্দৃষ্টিহীন, নতুবা তারা এভাবে শাস্তি ত্বরান্বিত করার কথা বলতে পারতো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান।' একথার অর্থ— সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ ও নিকটবর্তীতা-দূরবর্তীতা মানুষের দিক থেকে গণনাযোগ্য, আল্লাহ্‌র দিকে এমতো খণ্ডিত কাল চেতনার অবকাশ নেই। সেখানে রয়েছে কেবল মহাকালবোধ, যা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। বিষয়টিকে তুলনা করলে বলতে হয়, আল্লাহ্‌র একদিন, মানুষের গণনায় এক বৎসরের সমতুল। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে ত্বরায়ন-বিলম্বায়নের প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ মাত্র নেই।

অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার জন্য শাস্তি অনিবার্য। কোরআন, হাদিস ও আলেমগণের ঐকমত্য একথাই বলে। তাই যাদের জীবন সাঙ্গ হবে অবিশ্বাসের সঙ্গে, অথবা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানানুসারে যাদের মৃত্যু ঘটবে শিরিক সহকারে, তাদের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া গুণ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাঁর ক্ষমা ও দয়া প্রযোজ্য হবে কেবল পাপী বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে। আর এমতো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গের অবকাশও নেই।

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে মন্তব্য করেছেন, 'আল্লাহ্‌র একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসর তুল্য' এরকম বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। আর কোনো কিছু তাঁর আওতাবহির্ভূতও নয়। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত। সুতরাং শাস্তি বিলম্বিত হলেও, সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার সাধ্য কারো নেই।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— অন্তর্দৃষ্টি বিবর্জিত এ সকল অর্বাচীনেরা আল্লাহ্‌র শাস্তির দ্রুত আগমনাকাংখী। কিন্তু তারা জানেনা, আল্লাহ্‌র আযাবের একটি দিনকে মানুষের কাছে মনে হবে এক সহস্র দিবস। প্রকৃত কথা এই যে, দুঃখের দিবসকে মনে হয় সুদীর্ঘ এবং সুখের সময়কে মনে হয় ক্ষণিক। তাই এখানে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে— কেনো তোমরা কামনা করো দ্রুত শাস্তি? তোমরা কি জানোনা, শাস্তির একদিনকে মনে হবে এক হাজার দিনের সমান?

কোনো কোনো আলেম বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ কখনোই করেন না'। কিন্তু তিনি শাস্তিকে বিলম্বিত করেন ওই সময় পর্যন্ত যখন একদিনের

পরিমাণ হবে তোমাদের হাজার বছরের সমান। আর সেই সময় হচ্ছে কিয়ামতের সময়। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, কিয়ামতের এক দিবস হবে তোমাদের এক হাজার বছরের সমান। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, হে নিঃসম্বল মুহাজিরবর্গ! কিয়ামতের সময় তোমরা লাভ করবে পরিপূর্ণ নূর। বিত্তশালীদের অর্ধদিবস পূর্বেই তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে। তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের এক দিবস তখন হবে তোমাদের সহস্র দিবসের সমান। আহমদ। তিরমিজিও এর বর্ণনাকারী। তিনি এ কথাও বলেছেন যে হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সুসংবাদ প্রদান করেছেন, দরিদ্র ইমানদারেরা ধনী ইমানদারের অর্ধদিবস বা পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিরমিজি।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতো জনপদকে যখন তারা ছিলো সীমালংঘনকারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।' একথার অর্থ— আমি তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ করিনি বলে মুশরিকেরা যেনো এ কথা মনে না করে যে, তাদেরকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে। ইতোপূর্বেও আমি তাদের পূর্বসুরীদেরকে এরকম সাময়িক অবকাশ দিয়েছিলাম। ওই অবকাশে তারা সীমালংঘন করেই চলতো। তারপর যথাসময়ে আমি তাদেরকে ঠিকই শাস্তি দিয়েছিলাম। সে শাস্তি থেকে তাদের শেষরক্ষা হয়নি। আর সকলের অবশেষে গন্তব্য তো আমার দিকেই।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

❒ বল, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদিগের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী;

❒ সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা;

❒ এবং যাহারা প্রবল হইবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সকলকে এইমর্মে হুঁশিয়ার করে দিন, হে মানুষ! আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী, একথা নিশ্চিত।

প্রশ্নঃ রসুল স. ছিলেন যুগপৎ সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। তবে এখানে কেনো তিনি আদিষ্ট হলেন শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শক হিসাবে?

উত্তরঃ মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্র শাস্তির অতিদ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করেছিলো। তাই এখানে রসুল স. এর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে কেবল সতর্ককারী বা ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে। তিনি যে সুসংবাদ দানকারী, সে কথা তাই এখানে বলা হয়নি। এরকমও বলা যেতে পারে যে— ভীতিপ্রদর্শনের আলোচনা আসে সাধারণতঃ শুভসংবাদের আলোচনার পূর্বে। শুভসংবাদের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে কেবল আল্লাহ্র অনুগতদের সঙ্গে। আর সতর্ককরণের সম্পর্ক থাকে অনুগত অননুগত সকলের সঙ্গে। হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ আমাকে যে বার্তাসহ পাঠিয়েছেন, সেই প্রত্যাদেশিত বার্তা এবং আমার সম্পর্ক এরকম— এক সতর্ককারী তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে সম্বোধন করে বললো, হে আমার স্বজাতি! আমি দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের ওপারে একদল শত্রুসেনা আক্রমণোদ্যত। জলদি করো, জলদি করো (পালাও, পালাও)। কিছু লোক তার কথা মেনে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই অন্যত্র পালিয়ে গেলো। সদ্ব্যবহার করলো সুযোগের। এভাবে তারা পরিত্রাণ পেলো শত্রুর আক্রমণ থেকে। আবার কিছু সংখ্যক লোক তার কথা বিশ্বাস করলো না। পড়ে রইলো আপনাপন বসতবাটিতে। পরিণাম এই দাঁড়ালো যে, পরদিন প্রত্যুষে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো শত্রুর আক্রমণে। ওই সতর্ককারীর মতোই আমার অবস্থান। যে আমার কথা মানবে এবং আমি শুভবার্তা হিসেবে যা এনেছি তা মান্য করে চলবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে মানবে না, সে ভোগ করবে শাস্তি।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা'। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে শুভসমাচার— ক্ষমার ও সম্মানজনক জীবিকার। রসুল স. বলেছেন, ইসলাম পূর্ববর্তী পাপসমূহকে মুছে ফেলে। হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'এবং যারা প্রবর হবার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী'। এখানে 'মুয়া'জিযীন' অর্থ ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে, উপস্থিত করে স্থবিরতা, বিশৃংখলা, বিরুদ্ধবাদিতা। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— যারা আমার আয়াতকে প্রতিহত করতে চায় একথা বলে যে, কিয়ামত বলে কিছু নেই, জান্নাত-জাহান্নামও নেই। অথবা এর অর্থ— যারা নিজেদেরকে আমার আওতাবহির্ভূত বলে মনে করে, আরো ভাবে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে অক্ষম। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে— যারা আমার প্রতিপক্ষ হতে চায়, ভাবে তারাই বিজয়ী হবে, অব্যাহতি পাবে আমার শাস্তি থেকে।

আমি বলি, কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, যারা আমার রসুলকে অক্ষম করতে চায়, তিনি তো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চান, অথচ তারা স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতে চায় জাহান্নামে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উদাহরণ এরকম— এক লোক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। ক্রমশঃ প্রসরমান ওই অগ্নির দিকে ছুটে আসতে লাগলো কীটপতঙ্গেরা। তারা উন্মাদের মতো ঝাঁপ দিতে লাগলো ওই আগুনে। লোকটি প্রাণপনে বাধা দিতে লাগলো তাদেরকে। কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। ক্ষান্ত হলো না আত্মাহুতি দান থেকে। আমিও ওই লোকটির মতো তোমাদের কটিদেশ আঁকড়ে ধরে বাধা প্রদান করি, তবুও তোমাদের অগ্নি-অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রক্রিয়া রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, রসুল স. এর দিক থেকে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং তাদের ওই বৈমুখ্য যখন রসুল স. এর নিকটে হয়ে পড়লো অত্যন্ত অস্বস্তিকর, তখন তিনি স. আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করলেন এক সহজ পদ্ধতির, যা তাদেরকে নিকটবর্তী করবে। অর্থাৎ তিনি স. মনেপ্রাণে চাইতেন তারা পথপ্রাপ্ত হোক। এমতাবস্থায় একদিন তিনি কুরায়েশদের এক সমাবেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে অবতীর্ণ হলো সুরা আন্‌নজম। তিনিও তৎক্ষণাৎ তা পাঠ করে শোনালেন। যখন উচ্চারণ করলেন 'আফা রআইতুমুল্ লাতা ওয়ালউ'জ্‌জা ওয়াল মানাতা ছ্ছালিছাতাল উখরা', তখন শয়তান তাঁর সম্প্রদায়ের হেদায়েতপ্রাপ্তির অতি আগ্রহের সুযোগকে কাজে লাগালো। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো 'তিলকাল গারানীকুল উ'লা ওয়া ইন্‌না শাফায়াতা হুন্‌না লাতুরতাবা'। শেষোক্ত বাক্যটি শুনে প্রীত হলো কুরায়েশেরা। রসুল স. তাঁর

তেলাওয়াত সমাপ্ত করলেন। সেজদা করলেন। কুরায়েশেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। সেজদা করলো না কেবল ওলীদ ইবনে মুগীরা ও সাঈদ ইবনে আস। তারা শুধু এক মুঠো কংকর কপালে ঠেকিয়ে বললো, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা দু'জনেই ছিলো অতি বৃদ্ধ। তাই তারা সেজদা করতে পারলো না। সমাবেশস্থল ত্যাগের প্রাক্কালে কাফের কুরায়েশরা বলাবলি করতে লাগলো, এতদিনে মোহাম্মদের মুখ থেকে আমাদের দেব-দেবীদের প্রশংসা উচ্চারিত হলো। আরে, আমরাও তো একথা মানি যে, আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা, জীবন-মৃত্যুদাতা ও রিজিক প্রদাতা। তার সঙ্গে প্রতিমাপূজা করি তো কেবল এজন্য যে, ওগুলো আল্লাহ্র দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এতোদিনে মোহাম্মদ আমাদের অধিকার স্বীকার করে নিলো। এখন থেকে আমরাও তার অধিকারকে স্বীকার করে নিলাম।

সেদিনই সায়াহ্নে হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! একি করলেন আপনি। কেনো সংযোজন করলেন আল্লাহ্র বাণীর সঙ্গে অন্যের কথা। রসুল স. ভীত ও চিন্তিত হলেন। তখন আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন পরবর্তী আয়াত। সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে। রসুল স. এর অনেক সাহাবী তখন হিজরতকারী হিসেবে বসবাস করছিলেন আবিসিনিয়ায়। রসুল স. এর সঙ্গে কুরায়েশদের সেজদা করার সংবাদ তাঁদের নিকটেও পৌছলো। তাঁরা মনে করলেন, কুরায়েশরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই খুশী হয়ে অনেকেই ফিরে আসতে শুরু করলেন মক্কায়। বললেন, মক্কাবাসীদের প্রতি রয়েছে আমাদের ভালোবাসা। তাদের ভুল ভাঙলো শহরের সন্নিকটে এসে। পুনরায় আবিসিনিয়া যাত্রা ছিলো দুষ্কর। তাই তারা গোপনে গোপনে অথবা অন্য কারো নিরাপত্তার আশ্বাসে প্রবেশ করলেন মক্কায়।

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫২

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❒ আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা যখনই কিছু আবৃত্তি করিয়াছে তখনই শয়তান তাহাদিগের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়;

ইমাম বাগবী লিখেছেন, হজরত জিবরাইল যাঁর নিকটে প্রত্যাদেশ নিয়ে আবির্ভূত হন, তিনিই রসুল। আর যিনি প্রত্যাদেশ পান স্বপ্ন অথবা ইলহামের মাধ্যমে, তিনি হচ্ছেন নবী। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন নতুন শরিয়তের প্রবর্তক যিনি, তিনিই রসুল। আর 'নবী' শব্দটি নবী ও রসুল উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যিনি রসুল তিনি নবীও। কিন্তু সকল নবী রসুল নন। কেবলই নবী যাঁরা, তাঁরা প্রচার করেন তাঁদের পূর্ববর্তী রসুলের শরিয়ত। যেমন ছিলেন হজরত মুসা পরবর্তী এবং হজরত ঈসা পূর্ববর্তী সময়ের নবীগণ।

হজরত আবু জর বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি স. বললেন, আদম। আমি বললাম, তিনি কি রসুলও ছিলেন? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি এমন নবী, যাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রসুলের সংখ্যা কতো? তিনি স. বললেন, একটি বৃহৎ দল, যাদের সংখ্যা তিনশত দশের অধিক।

হজরত আবু উমামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের একটি সুবৃহৎ দল, তন্মধ্যে রসুলের সংখ্যা হচ্ছে তিনশত পনেরো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইবনে রাহওয়াইহ্ তাঁদের মসনদে। ইবনে হাব্বান এবং হাকেম তাঁদের সিহাহ্ এবং মুসতাদ্রাকে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমার পূর্বে যে সকল রসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! চিন্তিত হবেন না। এরকম ঘটনা নতুন নয়। আপনার পূর্ববর্তী রসুলগণের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছিলো। তাঁরা যখন তাঁদের উম্মতের পথপ্রাপ্তির অত্যুগ্র আগ্রহবশতঃ আল্লাহ্র বাণী থেকে কোনো আয়াত পাঠ করতেন, তখন শয়তান তার সঙ্গে তার নিজস্ব কথা প্রক্ষেপ করতো। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখনকার 'ইজা তামান্না' অর্থ যখনই আন্তরিক আকাংখা করতেন। কিন্তু কথাটির মর্মার্থ হবে এখানে 'যখনই কিছু আবৃত্তি করতেন' (বঙ্গানুবাদে সেকথাই লেখা হয়েছে)। উল্লেখ্য, অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, 'তামান্না' অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। আর 'আমনিয়াতুন' অর্থও পাঠ। যেমন হজরত ওসমানের শাহাদত বরণের পর জনৈক কবি পদ বেঁধেছিলেন—

তামান্না কিতাবাল্লহি আউয়ালা লাইলাতিন
ওয়াআখারাহা লাক্বা হিমালি মাক্বাদি।

অর্থঃ রাত্রির প্রথমাংশে তিনি আল্লাহ্র কিতাব আবৃত্তি করেন, আর শেষাংশে সাক্ষাত করেন মৃত্যুর সঙ্গে।

'আলক্বাশ্ শাইত্বনু' অর্থ শয়তান কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ নবীগণ যখন তাঁদের উম্মতের হেদায়েত প্রাপ্তির উদগ্র কামনা নিয়ে আল্লাহ্র কালাম তেলাওয়াত করেন, তখন শয়তান কর্তৃক কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়। বায়যাবী লিখেছেন, শয়তান নবীগণের কামনার অনুকূলে অতি সূক্ষ্ম ভ্রান্তি প্রক্ষেপ করে, ফলে তাঁরা নিপতিত হন সাময়িক ভ্রান্তিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন'। একথার অর্থ— শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত প্রক্ষেপণকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারণ করেন। নিষ্ফল করে দেন তার অপপ্রচেষ্টা। এভাবে নির্দোষ ও নিরাপদ রাখেন তাঁর প্রিয় নবীগণকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন'। একথার অর্থ— এভাবে নবীগণকে হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বাণীকে রাখেন নিষ্কলুষ ও সুদৃঢ়। ফলে নবীগণও মুক্ত থাকেন সাময়িক ভ্রম থেকে। নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত থাকে তাঁদের নবীত্ব ও নিষ্পাপত্ব।

একটি চরম জটিলতাঃ অন্যান্য নবীর মতো রসুল স.ও নিষ্পাপ ছিলেন। আর ধর্মীয় নির্দেশনার মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন। সুতরাং তাঁর কোরআন আবৃত্তিতে ভুল হওয়ার কথা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? তাছাড়া এ সম্পর্কে রয়েছে আল্লাহ্পাকের সুস্পষ্ট নিরাপত্তা। যেমন—'লা ইয়াতিহিল বাত্বিলু মিম্বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খলফিহী' (শয়তান তার কাছে আসতে পারে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়)। তাই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বর্ণিত বিবরণ উপেক্ষা করেছেন ভাষ্যকার বায়যাবী। তদুপরি তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত অবতরণের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত বিবরণটি (শানে নুজুল) যথার্থ নয়। কিন্তু জালালউদ্দিন সুয়ূতি বলেন, বিবরণটি বায্যার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানী উপস্থাপন করেছেন সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

আমি বলি, বায্যার কর্তৃক বিবরণটি এসেছে একটি অকর্তিত সূত্রপ্রবাহের মাধ্যমে। এর অন্য কোনো সূত্রপ্রবাহ এরকম অকর্তিত নয়। আর অকর্তিত এই সূত্রপরম্পরাভূত উমাইয়া ইবনে খালেদ একজন সুপ্রসিদ্ধ ও বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির অপরিণতসূত্রে সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন মক্কায়। অবতীর্ণ হলো সুরা আন্নজম। তিনি এক সমাবেশে তা আবৃত্তি করে শোনালেন। যখন পাঠ করলেন 'আফারাআইতুমুল্ লাতা ওয়াল উ'জ্জা ওয়া মানাতা ছ্ছালিছাতাল উখরা', তখন শয়তান তাঁর উচ্চারণের সঙ্গে সংযুক্ত করলো 'তিলকাল গারামীকু উ'লা ওয়া ইননা

শাফায়াতা হুন্না লা তুতাজ্বা'। মুশরিকেরা একথা শুনতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ ইতোপূর্বে এভাবে আমাদের উপাস্যগুলো সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করেনি। তেলাওয়াত শেষ হলে রসুল স. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। মুশরিকেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। নুহাশ এই বিবরণটিকে অকর্তিত সূত্রে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কিন্তু এই সূত্রপরম্পরাভূত ওয়াকেদী বর্ণনাকারীরূপে অগ্রাহ্য। আবু সালেহের মাধ্যমে কালাবী সূত্রে ইবনে মারদুবিয়াও বিবরণটিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কিন্তু কালাবীও অগ্রহণীয়।

বিবরণটি আরো উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফী সূত্রে ইবনে জারীর, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে শিহাব মাগাজী গ্রন্থে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব ও মোহাম্মদ ইবনে কায়েসের মাধ্যমে ইবনে জারীর এবং সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম। এসকল বিবরণের উদ্দেশ্য এক এবং এগুলোর সকল সূত্রপরম্পরাই হয় শিথিল, নয়তো কর্তিত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে বায্যার, ইবনে মারদুবিয়া ও তিবরানীর বর্ণনাটি অবশ্য অকর্তিত ও শক্তিশালী, যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই আলোচনার শুরুতে।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে অন্ততঃ এতটুকু আন্দাজ করা যায় যে, বিবরণটি অবশ্যই ভিত্তিবিবর্জিত নয়। এর মধ্যে আগেকার দু'টো অপরিণত সূত্রপরম্পরা বোখারী এবং মুসলিমের শর্তানুসারেও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে তিবরানীর একটি সূত্র এরকমঃ ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ—ইবনে শিহাব—জুহুরী—হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর। তাঁর অপর একটি সূত্র এসেছে ইবনে হারেছ—ইবনে হিশাম, এভাবে। এরকম আরো একটি সূত্রে তিবরানী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ মুকীম ইবনে সুলায়মান—হাম্মাদ বিন সালমান—দাউদ—আবুহিন্দ—আবুল আলীয়া।

উল্লেখ্য, আলেমগণ বিভিন্নভাবে উদ্ভূত সন্দেহভাজনতাকে দূর করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, রসুল স. তখন শয়তান কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বক্তব্যটি উচ্চারণ করেননি। উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর মুখ থেকে এরকম শোনেননি। শয়তানই তাঁর তেলাওয়াতের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো সংযোজন করে মুশরিকদের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো। আর তারা মনে করেছিলো কথাগুলো রসুল স. এর মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

কাতাদা বলেছেন, ওই সময় রসুল স. ছিলেন অর্ধচেতন অবস্থায়, ওই সুযোগে শয়তান তাঁর রসনা থেকে তার কথা গুলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় বের করে

দিতে পেরেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, আবইয়াদ (শাদা শয়তান) নামক এক শয়তান তখন এক কূটচাল চেলেছিলো, ক্ষণিকের জন্য হলেও সফলও হয়েছিলো। আর এটা ছিলো আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের প্রতি একটি পরীক্ষাও। এতে করে কেউ কেউ যেনো এ সন্দেহ না করেন যে, কোরআনে শয়তানের প্রক্ষেপণজাত কোনো কথা নেইতো! কিন্তু এমতো সন্দেহের অপনোদন ঘটিয়েছেন আল্লাহ্ নিজে পরবর্তী বাক্যে এভাবে 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ্ শয়তানের কুমন্ত্রণাজাত এমতো সন্দেহ দূর করে দেন। প্রকাশ করে দেন যে, প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো শয়তানের। এভাবে কোরআনের প্রকৃত বাণীকে তিনি রাখেন অমলিন, নিঃসন্দিগ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব সম্পূর্ণ কোরআন বিশ্বাসযোগ্য। যদি না হয় তবে 'কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন'— এই আয়াত আবার বিশ্বাসযোগ্য হবে কীভাবে? এমতো সন্দেহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে জ্ঞান ও প্রমাণের দাবি এই যে, আল্লাহ্পাক যখন কাউকে পয়গম্বর বানিয়ে প্রেরণ করেন, তখন দ্বীনের ভিত্তি কোরআন ও অন্যান্য কিতাব প্রচারের ক্ষেত্রেও তাঁকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পয়গম্বরগণ মাসুম ও মাহফুজ (নিষ্পাপ ও সুরক্ষিত)। তাই বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীগণ তাঁদের প্রচারিত কিতাবকে সত্য বলেই জানেন। সর্বান্তকরণে মানেন, এই কিতাব অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহাসত্য। সন্দিগ্ধতা থেকে তাঁদের হৃদয় সতত মুক্ত ও পবিত্র।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়াজ তাঁর 'আশ্‌শিফা' গ্রন্থে লিখেছেন, আলেমগণ কোনো অকর্তিত বিশুদ্ধ বর্ণনায় এঘটনার উল্লেখ করেননি। আর কোনো অকর্তিত ও বিশুদ্ধ সূত্রেও ঘটনাটি প্রমাণিত নয়। কেবল ঐতিহাসিকগণ ও তাফসীরকারেরা তাঁদের গ্রন্থে সত্য ও অসত্য ভালোভাবে যাচাই না করে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে সেকারণেই। কাযী আবুবকর আলা মালেকী বলেছেন, কিছুসংখ্যক প্রবৃত্তি-প্রভাবিত বেদাতী তাফসীরকারের দিকে কোনো কোনো লোক ধাবিত হয়। তাদের সামনে বর্ণনাকারীরাও হয়ে যায় অপ্রস্তুত। ফলে ছিন্ন হয়ে যায় তাদের বর্ণনাসূত্র। শব্দ ব্যবহারে ঘটে বিশৃঙ্খলা। ধর্মদ্রোহীরা আবার এসকল কথাকেই জোরে-শোরে প্রচার করে। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে বর্ণনা বৈষম্যও। যেমন— কেউ বলেছে ঘটনাটি ঘটেছিলো নামাজের মধ্যে। কেউ বলেছে সুরা আন্‌নজম তেলাওয়াতের প্রাক্কালে। কেউ কেউ আবার বলে, রসুল স. এর অন্তরে আপনা থেকেই প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো উদিত হয়েছিলো। পুরো ব্যাপারটি ছিলো অনবধানতাজনিত। আবার কেউ বলে, রসুল স. এর উচ্চারণের অনুকরণে

শয়তানই ওই কথাগুলো বলেছিলো। রসুল স. সে কথা শোনার সাথে সাথে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। এরকম আয়াত আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি। কেউ কেউ বলে, শয়তান তাঁর স. মুখ দিয়ে ওই অপবচন উচ্চারণ করিয়েছিলো। হজরত জিবরাইল একথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন, আমি তো এগুলো আপনাকে পাঠ করে শোনাইনি। আবার ঘটনাটি সম্পৃক্ত করা হয় কেবল তাবেয়ীগণের সঙ্গে। কোনো সাহাবীর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পৃক্তি নেই। আর বিবরণটির অধিকাংশ সূত্র শিথিল ও অযথার্থ। এর একটি সূত্রপরম্পরাই কেবল সুপরিণত স্তরে পৌঁছেছে সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত। কিন্তু এই সূত্র পরম্পরাটিও সন্দেহাতীত নয় এ কারণে যে, তিনি স. তখন কোথায় ছিলেন তা স্পষ্ট নয়— কাবা গৃহের চত্বরে, কুরায়েশদের অন্য স্থানের সমাবেশে, না মিনায়।

আবু বকর বায্‌যার বলেছেন, আমি জানিনা এই বিষয়টির এমন কোনো অকর্তিত সূত্র রসুল স. পর্যন্ত উপনীত হয়েছে, যার বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু উমাইয়া ইবনে খালেদ প্রমুখ একে অপরিণতরূপে প্রত্যয়ন করেছেন কেবল সাঈদ ইবনে যোবায়েরের সঙ্গে, হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যয়িত নয়। কেবল কালাবী আবু সালেহের বরাত দিয়ে একে হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। বায্‌যার আরো বলেন, এই একটি সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রেই এটি বর্ণনাযোগ্য নয়। আর প্রকাশ থাকে যে, কালাবীর বর্ণনা উপস্থাপন করা জায়েযই নয়। কারণ তা অত্যন্ত শিথিল ও পরিত্যাজ্য।

শেষে বলা হয়েছে,— 'এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, সেহেতু তিনি একথা ভালোভাবেই জানেন যে, কে বিশুদ্ধচিত্ত ও হেদায়েত প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে এরকম নয়। তাই তিনি হেদায়েতের যোগ্যকে দান করেন হেদায়েত এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্যকে করেন পথভ্রষ্ট। তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞাজাত এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা রচনার অধিকার ও সাধ্য কারোরই নেই। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যে প্রত্যাদেশ তাঁর বার্তাবাহকগণের প্রতি অবতীর্ণ করেন এবং যা কিছু তিনি করতে ইচ্ছা করেন, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই অবগত, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। আর শয়তান তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোনো কিছু প্রক্ষিপ্ত করলে, তা-ও তিনি বিদূরিত ও ব্যর্থ করে দেন। এভাবেই তিনি তাঁর আদিঅন্তহীন বাণীকে করেন চির প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা অসীম, অনন্ত।

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ
قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۙ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ
اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

❒ ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণহৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রহিয়াছে;

❒ এবং এই জন্যও যে, যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরলপথে পরিচালিত করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ হৃদয়।' এখানে ফিত্নাতান' অর্থ পরীক্ষা বা বিপদ। 'মারদ্ব' অর্থ ব্যাধি— মুনাফিকদের অন্তরের সন্দেহ ও কপটতা। 'ক্বসিয়াতি ক্বলুবুহুম' অর্থ পাষাণ হৃদয়। অর্থাৎ কঠিন অন্তর বিশিষ্ট অংশীবাদী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এই যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণ ও আল্লাহ্ কর্তৃক তার অপসারণ হচ্ছে কপটচারী ও অংশীবাদীদের জন্য একটি ভয়ানক পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াই তাদের ললাটলিখন। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত ও সুকঠিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে'। এখানে 'আজ্জলিমীন' (সীমালংঘনকারীরা) অর্থ রসুল স.এর বিরুদ্ধপক্ষ— মুনাফিক ও মুশরিক। আর 'শিক্বাক্ব' অর্থ সত্যবিরোধী অথবা রসুল স. এবং বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধাচারী। উল্লেখ্য, আগের বাক্যে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' এবং 'যারা পাষাণ হৃদয়' বলে মুনাফিক ও মুশরিকদের পরিচয় সুস্পষ্ট করা হয়েছে। তাই আলোচ্য বাক্যের শুরুতে 'ইন্নাহুম' (নিশ্চয়ই তারা) বললেই চলতো। কিন্তু বলা হয়েছে 'ইন্নাজ জলিমীনা' (সীমালংঘনকারীরা)। এরকম করা হয়েছে কেবল তাদের পরিচিতিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবার জন্যই।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এবং এ জন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেনো জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেনো এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেনো এর প্রতি অনুগত হয়।' এখানে 'লি ইয়া'লামা' (তারা যেনো জানতে পারে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি লুপ্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ চলে এসেছে এই আয়াতেও। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমি শয়তানকে যেমন প্রক্ষেপণের শক্তিদান করি তেমনি সে প্রক্ষেপণ-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থও করে দেই, সুপ্রতিষ্ঠিত করি আমার বাণীকে। আমার এমতো কর্মের উদ্দেশ্য দু'টি— ১. শয়তানের প্রক্ষেপণকে ব্যাধিগ্রস্ত কপট ও পাষাণহৃদয় অংশীবাদীদের জন্য দুর্লঙ্ঘ্য পরীক্ষা করে দেয়া ২. জ্ঞানবানদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেয়া ইমানের দৃঢ়তা, যেনো তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নিতে পারে যে, এই বাণী সত্য এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সমাগত। এভাবে তাদের হৃদয় যেনো আমার বাণীর প্রতি হয় সতত অনুগত।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'লিইয়া'লামা' এবং 'লিইয়াজ্‌আ'লা' শব্দ দু'টোর লাম হচ্ছে পরিণতি সূচক অব্যয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এমতো কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে— অবিশ্বাসীদেরকে বিপদগ্রস্ত করা এবং বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় ইমান দান করা। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'মুসাকে পেলো ফেরাউনের গৃহিনী। পরিণতিতে তিনি তাদের জন্য হয়েছিলেন শত্রু ও যাতনার কারণ।' এখানে লিইয়াকুনা (যেনো হয়) বাক্যে লাম অব্যয়টি ও পরিণতি সূচক, অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার পরিণতি হচ্ছে দুঃখ-যাতনা ও শত্রুতা।

'উতুল ই'লমা' (যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে) বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। সুদ্দী বলেন, কথাটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে, যারা শয়তানের প্রক্ষেপণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

'ইন্নাহু' অর্থ— অবশ্যই এটা। অর্থাৎ এই বাণীকে আল্লাহ্‌পাকই যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণ বা কুমন্ত্রণাদানের নিয়মটি একটি চিরাচরিত সত্য। এ নিয়ম বলবৎ রয়েছে মানুষের সূচনালগ্ন থেকে, হজরত আদমের সময় থেকে।

'ফা ইউ'মিনু বিহী' অর্থ তাদের অন্তর যেনো তার প্রতি (আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি) সুদৃঢ়রূপে অনুগত হয়। অর্থাৎ ওই সকল জ্ঞানী যেনো আল্লাহ্‌র এই পবিত্র বাণী সম্ভারকে গ্রহণ করে অন্তরের সঙ্গে। বিশ্বাস করে, এই কালাম নিশ্চয় আল্লাহ্‌র। অথবা তাঁরা যেনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌কে। 'ফা ইউ'মিনু বিহী' কথাটির

'ফা' এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বাক্যের 'ইয়া'লামা' এর সংযোগ থাকার কারণে এ অর্থটিও প্রকাশ পায় যে, কেবল অবগতির নাম ইমান নয়, বরং ইমান হচ্ছে হৃদয়ের বৈভব, যার প্রাপ্তি ঘটতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়ায়। জ্ঞানীগণ প্রথমে অবগত হন, তারপর তা ধারণ করেন হৃদয়ে। ফলে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি তাদের হৃদয় থাকে সতত অনুগত ও প্রশান্ত।

আর 'ফাতুখবিতা' অর্থ— অক্ষম করে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভীতি। অনুসারী হয় আল্লাহ্‌র নির্দেশের । ফলে তাদের অন্তর হয় নিষ্কলুষ।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরলপথে পরিচালিত করেন'। একথার অর্থ— ইমানদারেরা যখন দোদুল্যচিত্ততার সম্মুখীন হন, তখন আল্লাহ্‌ই তাদেরকে দেখান ন্যূনতা ও বাহুল্যবিমুক্ত সরল সঠিক পথ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, অথবা আসিয়া পড়িবে এক ভয়ংকর দিনের শাস্তি।

❒ সেই দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহেরই; তিনিই উহাদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে,

❒ এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদিগেরই জন্য থাকিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কাফেরেরা রসুল স. অথবা কোরআন, অথবা ইমানদারগণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহে নিপতিতবলে, এ আবার কেমন রসুল! একবার আমাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর প্রশংসা করে, আবার বলে, এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষিপ্ত। তাদের এমতো সন্দেহ স্বভাবজাত। তাই তা বিদূরিত হবে না, যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে, অথবা আসবে ভয়ংকর কোনো আযাব।

এখানে 'মিররইয়াত্' অর্থ সন্দেহ। আর 'মিনহু' (এতে) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে, কোরআনকে, অথবা বিশ্বাসীগণকে। 'আস্সায়াত' অর্থ শাস্তির সময় বা মৃত্যুর সময়। আর 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' অর্থ কিয়ামত দিবস। ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, 'ইয়াওমিন আক্বীম' অর্থ ওই দিবস, যে দিবস শেষে রাত্রি আসে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আস্সায়াত' অর্থ কিয়ামত এবং 'আ'ক্বীম' অর্থ বদর দিবস, যেদিন অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটেছিলো ঘোর অকল্যাণ। শব্দটির অভিধানগত অর্থ নিষিদ্ধ। 'রিহুন আক্বীম' অর্থ বৃষ্টিহীন বাতাস। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'আস্সায়াত' এবং 'ইয়াওমিন আ'ক্বীম' দুটোর অর্থই কিয়ামত দিবস। কেবল সেদিনের ভয়াবহতাকে প্রকট করে তুলবার জন্যই শেষে সংযোজন করা হয়েছে 'ইয়াওমিন আক্বীম'।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'সে দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্রই, তিনিই তাদের বিচার করবেন সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা অবস্থান করবে সুখদ কাননে'। একথার অর্থ— সেই কিয়ামতের সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্বই থাকবে না। তিনি তখন সকলের বিচার করবেন। বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং তিরস্কৃত করবেন অবিশ্বাসীদেরকে।

এখানে 'ফা উলাইকা' কথাটির 'ফা' অক্ষরটি একথাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে, তাদের আমলের বিনিময়ে নয়। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের মন্দ আমল হবে তাদের শাস্তির কারণ। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'লাহুম আ'জাবুন'। 'হুম ফী আ'জাবিন' এরকম কথা সেখানে আসেনি।

'জান্নাতিন নায়ীম' অর্থ সুখদ কাননে বা জান্নাতের উদ্যানে। বলা বাহুল্য, সুখদ কাননের অধিকার লাভ হবে আল্লাহ্তায়ালার দয়ায়। রসুল স. একবার বললেন, সৎ আমল কাউকে পরিত্রাণ প্রদান করবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকেও কি? তিনি স. বললেন, না। আমাকেও নয়। কিন্তু আমি যে তাঁর অপার ও অনুগ্রহের দ্বারা আসত্তাআবৃত। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, একবার রসুল স. জানালেন, সঠিক পথে চলো, আনন্দিত হও এবং মনে রেখো, কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে না। উপস্থিত সহচরবৃন্দ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনাকেও কি নয়? তিনি স. জবাব দিলেন, না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার অস্তিত্ব যে আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহে সম্পূর্ণ আবৃত। হজরত জাবের থেকে মুসলিমও এরকম বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিবরানী হজরত ইবনে আবী মুসা, শরীক ইবনে তারেক, উমামা ইবনে শরীক ও আসাদ ইবনে করজ সূত্রে।

একটি সন্দেহঃ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'তোমরা আপন আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করো' (সুরা নাহল)। এতে করে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, আমল দ্বারাই জান্নাত লাভ হয়?

সন্দেহের জবাবঃ জান্নাতে রয়েছে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। ওই সকল স্তর লাভ হবে সৎ আমলের বিনিময়ে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ ও সেখানে স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহনির্ভর। হান্নাদ তাঁর 'আজজুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র ক্ষমা ও অনুগ্রহে পুলসিরাত পাড়ি দিবে, আল্লাহ্র দয়ায় লাভ করবে বেহেশত এবং মর্যাদা লাভ করবে আপনাপন আমলের দ্বারা। আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবু নাঈমও এরকম বর্ণনা এনেছেন।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'। একথার অর্থ— এবং যারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত ও আমার প্রত্যাদেশিত বাণী প্রত্যাখ্যানে অনড়, তাদের জন্যই অপেক্ষমাণ রয়েছে দোজখের অবমাননাকর আযাব।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৫৮, ৫৯

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

❐ যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে আল্লাহের পথে এবং পরে নিহত হইয়াছে অথবা মৃত্যু বরণ করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন; এবং আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা।

❐ তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পছন্দ করিবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল।

'হাজারু' অর্থ হিজরত করেছে বা ধর্ম রক্ষার নিমিত্তে ত্যাগ করেছে স্বভূমি ও স্বজন। 'ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র পথে বা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনার্থে। 'কুতিলু' অর্থ ধর্মযুদ্ধে নিহত। 'মাতূ' অর্থ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু। 'লাইয়ারযুক্বান্নাহুমু-ল্লহু রিযক্বান হাসানা' অর্থ আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন তাদেরকে। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে ত্যাগ করেছে তাদের স্বদেশ ও স্বজন কেবল আল্লাহ্র

সন্তোষ অর্জনের অভিপ্রায়ে, এরপর জীবনদান করেছে জেহাদে অথবা বরণ করেছে স্বাভাবিক মৃত্যু, আল্লাহ্ তাদেরকে অবশ্যই চিরসুখময় বেহেশতে প্রদান করবেন সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ। আর আল্লাহ্ই তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ প্রদাতা।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থলে দাখিল করবেন, যা তারা পছন্দ করবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র পরিতোষকামী ওই সকল হিজরতকারীকে আল্লাহ্পাক প্রবেশ করাবেন বেহেশতে, যা তাদের নিকটে হবে পছন্দনীয়। অথবা তাদেরকে দেয়া হবে ওই অনুগ্রহসম্ভার যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং অনুভব করেনি কারো অন্তর। ওই অনুগ্রহসম্ভার হবে তাদের একান্ত মনোপুত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর প্রতিপক্ষদের অবস্থা ভালোভাবে জানেন, কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়, কিন্তু তাদের উপর তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রয়োগ করা তাঁর বিধান নয়, কারণ তিনি সহিষ্ণু।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ○ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ○ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○

❒ ইহাই হইয়া থাকে; কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হইয়া যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

❒ উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে পরিণত করেন দিবসে এবং দিবসকে পরিণত করেন রাত্রিতে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

❒ এই জন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এরকমই হয়ে থাকে; কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্

অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন'। একথার অর্থ— অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। পুনরায় যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই ওই অত্যাচারিতকে সাহায্য করবেন।

উল্লেখ্য, অত্যাচারের বিনিময়ে সমপরিমাণ অত্যাচার অন্যায় নয়। তবুও এমতো বিনিময়কে এখানে বলা হয়েছে 'আ'ক্বাব' বা প্রতিশোধ। কার্যকারণ ভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— প্রতিশোধস্পৃহাও এক ধরনের প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভ। আর প্রবৃত্তিজাত ক্ষোভও এক ধরনের পাপ। কিন্তু অত্যাচারিতের এ ধরনের প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্ পাপ বলে গণ্য করবেন না। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ এ ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুক মনোবৃত্তিকে ক্ষমা করে দেয়া এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করাকে নিজের জন্য সমীচীন ও উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'যে ধৈর্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে, এটা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ বদান্যতা। আর প্রতিশোধ গ্রহণ উত্তমতার পরিপন্থী। তবুও এরকম করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল' (সুরা শুআরা)। এই আয়াতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ যখন সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তখন বান্দারও উচিত, যে তার ক্ষতি করেছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। এটাই সর্বোত্তম।

'আ'ফুউন' অর্থ পাপ মোচনকারী। আল্লাহ্ যে শাস্তি দিতেও সক্ষম, সেই ইঙ্গিতটিও নিহিত রয়েছে শব্দটির মধ্যে। কারণ তিনিই 'আ'ফুউন' যার রয়েছে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা।

বাগবী লিখেছেন, হাসান আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— যে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, যেভাবে মুশরিকেরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, এরপর পুনরায় যদি তার উপরে অত্যাচার করা হয়, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন।

কোনো কোনো হাদিস বিশারদ বর্ণনা করেছেন, একবার কতিপয় অংশীবাদী বিশ্বাসীগণের একটি দলের উপরে আক্রমণ করে বসলো ২৮ শে মহররমে। মহররম মাস সম্মানিত। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়। তাই বিশ্বাসীরা তাদেরকে বললো, ক্ষান্ত হও। এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ অবৈধ। কিন্তু অংশীবাদীরা একথা মানলো না। বন্ধ করলো না তাদের আক্রমণ। বিশ্বাসীরাও সুদৃঢ় থাকলো স্বস্থানে। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে সাহায্য করলেন।

আমি বলি, এমতাবস্থায় 'পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল' এর মর্মার্থ হবে— নিষিদ্ধ মাসে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে বলে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

পরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে পরিণত করেন দিবসে এবং দিবসকে পরিণত করেন রাত্রিতে।' একথার অর্থ— তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিধর। তাই তিনি রূপান্তর করতে পারেন পরস্পর বিরুদ্ধতাকে। যেমন রাতকে করেন দিন এবং দিনকে করেন রাত। ইচ্ছেমতো একদিকে যতটুকু বাড়ান, ততটুকু কমান অপর দিকে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনি আলোকিত স্থানে ক্রমপ্রসারমান সূর্যাস্ত প্রবর্তন করে নামিয়ে আনেন রাতের অন্ধকার এবং অন্ধকারাচ্ছাদিত স্থানে সূর্যাস্তের বিস্তৃতি ঘটিয়ে নিয়ে আসেন দিবসের আলোকোজ্জ্বলতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং যার উপরে প্রতিশোধ কার্যকর করা হয়, তিনি উভয়ের কথা শোনেন। অথবা শোনেন বিশ্বাসীগণের প্রার্থনা এবং তা গ্রহণও করেন। আর দেখেন উভয়ের আমল। সুতরাং কারো আমলই তিনি বিনিময়বিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না। তাদের আমল অনুসারে তাদের জন্য নির্ধারণ করবেন স্বস্তি অথবা শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে — 'এটা এজন্যও যে, আল্লাহ্ ; তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য'। এখানে 'আল হাক্ক' অর্থ স্বতোৎসারিত সত্য অস্তিত্ব, যিনি এক, একক ও অংশীবিহীন। আর তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন সৃষ্টির সকল কিছুকে। তিনি সর্বজ্ঞও। সকল পূর্ণতা ও শুভবৈশিষ্ট্য তাঁর সত্তাসম্পৃক্ত। কেননা তিনি সর্বশক্তিধরও । তাঁর শ্রবণ-দর্শনও আনুরূপ্যবিহীনরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। তাই তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী— সকল কিছুই সত্য, মহাসত্য।

'আল বাত্বিল' অর্থ অসত্য, অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে যা অস্তিত্বশীল নয়, বরং যার অস্তিত্ব সম্ভাব্য, অত্যাবশ্যক নয়— অস্তিত্ব বিদ্যমানতার ব্যাপারে যা সত্যের (আল্লাহ্র) মুখাপেক্ষী। অথবা 'বাত্বিল' অর্থ অস্তিত্বহীনতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর অস্তিত্ব অসত্য, ভিত্তিহীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অংশীবাদিতার ধারণা থেকে অতুলনীয়রূপে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। এখানে 'আ'লী' অর্থ সমুচ্চ এবং 'কবীর' অর্থ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ব বিষয়ের।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে, যাতে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী'? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। প্রশ্নাকারে এখানে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে— দ্যাখো, দেখে নাও, মেনে নাও। এর মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তুমি, তোমরা কি লক্ষ্য করো না, অনুধাবন করো না ও জানো না যে, আল্লাহ্ই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে পৃথিবীর মৃত্তিকাকে করে তোলেন সুজলা, সুফলা ও শ্যামলিমাময়?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।' আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন জ্ঞান ও শক্তিমত্তার সর্বত্রগামিতা ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ততা। এখানে 'লাত্বীফ' অর্থ সূক্ষ্ম জ্ঞান, গোপন রহস্যের পরিজ্ঞান। অথবা 'লাত্বীফ' এমন অপার দয়া, যা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলের ও সকল কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর 'খবীর' অর্থ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পরিকল্পনা, সৃষ্টির সকল অবস্থা ও তাদের জীবনোপকরণ নির্ধারণ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ যাঁর নির্ভুল অবহিতি রয়েছে সৃষ্টির সকল বিষয়ের।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ই আকাশসমূহ ও মেদিনীমণ্ডলসহ সকল সৃষ্টির একক সৃজয়িতা। তাঁর সৃজন গুণসহ অন্য সকল গুণই মুখাপেক্ষিতারহিত। আর সত্তাগতভাবে তিনিই প্রশংসার্হ, যে প্রশংসার সঙ্গে কারো বা কোনোকিছুর কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টি ও সম্পৃক্তি নেই।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۝

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

❒ এবং তিনি তো তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মানুষ একথা কেনো অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, পৃথিবীতে বিচরণশীল আরোহণযোগ্য পশুকুল, অন্যান্য বাহন এবং সমুদ্রগামী সকল জলযানের উপরে তাদেরকে দেয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা, যাতে তারা এগুলোর দ্বারা উপকৃত হয়। আর তিনিই আকাশকে রেখেছেন অচঞ্চল, যাতে তা স্থানচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে পতিত না হয়, বা পৃথিবীকে আঘাত না করে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষের স্থলভাগের এবং জলভাগের চলমানতাকে নির্বিঘ্ন রাখা হচ্ছে তাঁর ওই অপার দয়ার এক নিদর্শন, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও এককত্ব বুঝানোর মাধ্যম সমূহের মধ্যে এক অনন্য মাধ্যম।

প্রকাশ থাকে যে, গগনমণ্ডলের জড় প্রকৃতি, এ ধরাধামের জড় প্রকৃতির অনুরূপ। পৃথিবী যেমন ধ্বংসশীল, পতনশীল, নিম্নমুখী, তেমনি আকাশও পতনশীল নিম্নমুখী। তবে বিধাতার অসামান্য মহিমা বলে তা পতন থেকে সুরক্ষিত। এখানে 'তিনি আকাশ স্থির রাখেন' কথার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আল্লামা বায়যাবী বলেন— আকাশের জড় প্রকৃতিই হচ্ছে উর্ধ্বমুখী। উর্ধ্বমুখীনতাই তার অভিলাষ। তিনি আরো বলেন, মহাপ্রলয়ের দিন নিম্নমুখী হওয়ার অনুমতি পাবে আকাশ।

আমি বলি, মহাপ্রলয়ের দিন এ ধরাপৃষ্ঠে আকাশের পতন প্রামাণ্য নয়। তবে ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া তেলের গাদের মত হওয়া বা মোচড়ানো কাগজের মতো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার প্রমাণ অবশ্যই বিদ্যমান।

উত্তম সমাধান হচ্ছে— ইসতেস্‌নার ব্যতিক্রমক চায়না ব্যতিক্রমের উপস্থিতিকে। আবার অবিদ্যমানতাকেও নয়। সেক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ব্যতীত আকাশ পতিত হবে না ভূমিতলে। অর্থাৎ আকাশ যতোক্ষণ স্থির থাকবে ততোক্ষণ তার পতিত হওয়ার আদেশ থাকবে অনুপস্থিত। ফলে কোন সময়েই আকাশের পতিত হওয়ার আদেশ কামনা করা যায় না।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! প্রথমে তো তোমরা ছিলে জড় পদার্থ তুল্য অপ্রাণ। তিনিই তোমাদের শুক্র, মাংশপিণ্ড, মানবাকার ইত্যাদি অধ্যায় শেষে তোমাদেরকে পরিগঠিত করেছেন দেহ ও আত্মা সম্বলিত পরিণত ও জীবন্ত মানুষরূপে। তারপর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল শেষে তিনিই ঘটাবেন তোমাদের মৃত্যু। এরপর পুনরুত্থিত করবেন পরকালে।

শেষে বলা হয়েছে— 'মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ মানুষের জীবন ও মৃত্যুকে ভরপুর করে দিয়েছেন অসংখ্য নেয়ামতে। নেয়ামতের মহাসমুদ্রে এভাবে আসত্তা নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞচিত্ত নয়। উল্লেখ্য, জীবনের মতো মৃত্যুও একটি অমূল্য নেয়ামত। কারণ মৃত্যুর পরেই উন্মুক্ত হয় আখেরাতের অনন্ত সুখসম্ভার লাভের দুয়ার। আর তা হতে পারে কেবল পুনরুত্থানের পরেই। তাই জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের কথা এখানে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে। নেয়ামত লাভের এই পথপরিক্রমা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অসচেতন। তাই শেষে বলা হয়েছে 'মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ'। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— জীবন-মৃত্যু-পুনরুত্থানের এই সুনির্ধারিত প্রক্রিয়াই আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্ব, সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ অবিশ্বাসীরা কেমন অবলীলায় এ সকল কিছুকে উপেক্ষা করে চলে। এটাই প্রমাণ যে, তারা অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ○ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

❐ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি নিয়ম-কানুন— যাহা উহারা পালন করে; সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই আছ।

❐ উহারা যদি তোমার সহিত বিতণ্ডা করে তবে বলিও, 'তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

❐ 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদিগের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।'

পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সরাসরি প্রসঙ্গতঃ কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বাক্যের শুরুতে এখানে সংযোজক অব্যয় 'ওয়া' (এবং) ব্যবহৃত হয়নি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ' আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম কানুন যা তারা পালন করে।' হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা মেনে চলে। এখানে 'মানসাকান' অর্থ নিয়ম কানুন বা শরিয়ত। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— খুশীর দিন। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ কোরবানীর স্থান, যেখানে কোরবানী করা হতো। কেউ কেউ বলেছেন, ইবাদতের স্থান। কেউ আবার বলেছেন, মেলা বা সমাবেশ। আরবী ভাষায় 'মানসাকান' বলে ওই স্থানকে, যেখানে মানুষ ভালো অথবা মন্দ কাজের উদ্দেশ্যে একত্রিত হতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হজের স্থানে প্রতি বছর মানুষ একত্র হয় বলে ওই একত্রায়নকে বলে 'মানাসিকে হজ'।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, নুসুক অর্থ ইবাদত। 'আরিনা মানাসিকানা' অর্থ আমাদেরকে ইবাদতের স্থানসমূহ দেখিয়ে দিন। 'মানসাক' অর্থ জবেহ্ অথবা জবেহের স্থান। 'নাসিকাতুন যাবিহাতুন নুসুক' অর্থ মেলার স্থান। আর 'মানসাক' অর্থ উপবেশন স্থল।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে।' এখানে 'আলআমর' অর্থ ধর্মীয় বিধান, জবেহের নিয়ম। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুকুল মূর্খ ও বিতণ্ডাপ্রবণ। যদি তারা জ্ঞানী হতো তবে অশালীনভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হতো না, বুঝতে পারতো, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম বিতর্কাতীত।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বুদাইল ইবনে ওরাকা, ইয়াযীদ ইবনে খানিস ও বশীর ইবনে সুফিয়ান সম্পর্কে। তারা সাহাবীগণকে বলেছিলো, যে পশুগুলোকে তোমরা নিজ হাতে হত্যা করো, সেগুলো খাও, কিন্তু আল্লাহ্ যেগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটান সেগুলো খাও না (এ কেমন কথা)।

জুজায বলেছেন, প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এখানে বিতর্ক পরিহার করতে বলা হয়েছে আরববাসীদেরকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতর্ক পরিহারের শুভ নির্দেশনাটি এখানে প্রযোজ্য হবে রসুল স. এর প্রতি। আরববাসীরা বলে, অমুক ব্যক্তি যেনো তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে। এ কথার অর্থ হবে— তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কোরো না। মোটকথা বিতর্কের সঙ্গে জড়িত থাকে উভয় পক্ষ। বিতর্ক কখনো এক দিক থেকে হয় না। সুতরাং 'লা ইয়াদ্বরিবান্নাকা যায়দুন' এর অর্থ এরকম হতে পারে না যে— তুমি জায়েদকে মেরো না। হ্যাঁ, যদি 'লা ইউদ্বারিবান্নাকা যায়দুন' বলা হয়, তবে তার অর্থ 'তুমি জায়েদকে মেরো না'। —এরকম বলা যাবে। বিবাদ-বিতর্ক সংঘটিত হয় বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের মাধ্যমে। এর মধ্যে একজন সরে দাঁড়ালে বিবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করো, তুমি তো সরল পথেই আছো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল বিভ্রান্তদেরকে আল্লাহ্র এককত্ব, আল্লাহ্র ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যভাজনতার দিকে আহ্বান করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ওই সরল পথের পথিক, যা নিয়ে যায় আল্লাহ্র নৈকট্যের দিকে।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে—'তারা যদি তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে বোলো, তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার বার্তাবাহক! তারা যদি বচসায় লিপ্ত হয়, তবে আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যে বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছো, সে সম্পর্কে যথাসময়ে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে অংশীবাদীদেরকে করা হয়েছে মৃদু ভর্ৎসনা। আয়াতটি জেহাদের বিধান প্রবর্তনের পূর্বের।

এরপরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বচনবাহক! আপনি আরো বলুন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ই এ বিতর্কের সমাধান করে দিবেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন যে, কে সত্য এবং কে সত্য নয়। এভাবে সেদিন সত্য-অসত্যের

দ্বন্দ্বদীর্ণতার চির অবসান ঘটবে। সত্যানুসারীরা হবে পুরস্কৃত এবং অসত্যানুগামীরা হবে তিরস্কৃত। উল্লেখ্য, সত্য-অসত্যের পার্থক্যসূচক প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীতেই, আর মহাবিচারের দিবসে প্রকাশিত হবে এর বাস্তবরূপ।

'তাখতালিফুন' অর্থ মতভেদ করছে। 'ইখতেলাফ' অর্থ মতভেদ, পরস্পর বিরোধী মনোভাব।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

❒ তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহের নিকট সহজ।

❒ এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার ইবাদতের সমর্থনে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীদিগের কোন সাহায্যকারী নাই।

❒ এবং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মুখ-মণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে। কেহ উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিলে তাহার প্রতি উহারা মার-মুখো হইয়া উঠে। বল, 'তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব?' —ইহা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে। এবং ইহা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল!

প্রথমেই উপস্থাপন করা হয়েছে একটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে তাকরীরি)। বলা হয়েছে— 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু

রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন?' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো একথা অবশ্যই জানেন যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহ্র নিকট সহজ।' একথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল ঘটিত ও ঘটিতব্য বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ফলকে। সুতরাং হে আমার নবী! আপনি অংশীবাদীদের কথাবার্তা, আচার ব্যবহার, চাল-চলন ও বিতর্ক-বিতণ্ডাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন না। আল্লাহ্পাক তাদের সকল কিছুই জানেন। আর সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর অসীম ও অতুলনীয় জ্ঞানে। আর জানিত বিষয়সমূহ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর জন্য কদাচ কঠিন নয়। সকল জ্ঞাতব্যই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব।

পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর, যার ইবাদতের সমর্থনে তিনি কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।' এখানে 'সুলতান' অর্থ ইবাদতের বৈধতার প্রমাণ। 'ইলমুন' অর্থ প্রত্যাদেশিত, বুদ্ধিগত, সত্য সংবাদবাহকগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত, অথবা পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ সুবিদিত কোনো জ্ঞান। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসনা করে প্রতিমার। অথচ তাদের এমতো উপাসনার পক্ষে প্রত্যাদেশগত প্রমাণ অথবা সত্যসংবাদদাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত, বুদ্ধিগত কিংবা সুবিদিত সূত্রগত কোনো জ্ঞানই তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদী অবশ্যই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীদের এমন সাহায্যকারী থাকে না, যা আল্লাহ্র আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে।' এখানে 'আয়াতুনা' অর্থ কোরআনের আয়াত। 'বায়্যিনাতিন' অর্থ সুস্পষ্ট, আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত বিশুদ্ধ বিশ্বাসসম্বলিত। 'আল মুনকারা' অর্থ প্রত্যাখ্যানজনিত অসন্তোষ। 'উজুহুণ' অর্থ মুখমণ্ডল। এখানে 'উজুহিহিম' বললেই যথেষ্ট হতো। তা না করে আরো অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'উজুহিল্ লাজীনা

কাফারূ'। এভাবে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে, তাদের অস্বীকৃতিজ্ঞাপন চরম ও অনড় সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর 'মুনকারা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদের ওই সকল দুর্বিনীত আচরণকে, যা তারা বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চায়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি দেখবেন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখে আমার নিকট থেকে প্রেরিত কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হবে, তখন তাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হবে অনড় অসন্তোষের চিহ্ন, যা তাদের প্রত্যাখ্যানপ্রবণতারই এক নির্লজ্জ প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কেউ তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে, তার প্রতি তারা মারমুখো হয়ে ওঠে।' এখানে 'ইয়াসতুনা' অর্থ হয়ে ওঠে আক্রমণোদ্যত, মারমুখো। অশ্ব যখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে, অবাধ্যতা অথবা তেজিভাব দেখিয়ে, অথবা, কোনো মাদী অশ্বের প্রতি কামোদ্দীপ্ত হয়ে হাঁটু মুড়ে সামনের পা দু'টো উত্তোলন করে, তখন তার ওই অবস্থাকে বলে 'সাতুল ফারাসু' (বাবে নাসারা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাত্ব আ'লাইহি' এবং 'সাত্ব বিহী' শব্দ দু'টো সমার্থক। 'সাত্বউন' এবং 'সাত্বওয়াতুন' হচ্ছে, ধাতুমূল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণের কেউ যদি তাদের সম্মুখে আমার বাণী আবৃত্তি করে, তবে তারা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত অশ্বের মতো মারমুখো।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলো, তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দিবো'? — এটা হচ্ছে আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এবং এটা কতো নিকৃষ্ট আবাসস্থল'। এখানে 'বিশাররিন' অর্থ মন্দ, নিকৃষ্ট। আর 'মিনজালিকুম' অর্থ এগুলির চেয়ে। অর্থাৎ এই কোরআনের চেয়ে, অথবা তোমাদের অসন্তোষ ও উষ্মার চেয়ে, অথবা বিশ্বাসীগণের প্রতি তোমাদের মারমুখো হওয়ার চেয়ে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, ক্ষান্ত হও। তোমরা কি চাও, কোরআনের বাণীবৈভবের চেয়ে, যার আবৃত্তি শুনে তোমরা উষ্মা প্রকাশ করো, মারমুখো হয়ে ওঠো, অতুষ্ট হও— সে সকল কিছুর চেয়ে নিকৃষ্ট কোনোকিছুর সংবাদ আমি তোমাদেরকে দিবো? তবে শোনো, ওই নিকৃষ্ট সংবাদ হচ্ছে জাহান্নাম, যার লেলিহান আগুন থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হায়, ওই অগ্নিআবাস কতোই না মন্দ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

❐ হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্রিত হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু লইয়া চলিয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অক্ষম যাঞ্ছাকারী ও যাহার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তাহা।

❐ উহারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো।' এখানে 'মাছালুন' অর্থ একটি উপমা বা একটি আশ্চর্য উদাহরণ। 'ফাস্তামিউ'লাহু' অর্থ শ্রবণ করো মনোযোগের সঙ্গে, নিবিষ্ট চিত্তে অথবা চিন্তা ভাবনার সঙ্গে ।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে, আমার এই উপমায় একথা স্পষ্ট হবে , সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ আসলে কোনোকিছুই নয়। এভাবে প্রকৃত সত্য প্রমাণিত হবার পরেও কি কাফেরেরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা অংশী নির্ধারণের উপরে অনড় রইবে? এরকম বক্তব্যভঙ্গির পর শুরু হয়েছে অনবদ্য উপমাটি।

বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তাদের নিকট থেকে, এটাও তারা তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে যাদের নিকট প্রার্থী হও, সেই সকল প্রতিমা এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে একটি মাছি সৃষ্টি করতেও তো পারবে না,

আবার কোনো মাছি যদি তাদের সামনে থেকে কোনোকিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তা ওই মাছিটির কাছ থেকে তারা উদ্ধারও তো করতে পারবে না। তাহলে বোঝো, কতো অথর্ব, অক্ষম, অচল ও অপাংক্তেয় তোমাদের উপাস্য।

এখানে 'জুবাবা' শব্দটির স্বল্প বহুবচন বোধক হচ্ছে 'আজিব্‌বাতুন'। আর অধিক বহুবচন বোধক 'জুববান'। যেমন 'গরাবুন' এরও বহুবচন যথাক্রমে 'আস্‌রিবাতুন' এবং 'গুরবানুন'। 'জুবুবুন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'জাব্‌বুন' থেকে। এর অর্থ বিতাড়ন। মাছি দেখলেই সকলে তাকে তাড়া করে। তাই মাছিকে বলা হয় 'জুবাব'।

'ওয়ালাবিজ্‌তামিউ লাহু' অর্থ— এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। অর্থাৎ প্রতিমাগুলো সম্মিলিতভাবেও একটি মক্ষিকা সৃজনে সক্ষম নয়। উল্লেখ্য, এর আগে একক উদ্যোগের অসামর্থ্যের কথা তো বলা হয়েছেই।

মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপরে জাফরানের প্রলেপ দিতো। আর সেগুলোর সামনে রেখে দিতো নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য। সেগুলোর উপরে বসতো মাছি। কোনো কোনো মাছি আবার খাদ্যকণা নিয়ে চলেও যেতো সেখান থেকে। কিন্তু মূর্তিগুলো ছিলো মাছি বিতাড়ন অথবা তাদের নিয়ে যাওয়া খাদ্যকণা উদ্ধারে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। আল্লাহ্‌পাক এভাবে তাদের উপাস্যগুলোর পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করে দিয়ে ঘটিয়েছেন মূর্তিপূজকদের চরম মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ১. যিনি সকল কিছুর সৃজয়িতা, সেই পবিত্রতম ও চিরঅপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্‌র সঙ্গে পৌত্তলিকেরা এমন অংশীকে মেনে নেয়, যে মক্ষিকার মতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ সৃষ্টিকেও সৃজন করতে সমর্থ নয়। না এককভাবে, না সমষ্টিগতভাবে। ২. সেগুলো এতোই অক্ষম ও দুর্বল যে, তাদের সামনে থেকে মক্ষিকাও যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তা উদ্ধার করারও শক্তি সে রাখে না। বিতাড়িতও করতে পারে না মক্ষিকাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'দুর্বল যাচ্‌ঞাকারী ও যার নিকট থেকে যাচ্‌ঞা করা হয় তা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' (যাচ্‌ঞাকারী, অন্বেষণকারী) অর্থ মক্ষিকা, যা অন্বেষণ করে প্রতিমাগুলোর সামনে রক্ষিত ভোগ বা আহার্যদ্রব্য। আর 'মাত্বলুব' (অন্বেষিত) অর্থ প্রতিমাসকল, যেগুলোর কাছে মক্ষিকারা খাদ্যান্বেষণে আসে। অর্থাৎ অন্বেষণকারী তো দুর্বলই, অন্বেষিত তো আরো দুর্বল, বরং নিরেট জড় পদার্থ। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন বিপরীতভাবে। বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' অর্থ মূর্তি আর 'মাত্বলুব' অর্থ মাছি। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। কারণ মূর্তি যেহেতু নিরেট জড়পদার্থ, তাই সেগুলোর অন্বেষণেচ্ছা ও প্রচেষ্টা তো থাকতেই পারে না। জুহাক বলেছেন, এখানে 'ত্বলিব' অর্থ মূর্তিপূজারী, আর 'মাত্বলুব' অর্থ মূর্তি।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না।' একথার অর্থ সমগ্র সৃষ্টির এক, একক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন একমাত্র প্রভুপালনকর্তা হিসেবে আল্লাহ্কে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা সমীচীন ছিলো, অংশীবাদীরা সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে না। পরিচয় লাভ করতে চেষ্টা করে না তাঁর আনুরূপ্যবিহীন সত্তা, গুণবত্তা ও কার্যকলাপের। তাইতো তারা নিরবচ্ছিন্নরূপে লালন করে চলে অপবিত্র ও অযথার্থ অংশীবাদিতার।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী'। এখানে 'ক্বিয়্যুন' অর্থ ক্ষমতাবান, সম্ভাব্য সৃষ্টির সৃজনায়ন যার ক্ষমতায়ত্ব। আর 'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, অজেয়, যার তুলনায় জড়-অজড় সকল কিছুই চিরঅবদমিত।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

❐ আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা।

❐ মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন, এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন ফেরেশতা, মানুষ উভয় শ্রেণী থেকে। ফেরেশতা বার্তাবাহকেরা আল্লাহ্র বার্তা পৌঁছে দেন মানুষ নবীগণের কাছে, কেউ আবার কবজ করেন প্রাণীকুলের রূহ, আবার কেউ পালন করেন সৃষ্টিকুলের রিজিক বণ্টনের দায়িত্ব।

বাগবী লিখেছেন, বার্তাবাহক ফেরেশতাবৃন্দ হচ্ছেন হজরত জিবরাইল, হজরত আজরাইল, হজরত মিকাইল ও হজরত ইস্রাফিল। আর বার্তাবাহক মানুষ হচ্ছেন পৃথিবীতে প্রেরিত নবী-রসুলগণ। তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদেশিত বিধানাবলী প্রচার করেন মানুষের মধ্যে। রসুলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন হজরত আদম আ. এবং সর্বশেষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

বাগবী আরো লিখেছেন, পৌত্তলিকেরা বলেছিলো, আমাদের মধ্যে এই সাধারণ লোকের উপরে কি কোরআন অবতীর্ণ করা হলো (অভিজাত ও বিত্তশালী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও)। তাদের একথার প্রতিবাদে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত, যার মর্মার্থ হচ্ছে— বার্তাবাহক মনোনয়নের অধিকার

রয়েছে কেবল আল্লাহ্র। আর তিনি তাঁর চিরমুক্ত অভিপ্রায়ানুসারে বার্তাবাহকরূপে নির্বাচন করেন কিছুসংখ্যক ফেরেশতা এবং কিছু সংখ্যক মানুষকে। এব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করবার অধিকার কারো নেই।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্পাক প্রকাশ করেছেন তাঁর সত্তাগত এককত্ব ও প্রভুপালকত্ব। আর এই আয়াতে প্রকাশ করেছেন তাঁর গুণগত এককত্বের ধারণা। এভাবে নবী-রসুলগণের স্বাধীন মনোনয়নের কথা বলে খণ্ডন করেছেন অংশীবাদীদের অসার যুক্তি। অজ্ঞ ও অপবিত্র তারা। তাই বলতে সাহস পায় 'আমরা মূর্তি ও ফেরেশতাদের পূজা করি এজন্য যে, ওগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন করে তুলবে। আরো বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা।' কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। আল্লাহ্র মনোনীত নবী-রসুলগণই হচ্ছেন তাঁর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। তাই বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে ইবাদত সম্পাদন করতে হবে কেবল তাঁদের অনুসরণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা'। একথার অর্থ শ্রুতির উপযোগী ও দর্শনের যোগ্য সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ব ও ক্ষমতাভূত। সকল কিছুর উপরে রয়েছে তাঁর নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন'। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ যতকিছু আমল পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে রেখে এসেছে, তার সকলকিছুই আল্লাহ্ জানেন। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ— মানুষ উত্তম অনুত্তম যা কিছু করেছে ও করবে, তার সকল কিছুই আল্লাহ্ অবহিত। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'হুম' (তা) সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে নবী-রসুলগণের সঙ্গে। অর্থাৎ নবী-রসুলগণের জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তীর সকল কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে'। একথার অর্থ— সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্রই নিকটে। প্রত্যাবর্তনের পর তিনিই সকলের কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ করবেন। ভালো, মন্দ সব কিছুর। তাঁর কর্মকাণ্ডের উপরে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার ও ক্ষমতা কারোরই নেই।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৭

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

❑হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদিগের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

এখানে 'রুকু করো' এবং 'সেজদা করো' কথা দু'টোর সম্মিলিত অর্থ— নামাজ পাঠ করো। রুকু ও সেজদা হচ্ছে নামাজের অপরিহরণীয় স্তম্ভ। ক্বিয়াম (দণ্ডায়মানতা) ও ক্বেরাত (কোরআন পাঠ) নামাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বটে, কিন্তু এ দু'টো রুকু ও সেজদা তুল্য গুরুত্ব রাখে না। তাই দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মানতা পরিহরণীয়, আবার মুক ব্যক্তির জন্য ক্বেরাতও পরিত্যাজ্য হয়। কিন্তু রুকু ও সেজদা কোনো অবস্থায় কারো জন্যই পরিহারের অনুমতি নেই। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, যে ব্যক্তি মাথার সাহায্যে রুকু ও সেজদা করতে পারে না, সে যেনো তার নামাজকে বিলম্বিত করে। যখন সামর্থ্য ফিরে পাবে, তখন সে নামাজ পাঠ করবে। কেবল অন্তরের নিয়ত অথবা ভ্রূ'র ইশারায় নামাজ হয় না।

'তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো' অর্থ ইবাদত সম্পন্ন করো আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে। আর 'সৎকর্ম করো' কথাটিকে হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখো এবং শুভ চরিত্রের অধিকারী হও। অবশ্য প্রকাশ্যতঃ সকল শুভকর্মই সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যেতে পারে, এখানে 'সৎকর্ম করো' বলে নির্দেশ করা হয়েছে সকল প্রকার শুভকর্ম সম্পাদন করতে।

রসুল স. জানিয়েছেন, বনী ইসরাইলের জনৈক নবীকে আল্লাহ্‌পাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তোমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো কেউ তাদের পুণ্যকর্মের উপরে নির্ভরশীল না হয়। আমি মহাবিচারের দিবসে সকলকে একত্র করবো। তখন যাকে চাইব, শাস্তি দিবো (হিসাব গ্রহণ করবো কঠোরতার সঙ্গে, যার উপকার চাইবো না, সে অবশ্যই হবে আযাবগ্রস্ত)। আর তোমার পাপী উম্মতদেরকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে না দেয় (এরকম যেনো না মনে করে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারা যেনো নিরাশ না হয়)। আমি ইচ্ছা করলে চরম পাপীকেও ক্ষমা করে দিবো, কারোরই পরওয়া করবো না। হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম।

হজরত আনাস থেকে বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য উপস্থিত করা হবে তিন প্রকার হিসাবের দপ্তর— একটি পুণ্যের, একটি পাপের এবং একটি নেয়ামতের। এরপর আল্লাহ্ তাঁর সবচেয়ে ক্ষুদ্র

নেয়ামতকে লক্ষ্য করে বলবেন, এই ব্যক্তির পুণ্যের দপ্তর থেকে তোমার সমতুল্য পুণ্যকর্ম বের করে আনো। ওই ক্ষুদ্র নেয়ামত তখন তার সকল পুণ্য বের করে আনবে। তবুও পুণ্যসমূহ তার সমতুল্য হবে না। নেয়ামত তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আপনার সম্মানের শপথ! আমি আমার সমতুল্য হিসেবে এ লোকের সকল পুণ্য নিয়ে নিয়েছি। এখন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল তার পাপরাশি। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ যদি তাঁর ওই বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে চান, তবে বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার পুণ্যগুলোকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিলাম, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম তোমার পাপরাশি থেকে এবং তোমাকে দান করলাম আমার নেয়ামত।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সওরী এবং আরো কতিপয় আলেম বলেন, এখানে সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। এখানে 'সেজদা' অর্থ নামাজের সেজদা। কেননা সেজদার সঙ্গে সঙ্গে রুকুর কথাও বলা হয়েছে। এ ধরনের অন্যান্য আয়াত দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, এ ধরনের 'সেজদা'র অর্থ নামাজ। যেমন— 'ওয়াস্জুদি ওয়ারকায়ী মাআ'র রকিয়ী'ন'। এখানেও 'সেজদা' অর্থ নামাজ। কেননা এখানেও সেজদার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে 'রুকু'র কথা। কিন্তু ইমাম ইবনে মোবারক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, আলোচ্য আয়াত পাঠের পর তেলাওয়াতের সেজদা অবশ্যই করতে হবে। কারণ হজরত উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সুরা হজের মধ্যে কি দু'টি সেজদা রয়েছে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। যে দু'টি সেজদা করবে না, সে যেনো ওই আয়াত তেলাওয়াত না করে। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি। হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, বায়হাকী ও হাকেম। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরা শিথিল। কারণ এর অন্তর্ভুক্ত ইবনে লেহিয়া বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহ শক্তিশালী নয়।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইবনে ওহাব বলেন, ইবনে লেহিয়া অসৎ ব্যক্তি নন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। হাকেম লিখেছেন, তিনি তো ছিলেন ইমাম, কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিবিপর্যয় ঘটে। আর তিনিই যেহেতু হাদিসটির একক বর্ণনাকারী, তাই হাদিসটিকে বলা হয় শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

আবু দাউদ তাঁর 'আল মারাসিল' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে লেহিয়া রসুল স. এর বাণীরূপে বর্ণনা করেছেন, সুরা হজ পেয়েছে দু'টি সেজদা সংযুক্ত হওয়ার ফযীলত। কিন্তু তাঁর এই বর্ণনাকে যথাসূত্রসম্বলিত বলা যায় না।

হজরত আমর ইবনে আস বলেছেন, রসুল স. আমাকে পাঠ করিয়েছেন কোরআনের ১৫টি তেলাওয়াতের সেজদাবিশিষ্ট আয়াত। তন্মধ্যে তিনটি সেজদা

রয়েছে সুরা মুফাস্সালাতে এবং দু'টি সুরা হজে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী, হাকেম, আলমনজুরী, আননববী। শায়েখ আবদুল হক এবং ইবনে কাত্তান বলেছেন বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। কারণ এই সূত্রপ্রবাহে রয়েছে ইবনে মুনাইন কালালী নামক একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী। তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবার আর একজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে সাঈদ সাকাফী মিসরী।

হজরত উকবা ইবনে আমেরের ইতোপূর্বের বর্ণনাটির পোষকতায় হাকেম বলেছেন, হজরত ওমর, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু মুসা এবং হজরত আম্মারের পরিণত শ্রেণীর একটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বর্ণনাতেও এর সমর্থন রয়েছে। আর এর প্রত্যয়নার্থে বায়হাকী তাঁর আলমা'রেফা পুস্তকেও খালেদ ইবনে মা'দানের একটি অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে ওমরের অভিমতও এরকম।

আমি বলি, এখানে পরিণত শ্রেণীও সুপরিণত শ্রেণীর সমতুল। কেননা কোনো আয়াতে সেজদায়ে তেলাওয়াত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের বর্ণনাই যথেষ্ট। কারণ তাঁরা নিশ্চয়ই রসুল স. এর নিকট থেকে না শুনে বর্ণনা করেননি। সেজদায়ে তেলাওয়াত সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিয়েছি সুরা ইনশিক্বাক্বের তাফসীরে।

সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৮

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَاجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

❐ এবং সংগ্রাম কর আল্লাহের পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের দ্বীনে; এই দ্বীন তোমাদিগের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও করিয়াছেন; যাহাতে রসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং

তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা স্যলাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

'জুহ্‌দ' অর্থ সামর্থ্য, শক্তিমত্তা। 'জাহাদ' অর্থ কষ্ট। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'জাহাদ' অর্থ প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'জুহ্‌দ' ও 'জাহাদ' দু'টো শব্দের অর্থই সামর্থ্য শক্তিমত্তা, কষ্ট। আর প্রাণপণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কেবল 'জাহাদ'। আর 'জিহাদ' ও 'মুজাহিদাহ্‌' মুফাইলাত প্রক্রিয়ায় পরিগঠিত হয়েছে 'জাহাদা' থেকে। এর অর্থ পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয় দিক থেকে প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও কষ্টস্বীকার। যুদ্ধক্ষেত্রে এরকমই পরিদৃষ্ট হয়। উভয় দিক থেকে সম্পদ ও শক্তিমত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটে তখন। মৌখিক ও সামরিক সকল যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

'ফীল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে মর্যাদায়িত ও সমুচ্চ করার অভিপ্রায়ে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফীল্লাহ্‌' অর্থ 'ওয়াজহিল্লাহ্‌'(কেবল আল্লাহ্‌র জন্য)। 'হাক্‌ক্বা জিহাদিহী' শব্দের বাক্যবিশ্লেষণ বিপরীতার্থক। অর্থাৎ কথাটির অর্থ— এমন জেহাদ করো, যা হবে কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে। এভাবে দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য জেহাদের সঙ্গে সম্পৃক্তি ঘটানো হয়েছে 'হাক্ব' শব্দটির। যেমন বলা হয় 'হুয়া হাক্‌কুন আ'লীম'। তাই কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— কেবল আল্লাহ্‌র জন্য জেহাদ করো। হজরত ইবনে আব্বাস তাই 'হাক্কা জিহাদিহী' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— নিজের সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা ব্যয় করো আল্লাহ্‌র পথে এবং ধর্মের ব্যাপারে মন্দ ব্যক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় পেয়ো না। মুকাতিল ও জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র জন্য এমন কাজ করো যেমন করা সমীচীন এবং এমনভাবে তাঁর ইবাদত করো, যেমন করা উচিত।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, হক্ব জেহাদ হচ্ছে খালেস নিয়তে আল্লাহ্‌র জন্য জেহাদ। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ— ইবাদত করো কেবল তাঁর, অবাধ্যচারী হয়ো না। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক বলেছেন, কুপ্রবৃত্তি ও লোভের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নাম জেহাদে আকবর বা হক্ব জেহাদ।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন, আমরা এবার ক্ষুদ্র জেহাদ থেকে বৃহৎ জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বায়হাকী তাঁর 'আজ্‌জুহ্‌দ' পুস্তকে হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন কতিপয় যুদ্ধবিজয়ী। তিনি স. তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তোমরা এবার

জেহাদে আসগর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে জেহাদে আকবরের দিকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! জেহাদে আকবর কী? তিনি স. বললেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বায়হাকী বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বলতাদুষ্ট।

আমি বলি, এখানে 'এবং সংগ্রাম করো আল্লাহ্‌র পথে যে ভাবে সংগ্রাম করা উচিত' কথাটির অর্থ কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ নয়। কারণ সশস্ত্র যুদ্ধের স্পষ্ট উল্লেখ এখানে নেই। বরং আলোচ্য বাক্য হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা যার শুরুতে বলা হয়েছে বিশেষভাবে নামাজের কথা, তারপর দোয়া ইবাদতের নির্দেশ, নামাজও যার অন্তর্ভুক্ত। এরপর বলা হয়েছে 'সৎকর্ম করো'। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র হক, বান্দার হক, নামাজ-রোজা, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উত্তম চরিত্র গঠন ইত্যাদি। সকল সুন্নত ও মোস্তাহাব আমলও এর অন্তর্ভুক্ত। সবশেষে এসেছে জেহাদের নির্দেশ। সুতরাং এখানে জেহাদকে কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এই জেহাদের অর্থ হবে— বিশুদ্ধতা অর্জন করো বিশ্বাসে, কথায় ও কর্মে। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই কেবল এমতো বিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভব। প্রবৃত্তির বিলোপন ছাড়া বিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভবই নয়। আর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে প্রয়োজন নবুয়তের দীপালোক। ওই আলোকাভিসারকেই বলা হয় জজবা ও সুলুক। প্রাচীন কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ এটাকেই বলেছেন এখলাস বা বিশুদ্ধায়ন। সুফী সাধকগণ এভাবে যখন তাঁদের প্রবৃত্তি বিলোপনে সমর্থ হন, তখন তাঁরা হন বিশুদ্ধাচারী বা মুখলিস। এই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গ কারো নিন্দামন্দের পরওয়া করেন না। সুনাম ও প্রসিদ্ধির আকাংখা ছাড়াই তাঁরা সম্পাদন করেন আল্লাহ্‌র ইবাদত। সকল অবস্থায় তাঁরা হন আনুগত্যশোভিত ও অবাধ্যাচরণমুক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে এটারই নাম জেহাদে আকবর। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে এই মহান জেহাদের একটি প্রকাশ্য প্রকাশ। জ্ঞাতব্য, কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ কামনায় যদি জেহাদ সম্পন্ন না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই পরিণত হবে নিষ্ফলতায়। রসুল স. অবহিত করেছেন, কর্মফল নিয়তনির্ভর। অর্জন হয় নিয়তানুযায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের জন্য দেশত্যাগ করবে তার হিজরত হবে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের জন্য। আর যে কোনো রমণীর পানি গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো পার্থিব প্রাপ্তির জন্য দেশত্যাগ করবে, তার হিজরত হবে তারই উদ্দেশ্যানুযায়ী। হজরত ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি সকল প্রকার অংশীদারের অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। কেউ পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সময় অন্য কাউকে আমার অংশীদার করলে আমি অতুষ্ট হই, তখন তার ওই কর্ম হয়ে যায় তার জন্য, যাকে সে করেছিলো আমার অংশীদার। মুসলিম।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্র রসুল স. বলেছেন, তোমরা এবার ছোটো জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে। তাঁর একথায় প্রতীয়মান হয় যে, নফসের বিরুদ্ধে জেহাদই হচ্ছে বড় জেহাদ। আর কেবল কামেল পীরের সংসর্গ গ্রহণের পরেই মুরিদ এ জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারে। যুদ্ধ শেষে রসুল স. এর সংসর্গে সাহাবীগণও ওই বড় যুদ্ধের বরকত লাভ করতেন। তখন তাঁদের অন্তর্জগতে বিশেষভাবে বর্ষিত হতো রেসালতের নূরের ঝলক। তার ফলে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যেতো তাদের হৃদয় ও প্রবৃত্তি। সাহাবীগণ ছিলেন সতত সত্যানুসারী। তাই তাঁরা তখন বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমরা সত্যিই এবার প্রত্যাবর্তন করেছি বৃহৎ জেহাদের ময়দানে। উল্লেখ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে থাকলেও তখন তাঁদেরকে পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে লক্ষ্য রাখতে হতো শত্রুর প্রতি। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরেই কেবল তাঁরা রসুল স. এর প্রতি হতে পারতেন পূর্ণ মনোযোগী। নিবিষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারতেন প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানসম্ভার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেননি তোমাদের দ্বীনে।'

আমি বলি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন সমগ্র মানবমণ্ডলী থেকে। আমার সহচরবৃন্দকেও নির্বাচন করেছেন তিনিই। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ সহযোগী।

হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা' বলেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসমাইলের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে বনী কুরায়েশকে, বনী কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। মুসলিম।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমের বংশধরগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন বনী ইসমাইলকে এবং বনী ইসমাইল থেকে বনী কেনানাকে। আর ধর্মের বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের উপরে কঠোরতা আরোপ করেননি।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কোনো বিশ্বাসী পাপ করে বসলে আল্লাহ্ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন শাস্তি থেকে অব্যাহতির পথ— তওবার মাধ্যমে, জাগতিক বিপদাপদ আরোপ করে, অধিকার পরিপূরণ দ্বারা, অথবা

ক্ষতিপূরণ কার্যকর করিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ইসলামে এরকম অনড় কঠোরতা রাখেননি, যাতে করে পাপমোচনের কোনো উপায়ই থাকে না। পূর্ববর্তী উম্মতের বেলায় অবশ্য বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত কঠিন। কোনো কোনো পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হতো। সেগুলোর বেলায় তওবার কোনো সুযোগই তাদের ছিলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ ফরজ দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন— নামাজের সময়, রমজানের চাঁদ, ঈদের চাঁদ, হজের সময় ইত্যাদি।

মুকাতিল বলেছেন, 'কঠোরতা রাখেননি' অর্থ— কষ্টকর অবস্থায় আমল সহজ করে দিয়েছেন। যেমন— সফরের সময়ের কসর নামাজ, ওজুর স্থলাভিষিক্তরূপে তায়াম্মুম, অপারগতার ক্ষেত্রে উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় নামাজ পাঠের অনুমতি, জীবন সংকটাপন্ন হলে পরিমিত হারাম আহার্য ভক্ষণের অনুমতি ইত্যাদি। কালাবীও কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। রসুল স.ও নির্দেশ করেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোনো হুকুম করি, তখন তা সাধ্যমতো পালন কোরো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— বনী ইসরাইলের উপরে যে সকল কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছিলো, তোমাদের উপরে সেরকম কঠোরতা নেই।

আমি বলি, 'ধর্মের ব্যাপারে কঠোরতা রাখেননি' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্ মুসলমানের জন্য শরিয়তের হুকুম পালন কষ্টদায়ক করেননি। বরং হুকুম সমূহকে করেছেন প্রিয় বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

রসুল স. বলেছেন, নামাজ আমার চোখের শান্তি। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ'। একথার অর্থ— হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমার রসুল মোহাম্মদ তোমাদের নিকটে যে ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছেন সেই ধর্ম তোমাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের ধর্মমতের অনুরূপ। সুতরাং এই ধর্মের অনুসারী হও। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনাটি কুরায়েশদেরকে লক্ষ্য করে উপস্থাপন করা হলেও পরোক্ষভাবে এর লক্ষ্য সমগ্র মানবমণ্ডলী। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম যাদের পিতৃপুরুষ নন, তারাও আলোচ্য নির্দেশনার অন্তর্ভূত। রসুল স. বলেন, সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী। বিশ্বাসীরা অনুসারী বিশ্বাসী কুরায়েশদের এবং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী কুরায়েশদের। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ে কুরায়েশদের অনুসারী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনায় সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র আরববাসীকে। কেননা আরববাসীরা সকলেই হজরত ইবাহিমের বংশোদ্ভূত। ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিখ্যাত সাহাবী হজরত সালমান ফারসী, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব প্রমুখ ছিলেন অনারব। তাছাড়া পৃথিবীর সুবিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকেই সরাসরি হজরত ইব্রাহিমের বংশোদ্ভূত নয়। তাই অনেকে বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে। সেকারণেই বলতে হয়, হজরত ইব্রাহিম হচ্ছেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পিতা। আর তিনি ছিলেন রসুল স. এর পিতৃপুরুষ। আবার রসুল স. এই উম্মতের পিতা সদৃশ। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যে পবিত্র ও অক্ষয় জীবন লাভ হয়, তিনি স. সেই জীবনের জন্মদাতা। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ হচ্ছে সকল মুসলমানের মা। তাই এরশাদ হয়েছে— ওয়া আয্ওয়াজুহু উম্মাহাতুকুম'।

রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের জনয়িতা সদৃশ। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি— তোমরা শৌচাগারে গিয়ে কখনো কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ দিয়ে বোসো না। ডান হাত দিয়ে শৌচকর্মও কোরো না। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসী মনে করতো, তারা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী। তাই তাদের মনোভাব খণ্ডনার্থে আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন 'এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ'। অর্থাৎ হে মক্কাবাসী— এখন তোমাদের সম্মুখে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ যে ধর্মমত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেই ধর্মই কেবল তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ। এর বিপরীত ধর্মমতাবলম্বীরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী নয়। সুতরাং তোমরা সকলে সমর্পিতপ্রাণ হও আমার এই শেষ রসুলের ধর্মাদর্শে। অপর এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ইব্রাহিমের সবচেয়ে নিকটতম ওই ব্যক্তি, সে তাঁর অনুসারী, এই নবী ও তার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও করেছেন।' এখানে 'হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমীন' অর্থ তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। (বঙ্গানুবাদে 'তিনি' এর অর্থ করা হয়েছে 'আল্লাহ্')। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' (তিনি) অর্থ হজরত

ইব্রাহিম। অর্থাৎ নবী ইব্রাহিম তার যুগেই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। তিনি তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে তোমার মুসলিমীন (সমর্পিত) বানিয়ে দাও, আর অগণিত বংশধরকে করো 'মুসলমান উম্মত'। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন। সেকারণেই কোরআন মজীদে এই উম্মতকে বলা হয়েছে মুসলিম। কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— নবী ইব্রাহিম ইতোপূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম। সেকথাই আল্লাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন এই কোরআনে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটি পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত 'তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন' এর ব্যাখ্যা। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে তোমাদেরকে কঠিন তা বিমুক্ত ধর্মাদর্শ ইসলামের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণের কারণ এই যে, তোমরা আমা কর্তৃক মনোনীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।' একথার অর্থ— মানবজাতির মধ্যে যুগে যুগে ইসলাম প্রচার করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে নাম দেয়া হয়েছে মুসলিম, মহাবিচারের দিবসে একথার সাক্ষ্য দিবেন তোমাদের রসুল স্বয়ং আর তোমরাও তখন মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয়ে এ বার্তার স্বীকৃতি প্রদান করবে।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আমি আমার উম্মতকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবো একটি উঁচু পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা যাবে সমবেত জনতাকে। তারাও ইচ্ছা করবে আমাদের মতো পর্বতারোহণের। নবীগণের মধ্যে তখন এমন কেউই থাকবেন না, যাদেরকে তাদের উম্মত মিথ্যা প্রতিপন্ন না করবে। কেবল আমরা হবো তাঁদের সত্যতার সাক্ষী। বলবো, তাঁরা আল্লাহ্র বাণী যথাযথরূপে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইবনে মোবারক তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' পুস্তকে লিখেছেন, ইবনে সা'দ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছেন, স্বসূত্রে আবু হিলা বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আহ্বান করা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আমি তা যথাযথরূপে পৌঁছিয়েছি জিবরাইলের নিকট। এরপর হজরত জিবরাইলকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি? তিনিও বলবেন, আমিও আপনার বাণী যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর নবী রসুলগণকে ডেকে প্রশ্ন করবেন, জিবরাইল কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা ঠিকঠাক পৌঁছিয়েছিলো? তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন,

তোমরা কী করেছো? নবী-রসুলগণ বলবেন, আমরা আপনাপন উম্মতকে তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহ্ সকল উম্মতকে ডেকে যখন একথার স্বীকৃতি চাইবেন, তখন কিছু সংখ্যক লোক একথা স্বীকার করবে এবং কেউ কেউ বলে উঠবে, না, আমাদের নিকট কোনো কিছু পৌঁছানো হয়নি। নবী-রসুলগণ বলবেন, আমাদের পক্ষে সত্য সাক্ষ্যদাতারা এখানে উপস্থিত। আল্লাহ্ বলবেন, কে? তাঁরা বলবেন, উম্মতে মোহাম্মদী। তখন উম্মতে মোহাম্মদীকে ডেকে বলা হবে, সাক্ষ্য পেশ করো। তাঁরা বলবেন, আমরা এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নবী-রসুলগণের কথা সত্য। একথা শুনে অন্যান্য উম্মতের অবাধ্যরা বলবে, এরা তো পৃথিবীতে এসেছে অনেক পরে। আমাদের যুগের কথা এরা কীভাবে জানলো? উম্মতে মোহাম্মদী বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলে একজন মহা সম্মানিত রসুল। তাঁর উপরে অবতীর্ণ করেছিলে কোরআন। ওই মহাগ্রন্থে আমরা পাঠ করেছি, নবী-রসুলগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকট আপনার বার্তা যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। —আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এটাই। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া কাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াসাত্বাল্ লিতাকুনূ শুহাদাআ আ'লান্নাসি ওয়া ইয়াকুনার রসুলু আ'লাইকুম শাহীদা।' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী প্রমুখ যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমি তা উল্লেখ করেছি সুরা বাকারার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন করো।' একথার অর্থ— সুতরাং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। হাসান বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্কে অবলম্বন করো' অর্থ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেনো সকল প্রকার অপ্রিয় বিষয় হতে তোমাদেরকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— স্বীয় প্রভুপালনকর্তা সকাশে এই মর্মে প্রার্থনা করো, যেনো তিনি তোমাদেরকে সত্য ধর্মের উপরে দৃঢ়পদ রাখেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্কে অবলম্বন করো' অর্থ— কোরআন ও সুন্নাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। রসুল স. উপদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টো বিষয় রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টোকে দৃঢ়তার সঙ্গে

আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো বিষয় হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুলের আদর্শ। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

হজরত আসীফ ইবনে হারেছ ইয়ামানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করেননি যাদের একটি নব আবিষ্কৃত আমল একটি সুন্নতকে বিলুপ্ত না করেছে, সুতরাং সুন্নতের উপরে অটল থাকা বেদাত প্রবর্তন করা অপেক্ষা উত্তম। আহমদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি।' একথার অর্থ— তিনিই তোমাদের উত্তম হেফাজতকারী, তিনিই তোমাদের কর্মসমূহের স্রষ্টা ও রক্ষক।

এখানে 'ফানি'মা' (কতোনা উত্তম) কথাটির 'ফা' (কতো) অব্যয়টি কারণ প্রদর্শক। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হয়ে যাবেন সর্বোত্তম রক্ষক ও সাহায্যকারী। কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজয়িতা ও সাহায্যদাতা। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। প্রকৃত কথা হচ্ছে— সৃজয়িতা ও সাহায্যদাতা তিনি ব্যতীত অন্য কেউই নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম। আদি-অন্তের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রশস্তি আল্লাহ্‌র, কেবলই আল্লাহ্‌র। সুরা হজের তাফসীর শেষ হলো আজ ৮ই জিলহজ, ১২০৩ হিজরী সনে। আলহামদু লিল্লাহ্।

সূরা মু'মিনূন

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। সুরা আম্বিয়ার পরে অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ১১৮টি আয়াত— একথা বলেছেন কুফার আলেমগণ। আর বসরার ক্বারীগণের মতে এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১১৯।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বলে আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. নামাজ পাঠকালে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১, ২

❐ অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে বিশ্বাসীরা,
❐ যাহারা বিনয়-নম্র নিজদিগের সালাতে,

আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর দৃষ্টি নিম্নগামী করেন। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আকাশের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সহচরবৃন্দ নামাজরত অবস্থায় আকাশের প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা নেত্রনিবদ্ধ করতে থাকেন সেজদার স্থানে।

ইবনে সিরীন থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ নামাজ সম্পাদনকালে আসমানের প্রতি নজর করতেন। তাঁদের এমতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

'ক্বদ আফলাহাল মু'মিনূন' অর্থ বিশ্বাসীরা সফলকাম হয়েছে। 'ক্বদ্' শব্দটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক বিষয়ে। যেমন 'লাম্মা' ব্যবহৃত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃঢ়তার নেতিবাচকতার বিষয়ে। 'ক্বদ' (অবশ্যই) অতীতকালবাচক হলে বক্তব্যে ফুটে ওঠে নিকট বর্তমানে অবশ্য ঘটিতব্য বিষয়। যেমন— 'ক্বদ্ ক্বমা' (সে এখনই দণ্ডায়মান হলো) 'ক্বদ্ আকালা' (এখনই সে আহার সম্পন্ন করলো)। আলোচ্য আয়াতেও 'ক্বদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে— তাদের সফলতা সুনিশ্চিত।

'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, 'ফালাহ্' অর্থ সাফল্য, ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তি, কল্যাণকর্মসম্পৃক্ততা। 'সাফল্য' অর্থ এখানে দুনিয়ার অথবা আখেরাতের কল্যাণ। অবশ্য এখানে আখেরাতের কল্যাণই উদ্দেশ্য। আখেরাতের কল্যাণসমূহ হচ্ছে— কবরের আযাব থেকে মুক্তি, কাঠিন্যবিমুক্ত হিসাব, কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ, অতি সহজে পুলসিরাত অতিক্রম, দোজখের আগুন থেকে অব্যাহতি, জান্নাত লাভ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তোষ ও দর্শনলাভ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এরকম পূর্ণ সফলতা পাপী বিশ্বাসীগণের ভাগ্যে জুটবে না। তবে তাঁরা বিশ্বাসী বলে বিভিন্ন উপায়ে পাপস্খলনের পর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই জান্নাত লাভ করবেন। আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন— 'বিন্দুবৎ পুণ্যও নজরে পড়বে পুণ্যবানদের, আর পাপীদের দৃষ্টিতেও পড়বে তাদের বিন্দু সমতুল পাপ।' কিন্তু ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সর্বসাফল্যের মূল। তাই তাদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র এককত্বের সাক্ষ্যপ্রদানকারী সৌভাগ্যশালী হবে এবং প্রবেশ করবে জান্নাতে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে সুপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ জান্নাতে আদন সৃষ্টি করলেন। ওই জান্নাতে সৃষ্টি করলেন বিপুল ফলভারে ভারানত বৃক্ষরাজি। তারপর সেখানে প্রবাহিত করে দিলেন সলিলিত নদী। তারপর জান্নাতে আদনকে বললেন, কথা বলো। জান্নাত বললো, 'ক্বদ্ আফলাহাল মু'মিনূন'। আল্লাহ্ বললেন, আমার গৌরব ও সম্মানের শপথ, কোনো কৃপণ তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না। তিবরানী।

আমি বলি, আলোচ্য হাদিসে কৃপণ বলে বুঝানো হয়েছে কাফেরকুলকে। তওহীদের স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য প্রদর্শন করে তারাই। ভিন্ন সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতে আদন সৃষ্টির পর তাতে স্থাপন করলেন এমন নেয়ামতসম্ভার, যা কোনো কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি, কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি এবং যা উপলব্ধিও করেনি কোনো হৃদয়। এরপর আল্লাহ্ তাকে বললেন, এবার কথা বলো। জান্নাতে আদন বললো, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার, তিবরানী এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। আরো এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব থেকে বায়হাকী ও মুজাহিদ এবং হজরত আনাস থেকে হাকেম। ইবনে আবিদ দুন্ইয়া তাঁর 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতুল আদনের ইমারতসমূহ সৃজন করেছেন শ্বেতশুভ্র মোতি, লোহিতাভ ইয়াকুত এবং সবুজাভ জবরজাদের ইষ্টক দ্বারা। সেগুলোর দরজা ও ঘর মেশকের, উদ্যানের তৃণরাজি জাফরানের, প্রান্তরস্থিত প্রস্তর মোতির এবং মৃত্তিকা অম্বরের। এভাবে সৃজন সমাপনের পর আল্লাহ্ তাকে বললেন, আওয়াজ দাও। জান্নাতুল আদন আওয়াজ দিলো 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছে বিশ্বাসীরা'। আল্লাহ্ বললেন, আমার মহামর্যাদার শপথ! তোমার অভ্যন্তরে কোনো কৃপণ প্রবেশ করবে না।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করা। যদিও তা হয় পাপের শাস্তি ভোগের পরে। সুতরাং পুণ্যবান-পাপী সকল বিশ্বাসীরাই এর অন্তর্ভূত। কেননা সফলতাই এঁদের সকলের অবশেষ পরিণতি। অনেক হাদিসে একথার প্রমাণ রয়েছে। ইমানদারেরা হতে পারেন দু'শ্রেণীর— পুণ্যবান ও পাপী। কিন্তু এখানে 'পুণ্যবান বিশ্বাসীগণ' বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীগণ। সুতরাং বিশেষভাবে পুণ্যবান বিশ্বাসীরা সফলকাম হবেন— একথা বলা গেলেও একথা বলা যাবে না যে, পাপী বিশ্বাসীরা সাধারণভাবেও সফলকাম হবেন না। আমি বিবেকবিরোধী বক্তব্যের প্রবক্তা নই। ফেকাহ্ শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে— কোনো আলোচনায় সুনির্দিষ্ট শর্ত বা গুণের উল্লেখ থাকলে অবশ্যই ওই শর্ত বা গুণের আলোকে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু যেখানে এরকম

শর্ত বা গুণের উল্লেখ নেই, সেখানে বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে সাধারণভাবে। এখানেও তেমনি 'বিশ্বাসীগণ' কথাটির অর্থ হবে পুণ্যবান, পাপী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীগণ। অর্থাৎ এখানে সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সকল বিশ্বাসীকে, বিশেষভাবে কেবল পুণ্যবান বিশ্বাসীগণকে নয়। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, গোনাহ্গার মুমিনেরা তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে অথবা পাপের শাস্তি প্রদানের পর অবশেষে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে'। এখানে 'আল খশিউ'ন ' অর্থ বিনয়ী, আল্লাহ্ সকাশে বিনয়-নম্র হওয়া। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ— নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবা, বিনীত হওয়া। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ— নিম্নগামী দৃষ্টির অধিকারী, মৃদুভাষী। হজরত আলী বলেছেন, নামাজ পাঠকালে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করার নাম খুশু বা নম্রতা। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ডানে বামে কে আছে, তা অবহিত না হওয়ার নাম খুশু।

আমর ইবনে দিনার বলেছেন, খুশু অর্থ সুস্থির পুণ্যবান। আলেমগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, খুশু অর্থ— সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আতা বলেছেন, নামাজের সময় শরীরের কোনো অংশ নিয়ে কৌতুক না করা, অপ্রয়োজনে না চুলকানো ইত্যাদি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একাগ্রচিত্ততার নাম খুশু। অর্থাৎ নামাজে মনোনিবদ্ধ রাখা, উচ্চার্য দোয়া কালামে গভীরভাবে অভিনিবেশী হওয়া, স্থানচ্যুত না হওয়া, এদিকে ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন না করা, পার্থিব কোনো কিছুতে আকৃষ্ট না হওয়া, আঙুল না মটকানো ইত্যাদি।

হজরত আবু দারদা বলেছেন, খুশু উদ্দেশ্য— বিশুদ্ধ উচ্চারণ, আল্লাহ্ সকাশে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হওয়া, পূর্ণ বিশ্বাস, পরিপূর্ণ ধ্যানমগ্নতা ও একাগ্রতা।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'খুশু'র অর্থ 'খুজু' (নম্রতা), অথবা বিনয়। কিংবা কথাটি সম্পর্কিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'খুজু' অর্থ নিবিষ্টচিত্ততা, স্থিরতা, একাগ্রতা— যার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। আর 'খুজ্জ'র অর্থ প্রকাশ্য কোমলতা ও বিনম্রতা — যার সম্পর্ক নির্ভর করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সে নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক দৃষ্টি না ফেরায়। সে এদিক ওদিক তাকালে, আল্লাহ্ও তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি স. বলেছেন, এটা এক রকমের বিপর্যয়, এর মাধ্যমে শয়তান মানুষের নামাজ বিনষ্ট করে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালনের বিপদ সম্পর্কে বলেছেন, এরকম আচরণ পুণ্যকামীদের জন্য অবশ্য পরিহরণীয়। নতুবা তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করা হবে। বাগবী। মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, নামাজের দোয়াকালাম পাঠের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি করার অপঅভ্যাস অবশ্য পরিত্যাজ্য। অন্যথায় তার দৃষ্টি হরণ করা হবে।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, লোকদের উচিত, তারা যেনো আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকে। এরকম যেনো না হয় যে, চিরতরে তার দৃষ্টি হারায়। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজা।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. এক লোককে নামাজের মধ্যে তার দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, তার মধ্যে খুশু থাকলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতো। হাকেম ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন শিথিল সূত্রে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. বললেন, আমি কপটতামিশ্রিত বিনয় থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণার্থী। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কপটতামিশ্রিত বিনয় কী? তিনি স. বললেন, বাহ্যিক বিনয় ও আন্তরিক অবিনয়।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরের নামাজের দণ্ডায়মানতা ছিলো স্থির কাষ্ঠখণ্ডের মতো। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ।

হজরত আসমা বিনতে হজরত আবু বকর বর্ণনা করেন, আমার মাতা উম্মে রুম্মান বলেছেন, হজরত আবু বকর একবার আমাকে নামাজে এদিক ওদিক ঢলে যেতে দেখে এমন ধমক দিলেন যে, আমার নামাজ ভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হলো। নামাজ শেষ হলে তিনি বললেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, কেউ নামাজে দণ্ডায়মান হলে সে যেনো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থির রাখে। ইহুদীদের মতো যেনো এদিক ওদিক না দোলে। নামাজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অচঞ্চল রাখা নামাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইজালাতুল খিফা।

হজরত আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ নামাজে দণ্ডায়মান হলে সে যেনো তার সামনের পাথর কণা সরাতে ব্যস্ত না হয়ে

পড়ে, কেননা তার সম্মুখে তখন বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহ্‌র রহমত। বাগবী। হজরত আবু জর থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে আদী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান।

পরিচ্ছেদ ঃ হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে বলেছেন, নামাজ পাঠকালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে সেজদার জায়গায়। হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সুনানে কবীর' নামক গ্রন্থে। হজরত আনাসের বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, রসুল স. আমাকে বলেছেন, নামাজে উপবেশনাবস্থায় এদিক সেদিক তাকিয়ো না। এরকম করলে নামাজ নষ্ট হয়। নফল নামাজে এমতো আচরণ সিদ্ধ হলেও ফরজ নামাজে অসিদ্ধ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৩, ৪

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

❒ যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে,

❒ যাহারা জাকাত দানে সক্রিয়,

আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লাগবি' (অসার ক্রিয়াকলাপ) অর্থ শিরিক। হাসান বলেছেন, পাপ, অবাধ্যতা। আমি বলি, এর অর্থঃ ওই কর্মসমূহ, যা আখেরাতে হবে নিষ্ফল— বক্তব্যগত অথবা আচরণগত। আর 'মু'রিদুন' দ্বারাও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে অংশীবাদিতা, অবাধ্যতা এবং আখেরাতের ক্ষতিকর কর্মসমূহের প্রতি। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতে বিশ্বাসীগণের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— 'যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে অর্থ— যে অবিশ্বাসীদের গালমন্দের জবাব গালমন্দের মাধ্যমে দেয় না। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া ইজা মাররু বিল লাগবি মাররু কিরামান' (অসৌজন্যের বিনিময়ে দান করতো সৌজন্য)।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'যারা জাকাত দানে সক্রিয়'। 'জাকাত' ও 'জাকাত দান' উভয়ই জাকাতের অন্তর্ভূত। তৎসত্ত্বেও এখানে জাকাতের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে 'ফায়িলুন' শব্দটি। সুতরাং বুঝতে হবে এক্ষেত্রে কেবল জাকাতের জন্য নির্ধারিত সম্পদের উল্লেখ করা হয়নি, বলা হয়েছে জাকাত প্রদানের কথা। কিন্তু এতে করেও বক্তব্যটি পরিষ্কার হয় না। তাই মনে করতে

হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে 'আদা' (আদায় করে) শব্দটি। ওই অনুক্ত শব্দসহকারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— 'লি আদায়িয় যাকাতি ফায়িলূন' (যারা জাকাত দানে সক্রিয়)। এখানে 'ফায়িলূন' অর্থ সক্রিয়, জাকাত প্রদানে দৃঢ়বদ্ধ। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'জাকাত দানে সক্রিয়' অর্থ পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদনে সক্রিয়।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫, ৬

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○

❒ যাহারা নিজদিগের যৌন অংগকে সংযত রাখে

❒ তবে নিজদিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করিলে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে'। একথার অর্থ— যে সকল বিশ্বাসী নর-নারী তাদের গোপনাঙ্গকে পবিত্র রাখে অবৈধ যৌনাচার থেকে।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।' এখানকার 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' (নিজেদের পত্নী) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'হাফিজূন' (সংযত রাখে) কথাটির সঙ্গে। একটি আরবী প্রবাদে রয়েছে 'ইহ্ফাজ আ'লাইয়া ই'নানা ফারাসী'। এর অর্থ— আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখো, স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ো না। এই প্রবাদে 'আ'লা শব্দের ব্যবহারে যে নিয়মে ঘটেছে, সেই নিয়মই প্রয়োগ করা হয়েছে 'হাফিজূনা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' এর বেলায়। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'হিফ্জ্' (সংযত রাখা) কথাটির মধ্যে রয়েছে 'দান না করা', ব্যয় না করার অর্থ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে 'লা ইয়াব্জিলুনা ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' (যারা আপন গোপনাঙ্গকে আপন স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যয় করে না) অথবা এখানকার 'আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম' এর সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ত ক্রিয়াসহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— 'হুম লা ইয়াবাজ্জিলুনা ইল্লা আ'লা আয্ওয়াজ্বিহিম'।

'মা মালাকাত আইমানুহুম' অর্থ— অধিকারভুক্ত দাসীগণ। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ আপন স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয় না।

বায়যাবী লিখেছেন, অধিকাংশ বিবেকবর্জিত বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'মা' (বিবেকবানদের ক্ষেত্রে 'মান')। এখানেও সেই অর্থে ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'মা'। কেননা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী তাদের মালিকের অভিপ্রায়াভূত বলে বিবেকবর্জিত বস্তুতুল্য। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'ফুরুজ' (যৌন অঙ্গ) অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন অঙ্গ। আর সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখতে বলা হয়েছে। তারপর আলোচ্য আয়াতে পৃথক করা হয়েছে স্ত্রী ও ক্রীতদাসীকে। অর্থাৎ বিশ্বাসী পুরুষ তার স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 'মা মালাকাত' (অধিকারভূত) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বায়যাবী ক্রীতদাসকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে এই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, তাহলে কোনো বিশ্বাসী রমণী কি তার ক্রীতদাসের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারবে? আমি বলি, উদ্ভূত প্রশ্ন ও সন্দেহ অবান্তর। কারণ এখানে 'মা মালাকাত আইমানুহুম' এর অর্থ কেবল ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস নয়। কারণ এখানে 'মান' ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয়েছে 'মা'। স্বল্পজ্ঞানের কারণে নারী জাতিকে সাধারণতঃ বিবেকহীন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে গণ্য করা হয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রাণীকুলের সঙ্গে। সুতরাং 'মা' প্রয়োগের কারণে এখানকার 'মালাকাত আইমানুহুম' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে কেবলই ক্রীতদাসী, অধিকারভূত দাসী— ক্রীতদাস কখনোই নয়।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

❐ এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী,

❐ এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

❐ এবং যাহারা নিজদিগের সালাতে যত্নবান,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং কেউ এদেরকে ছেড়ে অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালংঘনকারী।' এখানে 'আ'দূন' অর্থ সীমা অমান্যকারী, হালালকে ছেড়ে হারামের দিকে গমনকারী। উল্লেখ্য, এই আয়াতের মাধ্যমে মুতায়ার (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি রহিত করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে মুতায়া বৈধ ছিলো। কেউ দূরের কোনো শহরে সফরে গেলে সেখানকার কোনো মহিলাকে কিছুদিনের জন্য বিবাহ করতো। ওই মহিলা তার আহার্য রন্ধন করতো এবং তার মালসামানের হেফাজত করতো। এরপর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য সকল মহিলার সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা রহিত হয়ে যায়। তিরমিজি। উল্লেখ্য, মুতায়ার মাধ্যমে যে রমণীকে গ্রহণ করা হয় সে কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্ত্রী নয়। শিয়া সম্প্রদায় মুতায়াকে এখনো জায়েয মনে করলেও তারাও একথা বলে যে, মুতায়ালব্ধ স্ত্রীর উত্তরাধিকার নেই। এমতোক্ষেত্রে স্বামীও স্ত্রীর উত্তরাধিকার পায় না। সুতরাং তারা প্রকৃত অর্থে স্বামী-স্ত্রী নয়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উত্তরাধিকার কোরআন কর্তৃক স্বীকৃত। আমি সুরা নিসার তাফসীরের যথাস্থানে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হস্তমৈথুন নিষিদ্ধ। এটাই সাধারণ আলেমগণের অভিমত। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতা সমীপে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এরকম আমল মাকরুহে তাহরিমী (প্রায় হারাম)। তিনি আরো বলেছিলেন, আমি শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক হাশরের ময়দানে গর্ভবতী হাত নিয়ে উত্থিত হবে। আমি ধারণা করি তারা অভ্যস্ত ছিলো হস্তমৈথুনে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কোনো কোনো লোক পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলা করতো। আল্লাহ্ এজন্য তাদেরকে দণ্ডদান করেছিলেন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।' একথার অর্থ— বিশ্বাসীগণের নিকট আমানত স্বরূপ কোনো কিছু রেখে দিলে তারা তা যথাযথরূপে সংরক্ষণ করে এবং কারো নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে সে অঙ্গীকারও অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে।

অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দু'প্রকার— ১. আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, যা ইমানের সঙ্গে সতত সম্পৃক্তঃ যেমন— নামাজ, রোজা ও শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ, ২. মানুষের সঙ্গে সম্পাদিত পারস্পরিক অঙ্গীকারঃ যেমন— আমানত, ব্যবসায়, বিবাহ ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বান্দার নিকটে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাজের। নামাজ সঠিক হলে সে হবে সফলকাম, আর নামাজ সঠিক না হলে সে বঞ্চিত হবে সফলতা থেকে। যদি তার ফরজ নামাজে ত্রুটি পরিদৃষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন, আমার এই বান্দার নফল দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ করো। এভাবে বিচার করা হবে

তার অন্যান্য আমলকেও। অপর বর্ণনায় এসেছে, এরপর হিসাব গ্রহণ করা হবে তার জাকাতের, তারপর অন্যান্য আমলের। বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও আহমদ।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান।' একথার অর্থ— এবং যে সকল বিশ্বাসী নির্ধারিত সময়ে নামাজ পাঠ করে সুন্দর ও সুচারুরূপে। উল্লেখ্য ইতোপূর্বেও ২ সংখ্যক আয়াতে নামাজের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে বলা হয়েছে বিনয়-নম্রতার কথা। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যত্নবান হওয়ার কথা। এভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে নামাজের প্রসঙ্গকে করে তোলা হয়েছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর এভাবে ফুটে উঠেছে নামাজের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য— বিনয়-নম্রতা ও যত্নবানতা।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০, ১১

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ○ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

❑ তাহারাই হইবে উত্তরাধিকারী,

❑ উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদাউসের যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমাংশে সাধারণভাবে কেবল বলা হয়েছে বিশ্বাসীগণের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা, পরের অংশে সুনির্দিষ্টভাবে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ প্রদানের পর বলা হয়েছে সেখানকার চিরস্থায়ী বসবাসের কথা। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এতক্ষণ ধরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারীগণই তাদের সফলতার প্রতিভূরূপে লাভ করবে জান্নাতুল ফেরদাউসে বসবাসের চিরস্থায়ী অধিকার।

'ওয়ারিছুন' অর্থ উত্তরাধিকারী। এভাবে বিশ্বাসীগণকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বলে সম্মানিত করা হয়েছে এখানে। কিন্তু এতে করে আবার এমতো সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যে, পূর্বে অন্য কেউ বেহেশতের মালিক ছিলো, আর বিশ্বাসীগণ লাভ করবে তাদের পরিত্যক্ত জান্নাত। না, তা নয়। আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, অবিশ্বাসীদের জন্যও শর্তসাপেক্ষে জান্নাত নির্ধারিত ছিলো। সে শর্ত হচ্ছে ইমানের শর্ত। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করলে হবে জান্নাতের ওই অংশের মালিক। কিন্তু বিশ্বাস আনয়ন না করার কারণে তারা হবে জাহান্নামী। আর তাদের জন্য নির্ধারিত জান্নাতের অধিকারী করে দেয়া হবে বিশ্বাসীগণকে। বিষয়টি উত্তরাধিকার হস্তান্তর করার মতো। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ওয়ারিছুন' বলা হয়েছে একারণেই।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত রয়েছে দু'টি বাসস্থান— একটি বেহেশতে, আর একটি দোজখে। কেউ অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণের পর দোজখবাসী হলে তার বেহেশতের বাসস্থানের উত্তরাধিকার লাভ করবে বেহেশতবাসীরা। আলোচ্য আয়াতে সেই উত্তরাধিকারিত্বের কথাই বলা হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী। আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— বেহেশতবাসীরা নিজেদের জন্য নির্ধারিত অংশের অধিকারী তো হবেই, তদুপরি হবে তার ওই ভাইয়ের উত্তরাধিকারী যে দোজখবাসী হয়েছে বিশ্বাস গ্রহণ না করার কারণে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণে অনীহ হয়, আল্লাহ্ নিঃশেষ করে দেন তার বেহেশতের উত্তরাধিকার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ কর্মফল হিসেবে জান্নাত লাভ। অর্থাৎ উত্তরাধিকারী যেমন শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার লাভ করে, তেমনি পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীরাও অবশেষে লাভ করে বেহেশত।

'হুম ফীহা খলিদূন' অর্থ— তারা সেখানে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ জান্নাতুল ফেরদাউসে কেবল প্রবেশই করবে না, তারা সেখানে বসবাসও করবে অনন্তকাল ধরে।

ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও হাকেম হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে যখন 'ওহী' (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের সামনে ধ্বনিত হতো মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো আওয়াজ। একবার প্রত্যাদেশ অবতরণকালে আমি উপস্থিত ছিলাম তাঁর মহান সান্নিধ্যে। অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স. কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আরো অধিক দান করো, কম দিয়ো না, আমাদেরকে মর্যাদায়িত করো, লাঞ্ছিত কোরো না, সফল করো, বঞ্চিত কোরো না, আমাদেরকে করো অন্যাপেক্ষা অগ্রগণ্য, অন্যদেরকে আমাদের অগ্রণী কোরো না। আর আমাদেরকে করো প্রীত, প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত। তুমিও দয়া করে তুষ্ট হয়ে যাও আমাদের প্রতি। প্রার্থনা শেষে তিনি স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে দশটি আয়াত। যে এই আয়াতগুলোর উপরে আমল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'ক্বদ আফলাহাল মু'মিনূন' থেকে 'হুমুল ওয়ারিছুন' পর্যন্ত (আলোচ্য সুরার প্রথম দশ

আয়াত)। নাসাঈ হাদিসটিকে বলেছেন পরিত্যক্ত। কিন্তু হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। উল্লেখ্য, এই সুরার প্রথম দশ আয়াতে দেয়া হয়েছে প্রকৃত বিশ্বাসীগণের গুণাবলীসমূহের অনিন্দ্যসুন্দর বিবরণ। বিশ্বাসীগণের সত্তাগত ও গুণগত পরিপূর্ণতা উন্মোচিত, বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমেই। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১২, ১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

❒ আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে,

❒ অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আমিই তোমাদের একক সৃজয়িতা। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে। সুতরাং মনে রেখো, আমাকে একক স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করা এবং কেবল আমার ইবাদত করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

এখানে 'সুলালাতিন্' অর্থ উপাদান, উপকরণ। আর 'মিন ত্বীন' অর্থ মৃত্তিকা থেকে। এখানকার 'মিন' হচ্ছে বর্ণনামূলক। তাই 'সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' এর অর্থ দাঁড়ায়— মৃত্তিকার সারবস্তু থেকে।

এখানে 'ত্বীন' এর আরেক অর্থ হজরত আদম। আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ত্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আদমকে। আবদ ইবনে হুমাইদ স্বয়ং বলেছেন, 'মিন সুলালাতিম্ মিন ত্বীন' কথাটির অর্থ— আদম সন্তানগণের বীর্য। অর্থাৎ ত্বীন অর্থ বনী আদম এবং সুলালাতিন অর্থ বীর্য বা শুক্র।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সুলালাতিন' অর্থ পানির সারবস্তু। ইকরামা বলেছেন, 'সুলালাতিন্' অর্থ ওই পানি যা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে। আরববাসীরা 'নুত্ফা' বা বীর্যকে বলে 'সুলালাহ্'।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে'। অর্থাৎ আমি শুক্রবিন্দুর সারবস্তু সেখানে স্থাপন করি। এখানকার 'জাআ'লনাহু' (তাকে স্থাপন করি) এর 'হু' (তাকে) সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'সুলালাতিন্' (উপাদান) এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এখানে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, আমি ওই মৃত্তিকার সারবস্তু শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি

এক নিরাপদ আধারে। এরকমও হতে পারে যে, সর্বনামটি সম্বন্ধযুক্ত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'মানুষ' (ইনসান) এর সাথে। এভাবে বুঝতে হবে 'নুত্ফা' কথাটির পূর্বে লুপ্ত রয়েছে একটি জের প্রদানকারী অব্যয় (হরফে জার)। ওই অব্যয়টিকে উহ্য রেখে এখানে সংযোজিত হয়েছে 'নুত্ফাতান্' (শুক্রবিন্দুরূপে) কথাটি।

'ক্বারারিন' অর্থ আধার। অর্থাৎ গর্ভাধার। 'মাকীন' অর্থ নিরাপদ্। উল্লেখ্য যে, এখানে 'নিরাপদ আধার' এর নিরাপত্তা গর্ভধারিণীর জন্য নয়, বরং গর্ভস্থিত শিশুর জন্য। অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশুর কারণেই মাতৃউদরকে করা হয়েছে নিরাপদ আধার। সুতরাং বুঝতে হবে, গর্ভাশয়কে এখানে নিরাপদ আধার বলা হয়েছে রূপক অর্থে।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৪

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

❒ পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে উহাকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে।' এখানে 'মুদ্বগা়তান্' অর্থ রক্তপিণ্ড যার আকার চর্বনের উপযোগী পর্যায়ের।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা'। একথার অর্থ— অতঃপর আমি ওই রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি আরো ঘনবদ্ধ এক পিণ্ডে, গোশতপিণ্ডে। তারপর তার একাংশকে অস্থিতে পরিণত করে অপর অংশকে করি তার আবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি'। একথার অর্থ— অবশেষে তাতে আত্মার সম্পাত ঘটিয়ে দান করি জীবন্ত রূপ। এখানে 'আন্শা'নাহু' এর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক ঘটেছে 'সুলালাতিন' অথবা 'ইনসান' এর সঙ্গে। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া বলেছেন, এখানে 'খলক্বান আখার' (আরো এক রূপ) বলে বুঝানো হয়েছে রূহ নিক্ষেপ করাকে।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হবে, ওই রূহ অধোস্থিত রূহ বা পাশবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃত রূহ নয়। কারণ প্রকৃত রূহ সমুচ্চ ও পবিত্র এবং এর অবস্থানস্থল আরশের উর্ধ্বে, যা স্থানসম্ভূত কিছু নয়। আর নফস্, প্রাণ বা প্রবৃত্তি হচ্ছে তরল বা বায়বীয় এক ধরনের সূক্ষ্ম ও উষ্ণ পদার্থ, যা দেহজাত, অর্থাৎ মানবদেহের অধ্যায়াস্তরের প্রতিফল বা পরিণতি। আলোচ্য বাক্যে এই নফসের কথাই বলা হয়েছে। আর প্রকৃত রূহ তো সৃজিত হয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে আলমে আরওয়াহ্তে (আত্মার জগতে)। সেখানেই সকল রূহকে একত্রিত করে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? রূহসকল তখন সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ। আর তখন তো মানবদেহের অস্তিত্বই ছিলো না।

রূহনিক্ষেপ কাকে বলেঃ 'নাফাখে রূহ' হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ, যা অবিনশ্বর। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়ানাফাখতু ফিহী মিররূহী'। অস্থিসমূহ যখন চর্ম-গোশতের পোশাক পরিধান করে, তখন শরীরের সঙ্গে ঘটে রূহের সম্পর্ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে শরীর হাদেছ (নশ্বর) এবং রূহ ক্বদীম (অনশ্বর)। তবে 'আনশা' অর্থ যদি এখানে 'রূহনিক্ষেপ' বা 'আত্মাসম্পাত' হয়, নতুন সৃষ্ট কোনোকিছু না হয়, তবে এমতো প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র সত্য রসুল স. বলেছেন, মানব-বীর্য তার রমণীগর্ভে মনি হিসেবে থাকে চল্লিশ দিন। তারপর তা পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে, তারপর গোশতপিণ্ডে। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য চারটি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন একজন ফেরেশতাকে— ১. ভালো-মন্দ কর্ম-পরিক্রমা ২. আয়ুষ্কাল ৩. রিজিক বা জীবনোপকরণ ৪. সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য। তারপর তার প্রতি ঘটানো হয় আত্মার সম্পাত। যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! কিছুসংখ্যক লোক জীবনভর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, এভাবে পৌঁছে যায় বেহেশতের এক গজ ব্যবধানে, এমতাবস্থায় তকদীর তার উপরে প্রবল হয়, সে তখন শুরু করে পাপাচার, এভাবে সাঙ্গ হয় তার জীবনলীলা। আবার কিছুসংখ্যক লোক আজীবন পাপকর্ম করতে করতে উপনীত হয় এমন স্থানে, যখন তার এবং দোজখের মধ্যে ব্যবধান থাকে এক গজ, এমতাবস্থায় তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে তকদীর, সে তখন পৃথিবী পরিত্যাগ করে বেহেশতী লোকের মতো পুণ্যকর্ম করতে করতে, দোযখী হয়ে যায় বেহেশতী (এভাবে প্রায় নিশ্চিত বেহেশতী হয়ে যায় দোজখী এবং প্রায়নির্ধারিত দোজখী হয়ে যায় বেহেশতী)। বোখারী, মুসলিম।

একটি প্রশ্নঃ আলোচ্য আয়াতে শুক্রবিন্দু-জমাট রক্তপিণ্ড-অস্থিপঞ্জর-মাংস দ্বারা আবৃত হওয়া, এ সকল অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় দ্বারা। এতে করে বুঝা যায়, বর্ণিত পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত হয় অতি দ্রুত, বিরতিহীনভাবে। কিন্তু উপরে বর্ণিত হাদিসে পরিবর্তনগুলোর মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত হয়েছে 'ছুম্‌মা' (তারপর) শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় পরিবর্তনগুলো সূচিত হয় বিলম্বিত লয়ে, বিরতি সহকারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে আলোচ্য আয়াত ও উল্লেখিত হাদিসের বিবরণগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না কি?

জবাবঃ হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, দুই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর চল্লিশ দিন। তাই এমতো ক্ষেত্রে 'ছুম্‌মা' শব্দটির ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এমতো সুসঙ্গত রূপান্তরের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের সংখ্যাগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সুসঙ্গত এবং রূপান্তরণের গতিপ্রকৃতির বিস্ময়কর দিকটিই এখানে প্রধান। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রতিটি রূপান্তরকে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। তাছাড়া আগাগোড়া সকল রূপান্তরণের ক্ষেত্রে 'ফা' অব্যয় সংযোজিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্‌মা— যেমন ১. ছুম্‌মা জাআ'লনাহু নুত্‌ফাতান (অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি) ২. ছুম্‌মা খলাক্বনা নুত্‌ফাতা আলাক্বতান (পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাটরক্তে)। পরবর্তী তিন অবস্থা (পিণ্ড, অস্থিপঞ্জর, মাংস দ্বারা অস্থিপঞ্জর ঢেকে দেয়া) কে প্রকাশ করা হয়েছে 'ফা' অব্যয় সহযোগে। শেষে আবার ব্যবহৃত হয়েছে ছুম্‌মা। যেমন— ছুম্‌মা আনশা'নাহু খল্‌ক্বান আখার (অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি)। সুতরাং বুঝতে হবে বর্ণনাভঙ্গির এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরণের ব্যবধান ও বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত। মৃত্তিকার উপাদানকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারপর পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতৃগর্ভে তাকে স্থাপন করা এবং তাকে জমাটরক্তরূপে নিরাপদ রাখার বিষয়টিও কম আশ্চর্যের নয়। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক বিরল অলৌকিকতা। কিন্তু এর পরের অবস্থাগুলো (পিণ্ড, অস্থি-পঞ্জর, মাংসের আবরণ) তত্তুল্য আশ্চর্যজনক নয়। তাই প্রথম দুই অবস্থায় 'ছুম্‌মা' এবং শেষ তিন অবস্থায় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ ধাপে আবার রয়েছে উত্তুঙ্গ বিস্ময়। তাই সেখানে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে 'ছুম্‌মা'। বলা বাহুল্য, এরকম করাই ছিলো যুক্তিসঙ্গত।

মাসআলাঃ কেউ যদি অন্যায়ভাবে ডিম হস্তগত করে এবং হস্তগতকারীর নিকটে ওই ডিম্ব থেকে বাচ্চা নির্গত হয়ে মরে যায়, অথবা পেটের ভিতর থেকে ডিম বের করার পর বাচ্চা ফুটে বের হয়, তবে উভয় অবস্থায় ওই ডিমের জন্য জরিমানা দিতে হবে। কারণ তখন ওই ডিমে সৃজিত হয় জীবনের চিহ্ন। উল্লেখ্য, জরিমানার সম্পর্ক করা হয়ে থাকে প্রথম জীবনপ্রাপ্তির সঙ্গে।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'আরো এক রূপ দান করি' কথাটির অর্থ— তখন তার অস্থিতে উদগত হয় দন্ত ও কেশ। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ পূর্ণ যৌবনে পদার্পন। হাসান বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ অবশেষে আমি তাকে পরিণত করি নর অথবা নারীতে। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— অবশেষে তার রূপান্তর ঘটাই এভাবে— জন্মগ্রহণ, ক্রন্দন, দুগ্ধপান, বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, দুগ্ধপান ছেড়ে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, কৈশোর- যৌবন ইত্যাদি।

আমি বলি, কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আমি অতঃপর দান করি এক নতুন জীবন, সুফী সাধকগণের যে জীবন লাভ হয় পশুপ্রবৃত্তি সমূহের বিনাশনের (ফানার) পর। উল্লেখ্য, পরিবর্তিত এই জীবন ফেরেশতাদের মতো পবিত্র। ফেরেশতা-জীবন অতিক্রমণের পরেও রয়েছে আল্লাহ্র রহমতের দিকে নিরন্তর অভিযাত্রা, যার অবশেষ উপনীতির নাম বাকাবিল্লাহ্। ওই জীবনের কথাই বলা হয়েছে এখানে 'আরো এক রূপ দান করি'- এর মাধ্যমে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান'। এখানে 'ফাতাবারকা' কথাটির 'ফা' কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে বর্ণিত মানব সৃষ্টির অধ্যায়ান্তর ও বিবর্তন শেষে পূর্ণত্ব প্রদানের কারণে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্তায়ালা সুনিপুণ স্রষ্টা, সুউচ্চ, মহান। সুতরাং তিনি এক, অবিভাজ্য, আনুরূপ্যবিহীন। তাই একমাত্র তাঁর উপাসনা ভিন্ন সৃষ্টির অন্য কোনো উপায় নেই।

মুতাজিলাদের অভিমতঃ মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তাদের অভিমত হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা সুনিপুণ ও মহান স্রষ্টা। তাই বুঝতে হবে স্রষ্টা আরো রয়েছে, কিন্তু সুনিপুণ ও মহান নয়। এর জবাবে আমরা বলি, সৃজন কেবলই আল্লাহ্র। এক্ষেত্রে কেউ তাঁর অংশী নয়। একথা শরিয়তের দলিল ও বুদ্ধিগত প্রমাণ দ্বারা সুপ্রত্যয়িত। সুতরাং বান্দা তার কর্মের নির্মাতা বটে, কিন্তু স্রষ্টা কদাচ নয়। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'খলাক্বাকুম ওয়ামা তা'মালুন' (আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কার্যাবলীকেও)। সৃষ্টির অস্তিত্ব অনস্তিত্বজাত। আল্লাহ্ই তাকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। যে স্বয়ম্ভু নয়, সে আবার অন্যকে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারে কীভাবে। সুতরাং বুঝতে হবে সৃষ্টির অস্তিত্বের স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ্ তাই তার প্রতিক্রিয়া বা কর্মসমূহের স্রষ্টাও আল্লাহ্। সেকারণেই সকল সাহাবী এবং সত্যাধিষ্ঠিত বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত যে, স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। তবে আমরা একথাও বলি যে, অপ্রত্যক্ষ বা রূপক অর্থে সৃজনকর্মের সম্পর্ক বান্দার সঙ্গেও প্রমাণ করা যায়। যেমন হজরত ঈসা বলেছিলেন— আন্নী

আখলুকু লাকুম্ মিনাত্‌ত্বীনি কাহাইআতিত্ত্বইরি (আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখি নির্মাণ করেছি)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'ওয়া তাখলুকুনা ইফ্‌কান' (এবং তোমরা মিথ্যা রচনা করো)। কিন্তু একথা স্মরণ রাখাও অত্যাবশ্যক যে, 'খলক্ব' (সৃজন) শব্দটি যখন বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়, তখন তার অর্থ হবে নির্মাণ করা, রচনা করা, প্রস্তুত করা বা তৈরী করা। অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করা নয়। প্রকৃত কথা এই যে, বান্দাকে দেয়া হয়েছে সংকল্পের স্বাধীনতা। অর্থাৎ সে হতে পারে ভালো অথবা মন্দ কর্মের পরিকল্পক বা সংকল্পক, স্রষ্টা কখনো নয়। কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বয়ং। তিনিই বান্দার সৎ অথবা অসৎ উদ্দেশ্যকে অস্তিত্ব দান করেন, ফলে তা লাভ করে বাস্তব রূপ। বান্দার পুরস্কার এবং তিরস্কার নির্ধারণ করা হয় তার ওই ইচ্ছাগত স্বাধীনতার কারণে। তাই সে হতে পারে অর্জনকারী, স্রষ্টা কখনোই নয়। অর্থাৎ অর্জন সৃষ্টির, আর সৃজন আল্লাহ্‌র। বান্দা কেবলই পরিকল্পক ও নির্মাতা, আর আল্লাহ্ যেমন নির্মাতা, তেমনি সৃজয়িতাও। এ কারণেই মুজাহিদ বলেন, বান্দা নির্মাণ করে, আল্লাহ্‌ও নির্মাণ করেন, কিন্তু তিনি বান্দার চেয়ে উত্তম নির্মাতা, কারণ সৃজন তাঁর, কেবলই তাঁর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আল খলিক্বীন' অর্থ আকৃতি প্রস্তুতকারী বা পরিকল্পনাকারী। 'খলক্ব' এর আভিধানিক অর্থ পরিকল্পনা বা অনুমান। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, কথাটির ভিত্তি— অসম্ভবকে মেনে নেয়া কিন্তু অসম্ভব নয়। অর্থাৎ সৃষ্টির স্রষ্টা হওয়াকে অসম্ভব বলে মেনে নিলেও, বলতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বোত্তম ও মহান স্রষ্টা, অন্য কেউ নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমার প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমার চারটি বিষয় লাভ করেছে আল্লাহর আনুকুল্য, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে ....অবশেষে তাকে আরো এক রূপ দান করি' অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো 'সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান'। এই কথাটিই পরে অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যাদেশরূপে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'দ ইবনে সারাহ্ ছিলো রসুল স. এর সঙ্গী। প্রত্যাদেশিত বাণী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব ছিলো তার উপরে। একদিন রসুল স. বলবার আগেই সে উচ্চারণ করলো 'ফা তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খলিক্বীন'। রসুল স. বললেন, লিখে ফেলো, এটাই প্রত্যাদেশ। এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ প্রচার করতে শুরু করলো, আমিও নবী, আমার উপরেও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ইসলাম ত্যাগ করে সে চলে গেলো মক্কায়। কিছুকাল পরে মক্কা বিজিত হলো। রসুল স. কয়েকজন মহাঅপরাধীর তালিকা

প্রস্তুত করে বললেন, এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। আবদুল্লাহ্র নামও ছিলো ওই তালিকায়। সে আশ্রয় নিলো হজরত ওসমানের কাছে। হজরত ওসমান রসুল স. সকাশে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। রসুল স. কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন, তথাস্তু। হজরত ওসমান তাকে নিয়ে প্রস্থান করার পর রসুল স. বললেন, আমি 'তথাস্তু' বলার আগে তোমরা তাকে বধ করলেনা কেনো? আমি তো এজন্যেই সময়ক্ষেপণ করেছিলাম। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো ছিলাম ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। রসুল স. বললেন, এরকম নেপথ্য নির্দেশ নবীর জন্য অশোভন। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ওই দিনই মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে আজীবন তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধাচারী বিশ্বাসী।

আমি বলি, 'সাবিলুর রাশাদ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্র ধর্মত্যাগী হওয়া, মক্কাবিজয়ের পর তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়া, হজরত ওসমানের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রাপ্তি, পুনঃ ইসলাম গ্রহণ সকল কিছুই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওহি লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁর মুখ থেকে ওহির কোনো বাণী আগাম উচ্চারিত হয়েছিলো— সেকথা সেখানে নেই। ঐতিহাসিক বিচারে এরকম হওয়া অসম্ভবও। কারণ আবদুল্লাহ্ ধর্মত্যাগ করেছিলো মদীনায়। আর আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল হচ্ছে মক্কা। অর্থাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৫, ১৬

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝

❐ ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে,
❐ অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! মৃত্তিকার উপাদান থেকে তোমাদের সৃজনায়ন শুরু হবার পর থেকে বিভিন্ন স্তরান্তর শেষে তোমরা যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হবে, তখন এক সময় সাঙ্গ হবে তোমাদের জীবনলীলা। তখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে তোমাদের সকলকে। সুতরাং সচেতন হও। যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য।

'মায়্যিত' ও 'মায়্যেত' ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ কারী। আর 'মায়্যাত' অর্থ মৃত। সুতরাং এই শব্দটিকে এখানে 'জজম' যোগে উচ্চারণ করা সিদ্ধ নয়। যেমন— 'ইন্নাকা মায়্তুন ওয়া ইন্নাহু মায়্তুন' (নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে

এবং মৃত্যুবরণ করবে তারাও)। এ স্থানেও 'জজম' সংযোজন অসিদ্ধ। এরকম বলেছেন বাগবী। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'মাতা', 'ইয়ামূতু' হচ্ছে বাবে নাসারা, 'ইয়ামাতু' হচ্ছে ফাতাহা এবং 'ইয়ামিতু' হচ্ছে দ্বরাবা। 'মায়্যিতুন' ও 'মায়তুন' উভয় দিক থেকে জীবনের বিপরীত। 'মা-তা' এর শাব্দিক অর্থ নিদ্রাভিভূত, সমাহিত, স্থবিরিত। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'মায়তুন' ওই ব্যক্তি, যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং 'মায়্যিতুন' ও 'মায়্যেতুন' ওই ব্যক্তি যে মৃত্যুবরণ করবে।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে'। এ কথার অর্থ— মৃত্যুর পর সমাধিস্থ হবে তোমরা। সেখানে এক নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হলে শুরু হবে মহাপ্রলয়। ওই মহাপ্রলয় শেষে অনন্ত জীবনের স্বস্তি অথবা শাস্তি নির্ণয়ার্থে ঘটানো হবে তোমাদের মহাপুনরুত্থান।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৭, ১৮

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۚ

❒ আমি তো তোমাদিগের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নহি,

❒ এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।

'সাবয়া ত্বরায়িক্বা' অর্থ সপ্ত পথ। এখানে কথাটির অর্থ সপ্তাকাশ। কারণ প্রতিটি ঊর্ধ্বকাশ নিম্নবর্তী আকাশের উপর আরূঢ়। আকাশকে এখানে পথ বলার আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, প্রতিটি আকাশে রয়েছে ফেরেশতাদের চলাচলের পথ। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়ায়— আমি তো তোমাদের জন্য ঊর্ধ্বদেশে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য পথসমৃদ্ধ সপ্তাকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ামা কুন্না আনিল খলক্বি গফিলীন' (এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নই)। এখানে 'গফিলীন' অর্থ অনবধান, অসতর্ক, উদাসীন। এভাবে আলোচ্য বাক্যটি হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি তোমাদের উপরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছি এ কারণে যেনো তোমাদের প্রতি সতত উন্মুক্ত থাকে তোমাদের রিজিক ও বরকতের দ্বার, যেনো তোমাদেরকে

আলোক প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণ প্রদানে সদা নিয়োজিত থাকে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী। এ সকল কিছু হচ্ছে তোমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। আর এই অত্যাবশ্যকতা সংরক্ষণের জন্য আমি এক মুহূর্তও উদাসীন নই। তাইতো তোমাদের জীবনপ্রবাহ এতো সুসংরক্ষিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিণত।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি'। এখানে আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অর্থ বৃষ্টির পানি। 'বিক্বদারিন' অর্থ পরিমিতভাবে, যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু। আর 'মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি' অর্থ— আমি ওই পানি জমা হতে দেই নদী-নালায়, পুষ্করিণীতে ও বিভিন্ন জলাশয়ে, যাতে মানুষ সেগুলো থেকে নির্বাহ করতে পারে তাদের প্রয়োজন। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করি মৃত্তিকাভ্যন্তরে, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজনে ভূগর্ভ খুঁড়ে সে পানি তুলে আনতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম'। একথার অর্থ— ওই পানিকে আমি আবার করে দিতে পারি বাষ্পাকারে অন্তর্হিত, অথবা পানের অযোগ্য, কিংবা পৌঁছে দিতে পারি মানুষের আওতাবহির্ভূত গভীর অতলে। 'লাক্বাদিরূন' অর্থ আমি পানি অপসারণ করতে ওইরূপ সক্ষম, যেমন সক্ষম বৃষ্টি বর্ষণ করতে। অর্থাৎ আমি যদি পৃথিবীতে পতিত বৃষ্টির পানি অন্তর্হিত করে দিতে চাই, তবে তোমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পিপাসার পানি পাবে না। পিপাসার্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে তোমরা, তোমাদের পশুকুল এবং নিষ্ফলা হয়ে যাবে তোমাদের জীবন।

বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক বেহেশত থেকে চারটি নদী প্রবাহিত করেছেন— সাইহান, জাইহান, দজলা ও ফোরাত। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা ও ইবনে সুফিয়ান সূত্রে ইমাম হাসান উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতের একটি নদী থেকে জিবরাইলের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে দান করেছেন পাঁচটি নদী— সাইহান, জাইহান, দজলা, ফোরাত ও নীল। জিবরাইল নদী পাঁচটিকে স্থাপন করেছেন পর্বতে, সেখান থেকে মানব-কল্যাণার্থে প্রবাহিত করেছেন সমতলভূমিতে। একথারই ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরপর যখন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে, তখন আল্লাহ্ পৃথিবী থেকে জিবরাইলের মাধ্যমে উঠিয়ে নিবেন

কোরআন, সকল প্রকার ধর্মবোধ, হাজরে আস্‌ওয়াদ, মাক্বামে ইব্রাহিম, তাবুতে মুসা (তওরাত সংরক্ষক সিন্দুক) এবং ওই পাঁচটি নদী। এদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাকে অপসারণ করতেও সক্ষম'।

আমি বলি, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল নদীই জান্নাত থেকে উৎসারিত। আর হাদিস শরীফে কেবল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চনদীর কথা।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ১৯, ২০

❒ অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদিগের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

❒ এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে হয় মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন।

বৃষ্টিপাতের ফলে জমিনে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন প্রকারের সুপ্রচুর ফল ও ফসল— এগুলোই মানুষের রিজিক, অত্যাবশ্যক জীবনোপকরণ। এগুলো খেয়েই জীবন রক্ষা করতে হয় মানুষকে। মানুষের রিজিক আল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন এভাবে। প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই। আর আরব ও তৎসন্নিহিত এলাকায় খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। তাই উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখিত হয়েছে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের কথা।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ, যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, যাতে হয় মানুষের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন'। এখানকার 'সাইনাআ' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ বরকত। অর্থাৎ বরকতপূর্ণ পর্বতে আমি সৃষ্টি করেছি যয়তুন বৃক্ষ। কাতাদা, জুহাক ও ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ উৎকৃষ্ট, চমকদার। জুহাক বলেছেন, শব্দটি নাবত্নী। ইকরামা বলেছেন, আবিসিনীয়। কালাবী বলেছেন, 'সাইনাআ' অর্থ বৃক্ষের মালিক। কেউ কেউ বলেছেন, সুরিয়ানী ভাষায় ঘন তরুবীথিকে বলে 'সাইনাআ'। মুকাতিল বলেছেন, যে পর্বতে অধিক ফলবান বৃক্ষ জন্মায়, ওই পর্বতকে বলে সাইনাআ এবং সিনীন। মুজাহিদ বলেছেন, সাইনাআ হচ্ছে বিশেষ

এক প্রকারের পাথর, যা অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয় তুর পর্বতে। তাই শব্দটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তুর পর্বতের সঙ্গে। ইবনে জায়েদ বলেছেন, তুরে সাইনাআ একটি পূর্ণ নাম। যেমন পূর্ণ নাম ইমরাউল কায়েস। ওই নামের পর্বত রয়েছে মিসর ও ইলা'র মধ্যবর্তী স্থানে। ওই পর্বতের দিকেই হজরত মুসাকে আহ্বান করা হয়েছিলো।

'মানুষের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন' অর্থ সিনাই পর্বতের যয়তুনের মধ্যে রয়েছে দু'ধরনের উপকারিতা— ১. ওই যয়তুনের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো ও মালিশের কাজ হয় এবং তা ব্যবহৃত হয় ব্যঞ্জন বা তরকারীরূপে। অর্থাৎ ওই তেল রুটিতে মেখে নিয়ে খাওয়া যায়।

বাগবী লিখেছেন, 'সিবগিন' এবং 'সিবাগুন' অর্থ ওই তরকারী, যার মধ্যে রুটি চুবিয়ে রাখলে রুটি রঞ্জিত হয় তেলের রঙে। সাধারণ ব্যঞ্জনসমূহকে এরকম বলা হয় না।

মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ ওই বৃক্ষকে ব্যঞ্জন যেমন বানিয়েছেন, তেমনি বানিয়েছেন জ্বালানীও। তিনি বলেছেন, তুর পর্বতেই সর্বপ্রথম যয়তুন বৃক্ষের উদগম হয়েছিলো। তাই শব্দটিকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয় তুরের সঙ্গে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাথা তুলে দাঁড়ায় যয়তুন বৃক্ষ। বৃক্ষটির বিশেষত্ব এ কারণেই।

সূরা মু'মিনূনঃ ২১, ২২

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ○

❒ এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন্‌য়ামে; তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা আন্‌য়ামের মাংসও ভক্ষণ কর,

❒ এবং তোমরা উষ্ট্রে ও জলযানে আরোহণও করিয়া থাক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আনয়ামে'। এখানে 'ইবরাতান' অর্থ শিক্ষণীয় নিদর্শন, দলিল প্রমাণ, যা মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্‌তায়ালার পরিপূর্ণ ও আনুরূপ্যবিহীন শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আনয়াম বা চতুষ্পদ পশুকুলের মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু ধরা পড়ে না। তাই এখানে বসানো হয়েছে 'ইন্‌না' (অবশ্যই) শব্দটি। শব্দটির

মাধ্যমে এখানে দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রতি। বলা হয়েছে 'তোমাদের জন্য'। অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য চতুষ্পদ পশুকুলের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে শিক্ষাপ্রদ বিষয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা থেকে'। এখানে 'উদরে যা আছে তা থেকে' অর্থ দুধ বা তরল খাদ্য উপাদান থেকে।

তারপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে কিছু ভক্ষণ করো'। একথার অর্থ— এবং তোমরা ব্যবহার করো ওই সকল পশুর দুধ, ঘি, পশম, চর্বি ইত্যাদি, তাছাড়া ভক্ষণ করো সেগুলোর গোশত।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা উষ্ট্রে ও জলযানে আরোহণও করে থাকো'। একথার অর্থ তোমরা কিছু সংখ্যক পশুকে ব্যবহার করো বাহনরূপে, যেমন উট, মহিষ, গর্দভ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বাহন হিসেবে বলা হয়েছে কেবল উটের কথা। কারণ আরববাসীগণের বাহন প্রধানতঃ উট। তাছাড়া 'ফুলক্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল উটের ক্ষেত্রে, আবার উট স্থলভাগের জাহাজ বলেও সুপরিচিত।

'তুহমালুন' অর্থ তোমরা বোঝা বহন করাও, জলভাগে ও স্থলভাগে। উল্লেখ্য, চতুষ্পদ জন্তুকে আল্লাহ্ই মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই তো মানুষ সেগুলোকে বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে শিক্ষাপ্রদ বিষয়।

'নুসক্বীকুম' অর্থ তোমাদেরকে পান করাই আমি। এখানে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। কারণ শুভ্র সুপেয় দুধ আসে বর্জ্য ও রক্তের মাঝ থেকে। চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, ঘি, পশম ও চামড়ার উৎপাদন; কৃশ ও দুর্বল দেহ বিশিষ্ট মানুষের সেবায় নিরত এতোবড় বিরাট বপুধারী পশু এসব কি আল্লাহ্পাকের অপার মহিমার পরিচায়ক নয়?

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا
هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

❒ আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা লোকদিগকে বলিল, 'এ তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ, তোমাদিগের উপর নেতৃত্ব করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফেরেশ্‌তাই পাঠাইতেন; আমরা তো আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই।

❒ 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং ইহার বিষয়ে কিছু কাল অপেক্ষা কর।'

পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মহাকল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এতক্ষণ ধরে আলোচিত হয়েছে বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য, মানব সৃষ্টির রহস্য, মানুষের প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন নেয়ামত— যেমন আকাশের পথ, বৃষ্টি, ফল ও ফসলের বাগান, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদির কথা, যাতে নিহিত রয়েছে ইমান ও আনুগত্যের উদাত্ত আহ্বান।। আলোচ্য আয়াত থেকে শুরু করা হয়েছে ওই সকল লোকদের পরিণতির বিবরণ, যারা মহাকল্যাণের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। শুরু হয়েছে নবী নুহ ও তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের কাহিনী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না'? এখানে 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না' অর্থ 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' এই শাশ্বত সত্যের অস্বীকৃতি হচ্ছে আল্লাহ্‌রই নেয়ামতসমূহের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা— যা তোমরা অহরহ ভোগ করে চলেছো। আল্লাহ্‌পাক তো এসকলকিছু তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন, আবার যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া অথবা আখেরাতে তোমাদের উপরে আরোপ করতে পারেন কঠিন শাস্তি। অতএব, হে আমার সম্প্রদায়! তবুও কি তোমরা সচেতন হবে না? আল্লাহ্‌তায়ালাই যে একমাত্র ইলাহ্ সে কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে না?

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা লোকদেরকে বললো, এ তো আমাদের মতোই

একজন মানুষ। তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন'। এখানে 'আলমালাউ' অর্থ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, প্রধানগণ। উল্লেখ্য, হজরত নুহের সম্প্রদায়ের নেতা ও জনতা সকলেই বিশ্বাস করতো তাদের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমাগুলোও উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্র অংশীদার। একথাও তারা মনে করতো যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্র বার্তাবাহক হতে পারে না। আল্লাহ্র বার্তাবাহক হতে পারে কেবল ফেরেশতা। তাই তারা হজরত নুহের রেসালতকে অস্বীকার করে বসলো এবং নেতারা জনতাকে এই মর্মে সাবধান করে দিলো যে, নুহ যেহেতু মানুষ, সেহেতু রসুল নয়। সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণই হচ্ছে তাঁর রেসালতের দাবীদার হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ যদি রসুল করতে চাইতেনই, তবে নিশ্চয় রসুল করে পাঠাতেন কোনো ফেরেশতাকে। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এটাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে একথা শুনিনি'। একথার অর্থ— ওই নেতারা আরো বললো, আমাদের পিতৃপুরুষগণও তো প্রতিমা পূজা করতে করতে জীবন সাঙ্গ করেছে। কই, তাদের মুখে তো আমরা কখনো এক আল্লাহ্র ইবাদতের কথা, রসুল প্রেরণের কথা, কিয়ামতের কথা, বেহেশত-দোজখ ইত্যাদির কথা বলতে শুনিনি। উল্লেখ্য, বহুকাল ধরে ওই এলাকায় কোনো নবী-রসুল প্রেরিত হননি। তাই তাদের পূর্বসূরীরাও এ বিষয়ে কিছু জানতো না। সেকারণেই তাদের উত্তরসূরীরা হজরত নুহের রেসালাতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বসেছিলো।

এর পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'এ তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা করো'। একথার অর্থ— নেতারা আরো বললো, তাহলে বোঝো, সে একটা পাগল। পাগল না হলে কি কেউ রসুল হওয়ার মতো এমন উদ্ভট ও ভিত্তিহীন দাবী করে? আর পাগল কি কখনো আল্লাহ্র রসুল হয়? সুতরাং তোমরা আর পাগলের কথায় কান দিয়ো না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা করো, হয়তো তার পাগলামী ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে সে মরে গেলে তো সব ঝামেলাই একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৬, ২৭

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ

اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ○

❒ নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

❒ অতঃপর আমি তাহার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হইবে তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত; এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা নিমজ্জিত হইবে।

সুদীর্ঘ দিবস ধরে সত্যধর্ম প্রচার করতে করতে হজরত নুহ যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও বিপর্যস্ত, তখন আল্লাহ্পাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যারা ইমান আনবার তারা ইমান এনেছে, আর কেউই ইমান আনবে না, তখন হজরত নুহ প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! সীমালংঘনকারীদেরকে এতদিন ধরে তোমার যে আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছি, সেই আযাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে তুমি আমাকে সাহায্য করো তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। একথাই বলা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতে।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো'। এখানে 'বিআ'ইউনিনা' অর্থ আমার তত্ত্বাবধানে। অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ও প্রত্যাদেশানুযায়ী নৌকা নির্মাণ করলে কেউ তোমার ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হবে, তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া'। এখানে 'ফারাত্ তানূর' অর্থ উনুন্ উদ্গীরিত হবে। অর্থাৎ তোমার গৃহাঙ্গনের রুটি পাকানো চুলা ফেটে উদগীরিত হতে থাকবে পানি। উল্লেখ্য, আযাব শুরু হওয়ার এটাই ছিলো আলামত। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁদের ওই চুলা ফেটে পানি নির্গত হচ্ছে। সাথে সাথে তিনি একথা জানালেন হজরত নুহকে। তিনি তখন শুরু করতে লাগলেন নৌকারোহণের প্রস্তুতি। উল্লেখ্য, তাঁর বসতবাটি ছিলো কুফার মসজিদ সংলগ্ন এক স্থানে, বাবে কুন্দার প্রবেশপথের ডান দিকে। এক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সিরিয়ার কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতেন তিনি।

'ফাস্‌লুক ফীহা' অর্থ উঠিয়ে নাও। 'সালাকা' 'ফেলে লাযেম' (অকর্মক ক্রিয়া) এবং 'মুতাআ'দি'(সকর্মক ক্রিয়া) দু'টোই হয়। যেমন 'ফী কাজা' (আমি এরূপ অবস্থায় জড়িত হয়েছি)। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'মা সালাকাকুম ফী সাক্বার (তোমাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করালো কিসে?)।

'মিন কুললি যাওজাইনিছ্ নাইনি' অর্থ প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া। এটা হচ্ছে কর্মপদ। এর অর্থ প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া— নর ও নারী। এক বর্ণনায় এসছে, তখন হজরত নুহের নিকটে হাজির করানো হয়েছিলো প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া। তিনি হস্ত প্রসারিত করলে ডান হাতে এসে পড়তে লাগলো নর এবং বাম হাতে নারী। তিনি সেগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় তুলতে লাগলেন তাঁর নৌকায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার পরিবার পরিজনকে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত'। একথার অর্থ— তোমার পরিবার পরিজন অথবা তোমার অনুসারী বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে ভুলো না। তবে তাদেরকে অবশ্যই পরিত্যাগ কোরো সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই যাদের ধ্বংস সুনির্ধারিত। উল্লেখ্য, এরকম দুর্ভাগাদের মধ্যে ছিলো হজরত নুহের এক স্ত্রী এবং কেনান নামক এক পুত্র। আর একটি কথা এই যে, 'আলাইহি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় চিরদুর্ভাগ্য নির্ণয়ার্থে, যেমন এখানে হয়েছে। আর 'লাহুম' ব্যবহৃত হয় চিরসৌভাগ্যের বেলায়। যেমন এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ইন্‌নাল লাজীনা সাবাক্বত লাহুম মিনাল হুসনা'।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সীমালংঘন করেছে, তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তারা নিমজ্জিত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় নবী নুহ! যারা প্রকৃত অর্থে চিরভ্রষ্ট, তাদের জন্য তুমি আমার কাছে কোনো শুভপ্রার্থনা উপস্থিত কোরো না, তারা তোমার পরিবার পরিজন অথবা নিকটজন— যে-ই হোক না কেনো। মহাপ্লাবনে তাদের নিমজ্জন নিশ্চিত।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ○

❒ যখন তুমি ও তোমার সংগীরা জলযানে আরোহণ করিবে তখন বলিও, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহেরই, যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

❒ আরও বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামাইয়া দাও যাহা হইবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।'

❒ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জলযানে আরোহণ করবে তখন বোলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন জালেম সম্প্রদায় থেকে'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন' অর্থ যিনি আমাদের এই জলযানারোহণ ও অবতরণকে করেছেন নিরাপদ।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আরো বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ'। এখানে 'মুনযালান মুবারকান' অর্থ বরকতময় বা কল্যাণকর অবতরণ। অবতরণ কল্যাণকর হওয়ার অর্থ অবিশ্বাসী শত্রুদের কবলমুক্ত প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদতের সুযোগ, নিরাপদ জীবনযাত্রা, স্বস্তিদায়ক বংশবিস্তার ও সুপ্রচুর জীবনোপকরণ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতে দোয়া করতে বলা হয়েছে কেবল হজরত নুহকে। এতে করে প্রকাশিত হয়েছে হজরত নুহের বিশেষ মর্যাদা। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর দোয়াই তাঁর নিজের এবং উম্মতের জন্য ছিলো যথেষ্ট। উম্মতের জন্য পৃথক প্রার্থনা ছিলো নিষ্প্রয়োজন।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'। একথার অর্থ— হজরত নুহের সময়ের মহাপ্লাবনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে আল্লাহ্‌র মহাশক্তিমত্তার এক বিশেষ নিদর্শন। ওই মহাপ্লাবন থেকে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ লাভ এবং অবিশ্বাসীদের নিমজ্জনের মাধ্যমে এই নিদর্শনটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি মুমিনদের জন্য কতো দয়ার্দ্র এবং কাফেরদের জন্য কতো ভয়ানক শাস্তিদাতা। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের জন্য এ ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় রয়েছে এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম' (ওয়া ইন্ কুন্না লামুবতালীন)। এখানকার 'ইন্' শব্দটির প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইন্না' (নিশ্চয়ই)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিশ্চয়ই আমি নবী নুহের সম্প্রদায়কে বিপদে পতিত করেছিলাম, অথবা নিপতিত করেছিলাম পরীক্ষায়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইন্' হচ্ছে 'না' অর্থবোধক। আর 'লা' অর্থ 'ইল্লা' (ব্যতীত)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নূহকে নবীরূপে প্রেরণ ও তাঁর সত্য-আহ্বানের মধ্যে আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, কেবল এই উদ্দেশ্য ব্যতীত যে, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করবো, দেখবো মহাপ্লাবনের আযাব আপতনের পূর্বে তাদের আচরণ কী হয়— বিশ্বাসসম্মত না প্রত্যাখ্যানমুখর।

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ৩১, ৩২

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

❑ পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম;

❑ এবং উহাদিগেরই এক জনকে উহাদিগের নিকট রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম'। এখানে 'অন্য এক সম্প্রদায়' বলে বুঝানো হয়েছে আদ অথবা ছামুদ জাতিকে। বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত অভিমতটি সুসঙ্গত। কারণ আদ জাতিই ছিলো মহাপ্লাবন পরবর্তী পৃথিবীর প্রথম জনগোষ্ঠী, যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিলো রসুল। তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলের নাম হজরত হুদ আর হজরত সালেহ্ প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রসুল করে পাঠিয়েছিলাম'। একথার অর্থ— তাদের রসুল ছিলো তাদেরই সম্প্রদায়ভূত। তাই তারা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ছিলো সম্যক অবগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না'?

সূরা মু'মিনূনঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, 'এ তো তোমাদিগের মত একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার করো সে তো তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে;

❒ যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

❒ 'সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদিগের মৃত্যু হইলেও তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলে তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?'

❒ 'তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কদাচ্ ঘটিবে না, কদাচ্ ঘটিবে না!'

❒ 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।'

❒ 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রেরিত রসুলের সম্প্রদায়ের সমাজপতিদেরকে আমি করেছিলাম ধনবল ও জনবলে বলীয়ান। সুপ্রচুর সম্ভোগোপকরণ আমি দিয়েছিলাম তাদেরকে। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্ত তো তারা ছিলোই না, উপরন্তু দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো সত্যের আহ্বানকে। মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। সম্প্রদায়ের লোকজন বলেছিলো, এই লোক নিজেকে আল্লাহ্র রসুল বলে দাবি করে, অথচ দেখো, সে তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের পানাহারের মতোই তার নিত্যনৈমিত্তিক পানাহার।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। একথার অর্থ— অবাধ্যদের অগ্রণীরা আরো বললো, সুতরাং ভেবে দেখো হে জনতা! তোমরা যদি তোমাদেরই মতো একজন মানুষের ধর্মানুসারী হও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলেও, তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। অর্থাৎ প্রশ্নটির মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছে মহাপুনরুত্থান পর্বকে, যা সুনিশ্চিত। অথবা প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক (সওয়ালে তাকরিরী)। অর্থাৎ এই লোককে কীভাবে রসুল বলে স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব, যে পুনরুত্থানের মতো অবাস্তবতায় বিশ্বাসী। অথচ চাক্ষুষ বাস্তব হচ্ছে মৃত্যুর পর মৃতদেহসমূহ পরিণত হয় মৃত্তিকায় ও নিষ্প্রাণ অস্থিতে। কিংবা এখানকার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের কারণ হিসেবে। তারা বলেছিলো, 'যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। সেকথার কারণ বা প্রত্যয়নরূপে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা এ লোকের আনুগত্য করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একারণেই যে, সে পুনরুত্থানের মতো ভিত্তিহীনতায় বিশ্বাসী। এরকম অবাস্তবতায় বিশ্বাস করলে তোমরা ভয়ে ভয়ে জীবন কাটাবে। আর এতে করে বিঘ্নিত হবে তোমাদের পার্থিব ভোগ-সম্ভোগ।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না'। এখানকার 'যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে' কথাটি একটি লুপ্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। তাই তারা বলেছিলো, পুনরুত্থানের বিষয়টি জ্ঞানের অতীত, সত্য থেকে অনেক দূরে। কখনোই ঘটবে না, অথচ সেকথাই তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে। অথবা 'লিমা তূআ'দূন' (যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। 'মা তুআ'দূনা' বাক্যটি 'হাইহাতা' ক্রিয়ার কর্তা। এভাবে 'হাইহাতা' কথাটির অর্থ হবে এখানে অতীতকালবোধক। অর্থাৎ যা কখনো ঘটেনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাইহাতা' শব্দটি এখানে ক্রিয়ামূল যার অর্থ অঘটিতব্য।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না'। একথার অর্থ— নির্বোধ নেতারা আরো বলেছিলো, পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবন-মৃত্যুই আমাদের সবকিছু। পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসবহির্ভূত। বাগবী বলেছেন, ওই

সকল লোক পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিলো। তাই এখানে 'নাহ্ইয়া' অর্থ এরকম হবে না যে 'আমরা সকলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবো'। বরং এখানে ঘটেছে 'তাকদীম' এবং 'তা'খীর' (অগ্র-পশ্চাৎ) অর্থাৎ আমরা তো সকলেই জন্মলাভ করি এবং করি মৃত্যুবরণ। অবশ্য এমতো অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে তখন, যখন 'নামুতু' (আমরা মরি) ও 'নাহ্ইয়া' (আমরা বাঁচি) এর উদ্দেশ্য হবে সকল মানুষ।

আমি বলি, এখানে যদি সকল লোকও উদ্দেশ্য হয়, তবুও বাগবীর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেননা 'ওয়াও' (এবং) প্রকাশ করে সংযোজন ও সমষ্টিভূতকে। হানাফীগণের মতানুসারে ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে না। সুতরাং কথাটির অর্থ হবে— এই পৃথিবীতে নিরন্তর ঘটে চলেছে আমাদের মৃত্যু ও জন্ম। এরকম অর্থ হবে না যে— এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণের পর আমরা আবার পুনর্জীবন লাভ করবো।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই'। একথার অর্থ— সে তো আমাদের মতো মানুষ। অথচ আমাদের ধর্মমতানুসারে কথা না বলে সে আল্লাহ্ সম্বন্ধে উদ্ভাবন ঘটায় মিথ্যার। তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি না।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ○ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ○

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।'

❑ আল্লাহ্ বলিলেন, 'অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই।'

❑ অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

❑ অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি।

❑ কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিত করিতেও পারে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে'। একথার অর্থ— স্বসম্প্রদায়ের সীমালংঘন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার ওই রসুল বললো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! এরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং প্রতিশ্রুত শাস্তি অবতীর্ণ করে তুমি আমাকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করো।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, অচিরে এরা অনুতপ্ত হবেই'। এখানকার 'আ'ম্মা শব্দটির 'মা' অতিরিক্তরূপে সংযোজিত, যা সময়ের সংকীর্ণতার উপর বেগ সৃষ্টি করেছে। প্রবল করেছে। অথবা 'মা' অব্যয়টি এখানে অনির্দিষ্ট বাচক। এবং এর বিশেষণ হচ্ছে ক্বলীল (স্বল্প) এর অর্থ অচিরে, অবিলম্বে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে, শীঘ্রই যখন তারা আমার আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করবে, তখন অবিদূরণীয় অনুতাপ ভিন্ন তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে 'অতঃপর সত্য সত্যই এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো'। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'সাইহাতুন' শব্দটির অর্থ ধ্বংস, মহানাদ নয়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাইহাতুন' ও 'সিয়াহুন' অর্থ ভয়ংকর আওয়াজ। 'সিয়াহা বিহিম' অর্থ তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে। 'সিয়াহা ফীহিম' অর্থ তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর 'সাইহাহ্' বলে আযাবকে।

উল্লেখ্য, ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'ক্বরনান আখার' (পরে অন্য এক সম্প্রদায়) অর্থ যদি আদ সম্প্রদায় হয়, তবে এখানকার 'সাইহাতুন' এর অর্থ হবে কেবল ধ্বংস। আর ছামুদ সম্প্রদায় হলে শব্দটির অর্থ হবে মহানাদ বা সুবিকট আওয়াজ। এই মহানাদের বিবরণ দিয়েছি আমি সুরা আ'রাফের তাফসীরে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, হঠাৎ একদিন ধ্বনিত হলো গগন-মেদিনী বিদারী ভয়ংকর শব্দ। তার সাথে শুরু হলো মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন। ওই জীবন সংহারক আওয়াজে কলিজা ফেটে মরে গেলো অবাধ্য ছামুদেরা। আরো উল্লেখ্য, আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছিলো ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ুর মহামারাত্মক আঘাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম'। একথার অর্থ তখন আমার আযাবে তাদের অবস্থা হয়ে গেলো স্রোতবতী নদীতে ভাসমান বর্জ্যের মতো। উল্লেখ্য, যে ধ্বংস হয়ে যায়, আরববাসীরা তাকে বলে, নদীর স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেলো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। এখানে 'বু'দান' অর্থ ধ্বংস হয়ে গেলো। শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর মর্মার্থ— ধ্বংসই

তাদের পরিণতি। অথবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য। 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়' হচ্ছে এখানে কর্তার স্থলাভিষিক্ত এবং ক্রিয়ামূল 'বু'দান' স্থলাভিষিক্ত ক্রিয়ার। আর 'লিল্' এর 'লাম' এখানে অতিরিক্তরূপে সম্পৃক্ত। অথবা ব্যবহৃত বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি'। একথার অর্থ ওই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে বিনাশ করার পর আমি পৃথিবীতে ঘটিয়েছি আরো অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। যেমন— কওমে ছামুদ, কওমে লূত, কওমে শোয়াইব ইত্যাদি।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সীমালংঘনকারী কোনো জাতির ধ্বংসের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, ওই সময়ের পূর্বে যেমন কেউ ধ্বংস হবে না, তেমনি বেঁচেও থাকতে পারবে না কেউ ওই সময়ের পরে।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৪৪

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

❐ অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগের একের পর এককে ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা আরসালনা রসুলানা তাত্রা' (অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসুল প্রেরণ করেছি)। এখানকার 'তাত্রা' শব্দটির ধাতু মূল রূপ ছিলো 'ওয়াত্রা'। শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'ওয়াতরুণ' থেকে। এর অর্থ— বেজোড়। এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে শাফউন্ (জোড়)। 'তাওয়াতুর' ও 'মাওয়াতুর' এর অর্থ সমান্তরালভাবে একে একে আগমন করা এবং সেভাবেই পৃথকরূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'তাওয়াতুর' অর্থ সম্মিলিত অথবা পৃথকরূপে একের পর এক আসা। 'ওয়াতারা মুওয়াতারাতান ওয়া ইতারান' অর্থ একের পশ্চাতে অপর জন আগমন করেছে। কেননা বিচ্ছিন্নরূপে আগমনকে বলা হয়, 'মা ওয়াতারতু বাইনাল আশইয়া'।

আমি বলি, কারো কারো মতে তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতা বলা হয় ওই অবস্থাকে যখন তা ক্রমচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ পরস্পরলগ্ন হয় না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, 'লা বা'সা বিক্বদ্বয়ি রমাদ্বানা তাতরান' (রমজানের কাজা রোজা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করলে কোনো ক্ষতি হবে না)। নেহায়া আসমায়ী' বলেন, 'ওয়াতারতুল খবরা' (সুবিদিত সংবাদ) বলা হয় ওই বিবরণকে, যা বর্ণনা করে একজনের পর অন্যজন এবং তাদের মধ্যে থাকে কিছু বিরতি। তাই আমি বলি, এজন্যই পর পর বহু সূত্রে অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসকে বলা হয় খবরে মুতাওয়াতির (সুবিদিত বিবরণ) যাকে ঐক্যমত্যানুসারে 'অখ্যাত' বলা অসম্ভব।।

এখানকার 'ছুম্‌মা আরসালনা' (অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৩১ সংখ্যক আয়াতের 'পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অতঃপর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্থলে আমি অভ্যুদয় ঘটিয়েছি অন্য এক সম্প্রদায়ের। আর তাদেরকে পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছি অন্য এক রসুল। উল্লেখ্য, 'রসুল' শব্দটি প্রেরণকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলে বলতে হয় 'আমার রসুল'। আর যদি তার সম্পর্ক ঘটে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, তবে বলতে হবে— আমি রসুল প্রেরণ করেছি অমুক সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখনই কোনো জাতির নিকট তাঁর রসুল এসেছে, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সমগ্রের তুল্য। তাই এখানে সামগ্রিকভাবে বলা হয়েছে 'তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। নতুবা ওই সকল রসুলের সঙ্গে কিছুসংখ্যক বিশ্বাসী তো ছিলেনই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এককে ধ্বংস করলাম'। একথার অর্থ— যেমন আমি আমার রসুলগণকে একজনের পর একজন প্রেরণ করেছি, তেমনি তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি একে একে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি'। একথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী এখন কেবলই ইতিহাসচর্চার বিষয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গই শুধু ওই সকল ইতিকাহিনী থেকে উপদেশ গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

'আহাদীছা' অর্থ কাহিনী, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস। শব্দটি বহুবচনবোধক। এর একবচন হচ্ছে 'আহদুছাতুন'। 'আহাদুছাহ্' অর্থ ওই ইতিহাস যা মানুষ পাঠ করে

বিস্ময়ের সাথে চিত্তবিনোদনার্থে এবং পাঠ করে শোনায় অন্যকে। আখফাস বলেন, 'আহাদুছাহ্' ও 'আহাদীছা' ব্যবহৃত হয় মন্দ বিষয়ের স্থলে। আর উত্তম বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়— তিনি পর্যবসিত হয়েছেন ইতিহাসে। অর্থাৎ তিনি একজন আলোচিত অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ বলেছেন, 'আহাদীছ' হচ্ছে 'হাদীছে'র বহুবচন। যেমন 'আহাদীছুন নবী' অর্থ নবীয়ে করিম স. এর হাদিসসমূহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা'। একথার অর্থ— যে সকল লোক আমার প্রেরিত রসুলকে মান্য করে না, সাব্যস্ত করে তাদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে, তাদের উপরে পতিত হয় আল্লাহ্র আযাব। তাদের ধ্বংস অবধারিত।

সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

❒ অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারুনকে পাঠাইলাম,

❒ ফিরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

❒ উহারা বলিল, 'আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদিগেরই মত? এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে?

❒ অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল এবং উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসা ও তার ভ্রাতা হারুনকে পাঠালাম'। এখানে 'সুলত্বনিম্ মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা বিরুদ্ধবাদীদেরকে করে দেয় নির্জবাব। হজরত মুসার অলৌকিক যষ্টিটিকেও এখানে 'সুলত্বনিম্ মুবীন' বলা হয়ে থাকতে পারে। ওই যষ্টির প্রভাবে

ফেরাউন ও তার অনুসারীরা থাকতো সতত পরাস্ত। ওই যষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো অনেক মোজেজা। যেমন— লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দিলেই তা হয়ে যেতো বিরাট সাপ, যাদু প্রতিযোগিতার সময় ওই লাঠি সাপ হয়ে গলাধঃকরণ করেছিলো অনেক যাদুর সাপ ও উপকরণ। ওই লাঠির আঘাতে সাগর তার অভ্যন্তরভাগে সৃষ্টি করে দিয়েছিলো শুষ্ক পথ। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেরিয়ে আসতো পানির প্রস্রবণ। সেনাদলের চারদিকে ঘুরে এসে ওই লাঠিই করতো তাদের হেফাজত। রাতে ওই লাঠি জ্বলতো মোমবাতির মতো। কখনো তা পরিণত হতো ফলবান বৃক্ষে। কখনো হয়ে যেতো কূপ থেকে পানি উত্তোলনের রশি। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'সুলতান' অর্থ মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন। আবার 'সুলত্বনিম মুবীন' অর্থও হয়তো তা-ই, যেগুলো ছিলো হজরত মুসার রেসালাতের পক্ষের নয়টি দলিল বা প্রমাণ।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো; তারা ছিলো উদ্ধত সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— মুসা ও হারুনকে সত্যধর্মসহ যখন আমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকটে পাঠালাম, তখন তারা দর্পভরে অস্বীকার করলো নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে। তাদের ঔদ্ধত্য ছিলো সীমাহীন।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবো, যারা আমাদেরই মতো'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক (ইস্তেফহামে ইনকারী)। এর অর্থ— এই দুইজনের রেসালতের দাবী আমরা কিছুতেই মেনে নিবো না, কারণ তারা আমাদেরই মতো মানুষ।

'লিবাশারাইনি মিছলিনা' অর্থ যারা আমাদেরই মতো মানুষ। 'বাশার' শব্দটির সম্পর্ক একজনের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা তামাছ্ছালা লাহা বাশারান সাবীয়্যান' আবার বহুবচনের সঙ্গেও এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। যেমন আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা ইম্মা তারাইন্না মিনাল বাশারি আহাদান'।

'মিছলিনা' অর্থ আমাদের মতো। এক দুই বা অনেকের সঙ্গে প্রতিতুলনা হিসেবে শব্দটি ব্যবহার্য, ব্যবহার্য পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে তুল্যার্থেও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে। এখানে 'যাদের সম্প্রদায়' অর্থ হজরত মুসা ও হজরত হারুনের সম্প্রদায়। অর্থাৎ বনী ইসরাইল। 'লানা আ'বিদূন' অর্থ আমাদের দাস, আমাদের নির্দেশাধীন। আরববাসীরা অধীনস্থ বা নির্দেশাধীনদেরকে বলে আবদ বা দাস।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো'। একথার অর্থ— সত্যের প্রতিভূ নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যখন অনড়ভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো, তখন নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে দান করা হলো সলিল সমাধি। ধ্বংস।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায়'। একথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় রসুল মুসাকে দিয়েছিলাম তওরাত, যাতে তাঁর অনুসারীরা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত হয় এবং লাভ করে আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ। এখানে 'তারা' অর্থ বনী ইসরাইলেরা, ফেরাউনের অনুসারীরা নয়। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের সলিল সমাধির পর।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫০

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ○

❒ এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি মরিয়ম-তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন'। হজরত ঈসার পিতা ছাড়া সৃষ্টি এবং তাঁর পবিত্র মাতার স্বামীর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃজনগুণের প্রতিফলনে পুত্রবতী হওয়ার বিষয়টি পরস্পর সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এক। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, একবচনবোধক শব্দরূপ 'আয়াত'। বলা হয়েছে 'এক নিদর্শন'। অথবা মনে করতে হবে এখানে 'মরিয়ম-তনয়' কথাটির পরে উহ্য রয়েছে আর একটি 'আয়াত' (নিদর্শন) শব্দ। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এবং আমি মরিয়ম-তনয়কে করেছিলাম এক নিদর্শন এবং আর এক নিদর্শন করেছিলাম তাঁর মাতাকে। মরিয়ম-তনয়ের নিদর্শন হচ্ছে— তিনি দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলেন এবং উপস্থিত করেছিলেন তাঁর মাতার সতীত্বের সাক্ষ্য। আর পুরুষবিবর্জিত অবস্থায় মাতৃত্ব লাভ ছিলো তাঁর মাতার পবিত্রতার নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চ-ভূমিতে'। 'রবওয়াতিন' অর্থ উচ্চ ভূমি। হজরত ইবনে সালাম বলেছেন, ওই স্থানটি ছিলো দামেশকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং মুকাতিলের অভিমতও এরকম।

জুহাক বলেছেন, এখানে 'রবওয়াতিন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে দামেশকের নিম্নাঞ্চলকে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, 'রবওয়াতিন' বলে বালুময় স্থানকে। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রবওয়াহ্ উদ্দেশ্য বায়তুল মাকদিস। হজরত কা'ব এবং কাতাদাও এরকম বলেছেন। হজরত কা'ব আরো বলেছেন, 'রবওয়াহ্' এর অংশবিশেষ অন্য ভূমি অপেক্ষা উচ্চ। ইবনে জায়েদের মতে স্থানটি ছিলো মিসরের আশে পাশে। সুদ্দীর মতে ফিলিস্তিনের উচ্চ ভূমি।

'জাতি ক্বরারিন' অর্থ এমন সমতলভূমি, যেখানে নির্বিঘ্নে বসবাস করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ ফল-ফসল ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ লোকালয়। 'মায়ীন' অর্থ প্রস্রবণ বা স্রোতস্বতী। যেমন বলা হয় 'মাআ'নাল মাআ' (প্রবহমান পানি)। অথবা 'মায়ীন' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মাউ'ন' থেকে। 'মাউ'ন' অর্থ উপকার প্রদায়ক পানি, বৃহৎ কর্মের উপকরণ। কিংবা 'মায়ীন' হচ্ছে 'আ'না' এর কর্মপদীয়রূপ। 'আ'না' অর্থ দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনোকিছু। অর্থাৎ 'রবওয়াহ' ছিলো এমন উচ্চ অঞ্চল, যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫১, ৫২

يَآيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝

❒ আমি বলিয়াছিলাম, 'হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।

❒ 'এবং তোমাদিগের এই যে জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো'। এখানে 'ত্বইয়্যেবাত' অর্থ পবিত্র, হালাল, সুস্বাদু, বৈধ, পরিমিত। পরিমিত অর্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো স্বল্পাহার-অনাহার যেমন নয়, তেমনি নয় ভোজনবিলাসীদের মতো অতিভোজন। কথাটির মধ্যে রয়েছে নেতিবাচকতারও নির্দেশ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ কোরো না।

কেউ কেউ বলেছেন, হালাল হচ্ছে হারামের বিপরীত। আর এখানে হালাল-হারামের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে পরিশুদ্ধ ভোজন-প্রক্রিয়ার কথা। অর্থাৎ তোমাদের আহার যেনো হয় আল্লাহ্‌র স্মরণ সহকারে। ভোজনমগ্নতা যেনো তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত না করে। নিয়ে না যায় প্রবৃত্তিজাত ক্ষতিকর সম্ভোগপ্রবণতার দিকে। পরিমিতিবোধ যেনো থাকে সতত সক্রিয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সৎকর্ম করো'। এখানে 'সৎকর্ম করো' অর্থ তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহকে করো শিরিকবিমুক্ত, পরিশুদ্ধ, নিখুঁত এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনের মহাসংকল্পসম্বলিত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আমি প্রত্যেক যুগের নবী-রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম যে, তোমরা নিষিদ্ধ আহার্য গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ কোরো পরিশুদ্ধ ও পরিমিত আহার্য এবং যথা উদ্দেশ্যে ও যথানিয়মে সম্পাদন কোরো তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহ।

'ইয়া আইয়্যুহার রসুলু' (হে রসুলগণ) বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের রসুলগণকে। কিন্তু হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী, কালাবী এবং তাফসীরকারগণের এক দল মনে করেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে। একজনের সম্বোধনে এরকম বহুবচনবোধক শব্দপ্রয়োগ আরবী ভাষার একটি রীতি। আমি বলি, এরকম সম্বোধন করা হয় কেবল সম্বোধিতজনকে সম্মান প্রদানার্থে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, রসুল স. মহামানবতার মহান প্রতিনিধি। তাই তাঁকে বহুবচনবোধক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনিই মহামানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। আবার এরকম ব্যাখ্যা করার সুযোগও রয়েছে যে, উপস্থাপিত সম্বোধনের উদ্দেশ্য রসুল স. এবং তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ, যাঁরা তাঁর এবং তাঁর উম্মতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী। রসুল স. বলেছেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার কথাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে হজরত ঈসা এবং তাঁর পুতঃপবিত্রা জননীকে লক্ষ্য করে, যখন তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন প্রস্রবণ-বিশিষ্ট উচ্চভূমি রবওয়াহ্‌তে। উদ্দেশ্য ছিলো একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা যেনো পূর্ববর্তী রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ 'পবিত্রবস্তু আহার করো ও সৎকর্ম করো'— এই নির্দেশটির অনুসরণ করেন। অবশ্য বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— তোমাদের সকল আচরণ ও বিচরণ আমার জ্ঞানায়ত্ত। কারণ আমি সর্বজ্ঞ। আর এর যথাবিনিময়ও আমি যথাসময়ে প্রদান করবো। কারণ আমিই তো সকলের পুরস্কারদাতা এবং শাস্তিপ্রদাতা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের এই যে জাতি, তাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় করো'। একথার অর্থ— তোমরা মানুষ। সকল মানুষ একই জাতিগোষ্ঠিভুক্ত। সুতরাং তোমাদের জন্য বিশ্বাসগত ও মৌলিক বিধানগত দায়িত্বও এক। আর এটাই সকল নবী-রসুলের শরিয়তের মূল কথা যে, একমাত্র আমিই তোমাদের এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পালনকর্তা। সুতরাং তোমরা সকলে সমবেত হও এই শাশ্বত বিশ্বাসের আশ্রয়ে। আর একারণেই ভয় করো কেবল আমাকেই।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ○
فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ○

❒ কিন্তু মানুষ নিজদিগের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া সন্তুষ্ট।

❒ সুতরাং উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও কিছু কালের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিন্তু মানুষ নিজেদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে'। একথার অর্থ— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি পাঠানো হয়েছিলো আমার বাণীবাহকদেরকে। তারা আপনাপন সম্প্রদায়ের নিকটে প্রচার করেছিলেন আমার এককত্বের বিশ্বাস সম্বলিত চিরন্তন ধর্মাদর্শ। কিন্তু বিভ্রান্ত লোকেরা তাঁদের ওই অক্ষয় ধর্মাদর্শকে করেছিলো বিকৃত ও বিস্রস্ত। তদস্থলে প্রতিষ্ঠা করেছিলো অনেক ধর্মমত। যারা বিশ্বাসী তারা দিয়েছিলো সকল নবী-রসুল এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাবের স্বীকৃতি। অবশিষ্টরা করেছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যান। কেউ কেউ নবী-রসুলগণের কাউকে করেছিলো স্বীকার, কাউকে অস্বীকার। যেমন ইহুদী, খৃষ্টান, সাবায়ী। আবার কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছিলো সকল নবী রসুলকে। যেমন— অগ্নিউপাসক ও প্রতিমাপূজারী। উল্লেখ্য, এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারবে তখন, যখন এখানকার 'তাক্বত্তাউ' শব্দটিকে গ্রহণ করা হবে 'ক্বত্তাউ'(তারা টুকরা টুকরা করেছিলো) অর্থে। কারণ 'তাফাদ্দাল' আসে তাফয়ীলের অর্থে। কিন্তু এরকম বক্তব্যও সুসিদ্ধ যে, এখানে 'আমরাহুম' এর পূর্বে লুপ্ত রয়েছে 'জর প্রদান কারী অব্যয়' (ফী)। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— তারা ধর্মীয় বিধান পালন করতে গিয়ে হয়ে যায় পৃথক। ছিন্নভিন্ন। সৃষ্টি করে বিভিন্ন দল-উপদল। এক ধর্মকে করে বহুধাবিভক্ত।

এখানে 'তাক্বত্তাউ' 'আমরাহুম' ও 'বাইনাহুম' শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত সর্বনামগুলো বসেছে ওই সকল লোকের স্থলে, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন পয়গম্বরগণ। যেমন— ১. লাক্বদ আরসালনা নূহান ইলা ক্বওমিহী। ২. আন্‌শা'না ক্বুরুনান ফা আরসালনা ফীহিম রুসূলানা তাত্‌রা'।

'যুবুরান' অর্থ বহুধাবিভক্ত, দল-উপদল। শব্দটি 'যুবূর' এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ টুকরা হওয়া। যেমন বলা হয়— 'যুবুরাল হাদীদ' (লোহার টুকরা)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— কিতাবসমূহ। 'যাবারতুল কিতাব' অর্থ আমি স্পষ্ট অক্ষরে কিতাব লিখেছি। মোটা অক্ষরবিশিষ্ট গ্রন্থকে বলে 'যুবুর'। এর মর্মার্থ— তাদের ধর্ম ছিলো প্রথমে গ্রন্থাকারে, আল্লাহ্ যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলেন। পরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পরিবর্তন সাধন করে সেগুলোর। হাসান বলেছেন, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে করে ফেলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ত্রুটিযুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট'। একথার অর্থ— বিকৃত ও পরিবর্তিত মতবাদগুলোকে আবার তারা সত্য বলে জানে এবং এই নিয়ে সন্তুষ্টও থাকে। প্রদর্শন করে মিথ্যাশ্রয়ী দম্ভ।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদেরকে বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও কিছু কালের জন্য'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— কিছুদিন তাদেরকে নিমজ্জিত থাকতে দাও অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার পঙ্কে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'গামরাতি' অর্থ গাফলত বা অনবহিতি, বিভ্রান্তি। অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ হওয়ার দাবি। এখানে বিভ্রান্তিকে তুলনা করা হয়েছে ওই পানির সঙ্গে, যা মানুষের উচ্চতা অপেক্ষা উচ্চ। অর্থাৎ যে পানিতে মানুষের পূর্ণ নিমজ্জন ঘটে।

'হাত্তা হীন' অর্থ কিছুকালের জন্য। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। অথবা ওই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি অবতীর্ণ হয়। মর্মার্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্রমাগত অপআচরণ দর্শনে বিমর্ষ হবেন না। শুনে রাখুন, আমি অবশ্যই তাদেরকে যথাসময়ে আমার শাস্তির অন্তর্গত করবো। অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো আপনি ও আপনার সহচরবৃন্দের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم

مُّشْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ

❒ উহারা কি মনে করে যে আমি উহাদিগকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দিই বলিয়া উহাদিগের জন্য

❒ সকল প্রকার মংগল ত্বরান্বিত করিব? না, উহারা বুঝে না।

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত,

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে,

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থাপন করে না,

❒ এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান করিবার তাহা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে,

❒ তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে সকল লোক আপন ভ্রষ্টতায় সন্তুষ্ট, যারা তাদের প্রতি প্রেরিত পয়গম্বরগণকে মান্য করে না, অবলীলায় তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে জানে, তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে বিত্তবল ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর? কখনোই নয়। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো বিবেকবুদ্ধিহীন। তাই তারা একথা বুঝতে পারে না যে, তাদেরকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে আমার নেয়ামতরূপী আযাব।

হাসান বসরী বলেছেন, মুমিনগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, আর মুনাফিকেরা গোনাহ্ করা সত্ত্বেও থাকে নিশ্চিন্ত।

পরের আয়াত পঞ্চকের (৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১) মর্মার্থ হচ্ছে— 'যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার ইবাদতে প্রকাশ্য গোপন কোনো প্রকার শিরিক করে না এবং যারা তাদের প্রভুপালনকর্তা সকাশে প্রত্যাবর্তনে আস্থাশীল হয়ে ভীতকম্পিত হৃদয়ে দান খয়রাত করে, তারাই ত্বরান্বিত করে কল্যাণকর কর্মসমূহ, তারাই মহাকল্যাণের পথে অগ্রগামী।

এখানে 'আয়াত' অর্থ কোরআনের আয়াত যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, অথবা ওই সকল অলৌকিক নিদর্শন যা প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় এককত্বকে। 'ইউমিনূন' অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করে বা মেনে নেয়।

'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং 'শরীক স্থাপন করেনা' কথা দু'টো সমার্থক হলেও ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে কথা দু'টোকে উপস্থাপন করা হয়েছে পৃথকরূপে। দৃশ্যতঃ এটাকে পুনরাবৃত্তি মনে করা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। কারণ বিশ্বাসে শিরিক এবং ইবাদতে শিরিক এক কথা নয়। এই দুই ধরনের শিরিকই নিষিদ্ধ। ইবাদতের শিরিকই প্রকৃত শিরিক। মক্কার মুশরিকেরা এরকম শিরিকই করতো। তারা আল্লাহ্‌কে মানতো বটে, কিন্তু উপাসনা করতো প্রস্তর-প্রতিমার। তাই এখানে প্রকৃত বিশ্বাসীদের গুণস্বরূপ প্রথমে বলা হয়েছে 'বিশ্বাস স্থাপন করে' এবং পরে বলা হয়েছে 'শরীক স্থাপন করে না'।

'মা আতাউ' অর্থ উত্তম দান। বাগবী বলেছেন, জননী আয়েশা কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'ইউতুনা মা আতাউ' এবং বলতেন, এর অর্থ— সকল উত্তম কর্ম।

'ওয়াজ্বিলাতুন' অর্থ ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। অর্থাৎ সম্পাদিত পুণ্যকর্ম আল্লাহ্ কবুল করবেন কি করবেন না, এই ভয়ে। অথবা কৃত সৎকর্ম দর্পমিশ্রিত হয়ে যায় কিনা, এই আশংকায়। কিংবা এই চিন্তায় যে, আমার পুণ্য অত্যল্প, কিন্তু পাপ বেশী, সুতরাং এই যৎকিঞ্চিত পুণ্য কি আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে?

'যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে' কথাটির মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ। তাই বুঝতে হবে এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি লামে তা'লীলীয়া (হেতু বাচক লাম)। অর্থাৎ তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকতো একারণে যে, তাদেরকে এক সময় আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হতে হবেই। অথবা এখানে অনুক্ত রয়েছে একটি 'মিন'(হেতু)। অর্থাৎ একারণে তাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করানো হবে এবং তখন তিনি তাদের সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— সুচারুরূপে ইবাদত করা সত্ত্বেও যাদের হৃদয় এই ভয়ে ভীত থাকে যে, যদি এই আমল অগ্রাহ্য হয়! জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, 'যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই ভয়ে দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে' কথাটিতে কাদের কথা বলা হয়েছে? মদ্যপ ও অপহারকদের কথা? তিনি স. বললেন, না গো সিদ্দীক-তনয়া, এখানে বলা হয়েছে

ওই সকল লোকের কথা, যারা নামাজ পাঠ করে, রোজা পালন করে এবং দান-খয়রাতও করে থাকে। তথাপিও তারা এই ভয়ে ভীত হয় যে, যদি এই আমল গ্রহণযোগ্য না হয়। এরাই পুণ্যকর্মে সততসচেতন ও অগ্রগামী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে 'ওয়াল্লাজীনা ইউ'তূনা মাআ'তাও ওয়া কুলুবুহুম ওয়াজ্বিলাতুন' এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বললাম, এরা কারা? মদ্যপায়ী ও চোর? তিনি স. বললেন, নাগো সিদ্দীকনন্দিনী, না। এরা হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা রাতে নামাজের জন্য জাগ্রত হয় ও দান-ধ্যান করে, সেই সঙ্গে এই আশংকাও করে যে, যদি আমাদের আমল কবুল না করা হয়।

'উলায়িকা ইউসারিউ'না ফিল খইরাতি' অর্থ— তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ। অর্থাৎ— তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে অত্যধিক আগ্রহী, তাই কোনো পুণ্যকর্ম বাদ না পড়ে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, ইবাদতকারীদেরকে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কল্যাণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেই সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য যারা দৃঢ়তা ও দ্রুততার সঙ্গে পুণ্যকর্ম সমাধা করে। রসুল স. বলেছেন, দোয়া ছাড়া বিপদ দূর হয় না। আর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় না কল্যাণকর কাজ ব্যতিরেকে। কল্যাণকর কাজ হচ্ছে দান ও সচ্চরিত্র। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ওই আয়াতের অনুকূল যেখানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফাআতাহুমুল্লহু ছওয়াবাদ্ দুন্ইয়া ওয়া হুসনা ছওয়াবিল আখিরাহ'। অর্থাৎ তারা এমন সওয়াব লাভ করবে, যা তাদের বিরোধীদের ভাগ্যে ঘটবে না।

আমি বলি, বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে যে সকল কল্যাণজনক কাজের দিকে প্রবল উৎসাহভরে অগ্রসর হয়, তার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা লাভ করে আল্লাহ্‌র জিকিরের আস্বাদ। তাদের অন্তর পায় প্রশান্তি। স্বল্প জীবনোপকরণ পেয়েই তারা থাকে হৃষ্টচিত্ত ও পরিতৃপ্ত। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু হারাবার ভয় আর তাদের থাকে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর কোনো ভয়-ভরসা তাদের নেই। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাদের জন্য আশংকার কিছুই নেই। আর তারা ইলহামের মাধ্যমে অবগত হতে থাকে শুভ সমাচার।

'ওয়াহুম লাহা সাবিকুন' অর্থ— এবং তারা এতে অগ্রগামী হয়। অর্থাৎ তারা হয় জান্নাতের পথে সর্বাগ্রগণ্য। অথবা 'সাবিকুন' অর্থ এখানে অগ্রগামী নয়, বরং ইবাদতের দিকে, সওয়াবের দিকে, কিংবা বেহেশতের দিকে দ্রুত

পদবিক্ষেপকারী। কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আখেরাতের আগমনের পূর্বেই তারা জাগতিক কল্যাণের দিকে ধাবমান। অর্থাৎ আখেরাতের আগমনের আগেই যাদেরকে দেয়া হয় পৃথিবীর কল্যাণ। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানকার 'লাহা সাবিক্বুন' এর 'লাম' অর্থ 'ইলা' (দিকে)। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কাজের দিকে অগ্রগামী হয় না। যেমন 'লাহা নাহ্ওয়া আ'নহু' আয়াতের 'লাম'ও 'ইলা' (দিকে) অর্থবোধক। এ কারণেই কালাবী এই আয়াতের অর্থ করেছেন— তারা স্বজাতির সকলের চেয়ে কল্যাণকর কাজের দিকে অধিক অগ্রসর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— তাদের সৌভাগ্যবান হওয়া পূর্ব থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝ حَتّٰىٓ اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ۝ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

❒ আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

❒ না, এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও মন্দ কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।

❒ আমি যখন উহাদিগের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে।

❒ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না'। একথার অর্থ— ওই সকল লোক যারা স্বভাবজ পুণ্যানুরাগের কারণে কল্যাণময়তার দিকে দ্রুত ধাবমান, আমি তাদেরকে সাধ্যাতিরিক্ত কোনো নির্দেশ প্রদান করিনি, কাউকে দিইনি সামর্থ্যাতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয়'। একথার অর্থ— আমার নিকটে সংরক্ষিত রয়েছে লওহে মাহফুজ, অথবা মানুষের আমলনামা, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুণ্য ও পাপের প্রকৃত বিবরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না'। একথার অর্থ— তাদের কারো অধিকারই খর্ব করা হবে না। এতোটুকু হ্রাস করা হবে না কারো পুণ্য। বৃদ্ধিকরা হবে না করো পাপ।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'না, এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন'। একথার অর্থ— না, ধর্ম বিষয়ে তাদের অন্তর অবোধ, বরং তারা সবদিক দিয়েই মূর্খ। অথবা, প্রকৃত ধর্মবোধ সম্পর্কে তারা উদাসীন, অসচেতন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোনো বোধই তাদের নেই। কিংবা তারা ধর্ম বিষয়ে পুরোপুরি অসতর্ক। কেননা তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে। তারপর বিভক্ত হয়েছে বহু দলে উপদলে। অনুসারী হয়েছে তাদের মনগড়া মতবাদের। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তারা এই কোরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। অথবা গাফেল ইমানের পূর্ণ সৌন্দর্য থেকে। কিংবা গাফেল তাদের আপনাপন আমলনামা সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতদ্ব্যতীত আরো মন্দ কাজ আছে, যা তারা করে থাকে'। একথার অর্থ— অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস ছাড়াও তারা করে আরো অনেক অপকৃষ্ট কর্ম। অথবা— ইমানদারদের উত্তম আমলসমূহের প্রতি আকৃষ্ট তো তারা হয়ই না, উপরন্তু করে তাদের সঙ্গে শত্রুতা। এরকম মন্দকর্ম রয়েছে তাদের অনেক।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি, তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠে'। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শাস্তি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতৃবর্গের নিহত হওয়াকে। জুহাক বলেছেন, এখানে 'শাস্তি' অর্থ ওই দুর্ভিক্ষ, যা রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে আপতিত হয়েছিলো মক্কার মুশরিকদের উপর। রসুল স. তখন তাঁর প্রার্থনায় বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্। তুমি এই অবাধ্যদের উপরে অবতীর্ণ করো নবী ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, অংশীবাদীরা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে বাধ্য হয়েছিলো কুকুরের গোশত ও মৃত জানোয়ারের হাড়-মাংস খেয়ে। এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায়।

'ইয়াজআরূন' অর্থ আর্তনাদ করে ওঠে। আর আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'হাত্তা' উপস্থাপনের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের কারণ। অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে ঘোর অজ্ঞতা ও মন্দকর্মপ্রবণতাই তাদের এমতো শাস্তিতে নিপতিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠার কারণ।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, আজ আর্তনাদ কোরো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না'। একথার অর্থ— তাদের তখন বলা হবে আজ আর আর্তনাদ করে কোনো লাভ নেই। কারণ তোমরা আজ আমার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। আর আমার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তি তো অসম্ভব।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۙ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ○

❒ আমার আয়াত তো তোমাদিগের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে

❒ দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করিতে করিতে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! আমার বাণী তো আমার রসুল তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনান, কিন্তু তোমরা তা মান্য করা তো দূরের কথা, শ্রবণও করো না, স্থান ত্যাগ করো দর্পভরে, নিরর্থক বাক্যালাপ করতে করতে ।

এখানে 'তান্‌কিসূন' অর্থ সরে পড়ে, স্থান ত্যাগ করে। আর এখানকার 'বিহী সামিরান তাহ্‌জুরূন' কথাটির 'বিহী' সর্বনামের সম্পর্ক রয়েছে হেরেম শরীফের সঙ্গে, যদিও এখানে হেরেমের কথা রয়েছে উহ্য। কেননা হেরেমের অধিবাসী বলে মক্কার মুশরিকেরা দর্পপ্রকাশ করতো। অহংকার করতো এই বলে যে, আমরা হেরেমবাসী, কাবাগৃহের প্রতিবেশী। আমরা চিরদুর্জয়, চিরনির্ভয়। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং তাফসীরকারগণের একটি দল এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো আলেম আবার সর্বনামটি 'আয়াত' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। কেননা 'আয়াত' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক বহুবচন হলে হবে কিতাব বা কোরআনের অর্থপ্রদায়ক। তাই তা অর্থগতভাবে পুংলিঙ্গবাচক একবচনের সর্বনাম। এমতাবস্থায় 'বা' হচ্ছে কারণপ্রকাশক। কেননা কোরআন শ্রবণের পরেই তাদের অন্তরে জেগে উঠেছিলো বিশ্বাসবানদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকা।

'সামার' অর্থ রাত্রিকালিন কিসসা-কাহিনী, গল্প-গুজব করা। অর্থাৎ মুশরিকেরা রাতে কাবার আসে পাশে বসে বিভিন্ন রকমের গল্প-গুজব করতো এবং কোরআন শ্রবণ করলেই প্রকাশ করতো তাদের দম্ভ। 'সামিরুন ' হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। যেমন বাকের ও হামেল। এটাও বহুবচন। কেননা শব্দটি ' 'মুসতাকবিরীন' এর কর্তার অবস্থাপ্রকাশক। আর 'মুসতাকবিরীন' হচ্ছে বহুবচন। তাই কথাটিকে 'হুম সামারুন' এবং 'হুম সামিরুন' দু'টোই বলা যায়। 'নেহায়া' গ্রন্থেও একথা বলা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে 'ইজ্‌জ্বাআ-যাওজুহা মিনাস্‌ সামিরি' (যখন তার স্বামী ওই সকল লোকের কাছ থেকে এসেছে, যারা ব্যস্ত ছিলো কিসসা-কাহিনী নিয়ে)।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'সামারা', 'সামরান'ও 'সামুরান' অর্থ জাগ্রত থাকে। 'হুমুস সামারা' 'ওয়াস্‌সামিরাতুন' এবং 'সামিরুন' হচ্ছে বহুবচনবোধক বিশেষ্য। 'সামারা' অর্থ রাত্রি, নিশিথের কল্প-কাহিনী, চন্দ্রালোক, রাতের আঁধার, কাল। বায়যাবী লিখেছেন, ফায়িলুনের শব্দরূপে সামিরুন। মূলত শব্দটি ধাতুমূল, যেমন আফিয়াতুন। কেউ কেউ বলেছেন, 'সামিরুন' শব্দটি একটি একবচন বোধক শব্দ। কিন্তু তা বহুবচনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন 'তিফলুন' ব্যবহৃত হয় 'আতফালে'র স্থলে। এক আয়াতে এসেছে— 'ইয়াখরুজুকুম ত্বিফলান'। এখানেও 'ত্বিফলান' অর্থ 'আত্বফালান'।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'সামিরুন' বলে আঁধার রাতকে। এই অর্থই হবে এখানে সঙ্গত। তাই এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— রাতে তোমরা কিসসা-কাহিনীতে মত্ত থাকতে, আর কোরআনের আবৃত্তি শুনলে অহংকার প্রদর্শন করতে।

'তাহজুরুন' শব্দটি এসেছে 'হাজরুন' থেকে। এর অর্থ অশ্লীল উক্তি, মন্দ আলোচনা। আর 'হাজর' অর্থ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, নিরর্থক কথা বলা, সরে পড়া। অর্থাৎ কোরআন-শ্রবণ থেকে তোমরা কেটে পড়ো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। অথবা রসুল স. কিংবা কোরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অর্থহীন কথাবার্তা বলো। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কুরায়েশেরা কাবাগৃহের আশেপাশে বৈঠকী আলোচনায় মত্ত থাকতো। কিন্তু তাওয়াফ করতো না, আবার কাবার প্রতিবেশী বলে অহংকারও করতো। তাদের এমতো আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটি।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۚ بَلْ

جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ۝

❒ তবে কি উহারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না উহাদিগের নিকট এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের নিকট আসে নাই?

❒ অথবা উহারা কি উহাদিগের রসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে?

❒ অথবা উহারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? না, সে উহাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা এই বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না তাদের নিকটে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি'? প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। উল্লেখ্য যে না সূচক বাক্যের অস্বীকৃতি থেকে ধর্তব্য হয় হ্যাঁ সূচক । আল ক্বওল অর্থ কোরআন পাক। আলিফ লামটি সীমিতার্থক। অর্থাৎ রসুল মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ বাণীবৈভব যা তিনি উপস্থাপন করেছেন। তারা যথেষ্ট চিন্তা গবেষণা করেছে এ কোরআন সম্পর্কে। যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এর প্রতি। সক্ষম হয়নি ছোট্ট একটি সুরার অনুরূপ সুরা তৈরী করতে। ফলে তাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে এর অজেয়তা। প্রত্যয়িত হয়েছে, এটা মানব রচিত নয়। প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়— প্রত্যাদেশিত বাণীর বিষয় তো তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তাদের পিতৃপুরুষ হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের উপরও অবতীর্ণ হয়েছিলো এরকম প্রত্যাদেশ। এ বিষয়ে তারাতো অবহিত। এখন আবার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। সুতরাং বিষয়টি তো তাদের কাছে অননুধাবনীয় নয়।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি তাদের রসুলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?' একথার অর্থ— যিনি তাদের কাছে রেসালাতের দাবি উত্থাপন করেছেন, তিনি কি তাদের অপরিচিত কেউ? তাঁর জন্ম, বংশপরিচয়, আমানতদারী, পবিত্র চরিত্র, সৌজন্য, অঙ্গীকারপূরণপ্রিয়তা, অক্ষরের অমুখাপেক্ষিতালব্ধ জ্ঞান— এগুলো সম্পর্কে কি তাদের জানা নেই? এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্ণিত পরিচিতি সমূহের কোনো একটি সম্পর্কেও যদি তাদের জানা না থাকে, তবুও তো বিনা প্রমাণে তাঁকে রসুল না মানা অন্যায়।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ?' এখানকার 'আম' হচ্ছে অস্বীকৃতি প্রকাশক। অর্থাৎ আমার রসুল কস্মিনকালেও উন্মাদ নয়। অথচ ধৃষ্টতা প্রদর্শকেরা বলে, তিনি নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতত্রয়ের সকল 'আম' হচ্ছে আমে মুত্তাসিলাহ্ (অবিচ্ছিন্ন বাক্য)। আর 'আফালাম ইয়াদ্দাব্বারু' হচ্ছে 'জুমলায়ে মুস্তানিফা (বিচ্ছিন্ন বাক্য)। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— শ্রবণকারীরা যখন কোরআনের আয়াত শোনে, তখন তাদের মনে অযথা সন্দেহ জাগে, ফলে তারা সেখান থেকে সরে পড়ে, অহংকার করে এবং হয়ে যায় অশ্লীল বাক্যালাপের মুখপত্র। তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, অথবা তাদের নিকট ইতোপূর্বে কি কোনো পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়নি, কিংবা আমার এখনকার রসুলের বিশ্বাসভাজনতা সম্পর্কে কি তারা অবহিত নয়? তারা বলে, আমার রসুল উন্মাদ! কী জঘন্য উক্তি! না, এরূপ কখনোই নয় । নবী-রসুলগণ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। আমার শেষ রসুলও অবশ্যই সেরকম। একথা সূর্যালোক সদৃশ সত্য, গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'না, সে তাদের নিকট সত্য এনেছে'। একথার অর্থ— আমি আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি— না, আমার প্রিয়তম রসুল কখনোই উন্মাদ নন। তাঁর বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান সুস্থ, উচ্চ ও'গভীর। সুতরাং বিকৃতমস্তিষ্ক ও হিংসুকেরা ছাড়া তাঁকে কেউ উন্মাদ বলতে পারেই না।

'আল হাক্ব' অর্থ সর্বজনবিদিত সত্য। অর্থাৎ যা প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ও বুদ্ধিগত দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা স্বল্পবুদ্ধি ও গভীর বোধের অভাবে এখনও সত্যের দিকে এগিয়ে আসছে না, কিন্তু তারা শত্রু মনোভাবাপন্ন নয়। ওই কিছু সংখ্যককে বাদ দিলে তাই বলতে হয়, তাদের অধিকাংশই সত্যবিদ্বেষী।

সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৭১, ৭২

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

❒ সত্য যদি উহাদিগের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃংখল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে, আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ, কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ অথবা তুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই'। একথার অর্থ— সত্য যদি ওই সকল পৌত্তলিকদের কামনা-বাসনানুযায়ী হতো, তবে অসংখ্য উপাস্য এ পৃথিবীতে অবস্থান করতো; সবকিছু হয়ে পড়তো বিশৃঙ্খল, বরং এই মহাবিশ্বতো যেন অস্তিত্বই লাভ করতো না। যেমন অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে — যদি এ আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো তাহলে অবশ্যই বিনষ্ট করে দিতো এ দুটিকে।

ইবনে জুরাইজ, মুকাতিল, সুদ্দী ও বিচক্ষণ আলেমের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, এখানে 'আল হাক্ব' (সত্য) অর্থ আল্লাহ্। হজরত বারা ও জুহাক বলেছেন, এখানে সত্য অর্থ কোরআন। এমতো অর্থ গ্রহণীয় মনে করা হলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যদি তাদের কামনা-বাসনানুসারে অন্যকে তার শরীক করতেন, সন্তান গ্রহণ করতেন, তবে এই মহানিসর্গ হয়ে পড়তো শতধাবিচ্ছিন্ন। অথবা তিনি যদি এই কোরআন অবতীর্ণ করতেন তাদের অভিপ্রায়ানুসারে, তবে এতে থাকতো অংশীবাদিতা ও পাপের শিক্ষা, তখন আল্লাহ্ তো আর আল্লাহ্ই থাকতেন না। অনস্তিত্বের আঁধারে আবৃত থাকতো সমগ্র সৃষ্টি। কারণ মহাসৃজন ও মহাপ্রতিপালনের ক্ষেত্রে অংশীবাদিতার অস্তিত্ব মাত্র নেই। আর আল্লাহ্ কখনো শিরিক ও গোনাহর শিক্ষা দিতে পারেন না। তিনি যে সকল দোষত্রুটি থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সত্য যদি তাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অনুগামী হতো, তবে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে কোনোকিছু আর অবশিষ্ট থাকতো না, যার উপরে প্রবহমান রয়েছে এই মহাসৃষ্টি। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. কর্তৃক আনীত ধর্ম যদি অংশীবাদীদের আকাংখা, অভিলাষের অনুগামী হতো, তবে আল্লাহ্র এককত্ববোধের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো বহু উপাস্যের ধারণা। তখন আল্লাহ্ সকলের উপরে গজব অবতীর্ণ করতেন। ফলে সবকিছু হয়ে যেতো নিশ্চিহ্ন, নিরস্তিত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'জিকরিহিম' অর্থ এমন

সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ, যা আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথবা ওই স্মারক, যা ছিলো তাদের কাম্য। যেমন এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে— লাও আন্‌না ইন্‌দানা জিকরাম মিনাল আউয়ালীনা লাকুন্‌না ইবাদিল্‌লাহিল মুখলাসীন' (আমাদের নিকট যদি থাকতো পূর্ববর্তীদের কোনো উপদেশ, তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর বাঞ্ছিত বান্দা)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জিকরিহিম' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই গ্রন্থকে, যেখানে বিবরণ রয়েছে বিশ্বাসীদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের। অর্থাৎ কোরআন মজীদ। অন্য আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— লাক্বাদ আনযালনা ইলাইকুম কিতাবান ফিহী জিকরিহিম' (আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্‌নাহু লাজিকরুল্‌ লাকা' (নিঃসন্দেহে এটা আপনার মর্যাদার মাধ্যম)। মোট কথা, কোরআনে গ্রহণ করা হয়েছে কুরায়েশদের মুখের ভাষা। আর ভাষার দিক দিয়ে মানুষকে করা হয়েছে কুরায়েশদের অনুগামী। আর রসুলপরবর্তী খেলাফতও নির্ধারিত হয়েছে কেবল তাঁদের জন্য।

'ফাহুম আ'ন্‌ জিকরিহিম মু'রিদূন' অর্থ— কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মর্মার্থ— তারা এমন কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যা তাদের মান-মর্যাদার মাধ্যম।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'অথবা তুমি কি তাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাও'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিসূচক। সুতরাং এর অর্থ হবে— হে আমার রসুল! আপনি তো তাদের কাছে বিনিময়-প্রত্যাশী নন যে, বিনিময় প্রদানের ভয়ে তারা ইমান ও হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌ আখেরাতে যে প্রতিদান আপনাকে দিবেন, সেই প্রতিদানইতো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণপ্রদাতা। সুতরাং আপনি তাদের বিনিময়ের মুখাপেক্ষীই নন। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক 'আম' অব্যয়।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, এখানকার 'খরাজ' ও 'খিরাজ'। সমার্থক অর্থাৎ এমন ব্যয়, যার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। আর এক অর্থ অপরকে প্রদান করা। যেমন বায়যাবী লিখেছেন দখল অর্থ আয়, এর বিপরীত অর্থ ব্যয়। শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির করের বেলায়। 'খইর' অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত, প্রবহমান।

وَاِنَّكَ لَتَدۡعُوۡهُمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ○ وَاِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوۡنَ ○ وَلَوۡ رَحِمۡنٰهُمۡ وَكَشَفۡنَا مَا بِهِمۡ مِّنۡ ضُرٍّ لَّلَجُّوۡا فِیۡ طُغۡیَانِهِمۡ یَعۡمَهُوۡنَ ○

❒ তুমি তো উহাদিগকে সরলপথে আহ্বান করিতেছ।

❒ যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত;

❒ আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমিতো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো মানুষকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন সরল পথের দিকে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছে আহ্বান প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ। বলা হয়েছে আহ্বানকারী যেহেতু পার্থিব লাভ ও লোভের প্রত্যাশী নয়, এবং যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সকলেই জ্ঞানী এবং যেহেতু তাঁর প্রদর্শিত পথ নয় বক্রতাবিশিষ্ট, সেহেতু তা প্রত্যাখ্যানের অতীত। এতদসত্ত্বেও যারা প্রত্যাখ্যানপ্রবণ তারা যে জ্ঞানহীন ও সত্যের শত্রু, সে কথা সুনিশ্চিত। আর তারা যে এরকম করবে তা তাদের সৃষ্টির সূচনালগ্নেই নিরূপিত হয়েছে। তারা চিরদুর্ভাগা। নয়তো তারা এরকম করবে কেনো? জাগতিক সকল কর্মকাণ্ডে তাদের জ্ঞান সতত সচল থাকলেও স্থায়ী কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধি এতো অকার্যকর হবে কেনো? 'ওয়াল্লাহু ইয়াহ্‌দি মাঁইয়াশা-উ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম' (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে দেন এবং সঠিক পথে চলার সামর্থ দান করেন)।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা তো সরলপথবিচ্যুত'। একথার অর্থ— মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি যাদের প্রত্যয় নেই, তারা তো সরল পথ থেকে চ্যুত। তাদের বোধ ও বুদ্ধি বিপর্যস্ত। কারণ তাদের অস্তিত্বের উৎসারণ ঘটেছে আল্লাহ্‌তায়ালার 'আলমুদ্বিললু' (পথ ভ্রষ্ঠকারী) নাম থেকে। সুতরাং সোজা পথে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে দয়া করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে'। 'দ্বুররিন্' অর্থ দুঃখ-দৈন্য,

আযাব। এখানে 'দুঃখ-দৈন্য' বলে বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধে নিহত পৌত্তলিক নেতাদের উপরে আপতিত দুঃখ-দৈন্যকে। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। আর জুহাক বলেছেন, রসুল স এর অপপ্রার্থনার ফলে মক্কার মুশরিকদের উপরে অবতীর্ণ দুর্ভিক্ষকে। উভয় ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যের অনুকূল।

'লালাজ্‌জু ফী তুগ্‌ইয়ানিহিম ইয়া'মাহুন' অর্থ— তথাপিও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকবে। নিমজ্জিত থাকবে বক্রতা ও ভ্রষ্টতায় ।

'ফী তুগ্‌ইয়ানিহিম' অর্থ বিভ্রান্তিতে, বক্রতায় অথবা ভ্রষ্টতায়। যেমন— আত্মঅহংকারে, সীমালংঘনে অথবা রসুল স. এর শত্রুতায়। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে দয়া করিনি, যদি দয়া করে আমি তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেও দেই, তবুও তারা পড়ে থাকবে বিভ্রান্তির অতল তলে। সেখানেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হতে থাকবে অনন্তকাল।

নাসাঈ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, একবার আবু সুফিয়ান রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! আমি তোমাকে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, এ দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও। আমরা তো পশুর পশম ও রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে চলেছি। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭৬, ৭৭

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

❒ আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি নত হইল না এবং কাতর প্রার্থনাও করিল না।

❒ যখন আমি উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করলাম'। এখানে 'আযাব' (শাস্তি) অর্থ বদর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তি, অথবা শাস্তি দুর্ভিক্ষের।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামাসতাকানু লিরব্বিহিম' (কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নত হলো না)। একথার অর্থ— কিন্তু তারা তাদের দয়াময় প্রভুপালকের দিকে ফিরে এলো না, অনড় হয়ে রইলো সত্য-প্রত্যাখ্যানের উপর। 'আস্‌তাকানু' হচ্ছে বাবে ইস্তেফআ'ল, যার মূল হচ্ছে 'কাউনুন', যা পরিবর্তন বা স্থানান্তরণের মুখাপেক্ষী। অথবা 'আসতাকানু' হবে বাবে ইফতিয়াল থেকে, যার মূল 'সুকুনুন' (কাফের পরে আলিফে ইশবাঈ)।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ামা ইয়াতাদ্বররাউন'(এবং কাতর প্রার্থনাও করলো না)। একথার অর্থ— এবং তারা রোদনকাতর প্রার্থনাও নিবেদন করলো না, অনুতাপজর্জরিত ও রোদনকাতর হবার যোগ্যতাই যে তাদের নেই।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আছাল হানাফী রসুল স. এর দরবারে বন্দী অবস্থায় এলে তিনি স. তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার পর ছেড়ে দেন। তিনি মক্কাগমনের পর মুসলমান হন এবং কুরায়েশদের খপ্পর থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন মক্কা ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী এক স্থানে। এরপর তিনি বন্ধ করে দেন ইয়ামামা থেকে মক্কাভিমুখী যাবতীয় বাণিজ্য কাফেলা। ফলে মক্কাবাসীরা পড়ে বিপাকে। চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় তাদের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তারা জন্তু-জানোয়ারের পশম পর্যন্ত খেতে শুরু করলো, তখন নিরুপায় হয়ে আবু সুফিয়ান মদীনায় রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি কি নিজেই দাবি করোনা যে, তুমি সমগ্র বিশ্বের রহমত? রসুল স. বললেন, নিঃসন্দেহে। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার বাপ-দাদাদেরকে তলোয়ার দ্বারা এবং তাদের বংশধরদেরকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা মেরে চলেছো কেনো? তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াতে একথার সাক্ষ্যও বিদ্যমান যে, আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ - দৈন্য দূর করলেও তারা অবনত হবে না আমার সম্মুখে।

একটি সন্দেহঃ বর্ণিত তাফসীর দৃষ্টে একথাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ্ মক্কাবাসীদেরকে যে শাস্তি দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তা দূর করেননি। অথচ বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাদের জন্য বদদোয়া করলেন; হে আল্লাহ্! নবী ইউসুফের যুগের মতো এদের উপরেও দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দাও। বলাবাহুল্য দোয়া কবুল করা হলো। দুর্ভিক্ষের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে আবু সুফিয়ান রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কি দাবি করো না যে, তুমি সকলের ও সকলকিছুর জন্য রহমত? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তুমি তোমার পিতৃপুরুষদেরকে তরবারীর আঘাতে এবং তাদের সন্তানদেরকে দুর্ভিক্ষের আঘাতে এভাবে সংহার করে চলেছো কেনো? যাহোক, এখন তাহলে দোয়া করো, আল্লাহ্ যেনো দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। রসুল স. দোয়া করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। উল্লেখ্য, এ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ দুর্ভিক্ষ অপসারিত করে দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাফসীর ও হাদিসের এই বৈসাদৃশ্যের সমন্বয় সাধন কীভাবে সম্ভব। এর জবাবে আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের প্রতি

দয়া করা হয়নি, শাস্তিও অপসারণ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্ জানতেন যে, শাস্তি দূর করে দিলেও তারা অবিশ্বাসেই অনড় থাকবে। কিন্তু ওই শাস্তি যে দূরীভূত হয়ইনি— সেকথার উল্লেখ আয়াতে নেই। তাই একথা বলতে আর বাধা নেই যে, পরবর্তীতে রসুল স. এর দোয়ায় ওই শাস্তি অপসারিত হয়েছিলো। কিন্তু তার পরেও তারা তওবা করেনি। বরং অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মতো ঘুরেই চলেছিলো।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই, তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে'। এই আয়াতেও 'কঠিন শাস্তি' অর্থ দুর্ভিক্ষের শাস্তি। অবশ্য ৬৪ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'যখন আমি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা আঘাত করি' কথাটির অর্থ বদর যুদ্ধের শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ক্ষুধার শাস্তি বন্দীত্ব অথবা নিহত হওয়ার শাস্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। তাই কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই বলে আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে। আর জুহাকের মতানুসারে যদি কেবল 'শাস্তি' দ্বারা দুর্ভিক্ষের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে 'কঠিন শাস্তি' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কবরের আযাব, কিয়ামতের আযাব এবং দোজখের আযাবের কথা। যদি তাই হয় তবে একথাও বুঝতে হবে যে, এখানকার অতীতকালবোধক 'ফাতাহ্না' ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তির নিশ্চিতার্থে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাদের এ সকল শাস্তি সুনিশ্চিত। যেমন করা হয়েছে 'হাজাশ্ শামসু কুব্বীরাত' আয়াতে। এমতাবস্থায় এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি— বন্দীত্বের, হত্যার ও দুর্ভিক্ষকালীন ক্ষুধার; কিন্তু কোনো কিছুতেই নত হয়নি তারা, কাতর প্রার্থনাও জানায়নি, অবশেষে যখন তাদেরকে আখেরাতের আযাবে নিপতিত করা হবে, তখন তারা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে হতাশ। উল্লেখ্য, তাদের এমতো হতাশার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে 'ইয়াওমা তাকুমুস সাআ'তু ইউবলিসুল মুজ্রিমুন' আয়াতের তাফসীরে।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ তিনিই তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।

❒ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে তোমাদিগের বংশ বিস্তার করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্রিত করা হইবে।

❒ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই তোমাদেরকে শুনবার জন্য কান, দেখবার জন্য চোখ এবং উপলব্ধি করবার জন্য হৃদয় দান করেছেন, যাতে তোমরা দেখে শুনে বুঝে সত্য সরল পথের সন্ধান পেতে পারো। অর্জন করতে সমর্থ হও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বলীলাম্ মা তাশকুরূন' (তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো)। এখানে 'ক্বলীলাম্ মা' এর 'মা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। 'ক্বলীলান্' অর্থ যৎ সামান্য। গ্রহীতার দায়িত্ব হচ্ছে দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও দান করেছেন, সেই চিরঅসমকক্ষ মহাসৃজয়িতার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু মানুষ এই অত্যাবশ্যক দায়িত্ব অল্পই পালন করে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রচলিত অর্থে কথাটি না সূচক। যদি এটাকেই গ্রহণ করা হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা একেবারেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে'। একথার অর্থ— 'হে মানুষ! আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে এনে তোমাদের বংশ থেকেই সৃষ্টি করেছেন বহুসংখ্যক মানুষ। এভাবে তোমাদেরকে সম্প্রসারিত করার পর পুনরায় সকলকে একত্রিত করবেন তাঁর সকাশে পুনরুত্থান দিবসে।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে আবর্তন ঘটে রাত্রি ও দিবসের'। একথার অর্থ— জীবন-মৃত্যু তাঁরই অভিপ্রায়াধীন ও ক্ষমতায়ত্ত। দিবস-নিশিথের নিয়মিত আবর্তনও তাঁর বিধানানুগত। সুতরাং একথা মেনে নিতে হবেই যে, তিনি অতুলনীয়রূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' একথার অর্থ— তোমরা এতো কিছু শুনে, দেখে, বুঝেও কি একথা মেনে নিবেনা যে, সকল কিছুই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ও শক্তিমত্তার অধীন, জীবন-মৃত্যু, দিবারাত্রির আবর্তন সব। একথাও কেনো স্বীকার করবে না যে, যিনি একবার জীবন দিতে সক্ষম, তিনি তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৮১, ৮২, ৮৩

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ
عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

❒ এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা বলে উহাদিগের পূর্ববর্তীগণের মত,

❒ উহারা বলে, 'আমাদিগের মৃত্যু ঘটিলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হইব?'

❒ 'আমাদিগকে তো এই বিষয়েই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকেও। ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এতদসত্ত্বেও মক্কার মুশরিকেরা তাদের পূর্ববর্তীযুগের মুশরিকদের মতো একইভাবে বলে, আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

এখানকার প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়— এমন কখনোই হতে পারে না যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবো।

এরপরের আয়াতের মর্মার্থ— আমাদেরকে যেভাবে এখন পুনরুত্থানের কথা শোনানো হচ্ছে, তেমনি শোনানো হতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। আসলে পুনরুত্থান, হিসাব নিকাশ এগুলো কিছুই নয়, কল্প-কথা মাত্র।

'আসাত্বীর' অর্থ উপকথা বা মিথ্যা কথা। 'সাত্বর' অর্থ সারি—গ্রন্থের, বৃক্ষের, মানুষের। এখানে প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য। 'সাত্বরা ফুলানুন' অর্থ অমুক ব্যক্তি লিখেছে। 'সাত্বরে'র বহুবচন 'আসত্বার' 'সুতুর'। আর 'আসাত্বীর' হচ্ছে আসত্বা'র এর বহুবচন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমাদেরকে প্রদত্ত পুনরুত্থানের এই সংবাদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে কিংবদন্তী, উপকথা, কল্পকাহিনী যা যুগ যুগ ধরে জনশ্রুতিতে প্রবহমান।

মুবাররাদ বলেছেন, আসাত্বীর হচ্ছে 'আসতুরাহ' এর বহুবচন, যেমন বহুবচন 'আরাজীহ' 'আরজুহাহ' এর 'আহাদীস' 'আহদুসাহ' এর, 'আআজীব' 'আ'জুবাহ্' এর এবং 'আজাহীক' 'আজহুকাহ্' এর। নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য লিপিবদ্ধ ও উচ্চার্য ভিত্তিহীন কাহিনীকে বলে আসাত্বীর। তাই শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ মিথ্যা কথন।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ ○ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ○

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান তবে বল, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার?'

❒ উহারা বলিবে,'আল্লাহের।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?'

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?'

❒ উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

❒ জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাহার উপর রক্ষক নাই?'

❒ উহারা বলিবে, 'আল্লাহের।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ?

❒ আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য পৌছাইয়াছি; কিন্তু উহারা তো মিথ্যাবাদী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো, তবে বলো, এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?' এখানে 'যদি তোমরা জানো' কথাটির অর্থ— নিশ্চয় তোমরা জানো। অর্থাৎ আল্লাহ্ই যে সকল কিছুর একক সৃজয়িতা সে কথা না মেনে কারো উপায়ই যে নেই। এই বিষয়টির অস্বীকৃতি অসম্ভব।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা একথা ভালো করে জানো যে, আল্লাহ্ই পৃথিবীবাসীদেরকে ও আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তবে তোমরা একথা মানতে চাওনা কেনো যে, তিনি পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পূর্ণরূপে সক্ষম? তিনি এরকম করবেনও। নিশ্চিত করবেন সকলের যথাপুরস্কার ও যথাতিরস্কার। দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি নিশ্চয় প্রথম বারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, আল্লাহ্র। বলো, তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! 'এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে, তারা কার' আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে যখন তারা বলবে, আল্লাহ্র, তখন আপনি তাদেরকে বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! তাদেরকে পুনঃ জিজ্ঞেস করুন, সপ্ত আকাশ এবং মহাআরশের মহাঅধিপতি কে? তারা বলবে, আল্লাহ্। আপনি বলুন, এরপরেও কি তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে অনবধান থাকবে? আঁকড়ে ধরে থাকবে অংশীবাদিতাকে? আপনি তাদেরকে আবারো জিজ্ঞেস করুন, যদি তোমরা জানো তবে আমাকে বলো, সামগ্রিক ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি সকলের এবং সকল কিছুর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন এবং যিনি ভিন্ন অন্য কোনো রক্ষক নেই? তারা বলবে, আল্লাহ্র। আপনি তখন বলুন, তবুও তোমরা কী কারণে বিভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছো? কীভাবে অস্বীকার করে চলেছো পুনরুত্থানকে।

এখানে 'মালাকুত' অর্থ রাজকীয় কর্তৃত্ব, সম্মান, প্রাধান্য, বিজয়। শব্দটির সঙ্গে 'ওয়াও' ও 'তা' অক্ষরদুটি সংযোজিত হয়েছে মুবালাগার (আধিক্যের) জন্য। সুতরাং শব্দটির অর্থ— এমন চূড়ান্ত বিজয়, যা অননুমাননীয়। সেকারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও শক্তিমত্তা জ্ঞাপনার্থে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মালাকুত' অর্থ অসীম ভাণ্ডার।

'ইউজ্বীরু' অর্থ রক্ষা করেন, হেফাজত করেন সকল অনিষ্ট থেকে, আশ্রয় দান করেন যাকে খুশী তাকে। 'ওয়ালা ইউজ্বারু আ'লাইহি' অর্থ আল্লাহ্ যাকে আশ্রয় দিবেন না, কেউ আশ্রয় দিতে পারবেও না তাকে। সুতরাং তিনি যাকে আশ্রয় দেন, তাকে কেউ আশ্রয়চ্যুত করতে পারে না এবং যাকে করেন আশ্রয়হারা, তাকেও কেউ দিতে পারে না কোনো আশ্রয়।

এরপরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— 'আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী'। এখানে 'আলহাক্ব' (সত্য) অর্থ তওহীদ ও কিয়ামতের সংবাদ। আর এখানে 'তারা তো মিথ্যাবাদী'। অর্থ— তারা তো আল্লাহ্র এককত্বের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানকারী এবং মহাপ্রলয়ের সংবাদ অমান্যকারী।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৯১, ৯২

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟

❑ আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাহার সহিত অপর কোন ইলাহ্ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া পড়িত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

❑ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি সন্তান গ্রহণকারীদের সমতুল নন। তিনি সকল সাদৃশ্য ও আনুরূপ্য থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। আর তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যেও কারো কোনো প্রকার অংশ নেই। এরকম অংশ যদি কারো থাকতো, তবে ওই অংশীদারেরা আপনাপন অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তো। কূটকৌশল ও যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে তারা তখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতো একে অপরের উপর। ফলে মহানিসর্গের নিয়ম ও শৃঙ্খলা হয়ে পড়তো বিপর্যস্ত। তাই একাধিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেন'— অংশীবাদীদের এমতো উক্তি সর্বৈবরূপে মিথ্যা। এরকম ধারণা, কল্পনা ও বক্তব্য থেকে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— ' তিনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে'। আল্লাহ্র অংশীবিহীনতার দ্বিতীয় প্রমাণ বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। উল্লেখ্য, গুণী ব্যক্তির গুণ হতে পারে কোনো নির্দেশের বিশেষ কারণ। যেমন— তোমার পুরনো বন্ধু জায়েদের সঙ্গে

সদাচরণ করো। এখানে পুরাতন বন্ধুত্বই হয়েছে সদাচরণের নির্দেশ প্রদানের কারণ। তেমনি আল্লাহ্‌র কোনো শরীক না থাকার একটি প্রমাণ বা কারণ এই যে, তিনি সর্বজ্ঞ— দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। অন্য কেউই এরকম নয়। হতে পারে না।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ○ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ○ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ○

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও,

❒ 'তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

❒ আমি তাহাদিগকে যে-বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম।

❒ মন্দের মোকাবেলা কর উত্তম দ্বারা উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন এভাবেঃ হে আমার প্রভুপালনকর্তা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে, সে শাস্তি যদি তুমি অবতীর্ণ করতেই চাও, তবে তুমি আমাকে সীমালংঘনকারীদের কাছ থেকে পৃথক করে রেখো।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি, তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তির ভয় আমি দেখিয়েছি, তা আমি অবশ্যই আপনাকে দেখাতে পারি। কিন্তু আপনি যে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। আবার আপনার কারণে তাদের কেউ কেউ তো ইসলামও গ্রহণ করেছে, ঘটে চলেছে তাদের বংশবিস্তারও।

উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা বার বার কিয়ামত ও আযাবকে অস্বীকার করে যাচ্ছিলো। বার বার বলে যাচ্ছিলো, কথিত আযাব এখনই অবতীর্ণ হচ্ছে না কেনো? তাদের এমতো ত্বরাপ্রবণতাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'মন্দের মোকাবেলা করো উত্তম দ্বারা'। এখানে 'উত্তম দ্বারা' অর্থ উত্তম আচরণ দ্বারা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ঔদার্য ও কল্যাণকামনা দ্বারা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'উত্তম' অর্থ কালেমায়ে তওহীদ এবং 'মন্দ' অর্থ কালেমায়ে শিরিক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মন্দ' অর্থ পাপ এবং 'উত্তম' অর্থ মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যাকে বেঁচে থাকতে বলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি জানি আপনাকে নিরন্তর সহ্য করতে হয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসঙ্গত ও অসুন্দর বাক্যবান, অপআচরণ। এজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিও আমি অবতীর্ণ করতে পারি। সুতরাং আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের জন্য শাস্তি কামনা করবেন না। আপনি যে আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাকল্যাণের রসুল। আপনি বরং ধৈর্যধারণ করুন। উত্তম আচরণ দ্বারা প্রতিহত করুন তাদের অযৌক্তিকতাকে। তাদের বোধোদয়ের জন্য কিছুকাল তাদেরকে প্রদান করুন অবকাশ। শাস্তির জন্য নির্ধারিত সময় তো রয়েছেই। যথাসময়ে তাদের উপর আমি অবশ্যই অবাধ্যতার শাস্তি আপতিত করবো।

সূরা মু'মিনূন : আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে'

❒ 'হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি উহাদিগের উপস্থিতি হইতে',

❒ যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক'! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর,

❒ যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই।' না, ইহা হইবার নয়। এতো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে যবনিকা থাকিবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে'। এখানে 'হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীন' অর্থ শয়তানের কঠিন কুপ্ররোচনা।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি থেকে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি আমার নামাজে ও অন্যান্য ইবাদতে কঠিন কুপ্ররোচনা প্রেরণকারী ওই সকল শয়তানের উপস্থিতি থেকে তোমার নিকটে আশ্রয় যাচনা করি। কারণ তারা বিশ্বাসীগণের নিকটে উপস্থিত হয় কেবল কুপ্ররোচনা প্রেরণের উদ্দেশ্যেই।

এরপরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো'। এখানকার 'হাত্তা' হচ্ছে 'হাত্তা ইবতেদাইয়া' (সূচনা মূলক অব্যয়) । এর সম্পর্ক রয়েছে ৯৬ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'তারা যা বলে সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত' কথাটির সঙ্গে, অথবা ৯০ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কারো মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামের নির্ধারিত অংশ তাকে দেখানো হয়। বলা হয়, তুমি যদি বিশ্বাসী হতে তবে তোমার জন্য নির্ধারণ করা হতো জান্নাতের ওই স্থানটি, কিন্তু তুমি তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাই এখন তোমাকে প্রেরণ করা হবে তোমার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে। ওই সময় সে বলে, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও।

এখানে 'ইর্জিঊ'নী (আমাকে প্রেরণ করো) বলে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ্‌কে। কিন্তু সম্বোধনটি বহুবচনবোধক। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ এক হলেও কেবল সম্মান প্রদানার্থেই করা হয়েছে এরকম বহুবচনের ব্যবহার । কেউ কেউ বলেছেন, এটা হচ্ছে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। বহুবচনবোধকতার ব্যবহার এসেছে এখানে একারণেই। এর প্রকৃত রূপ ছিলো 'ইরজিঊ'ন'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'প্রতিপালক' (রব) বলে বুঝানো হয়েছে প্রাণহরণকারী ফেরেশতাগণকে। কেননা মৃত্যুপথযাত্রী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সরাসরি প্রার্থনা জানায় তাদের নিকটেই। বলে, আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে দাও।

এরপরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি'। এখানে ফীমা তারাক্তু (যা আমি পূর্বে করিনি) কথাটির অর্থ যে ইমান আমি পূর্বে গ্রহণ করিনি। অর্থাৎ যে ইমানকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যে বিশ্বাসকে আমি ইতোপূর্বে পরিত্যাগ করেছিলাম, সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নির্দেশিত সৎকর্ম সম্পাদনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দাও। অথবা— যে সম্পদ আমি পৃথিবীতে ছেড়ে এসেছি সেই সম্পদ পুণ্যকর্মে ব্যয় করনার্থে আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে চলে যেতে দাও।

ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা ইমানদারের নিকট আবির্ভূত হলে বলে, তোমাকে কি দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিবো? ইমানদার বলে, আবার কি সেই চিন্তা-ভাবনাসঙ্কুল আবাসের দিকে? আমি তো যেতে চাই আল্লাহ্র দিকে। আর এমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তার সঙ্গে মিলনকে প্রিয় মনে করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্মিলনকে অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তার সঙ্গে মিলনকে অপ্রিয় মনে করেন। জননী আয়েশা অথবা অন্য কোনো উম্মত জননী একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কেউই তো মৃত্যুকে প্রিয় মনে করি না। তিনি স. বললেন, না, এরকম নয়। প্রকৃত পরিস্থিতি এরকম— মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করা হয় আল্লাহ্র পরিতোষ ও মর্যাদাদানের সুসংবাদ। তখন পিছনের কোনো কিছুই আর তার কাছে প্রিয় মনে হয় না। তারা তখন হয়ে ওঠে আল্লাহ্র সন্দর্শনাকাংক্ষী। আর অবিশ্বাসীদের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাদেরকে দেয়া হয় আল্লাহ্র অপরিতোষ ও শাস্তির বার্তা। তারা তখন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকে সর্বাপেক্ষা অধিক অপ্রিয় মনে করে এবং আল্লাহ্ও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে অপ্রিয় মনে করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'না, তা হবার নয়'। একথার অর্থ— মৃত্যুর ফেরেশতা তখন বলে, না, এখন পৃথিবীতে প্রত্যাগমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতো তার একটি উক্তি মাত্র'। এখানে 'কালিমাহ্' অর্থ উক্তি— পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক। ব্যাকরণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ একটি শব্দসম্বলিত বাক্য বা উক্তি। কিন্তু আরববাসীগণের পরিভাষায় কথাটির অর্থ পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের সম্মুখে যবনিকা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত'। একথার অর্থ— তাদের সামনে রয়েছে বরজখ। মুজাহিদ বলেছেন, ওই সকল লোকের প্রত্যাগমনের মধ্যে রয়েছে পর্দা বা প্রতিবন্ধক। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'বারযাখুন্' অর্থ পৃথিবীর অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল। কেননা অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনন্তজীবনের দিকে যাত্রা করা যায় না। জুহাক বলেছেন, 'বারযাখ্' অর্থ মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়। কেউ কেউ বলেছেন,'বারযাখ' উদ্দেশ্য কবর।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০১

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

❒ এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না, এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না,

---

সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে শিংগায় প্রথম ফুৎকারের কথা। অর্থাৎ যে ফুৎকার দিলে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, সেই ফুৎকারের কথা। তখন আকাশ পৃথিবীর সকল কিছু হয়ে যাবে নিশ্চেতন। তাই কেউ কারো আত্মীয়স্বজন বা প্রিয়জনের খোঁজখবর রাখতে পারবে না। দীর্ঘকাল এভাবে থাকার পর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। তখন সবাই নিজ নিজ স্থানে উঠে দাঁড়াবে এবং বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চেয়ে থাকবে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে শুরু করবে বাক্যালাপ।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা। তখন সকলে পুনরুত্থিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে নিজ নিজ স্থানে। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, পুনরুত্থান দিবসে সকল মানব-মানবীকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে একে অপরের সম্মুখে। এক ঘোষক বলবে, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক, সে যদি কারো হক নষ্ট করে থাকে তবে সে যেনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার কাছে চলে আসে। ওই সময় যে লোক তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী অথবা ভাইয়ের নিকট কোনো হকের পাওনাদার হয়, তবে সে আনন্দিত হবে। যথাবিনিময়ও আদায় করে নিবে। একথা বলে হজরত ইবনে মাসউদ পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'ফুৎকার' অর্থ শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার।

'যেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না' কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ বংশমর্যাদার কারণে অহংকার প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ বংশীয় বন্ধনের কোনো মূল্য তখন থাকবে না । অথবা কথাটির অর্থ হবে— সেদিন আত্মীয়েরা একে অপরের কোনো উপকার করতে পারবে না। আপন পরিণতি-চিন্তায় তখন সকলে এতো ব্যতিব্যস্ত ও ভীত থাকবে যে, কারো প্রতি কেউ কোনো ভালোবাসা খুঁজে পাবে না। দূর হয়ে যাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি। পরিস্থিতিগত ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, লোকেরা পালাতে থাকবে তাদের পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে।

এখানে 'বাইনাহুম' এর 'হুম' সর্বনাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্থলাভিষিক্ত, যাদের আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের অবস্থা হবে তখন অন্যরকম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আলহাক্বনা বিহিম জুররিয়্যাতাহুম' (আমি তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিবো)। রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে পুত্রসন্তানেরা দাঁড়িয়ে থাকবে হাউজে কাউসার ও বেহেশতের নহরের নিকটে। তাদের হস্তধৃত পাত্রে থাকবে পবিত্র পানীয়। কেউ ওই পানীয় পান করতে চাইলে তারা বলবে, না, আমি এই পানীয় পান করাবো আমার মাতা-পিতাকে। এমনকি গর্ভপাত হয়ে যাওয়া সন্তানও সেদিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে বলবে, আমার মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরাও প্রবেশ করবো না। হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু জর থেকেও।

একটি সন্দেহ ঃ বিশুদ্ধসূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেদিন আমার বংশীয় ও নিকটজনদের সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকলের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সন্দেহের জবাব কী?

জবাবঃ রসুল স. হচ্ছেন সকল বিশ্বাসীর পিতা। এভাবে বিশ্বাসীরা রসুল স. এর আত্মার আত্মীয়। আর তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণ হচ্ছেন বিশ্বাসীগণের মাতা। আত্মার আত্মীয়তার এই সম্পর্কটিই সেদিন থাকবে অবিচ্ছিন্ন।

বাগবী লিখেছেন, এক হাদিসে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে কারো বংশ অথবা অন্য কোনো মাধ্যম উপকারপ্রদায়ক হবে না, কেবল রসুল স. এর বংশ ও মাধ্যম ছাড়া। অর্থাৎ কোরআন ও ইমান ছাড়া।

'একে অপরের খোঁজখবর নিবে না'। কথাটির অর্থ— সেদিন কেউ কারো বংশপরিচয়ের কথা জানতে চাইবে না, যেমন পৃথিবীবাসীরা বলে, তুমি কোন গোত্রের, কোন বংশের?

একটি সন্দেহঃ এক আয়াতে এসেছে— 'ওয়া আক্ববালা বা'দুহুম আ'লা বা'দিন ইয়াতাসাআলুন'। এতে করে বুঝা যায় সেদিন মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

সন্দেহের জবাবঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্রলয়কালে কেউ কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না। কারণ তখন সকলে থাকবে অচৈতন্য অবস্থায়। চেতনা ফিরে পাবে পুনরুত্থানের পর। তখন তারা শুরু করবে পারস্পরিক বাক্যালাপ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০২

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

❑ এবং যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম।

'মাওয়াযীনু' অর্থ পাল্লা। এর একবচন হচ্ছে 'মাওযুনুন'। এখানে 'পাল্লা ভারী হবে' অর্থ পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। অর্থাৎ পাপের তুলনায় পুণ্যের ওজন হবে বেশী। অথবা 'মাওয়াযীনু' এর এক বচন হচ্ছে মীযান। মীযান অর্থ হিসাবের পাল্লা। এভাবে 'পাল্লা ভারী হবে' কথাটির অর্থ হবে— হিসাব গ্রহণ কালে যার নেকীর পাল্লা ঝুঁকে পড়বে। এখানে একবচন 'মীযান' উল্লেখ না করে এর বহুবচনবোধক শব্দরূপের ব্যবহার করা হয়েছে একারণে যে, সেদিন সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে পৃথকভাবে পৃথক পৃথক পাল্লার মাধ্যমে। অথবা এখানে 'মাওয়াযীনু' হচ্ছে মীযানের সংখ্যাগত সমষ্টি।

'মুফলিহুন' অর্থ সফলকাম। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ এবিষয়ে একমত যে, মহাবিচারের দিবসে' মীযানের মাধ্যমে ওজন করা হবে সকলের পাপ-পুণ্য, এব্যাপারে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু খারেজী, মুতাজিলা ও শিয়া সম্প্রদায় একে অস্বীকার করে থাকে। অন্যান্য বেদাতীরাও মীযান ও ওজনে বিশ্বাস করে না।

বায়হাকী তাঁর আলবা'ছ গ্রন্থে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদিসে জিবরাইল নামে যে প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত জিবরাইল রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মোহাম্মদ! ইমান কী? তিনি স. বললেন, এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, আরো বিশ্বাসস্থাপন ফেরেশতাবৃন্দ, বার্তাবাহকবর্গ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও মীযানের প্রতি। একথার উপরেও বিশ্বাস স্থাপন যে, সকল ভালো ও মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। হজরত

জিবরাইল বললেন, আমি যদি এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তবে কি আমি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হজরত সালমান থেকে মুসলিম সূত্রে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, মহাবিচারের দিবসে মীযান স্থাপন করা হবে। আর ওই মীযান এতো বড় হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাতে সংকুলান হবে। ইবনে মুবারক তাঁর 'আজ্‌জুহুদ' গ্রন্থে এবং আজরী তাঁর 'আশ্‌শরিয়ত' গ্রন্থে পরিণতসূত্রে এবং ইবনে হাব্বান তাঁর তাফসীর গ্রন্থে যথাক্রমে হজরত সালমান এবং হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, মীযানের হবে একটি দণ্ড ও দুইটি পাল্লা। ইবনে আবিদ্‌ দুনইয়া ও ইবনে জারীর তাঁদের আপনাপন তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচার দিবসে মীযানের পরিচালক হবেন হজরত জিবরাইল। উল্লেখ্য, মীযানের বিষয়টি সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত।

আনুসাঙ্গিক আলোচনা : পাপ-পুণ্যের ওজন কীরূপে হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বান্দাকে তার আমলসহ মীযানে ওঠানো হবে। বিশ্বাসীগণের ওজন হবে তাঁদের পুণ্যানুসারে। আর অবিশ্বাসীদের কোনো ওজনই হবে না।

রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে উপস্থিত করা হবে মোটা-তাজা কিছু লোক। কিন্তু তাদের ওজন হবে ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষসদৃশ। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'ফালা নুক্বিমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়ায্‌নান'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক হাদিসে একথা এসেছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, যে সকল লোকের ওজন হাল্‌কা হবে তারা হবে কাফের। পাপী মুমিনদের ওজন কিন্তু হালকা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, পাল্লায় ওঠানো হবে পাপ-পুণ্যের আমলনামা। হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, বিচারকালে আমার এক উম্মতকে সকলের সম্মুখে আনা হবে। নিরানব্বইটি দপ্তর খোলা হবে তার। প্রত্যেকটি দপ্তরের দৈর্ঘ্য হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহ্‌ বলবেন, এগুলোর কোনো একটিকেও কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমার আমল লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপরে জুলুম করেছে? সে বলবে, না। আল্লাহ্‌ বলবেন, কেনো নয়? তোমার তো একটি অলিখিত পুণ্য আমার কাছে জমা রয়েছে। আজ শেষ হিসাবের দিন। সুতরাং তোমার অধিকার খর্ব করা হবে না।

এরপর তার সম্মুখে মেলে ধরা হবে একটি কাগজের টুকরা। সে দেখবে, সেখানে লেখা রয়েছে— আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশআদু আন্না মোহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু। সে নিবেদন করবে, হে আমার প্রভুপালক! আমার এই বিশাল বিশাল দপ্তরের উপস্থিতিতে এই ছোট কাগজের টুকরা উপস্থিত করার রহস্য কী? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার প্রতি আজ অবিচার করা হবে না। এরপর সকল দপ্তর এক পাল্লায় রেখে কাগজের টুকরাটি রাখা হবে অপর পাল্লায়। দেখা যাবে, কাগজের টুকরা সম্বলিত পাল্লাটিই অধিক ভারী। আল্লাহ্র নাম অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু কি অধিক ভারী ও ওজনদার হয়? হজরত ইবনে ওমর থেকে উত্তম ও বিশুদ্ধসূত্রে আহমদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আমলসমূহকে অবয়ববিশিষ্ট করে পাল্লায় উত্তোলন করা হবে। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে মীযানের এক পাল্লায় রেখে দিয়ে অপর পাল্লায় যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যকে উত্তোলন করা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র পাল্লাই অধিক ভারী হবে। তিবরানী।

ইবনে আব্দুর রাজ্জাক এলেমের ফযীলতের পরিচ্ছেদে স্বসূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের দিন মানুষের আমল রাখা হবে এক পাল্লায়, অপর পাল্লায় রাখা হবে বালিকণা সদৃশ এক প্রকার বস্তু। দেখা যাবে ওই পাল্লাই অধিক ভারী হয়েছে। অতঃপর ওই লোককে বলা হবে তুমি কি জানো, বালিকণা সদৃশ বস্তুগুলো কী? সে বলবে, না, আমি জানি না। তখন তাকে বলা হবে, এ হচ্ছে এলেমের ফযীলত, যা তুমি মানুষকে শিক্ষা দিতে।

এলেমের ফযীলতের বর্ণনায় হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে ইমাম জাহাবী সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমল ওজনের দিবসে ওজন করা হবে আলেমগণের এলেমের নূর ও শহীদগণের রক্ত। দেখা যাবে আলেমগণের পাল্লাই শহীদগণের রক্তাপেক্ষা অধিক ওজনদার।

আমি বলি, সেদিন বিশ্বাসীগণকে তাদের আমলনামাসহ অথবা তাদের আমলকে দেহবিশিষ্ট করে এক পাল্লায় রাখা হবে। অপর পাল্লায় রাখা হবে মন্দ আমলসহ অবিশ্বাসীদেরকে, তাদের আমলগুলোকেও তখন করা হবে দেহবিশিষ্ট। কিন্তু দেখা যাবে, তাদের আমলগুলো কীটপতঙ্গের পাখার মতোও নয়। এই প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে— 'ওয়ামান খফ্ফাত মাওয়ামীনুহু' (মীযানে তার কোনো ওজনই হবে না)। বিশ্বাসীগণের দাঁড়িপাল্লায় কিছু না কিছু ওজন করা হবেই,

কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র সাক্ষ্যও যদি হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে— 'এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে'। তবে ভারী হওয়ার বিষয়ে থাকবে শ্রেণীভেদ। যে বৃহৎ পাপ থেকে বেঁচে থাকবে এবং যার অন্যান্য পাপকে আল্লাহ্ দূর করে দিবেন, দাঁড়িপাল্লায় তার আমলের ওজন হবে সবচেয়ে বেশী, আর তার পাপের পাল্লা হবে শূন্য ও ওজনহীন। আর যাদের আমল হবে পাপপুণ্য সংমিশ্রিত, তাদের কেউ কেউ যাবে জান্নাতে এবং কেউ কেউ জাহান্নামে। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পাপ পুণ্যের ওজন গ্রহণের সময় যদি কারো পাপের তুলনায় একটি পুণ্যও বেশী হয়, তবে সে-ও প্রবেশ করবে বেহেশতে এবং যার পুণ্যাপেক্ষা পাপ বেশী সে প্রবেশ করবে দোজখে। অর্থাৎ পাপ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই তাকে তখন প্রবেশ করানো হবে দোজখের আগুনে, যেমন আগুনে পুড়ে পাকসাফ করা হয় লোহাকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মীযানে ওজন করা হবে ছয় রতির চেয়েও কম পাপ-পুণ্যের। যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে, তারা হবে আরাফের অধিবাসী, এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে বসবাসের পর আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে এক সময় তারা চলে যাবে বেহেশতে। ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিতে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি একারণে যে, অবিশ্বাসীদের কোনো পুণ্যই থাকবে না। আবার কোরআন মজীদে কেবল বলা হয়েছে পুণ্যবান বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কথা। পাপী বিশ্বাসীগণের কোনো আলোচনা কোরআনে নেই। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ওই যুগে সকল বিশ্বাসীগণই ছিলেন পুণ্যবান। তারা ছিলেন রসুল স. এর সম্মানিত সহচর। উল্লেখ্য, বৃহৎ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীও পাপহীনগণের মতো।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۝

❒ এবং যাহাদিগের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে।

❒ অগ্নি উহাদিগের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহাদিগের মুখমণ্ডল হইবে বীভৎস;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এবং যাদের পুণ্যের পাল্লা শূন্য হবে, অথবা যারা হবে পুণ্যহীন তাদের আমলের কোনো ওজনই করা হবে না। তারাই হবে অবিশ্বাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত। জাহান্নাম হবে তাদের স্থায়ী আবাস।

হজরত আনাস থেকে বাযযার ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আদম সন্তানদেরকে দাঁড় করানো হবে মীযানের দুই পাল্লার মাঝখানে। সেখানে নিয়োজিত করা হবে এক ফেরেশতাকে। যার পাল্লা হবে ভারী, সমগ্র সৃষ্টি শুনতে পায়, এমন আওয়াজে ওই ফেরেশতা তার সম্পর্কে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। সে আর কখনো দুর্ভাগা হবে না। আর যার পাল্লা হবে হালকা, তার সম্পর্কে সে বলবে, এই ব্যক্তি ভাগ্যহীন। সে আর কখনো সৌভাগ্যশালী হবে না। এই হাদিসে 'খফ্ফাত' শব্দটির উদ্দেশ্য— একেবারেই ওজন না হওয়া।

আমি বলি, সম্ভবত পাপী বিশ্বাসীদের আমলনামা ওজন করা হবে দু'বার। প্রথম ওজনে পুণ্যাপেক্ষা পাপ বেশী হওয়ার কারণে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে দোজখে। কিছুকাল শাস্তিভোগের পর যখন তাদের পাপক্ষয় হবে, তখন পুনরায় ওজন করা হবে তাদের আমলনামা। তখন দেখা যাবে তাদের পাপাপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা ভারী। ঘোষক ফেরেশতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলবে, এই ব্যক্তি সৌভাগ্যমণ্ডিত। আর কখনও সে সৌভাগ্যহীন হবে না। আমি সুরা ক্বারিয়া'য় এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি।

আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে কেবল কাফেরদের পরিণতির কথা। বলা হয়েছে, 'তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে'। এ কথার অর্থ পৃথিবীতে নিজেকে পুণ্যসমৃদ্ধ করার যে সুযোগ তারা পেয়েছিলো, সেই সুযোগ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে তারা।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে'। একথার অর্থ— তখন তাদের মুখমণ্ডলে জ্বালিয়ে দেয়া হবে আগুন আর আগুন। কামুস গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। কিন্তু গোনাহ্গার মুমিনেরা কিছুকালের জন্য দোজখবাসী হলেও তাদের মুখমণ্ডলে আগুন জ্বালানো হবে না। হজরত জাবের থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, এই উম্মতের কিছু লোক দোজখবাসী হবে সত্য, দোজখের আগুন তাদেরকে দগ্ধও করবে, কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল থাকবে অগ্নিশূন্য। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে। জিয়া এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু দারদা বলেছেন, 'অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে' সম্পর্কে একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, আগুনের একটি

লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। ফলে তাদের সারা শরীরের গলিত মাংস বয়ে পড়বে পদতলের গ্রন্থিসমূহে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিবরানী ও আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে স্পর্শ করবে আগ্নির একটি সুতীব্র শিখা। ফলে তাদের গোশত হবে অস্থিচ্যুত এবং তা ঝুলে পড়বে পায়ের টাখনু পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস'। কথাটির অর্থ— তখন তাদের অগ্নিদগ্ধ দুই ওষ্ঠ সরে যাবে স্বস্থান থেকে— উপরের ওষ্ঠ উপরের দিকে এবং নীচের ওষ্ঠ নিচের দিকে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. 'এবং তাদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগুন তাদেরকে এমনভাবে দগ্ধিভূত করবে যে, উপরের ঠোঁট উঠে যাবে মস্তকের মধ্যখান পর্যন্ত এবং নিচের ঠোঁট গিয়ে ঠেকবে নাভিমূলে। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, মুখমণ্ডল বীভৎস হওয়া সম্পর্কে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আগুনে পুড়ে তাদের দন্ত হবে বহির্গত ও ওষ্ঠ সংকুচিত।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ○ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ○ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ○ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ○

❑ তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় নাই? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করিয়াছিলে।

❑ উহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়;

❑ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এই খানেই থাক্ এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্ না।'

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— তখন দগ্ধমান দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, দেখো, কী নিদারুণ দুর্দশা আজ তোমাদের? তোমরা তো যথাসময়ে সতর্ক হতে পারতে। তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকটে আবৃত্তি করা হয়েছিলো। হয়নি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে অনড়ভাবে চেপে বসেছিলো। তাইতো আজ আমাদের এই করুণ পরিণতি। এখন আমরা বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যিই আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। কিন্তু হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এ অবিশ্রান্ত অগ্নিদহন যে অসহনীয়। আমরা পরিত্রাণার্থী। অতএব, আমাদেরকে উদ্ধার করো। পুনরায় প্রেরণ করো পৃথিবীতে। আমরা আর সত্যপ্রত্যাখ্যান করবো না। যদি করি, তবে তো আমরা অবশ্যই হবো সীমালংঘনকারী এবং চিরশাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ্ তখন বলবেন, না, পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরণ আমার নিয়ম নয়। সুতরাং তোরা এখানেই অনন্ত কাল ধরে হীন অবস্থায় দগ্ধীভূত হতে থাক। হয়ে যা নির্বাক।

'ইখসাউ' অর্থ হীন অবস্থায় নির্বাক হয়ে যা। অর্থাৎ দূর হয়ে যা। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'খসাআল কালবা' অর্থ কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 'খসাআল কালবু' অর্থ কুকুর দূর হয়েছে। যেমন— 'ইনখসাআ' অর্থ দূর হয়েছে। কথাটি ইনফিয়াল রূপে লাজেমও হবে, আবার হবে মুতাআদ্দিও। আর 'খসাউন' এবং 'খুসুউন' হচ্ছে ধাতুমূল।

'ওয়ালা তুকাল্লিমুনী' অর্থ কথা বলিস্ না। অথবা আমার কাছে শাস্তি থেকে উদ্ধারের কথা আর বলিস্ না। এ শাস্তি অন্তহীন। এ ঘোষণার পর চিরহতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে দোজখীরা।

হাসান বলেছেন, এটাই হবে চিরদোজখীদের সঙ্গে শেষ কথা। এরপর কেবল ভয় ও বাধ্যগত ধৈর্য অবলম্বনই হবে তাদের শেষ সম্বল। শুধু কুকুরের মতো অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে থাকবে তারা। নিজের অপরের কারো কথাই আর বুঝতে সক্ষম হবে না। কুরতুবী বলেছেন, যখন তাদেরকে বলা হবে 'আমার সঙ্গে আর কথা বলিস্ না' তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সকল আশাভরসা থেকে। নিমজ্জিত হবে নিঃসীম নিরাশায়। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে কেবল। আর চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে দোজখের উপরের সকল দরজা।

হান্নাদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জাওয়াইদুল জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, দোজখবাসীরা দোজখের পরিচালক মালেক ফেরেশতাকে ডেকে বলবে, হে দোজখ-সংরক্ষকদের নেতা! তুমি তোমার

প্রভুপালককে ডেকে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে উদ্ধার করেন। মালেক চল্লিশ বছর নিশ্চুপ থাকার পর বলবে, এখানেই তোমাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল। দোজখীরা তখন আল্লাহ্‌কে ডেকে বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আল্লাহ্ তাদের কথার কোনো জবাব দিবেন না। এভাবে কেটে যাবে পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংসের সময়ের দ্বিগুণ পরিমাণ সময়। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানে থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এর পর থেকে দোজখীরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ। শ্বাস-প্রশ্বাসের গড়গড় শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই তাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে না।

সাঈদ ইবনে মনসুর এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, যেন অগ্নিবাসীরা আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকবে। চতুর্থ বার ডাকার পর আল্লাহ্ তাদের কথার জবাব দিবেন। পঞ্চমবারের পর তারা আর কথা বলতে পারবে না। প্রথম বার বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান করেছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হবার কোনো পথ কি আমাদের জন্য খোলা আছে?' আল্লাহ্ বলবেন, 'যখন তোমাদের এক আল্লাহ্‌র উপরে আস্থা আনয়ন করতে বলা হয়েছিল, তখন তোমরা সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আশ্রয় করেছিলে অংশীবাদিতাকে। তাই তো তোমাদের আজ এই করুণ পরিণতি। আজ সিদ্ধান্ত সেই আল্লাহ্‌র যিনি আনুরূপ্যহীনভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত। 'তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা সবকিছু দেখলাম, শুনলাম। এখন তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। আমরা এবার অবশ্যই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবো ও পুণ্য কর্মে থাকবো সততসম্পৃক্ত'। আল্লাহ্ বলবেন, 'এই দিবসের আগমনে তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে, তাই আমিও আজ তোমাদের এই অগ্নি আযাব থেকে স্বেচ্ছাবিস্মৃত। এখন গ্রহণ করো তোমাদের মন্দ কর্মের নিদারুণ পরিণতির আস্বাদ। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! আমাদেরকে দান করো কিছুকালের অবকাশ। আমরা তোমার আহ্বানকে মান্য করবো, তোমার বচনবাহকের কথা মতো চলবো'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা কি আজকের এই দুর্দশার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে এই মর্মে শপথ করো নি যে, আমরা দুর্ভাগ্যবিমুক্ত?' তারা বলবে, 'হে আমাদের মহাসৃজয়িতা! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, আমরা যেনো বিগত জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম আমল করতে পারি'। আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি, যা ছিলো সদুপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট? আর তোমাদের নিকট কি কোনো ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরিত হয়নি? এবার তবে গ্রহণ করো শাস্তির স্বাদ। আজ

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই'। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা। দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রভুপালয়িতা! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো'। আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক। এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস্ না'। এরপর আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। ওই দগ্ধ ও বীভৎস মুখমণ্ডলে না থাকবে মুখ, না থাকবে নাসিকার কোনো চিহ্ন। থাকবে কেবল ভিতরে ভিতরে ধ্বনিত নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ। আগুনের সর্প ও বৃশ্চিক পতিত হবে তাদের উপর। সেগুলো অহরহ দংশন করতে থাকবে তাদেরকে। ওই সাপগুলোর কোনো একটি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে নিঃশ্বাস ফেলে, তবে তার বিষের প্রতিক্রিয়ায় পুড়ে যাবে অপর প্রান্তের অধিবাসীরা। আর ওই বিচ্ছুগুলোর কোনো একটি দংশন করলে মরে যাবে পৃথিবীর লোকেরা। ওই সকল আগুনের সাপ-বিচ্ছুর দংশনে চির দোজখীদের শরীরের সকল গোশত ঝুলে পড়বে তাদের পায়ের কাছে। আর কণ্ঠদেশ থেকে অনবরত উত্থিত হতে থাকবে অরণ্যের পশুকুলের আওয়াজের মতো অর্থহীন আওয়াজ।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ○ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

❒ আমার দাসদিগের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

❒ 'কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা হাসিঠাট্টা করিতে এতো মশ্গুল ছিলে যে, উহা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাসি-ঠাট্টাই করিতে'

❒ 'আমি আজ তাহাদিগকে তাহাদিগের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।'

মুকাতিল বলেছেন, হজরত আম্মার, হজরত সুহাইব, হজরত সুলায়মান প্রমুখ দরিদ্র সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতত্রয়। মক্কার মুশরিকেরা তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো।

আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার এই সকল দাস দরিদ্র হলেও আমার প্রিয়। তারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। কারণ তারা বিদ্রূপবানে জর্জরিত হয়েও বলে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো ও দয়া করো, প্রদান করো আশ্রয়। তুমি তো দয়ালুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু হে অংশীবাদীরা! তোমরা এদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় এতো বিভোর হয়ে যাও যে, আমার কথা তোমাদের মনেই থাকে না। হাসি-ঠাট্টা করাই যেনো তোমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। অথচ দেখো, আজ তারা তাদের ধৈর্যের কারণে পুরস্কৃত, সফলকাম।

'সিখরিয়্যান' অর্থ হাসি-ঠাট্টা। ক্বারী কুসাই ও ফারা বলেছেন, 'সিখরিয়্যা' এর 'সিন' অক্ষরটি হবে যের বা কাসরা যুক্ত। আর যদি 'সিন' পেশ যুক্ত হয়ে 'সুখরিয়্যান' হয় তবে তার অর্থ হবে কাউকে ক্রীতদাস বানিয়ে নেয়া, অপদস্থ করা। খলিল বলেছেন, শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন—'বাহ্রু লুজ্জিয়্যেন', 'বাহ্রু লিজ্জিয়্যেন'এবং 'কাওকাবুন দুররী' 'কাওকাবুন দিররী'। সুরা যুখরুফে উল্লেখিত 'সুখরিয়্যান' তাই হাসি-হাট্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ক্বারীগণ এব্যাপারে একমত। কামুস গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'সাখিরুমিনহু' এবং 'সাখিরুবিহী' অর্থ তার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে। ঠাট্টা (সাখিরু) এখানে বিশেষ্য। আর শব্দটি পেশযুক্ত যেমন হয়, তেমনি হয় যের যুক্ত। যেমন— সাখরাতুন, সিখরিয়্যান ও সুখরিয়্যান। এর অর্থ— তাকে থামিয়ে দিয়েছে অথবা বাধ্য করেছে এমন কাজের জন্য, যা সে করতে চায় না। নেহায়া গ্রন্থেও এরকমই বলা হয়েছে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে,'সিখরিয়ুন' ধাতুমূল। আর এখানে শব্দটি এসে মুবালাগার (আধিক্যের) জন্য। অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে 'ইয়া'। আর এখানে 'তামাশা' (ইসতিহ্জাহ) উদ্দেশ্য। এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে। বলা হয়েছে 'ওই হাসি তামাশা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো'।

হাসি-ঠাট্টা বাচনিক বিদ্রূপের পরেই হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত হওয়াকে বিশ্বাসীগণের সঙ্গে রূপক অর্থে যুক্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিলো তাদের স্মরণচ্যুত হওয়ার কারণ। ওই কারণকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এখানে তাই বলা হয়েছে, ওই হাসি-ঠাট্টাই তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো।

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ○ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

❒ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে?'

❒ উহারা বলিবে, 'আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।'

❒ তিনি বলিবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বলবেন, বলো, কতো বছর তোমরা ছিলে পৃথিবীতে ও মৃত্যুপরবর্তী কবরের জগতে?

পরের আয়াতে(১১৩)বলা হয়েছে—'তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা দিনের কিছু অংশ'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পশ্চাতের যাপিত জীবনকালকে মনে করবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এর বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন— ১. দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে অতীতের সুখের সময়কে মনে হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ২. বর্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় অতীতকে মনে হয় অত্যন্ত অল্প। ৩. আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পৃথিবী ও কবরের জীবনকে কম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ৪. অতীত কেটেছে আনন্দ উল্লাসে, তাই আখেরাতের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে এসে সে আনন্দ উল্লাসকে যৎকিঞ্চিত মনে হতেই তো পারে। শেষোক্ত কারণটিকে গ্রহণ করা হলে কেবল পৃথিবীর জীবনই হবে ধর্তব্য। কারণ কোরআন, হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্যানুসারে একথা সুপ্রমাণিত যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কবরের আযাব অবশম্ভাবী। তাদের পৃথিবীর জীবনই কেবল আনন্দ-উল্লাসমুখর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন'। এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের জবাব যদি সঠিক না হয়, তবে আপনি আপনার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব। কারণ তারা আজ পুরস্কৃত ও আনন্দিত। আর আমরা

তিরস্কৃত, অপদস্থ ও শাস্তিযোগ্য। অথবা এখানে 'গণনাকারীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে আমল লেখক ফেরেশতাগণকে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আপনি না হয় এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন আপনার পক্ষ থেকে নিয়োজিত আমাদের আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে। আমাদের জীবনালেখ্য তাদের কাছেই সুসংরক্ষিত। সুতরাং তাদের জবাবই হবে সঠিক জবাব।

এরপরের আয়াতে (১১৪) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বলবেন, আখেরাতের অনন্তকালের শাস্তির তুলনায় পৃথিবীর জীবন যৎসামান্য। সুতরাং যৎসামান্য সময়ের জন্যই তোমরা অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে। তোমাদের জন্য আক্ষেপ! একথা যদি তোমরা তখন বুঝতে পারতে।

রসুল স. বলেছেন, হাতের আংগুল সমুদ্রে ডুবিয়ে আনার পর তাতে যেটুকু পানি লেগে থাকে সেই পানিটুকুকেই পৃথিবীর জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে অসীম জলধিসম আখেরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায়। মুসতাওয়ারাদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা ও মুসলিম।

'যদি তোমরা জানতে' কথাটির মাধ্যমে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মূল দোষ। যেনো বলা হয়েছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যদি তখন সত্যিসত্যি বুঝতে পারতে যে অতিশীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীর জীবন, তবে তোমরা হাসি-ঠাট্টা, আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তিপূজার মধ্য দিয়ে তোমাদের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট হতে দিতে না। আজকের এই বিচার দিবসের কথাও বিস্মৃত হতে না। রসুল স. নির্দেশ করেছেন, দুনিয়ায় বসবাস করো মুসাফিরের মতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এ কথাটিও সংযুক্ত রয়েছে যে, 'নিজেকে কবরবাসীর মধ্যে গণ্য করে নাও'।

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ○ فَتَعَٰلَى
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ○ وَمَن يَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الْكَٰفِرُونَ ○ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّٰحِمِينَ ○

❒ 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?'

❒ মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।

❒ যে ব্যক্তি আল্লাহের সহিত ডাকে অন্য ইলাহ্কে, যাহার নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নাই; তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হইবে না।

❒ বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতে উত্থাপিত হয়েছে একটি হুমকি সহ অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (হামযায়ে ইনকারিয়া তাওবিখিয়া)। সুতরাং প্রশ্নের আকার উঠিয়ে দিলে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যেরকম মনে করেছিলে সেরকম নয়। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনর্থকরূপে এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না— এরকম কিছুতেই নয়। তোমরা ছিলে অজ্ঞ। তাই এ কথা তখন বুঝতে পারোনি যে, আল্লাহ্র পরিচয় অর্জন ও এক আল্লাহ্র ইবাদতে সমর্পিত প্রাণ হওয়াই ছিলো তোমাদের অস্তিত্বায়নের মূল উদ্দেশ্য। এখানে 'আ'বাসা' অর্থ অনর্থক, উদ্দেশ্যবিবর্জিত।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— 'মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই'। এখানে 'আলমালিকুল হাক্ব' অর্থ প্রকৃত মহারাজাধিরাজ। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রকৃত রাজা বা বাদশা কেবল আল্লাহ্। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা। এভাবে বক্তব্যটির উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনিই যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির একক সৃজয়িতা ও অধিকর্তা, সেহেতু তাঁর এই সৃষ্টি অনর্থক নয়। আর তাঁর নিকটে জবাবদিহির জন্য প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টিও প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র মহামর্যাদার জ্যোতিচ্ছটা প্রতিনিয়ত পতিত হয় আল্লাহ্র আরশের উপরে। তাই এখানে আরশকে বিশেষ গুণে বিভূষিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'আ'রশিল কারীম' (সম্মানিত আরশ)।

এরপরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে ডাকে অন্য ইলাহ্কে, যার নিকট এ বিষয়ে কোনো সনদ নেই; তার হিসাব তার

প্রতিপালকের নিকটে আছে; নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না।' এখানে 'ডাকে' অর্থ ইবাদত করে। তওহীদের নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। এমন ধর্মাদর্শও গ্রহণ করা যাবে না, যা প্রত্যাদেশিত নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে ব্যক্তি প্রত্যাদেশিত প্রমাণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে, মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তাকে এর জন্য কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। চিরদিনের জন্য শাস্তিগ্রস্তও হতে হবে। অনন্তকালের জন্য বাস করতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো প্রকার সুযোগ কোনো দিনই আর তারা পাবে না।

শেষ আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। এটাই সুরা মু'মিনূনের শেষ আয়াত। উল্লেখ্য, সুরার শুরুতে বলা হয়েছে 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা'। এবং শেষে বলা হলো 'নিশ্চয়ই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না'। আর সবশেষে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সকল অনুসারীগণকে শিক্ষা দেয়া হলো একটি উত্তম প্রার্থনা। বিশ্বাসীরা সফলকাম বলেই তাদের কাছে এই প্রার্থনার মূল্য অনেক, অনেক।

'ইগফির' অর্থ ক্ষমা করো। 'ওয়ারহাম' অর্থ— এবং দয়া করো। বলাবাহুল্য, এ দু'টো ছোট্ট কথার মাধ্যমে রচিত হয় প্রার্থনার বিশাল পরিসর। ক্ষমার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায় পশ্চাতের সকল অপরাধ। আর দয়াপ্রাপ্তির ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন, সেই লাভ করবে মহাকল্যাণ।

বাগবী লিখেছেন, হানাশ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে এক পাগলকে নিয়ে আসা হলো। তিনি ওই পাগলের দুই কানে 'আফাহাসিবতুম আন্নামা খলাক্বনাকুম' থেকে (১১৫ সংখ্যক আয়াত থেকে) এই সুরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফু দিলেন। পাগলটি সুস্থ হয়ে গেলো। রসুল স. হজরত ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি ওই লোকের কানে কী পড়ে ফুঁ দিয়েছিলে? তিনি বললেন, সুরা মু'মিনূন। রসুল স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! এই সুরা পাঠ করে কেউ যদি কোনো পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে ফুঁ দেয়, তবে সেই পাহাড়ও হয়ে পড়বে স্থানচ্যুত।

আলহামদুলিল্লাহ্ সুরা মু'মিনূনের তাফসীর শেষ হলো আজ সফর মাসের ১৫ তারিখে, ১২০৪ হিজরী সনে।

সূরা নূর

এই সূরার অবতরণ স্থল মদীনা। এর আয়াত সংখ্যা ৬৪ এবং রুকু সংখ্যা ৬। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হাশর এর পরে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ ইহা একটি সূরা ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহাতে দিয়াছি অবশ্য পালনীয় বিধান, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

❒ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— উহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে; আল্লাহের বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এই সূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা। আমিই এই সুরার অবতারণক। আর আমি এতে সন্নিবেশিত করেছি অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী। আরো উপস্থাপন করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তোমাদেরকে সতর্ক করণার্থে।

এখানে 'এটা আমি অবতীর্ণ করেছি' বলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই সুরার বিশেষত্বকে। 'ফারাদ্বনা' অর্থ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতারিত অবশ্যমান্য বিধান। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফারাদ্বনা' অর্থ— আমি একে বর্ণনা করেছি বিস্তারিতভাবে, পৃথক পৃথকরূপে ও স্পষ্ট করে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ফারাদ্বনা' অর্থ 'কাদ্‌দারনাহা' (আমি এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি)।

'বাইয়্যিনাত' অর্থ প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট। 'যাতে তোমরা সতর্ক হও' অর্থ যাতে তোমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো, বেঁচে থাকতে পারো নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে'। 'ফাজ্বলিদু' কথাটির মাধ্যমে এখানে দেয়া হয়েছে ব্যভিচারের বিধানের বিবরণ। আর সে বিধান হচ্ছে, অপরাধ প্রমাণিত হলে নারী-পুরুষ উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত এরকম বলেছেন সিবওয়াইহ্। মোবাররাদ বলেছেন, এখানে 'আয্‌যানী' (ব্যভিচারী) এবং 'আয্‌যানীয়াহ্ (ব্যভিচারিণী) এর মধ্যে রয়েছে আলিফ লামে মাউসুলা (জোযক অব্যয়) এবং শর্তের সম্বন্ধ রয়েছে এর সঙ্গে। তাই 'ফাজ্বলিদু' শব্দটির 'ফা' গণ্য হবে ফায়ে জাযাইয়া (পরিণতিপ্রকাশক ফা) হিসেবে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— যে সকল নারী-পুরুষ ব্যভিচার করবে, তাদেরকে করতে হবে একশতটি কশাঘাত। আর এখানে 'ফাজ্বলিদু' বলে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আঘাত করতে হবে শরীরের চামড়ার উপর। 'জ্বালদুন' অর্থ শরীরের চামড়ার উপরে প্রহার করা। যেমন 'জালদাহু' (তার চামড়ায় মেরেছে), 'র'সাহু' (তার মাথায় মেরেছে), 'বাত্বনাহু' (তার পেটে মেরেছে)।

মাসআলাঃ প্রহার করতে হবে এমন ছড়ি বা চাবুক দ্বারা যার রয়েছে গ্রন্থি বা গিরা। হানজালা সুদুসীর উক্তিরূপে ইবনে শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলতেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, চাবুকের গিরা কেটে দিতে হবে। এরপর চাবুকটিকে দু'টি পাথরে রেখে উত্তমরূপে থেতলা করতে হবে। এরপর শুরু করতে হবে কশাঘাত। হানজালা বলেন, আমি একথা শুনে বললাম, হে রসুল স. এর সহচর! এরকম করা হতো কোন সময়ে? তিনি বললেন, খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবের সময়ে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আমার উপরে হদ প্রয়োগ করুন। রসুল স. একটি চাবুক আনতে নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, এটা তো খুবই শক্ত। আর এতে গিরাও রয়েছে। আনতে হবে এর চেয়ে অশক্ত একটি চাবুক। একটু পরে আর একটি চাবুক আনা হলে তিনি স. বললেন, না, এটাও নয়। এটা আবার বেশী নরম। এরপর আনা হলো মধ্যম প্রকৃতির আর একটি চাবুক। তিনি স. তখন ওই চাবুক দিয়ে কশাঘাত করালেন লোকটিকে। জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে ইবনে আবী শায়বাও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর মুয়াত্তা'য়।

'মিয়াতা জ্বালদাতিন' অর্থ একশত কশাঘাত করবে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের প্ররোচনা প্রথমে আসে সাধারণতঃ নারীর দিক থেকে। কেননা শারীরিক সৌন্দর্য উন্মোচন করে তারাই আগে পুরুষকে উত্তেজিত করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারীর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ব্যভিচারিণীর কথা। আবার চৌর্যবৃত্তির পুরোধা হচ্ছে পুরুষ। তাই চুরি সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— আস্ সারিকু ওয়াস্ সারিক্বাতু (চোর আর মহিলা চোর) প্রথমে পুরুষ, তারপর নারী।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি অবিবাহিত, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে একশত কশাঘাত। আলোচ্য আয়াতে এই বিধানেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, তাদেরকে এর চেয়ে আর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, শাস্তি কার্যকর করার পর তাকে এক বৎসরের জন্য এমন দূরত্বে প্রেরণ করতে হবে, যে দূরত্বের কারণে নামাজকে কসর করতে হয়। যাত্রাপথ যদি নিরাপদ হয় তবে মুহরিম ছাড়াই শাস্তিপ্রাপ্তা নারীকে দূরে প্রেরণ করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের দু'টি অভিমত জানা যায়। 'মিনহাজ' গ্রন্থে রয়েছে, বিশুদ্ধ মত এই যে, এরকম নারীকে একাকী দেশান্তর করা যাবে না। দেশান্তর করতে হবে স্বামী অথবা মুহরিম (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষের সঙ্গে। তার ওই পুরুষ সঙ্গীকে কিছু বিনিময়ও দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই বিনিময় দিবে কে? এ সম্পর্কেও রয়েছে দু'টি অভিমত। একটি হচ্ছে— বিনিময় দিতে হবে ওই নারীর সম্পদ থেকে। দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে— বায়তুল মাল থেকে দিতে হবে ওই বিনিময়। বিনিময় প্রদান করা সত্ত্বেও যদি তার স্বামী অথবা মুহরিম তার সঙ্গে যেতে না চায়, তবে এক বর্ণনায় এসেছে, বিচারক তাকে যেতে বাধ্য করবেন। মিনহাজে রয়েছে, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, ইমাম এ ব্যাপারে বল প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম মালেক বলেন, শাস্তি প্রয়োগ করার পর ব্যভিচারীকে দেশান্তর করতে হবে, ব্যভিচারিণীকে নয়।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নিম্নের হাদিসসমূহ। যেমন— ১. হজরত উবাদা ইবনে সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। এবং বিবাহিত নারী-পুরুষ যথাক্রমে পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে উভয়কে একশত কশাঘাত করার পর করতে হবে সঙ্গেসার। এই হাদিসের প্রথমে রয়েছে, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও (ব্যভিচারের

বিধান আমার নিকট থেকে শিখে নাও, শিখে নাও)। উল্লেখ্য, প্রথমে বিধান দেয়া হয়েছিলো, ব্যভিচারিণীকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে, যতক্ষণ না তার জন্য নতুন বিধান দেয়া হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। বলা হয়— ব্যভিচারক ও ব্যভিচারিকা উভয়কে করতে হবে একশত কশাঘাত। সুরা নিসার তাফসীর করতে গিয়েও আমি যথাস্থানে হাদিসটি সন্নিবেশিত করেছি। ২. হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে করতে হবে একশত করে বেত্রাঘাত এবং তাদেরকে করতে হবে দেশান্তরিত। বোখারী। ৩. বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে খালেদ ও হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. এর মহান দরবারে একবার উপস্থিত হলো দু'জন লোক। একজন বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে আমাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে কিছু বলবার অনুমতি দিন। রসুল স. বললেন, বলো। লোকটি বললো, আমার ছেলে ছিলো এ লোকের কর্মচারী। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকজন আমাকে বলে, তোমার ছেলেকে সঙ্গেসার করা হবে (মাটিতে পুঁতে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মেরে ফেলা হবে)। শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে আমি তাকে একশ'টি ছাগল ও একটি ক্রীতদাসী দিলাম। এরপর আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করার পর দেশান্তর করতে হবে এক বৎসরের জন্য। আর ওই মহিলাকে করতে হবে সঙ্গেসার। একথা শুনে রসুল স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি এ বিষয়ের মীমাংসা করবো কিতাবুল্লাহ্র বিধানানুসারে। যাও, তুমি তোমার ছাগল ও ক্রীতদাসী ফেরত নিয়ে নাও। তোমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত, আর ওই মহিলার শাস্তি সঙ্গেসার। এরপর তিনি স. হজরত আনাসকে বললেন, আনাস! যাও, ওই মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এসো। সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার করো। ওই মহিলা এসে তার দোষ স্বীকার করলো। সঙ্গেসারও কার্যকর করা হলো তার উপর।

ইমাম মালেক এর জবাবে বলেন, হাদিসে উল্লেখিত 'আল বিকরুবিল বিকরি ওয়া তাগরীবু আমিন' কথাটির মধ্যে রমণীদের কথা বলা হয়নি। সুতরাং নারীদেরকে দেশান্তর করার বিধান এর অন্তর্গত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইমাম মালেকের এই অভিমতটি অযথার্থ। উল্লেখিত কথাটির অন্তর্গত নারীরাও। কারণ এই হাদিসের শুরুতেই বলা হয়েছে আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও— আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বিক্‌র (কুমারী নারী) থেকে (বিবাহের) অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া হজরত জায়েদের হাদিসে উল্লেখিত 'মান যানা' কথাটিও সাধারণ অর্থবোধক, পুরুষ ও নারী উভয়েই এর অন্তর্গত। তবে ইমাম মালেকের অভিমতকে বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে এই বলে যে, রসুল স. নারীদেরকে মুহরিম কাউকে সঙ্গে না নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুহরিম সঙ্গী ব্যতীত নারীরা সফর করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। আহমদ ও আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও বোখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমদ এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরকম আরো বর্ণনা করেছেন হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং আবু দাউদ হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এ সকল হাদিসের ভিত্তিতেই ইমাম মালেক বলেছেন, দেশান্তর করতে হবে কেবল পুরুষকে, নারীকে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছে, নারীকেও দেশান্তর করতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে দিতে হবে তার মুহরিম সঙ্গী।

তাহাবী লিখেছেন, নারীর জন্য যদি একাকী দেশান্তরের সফর নিষিদ্ধ করা হয়, তবে নিষিদ্ধ করতে হবে পুরুষের ক্ষেত্রেও। কারণ যদি কোনো সাধারণ বিধানের কিছু অংশ সুনির্দিষ্ট হয় তবে অনুমানের (কিয়াসের) মাধ্যমে অবশিষ্ট অংশকেও সুনির্দিষ্ট করা যায়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। যেমন তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি তোমাদের কোনো ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আর সেই ব্যভিচার যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, হুমকি প্রদর্শন করবে না। এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'লা ইয়াছরিবু' কথাটিও; যার অর্থ আমি করেছি 'হুমকি প্রদর্শন করবে না'। কথাটির আর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, হুমকি প্রদর্শনকেই যথেষ্ট মনে করবে না, বরং ব্যভিচারের দণ্ডবিধিও প্রয়োগ করবে। হাদিসটির পরবর্তী অংশ এরকম— দ্বিতীয় বার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, এর অতিরিক্ত কিছু করবে না। তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বিক্রয় করে দিবে। এক মুঠো চুলের বিনিময়ে হলেও। বোখারী, মুসলিম। এখানে রসুল স. তৃতীয় বার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে ওই ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করে দিতে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে, যদি দেশান্তরকে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে ক্রীতদাসী তো আর তার মালিকের অধিকারে থাকবে না। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিক্রেতার অধিকার যদি ক্ষুন্ন হয় তবে ক্রেতার অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করবে কী করে? কাজেই, এমতো নির্দেশ রসুল স. দিতে পারেন না। সুতরাং বলতে হয়, ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য নয়। আর ক্রীতদাসীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন রমণীকে তো

দেশান্তর না করাই উত্তম হবে। কারণ ক্রীতদাসীর শাস্তি স্বাধীন রমণীর শাস্তির অর্ধেক। যেমন এরশাদ হয়েছে— 'আলাইহিন্না নিসফু মা আলাল মুহসানাতি মিনাল আজাবি'। আর স্বাধীন রমণীকে যদি দেশান্তর করা না যায়, তবে স্বাধীন পুরুষকেও যাবে না। কারণ উভয়ের বিধান এক, এর মধ্যে কমবেশী করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু একথা বলার উপায় নেই যে, তাহাবীর এমতো ব্যাখ্যা যথার্থ। কারণ রমণীদের দেশান্তর প্রমাণিত হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে। পুরুষের একাকী সফরের নিষিদ্ধতা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং পুরুষের উপর দেশান্তরের বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী বলেন, বর্ণিত হাদিসের উপরে দেশান্তরের প্রমাণ স্থাপন করা ঠিক হবে না। কারণ এতে করে প্রমাণিত হবে যে, হাদিস কোরআনকে রহিত করে। এরকম একক বর্ণনা দ্বারা কোরআন রহিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একথা না বলেও উপায় নেই যে, তাদের দলিলও অগ্রহণীয়। রহিত হওয়ার বিধানে যে অগ্রাধিকারকে মেনে নেয়া হয়, তা সামগ্রিক অগ্রাধিকার নয়, বরং অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হবে কেবল কোনো বিশেষ কারণ, শর্ত বা গুণবত্তার উপর, যেনো সুসিদ্ধ কোনো কিছুকে আবার অসিদ্ধ না বলতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, নামাজে রোকনের মধ্যে সুরা ফাতিহার নির্ণায়ন, কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী ক্রীতদাস মুক্ত করার শর্ত, কাজা রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা, তাওয়াফের সময় পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির কথা। এ সকল ক্ষেত্রে হাদিস দ্বারা কোরআন রহিত হওয়ার ধারণা করা যায় না। কিন্তু সকল ক্ষেত্র এরকম নয়। যদি তাই হয়, তবে অধিকাংশ হাদিস অগ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন বৈধ্যব্যের ইদ্দত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু শোকপ্রকাশের প্রত্যয়ন কোরআনে নেই। শোক প্রকাশের কথা এসেছে হাদিসে, আর তা ইদ্দতের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবেও আসেনি। ইদ্দত পালনকালে কোনো রমণী যদি শোক পালন না-ও করে, তবু তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সে হয়ে যাবে গোনাহ্গার। কিন্তু ইদ্দত শেষে তার পুনঃবিবাহ অসিদ্ধ হবে না। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ এবং এর সঙ্গে অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব, কিন্তু তা নামাজের রোকন নয়। সুতরাং হাদিসের মাধ্যমে যদি বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরকে যুক্ত করা হয়, তবে এতে করে জায়েযকে নাজায়েয করা হয়েছে বলা যাবে না।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, দেশান্তর করা না করার বিষয়ে কোরআনে কোনো কিছুই বলা হয়নি। তাই হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি কোরআনের বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে অনিবার্য হয়ে পড়বে কোরআনের বিধানে অতিরিক্ত সংযোজন করা, যাতে সূচিত হবে রহিত করণ, যা কখনোই বিধিবদ্ধ নয়।

হানাফী তাত্ত্বিকগণ বলেন, সিবওয়াইহ্ এর বক্তব্যানুসারে সূরা নিসায় যে বিধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, সেই বিধানের বিবরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। সুতরাং এখানকার বিধানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান। যদি এরকম না হতো, তবে একে পরিহার করাই হতো শ্রেয়। কিন্তু মোবাররাদের উক্তি অনুসারে যদি আলোচ্য আয়াতের 'ফাজ্বলিদু' কথাটিকে শর্তের পরিণতি সাব্যস্ত করা হয়, তবে কথাটির উদ্দেশ্য হবে, একশত বেত্রাঘাতের বিধান তো অবশ্যই স্বস্থানে অনড়, এখন এর সঙ্গে যদি দেশান্তরকেও যোগ করা হয়, তবে তা হবে অতিরিক্ত।

এখানে এই মর্মে একটি সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে যে, হাদিসটি প্রসিদ্ধ বলে ইসলামী বিশ্ব গ্রহণ করেছে। আর একথাও মেনে নিয়েছে যে, এরকম হাদিস দ্বারা কোরআনের বিধানের সঙ্গে নতুন বিধান সংযোজন করা যায়। এ সম্পর্কে বলা যায়, ইসলামী বিশ্ব নিশ্চয় বর্ণিত হাদিসকে যথাসূত্রসম্বলিত বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু একথাও ঠিক যে, যথাসূত্রসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর শ্রেণীচরিত্র পরিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ একে একক বর্ণনার বাইরে কিছু মনে করা যাবে না। আর যথাসূত্রবিশিষ্ট হওয়ার এই উদ্দেশ্যটিকেও মানা যাবে না যে, সমগ্র উম্মতকে বিষয়টি মেনে নিতে হবে এবং এর উপরে আমল করতেই হবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ উম্মত দেশান্তরের আবশ্যকতাকে স্বকীয় বলে মনে করে না।

একটি জটিলতা ঃ সুবিদিত আয়াত তো স্বতঃসিদ্ধই। কিন্তু এর মর্মার্থ যুক্তিসিদ্ধ। কেননা আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াত আংশিক নির্দিষ্টকৃত একটি সাধারণ বিধান। যেমন আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে'। যদিও ব্যভিচারলিপ্ত প্রত্যেকেই এ বিধানের অর্ন্তভুক্ত, তবুও বিধানটি প্রযোজ্য হবে কেবল স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বেলায়। তাছাড়া অধিকাংশ আলেমগণের মতে তাদেরকে অবিবাহিতও হতে হবে। এর সঙ্গে দেশান্তরের বিধানের সংযোজনকেও করে নিতে হবে অনুমানের ভিত্তিতে। বিষয়টি স্বয়ং যুক্তিসিদ্ধ। এর উদ্ভাবন যুক্তিনির্ভর। পরিশেষে অধিকাংশ ফকিহ্ ও আরবী ভাষাবিদ এরূপ উদ্ভাবনের প্রবক্তা নন। এতে অনুমিত হয় যে, আয়াতটি সূত্রের দিক থেকে স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু পরিগঠিত হয়েছে যুক্তিসিদ্ধ হিসাবে। আর আলোচ্য হাদিসটি সূত্রের দিক থেকে একক বর্ণিত যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু পরিগণিত হয়েছে স্বতঃ সিদ্ধ হিসাবে। এখন কথা হচ্ছে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা যখন কোরআন রহিত করা যায়, তখন উত্তম হবে হাদিসকেই অগ্রাধিকার দেয়া। এর সমাধান কী?

সমাধানঃ এমতোক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসের বিধানে সমতার কথা যদি মেনেও নেয়া যায়, তবে অন্ততঃ এতটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে, ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য হাদিসের হুকুমই প্রথম হুকুম। হজরত উবাদার হাদিসে এসেছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। আল্লাহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের জন্য পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিতদের জন্য শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার। এখন দেখা যাচ্ছে আয়াত ও হাদিসে সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আয়াত রহিত হয় না, হয় রহিতকারী। ইমাম শাফেয়ী তাই বলেছেন, বিবাহিতদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের শাস্তি রহিত হয়েছে। তাদেরকে করতে হবে কেবল সঙ্গেসার। সুতরাং অবিবাহিতদের জন্য যদি দেশান্তরকে রহিত মনে করা হয়, তবে ক্ষতি কী? আর আলোচ্য আয়াতই হতে পারে এর রহিতকারী। এক্ষেত্রে অনুমানসিদ্ধতার অবকাশ আর নেই।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, দেশান্তর ওয়াজিব, এরকম কথা কোনো হাদিসে নেই। সুতরাং আমি একে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে পারি না। তবু হাদিসের মাধ্যমে কেবল ওয়াজিব বিধান বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের বিষয়টিও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এতে করে দেশান্তর ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বরং বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতের সঙ্গে দেশান্তরের কথাও বলেছেন। এই হাদিস দৃষ্টে অনুমতি হয়, দেশান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ ছিলো না। শাস্তি ছিলো কেবল বেত্রাঘাত। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় অপরাধী ও অপরাধিনীর চরম অবমাননা, অথবা শাস্তির পুনরাবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, পরিস্থিতিগত কারণে যদি বিচারক বেত্রাঘাতের পর দেশান্তরের নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে নাজায়েযও বলা যাবে না।

দ্রষ্টব্যঃ শাফেয়ীগণ দেশান্তরের বিধানকে প্রাধান্য প্রদানার্থে বলেন, এতে করে ব্যভিচারের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। কারণ নতুন স্থানে সে হয়ে যায় অপরিচিত। ফলে ব্যভিচারের সুযোগও তার জন্য হয়ে যায় অনিশ্চিত। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, বরং এতে করে তার জন্য ব্যভিচারের সুযোগ হয়ে যায় অবারিত। যেমন ব্যভিচারিণী পরিচিত জনদের ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার লজ্জা-শরম বলে আর কিছু থাকে না। অপরিচিত স্থানে সে বরং আরো বেশী নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে ব্যভিচার করার সুযোগ পায়। প্রবৃত্তিজাত আকর্ষণে সে যদি এরকম না-ও করে, তবে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনেও তার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় আবদুর রাজ্জাক এবং মোহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানীর কিতাবুল আছারের বর্ণনার মাধ্যমেও এ আশংকা প্রমাণিত হয়। তারা লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা, হান্নাদ

সূত্রে ইব্রাহিম নাখয়ীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তাদেরকে দেশান্তর করতে হবে এক বছরের জন্য। হজরত আলী একথা শুনে বললেন, দেশান্তর করলে তো সৃষ্টি হবে আরো অনেক বড় ফেতনা।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের উক্তিরূপে জুহুরী সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, হজরত ওমর মদ্যপানের অপরাধে রবীয়া ইবনে উমাইয়াকে খয়বরে দেশান্তর করেন। রবীয়া সেখানে গিয়ে রোমীয় প্রশাসক হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় এবং খৃষ্টান হয়ে যায়। হজরত ওমর এ সংবাদ পেয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর কোনো মুসলমানকে দেশান্তরের শাস্তি দিব না।

মাসআলাঃ বিচারক যদি মনে করেন বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর প্রয়োজন, তবে তিনি দেশান্তরের বিধানও প্রয়োগ করতে পারবেন। রসুল স. এর দেশান্তর সম্পর্কিত হাদিস এবং হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমানের সিদ্ধান্তেও একথার প্রমাণ রয়েছে। নাসাঈ, তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বোখারী-মুসলিমের শর্তানুসারে হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এবং দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. বেত্রাঘাতও করেছেন, আবার দেশান্তরও করেছেন, এরকম করেছেন হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও। ইবনে কাত্তান বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আর দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর।

অপ্রসিদ্ধ সূত্রে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওসমান এক মহিলাকে বেত্রাঘাত করেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দেন খয়বারে। উল্লেখ্য, কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই নয়, বিচারক অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও দেশান্তরের বিধান কার্যকর করতে পারেন।

হজরত আমর ইবনে শোয়াইব থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক তার গোলামকে হত্যা করে ফেললো। রসুল স. তার উপরে কার্যকর করলেন একশত বেত্রাঘাত ও দেশান্তর। তাকে খারিজ করেন বিত্তজনের তালিকা থেকে এবং মুক্ত করে দিতে বলেন একটি ক্রীতদাসকে।

সাঈদ ইবনে মনসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রমজান মাসে মদ্যপান করলো। হজরত ওমর তাকে দশটি বেত্রাঘাত করলেন এবং দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়ায়। বোখারী এই বর্ণনায় একটি অংশ বর্ণনা করেছেন তা'লীকরূপে। বাগবী তাঁর আলজু'দিয়াতে অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— হজরত ওমর কারো উপর রাগান্বিত হলে তাকে প্রেরণ করতেন

সিরিয়ায়। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, বসরায়। নাফে—আইয়ুব—মুয়াম্মার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক লোককে দেশান্তরিত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফাদাকে।

সম্মানিত পীর মাশায়েখগণ কখনো কখনো কোনো মুরিদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তির তীব্রতা অনুভব করলে তাকে কিছু সময়ের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেনো বিদেশ বিভূঁয়ে ঘুরে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং স্বভাবে সৃষ্টি হয় বিনয়-নম্রতা। উল্লেখ্য, কুপ্রবৃত্তিই মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়, চিরস্থায়ী সুখ ও অপরিসীম শান্তির পথ থেকে স্খলিত করে বানিয়ে দেয় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসারী। অবশেষে উপনীত করায় দোজখের দ্বারপ্রান্তে। তাই প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধি, আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তোষ ও চিরসুখময় বেহেশত প্রাপ্তির নিমিত্তে কামেল পীর মাশায়েখগণের কাছে বায়াত হওয়া অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ওয়াত্তাকুল্লহা ওয়া কুনু মায়াস্‌সাদিক্বীন'। একথার অর্থ— এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও সত্যবাদীগণের (পীর-মাশায়েখগণের) সংসর্গ বরণ করো।

আমি বলি, বিচারক যদি কোনো মুসলমানকে পাপে প্রলিপ্ত দেখতে পান এবং ওই মুসলমান যদি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তবে তিনি তার উপর এক বৎসরের দেশান্তরের বিধান প্রয়োগ করতে পারেন। আর যদি সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হয়, তবে তার শাস্তি এই যে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে বের করে দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে করতে হবে বন্দী। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবহিত।

মাসআলাঃ বিবাহিত ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর শাস্তি সঙ্গেসার। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে একমত। আলেমগণও বলেছেন, বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। কেবল বিভ্রান্ত খারেজীরা এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণকারী। তারা সাহাবীগণের ঐকমত্য ও একক বর্ণিত হাদিসকে অস্বীকার করে। দাবি করে, সঙ্গেসার বা রজম কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর একক বর্ণনার (খবরে আহাদের) বিধানও ওয়াজিব কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সঙ্গেসার প্রমাণিত হয়েছে সুবিদিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে, যা অনস্বীকার্য। এরকম সুবিদিত ও সুপ্রসিদ্ধ বিষয়কে কিছুতেই অগ্রাহ্য মনে করা যায় না। যেমন— হজরত আলীর বীরত্ব, হাতিম তাঈয়ের বদান্যতা। সঙ্গেসারের হাদিস যদিও ব্যাপকার্থে সুবিদিত নয়, তবুও তা ঐকমত্যোৎসারিত হওয়ার কারণে বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। আর এর বিশেষত্ব ও অবস্থার কথা একক বর্ণিত হাদিসে তো এসেছেই।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ স.কে আল্লাহ্‌তায়ালা পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরে অবতীর্ণ

করেছেন কিতাব, ওই কিতাবে অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে রজমের (সঙ্গেসারের) আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন। তিনি স. এ বিধান কার্যকর করেছেন। আমিও এ বিধান কার্যকর করেছি। সুতরাং ব্যভিচারী বিবাহিতাদের সঙ্গেসারের বিধান সত্য। তবে শর্ত হচ্ছে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা, গর্ভবতী হওয়ার দ্বারা, অথবা অপরাধী-অপরাধিনীর স্বীকারোক্তি দ্বারা। বোখারী, মুসলিম।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ মোহাম্মদ স.কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপরে কিতাব নাজিল করেছেন। নাজিলকৃত আয়াতের মধ্যে সঙ্গেসার সম্পর্কিত বিধানও রয়েছে। আমি ওই আয়াত পাঠ করি এবং স্মরণে রাখি। যেমন— 'আশশায়খু ওয়াশশায়খাতু ইজা যানায়া ফারজুমুহুমা আল বত্তাতা নাকলাম মিনাল্লহি ওয়াল্লহু আযীযুন হাকীম' (বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সঙ্গেসার করে দাও এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। রসুল স. সঙ্গেসার করিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আমিও সঙ্গেসার করিয়েছি। এই হাদিসের শেষাংশে রয়েছে, হজরত ওমর আরো বলেছেন, 'ওমর কিতাবুল্লাহ্র সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করেছে' মানুষের এরকম উক্তির আশংকা না থাকলে আমি সঙ্গেসার সম্পর্কিত আয়াত কোরআন মজীদের টীকা ভাষ্যরূপে সংযুক্ত করে দিতাম। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আমি আশংকা করি দীর্ঘদিন গত হলে মানুষ বলবে কোরআন মজীদে রজমের বিধান নেই। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, আমার কাছে একথা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ বলবে, ওমর আল্লাহ্র কিতাবে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। যদি এরকম ধারণা আমার না থাকতো, তবে আমি রজমের আয়াত কোরআনে লিখে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, পরবর্তী যুগের কেউ কেউ বলবে, কিতাবুল্লাহ্য় রজমের বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, আমার একথা মনোপুত নয় যে কেউ বলুক 'ওমর আল্লাহ্র কিতাবে নতুন কিছু যোগ করেছেন'— এরকম বলার অবকাশ যদি না থাকতো, তবে আমি রজমের বিধান কোরআনে সংযোজন করে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয়, ভবিষ্যতে কিছু লোক বলবে, রজমের বিধান তো কোরআনে নেই। হজরত ওমর তাঁর এই ভাষণ দিয়েছিলেন সাহাবীগণের এক সমাবেশে। কিন্তু কেউই তখন তাঁর কথার প্রতিবাদ করেননি। এতে করে বোঝা যায়, রজমের আয়াত যে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে তাঁরা সকলে একমত। হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে হাকেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রজমের বিধান এই— বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি ব্যভিচার করে,

তবে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ সঙ্গেসার করে দাও। সহিহ্ ইবনে হাব্বান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সুরা আহযাব ছিলো সুরা বাকারার সমান দীর্ঘ। আর ওই সুরাতেই ছিলো রজম বিষয়ক আয়াত। সহিহ্ বোখারী ও সহিহ্ মুসলিম গ্রন্থে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে, তার রক্তপাত হালাল নয়। তবে তিন কারণে তা করা যেতে পারে— ১. কেসাস (জীবনের বদলে জীবন) ২. বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার ৩. ধর্মত্যাগ।

হজরত আবু উমামা বিন সহল বিন হানিফের বর্ণনায় এসেছে, যখন খলিফা হজরত ওসমানের বসতবাটি ঘেরাও করা হলো, তখন তিনি একদিন তাঁর প্রকোষ্ঠের জানালায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, রসুল স. কি একথা বলেননি যে, তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো বৈধ নয়? সে তিনটি কারণ কি এই নয় যে, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়া, কেসাস ও ধর্ম পরিত্যাগ? অতএব, তোমরা শুনে নাও, আমি এ তিনটির একটির মধ্যেও পড়ি না। তবু কি তোমরা আমাকে হত্যা করবে? তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারেমীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। শাফেয়ী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মসনদে। আরো বর্ণনা করেছেন বায্যার ও হাকেম। হাকেম আবার বোখারী ও মুসলিমের সূত্রানুসারে হাদিসটির সূত্রপরম্পরাগত বিশুদ্ধতাও নির্ণয় করেছেন। বায়হাকী ও আবু দাউদ বোখারী ও আবু কালাবার বর্ণনানুসারে হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন ফে'লী (কর্মকাণ্ডগত) হাদিসরূপে। হজরত আবু কালাবার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তিন কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দান করেননি— হত্যাকাণ্ড, বিবাহিতের অবৈধ যৌনচরিতার্থতা এবং ধর্মত্যাগী, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. হজরত মা'জ ইবনে মালেকের সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন তখন, যখন তিনি নিজ মুখে এর স্বীকারুক্তি দিয়েছিলেন। হাদিসটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজা। বোখারী ও মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা, হজরত জাবের প্রমুখ থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরাইদা বর্ণনা করেছেন, হজরত মা'জ ইবনে মালেক রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপনীত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করে দিন।

রসুল স. গামেদ গোত্রীয় এক মহিলাকেও সঙ্গেসার করিয়েছিলেন। ওই মহিলা রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে তাঁর ব্যভিচারজাত

গর্ভধারণের কথা জানিয়েছিলেন। রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তাঁর সন্তান প্রসবের পর। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁর সন্তান দুগ্ধপান ত্যাগ করে স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করতে শিখেছিলো।

জোহনিয়া গোত্রীয় এক রমণীর উপরেও সঙ্গেসার কার্যকর করিয়েছিলেন রসুল স.। তিনিও ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলেন তাঁর নিজ জবানে। হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

ওলামা, ফোকাহা ও হাদিসবেত্তাগণের বক্তব্য হচ্ছে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও সঙ্গেসার প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে। এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পৌঁছেছে সুবিদিত পর্যায়ে। আল্লাহ্ই অধিক অবহিত।

মাসআলাঃ একজন বিবাহিত এবং অন্যজন অবিবাহিত হলে অবিবাহিতকে করতে হবে বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতকে সঙ্গেসার, যেমন করা হয়েছিলো এক লোকের অধীনস্থ শ্রমিক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সংঘঠিত ব্যভিচারের বেলায়। শ্রমিককে করা হয়েছিলো বেত্রাঘাত ও তার মনিবপত্নীকে করা হয়েছিলো সঙ্গেসার।

মাসআলাঃ বিবাহিতদেরকে সঙ্গেসার করার পূর্বে বেত্রাঘাত করতে হবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে মনে হয়, প্রথমে বেত্রাঘাত করতে হবে। তারপর করতে হবে সঙ্গেসার। অবশ্য তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিতদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং এই আয়াত রহিতও নয়। তিনি একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য বিধানটি পূর্ণ শাস্তি নয়, বরং এ হচ্ছে আংশিক শাস্তি। অপর অংশটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। আর তা হচ্ছে এক বৎসরের দেশান্তর, আর বিবাহিতদের বেলায় অপর অংশটি হচ্ছে সঙ্গেসার। একথাও ঠিক যে, দেশান্তরের হাদিসের সঙ্গে যেমন আলোচ্য আয়াতের কোনো বিরোধ নেই, তেমনি বিরোধ নেই এই আয়াতের সঙ্গে রজম বিষয়ক হাদিসেরও। উভয় ক্ষেত্রে হাদিস হয়েছে কোরআনের পরিপূরক বা সম্প্রসারক। আর রজমের হাদিস যেহেতু সুবিদিত পর্যায়ের, তাই আয়াত ও হাদিস উভয়ের উপরে আমল করা যাবে। হজরত উবাদা ইবনে সামেতের হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত ও বিবাহিতার প্রত্যেকের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার।

হজরত সালমা ইবনে মাহ্বাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। আল্লাহ্ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর মুক্তির উপায় জানিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য

একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের দেশান্তর। আর বিবাহিত-বিবাহিতার প্রত্যেকের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও সঙ্গেসার। হজরত আলীর বক্তব্য থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। বক্তব্যটি শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেছেন হাকেম, আহমদ ও নাসাঈ। বক্তব্যটি এই— হজরত আলী কুফায় সুরাহা হামেদানিয়াকে বেত্রাঘাত করার পর সঙ্গেসারও করেন। বেত্রাঘাত করা হয় বৃহস্পতিবারে এবং সঙ্গেসার শুক্রবারে। এভাবে দণ্ড কার্যকর করার পর তিনি বলেন, আমি বেত্রাঘাত করেছি কিতাবুল্লাহ্ অনুসারে এবং সঙ্গেসার রসুল স. এর সুন্নত অনুযায়ী। এই বিবরণটি সহিহ্ বোখারীতেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ওই মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর নিকটে আলোচ্য আয়াতের বিধান কেবল অবিবাহিত-অবিবাহিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা বিধানটি বিবাহিত-বিবাহিতার ক্ষেত্রে রহিত। হজরত উবাদা এবং হজরত সালমার হাদিসের মাধ্যমেও একথা জানা যায়। তাছাড়া রসুল স. হজরত মায়ে'জ, গামেদিয়া গোত্রীয় এবং জোহনীয়া গোত্রীয় দুই নারীকে সঙ্গেসার করিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গেসারের পূর্বে তাদেরকে বেত্রাঘাত করেননি। বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনোটাতেই সঙ্গেসারের পূর্বে বেত্রাঘাতের কথা নেই। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদের হাদিসে ইতোপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এক শ্রমিক ও তার প্রভুপত্নীর ব্যভিচারের কথা। শ্রমিক সম্পর্কে রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে বেত্রাঘাত করো এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসনে পাঠাও। আর হজরত আনাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আনাস! যাও, ওই মহিলা যদি তার ব্যভিচারের কথা নিজ মুখে স্বীকার করে, তবে তাকে সঙ্গেসার করে দাও। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি স. বলেছেন কেবল সঙ্গেসারের কথা, বেত্রাঘাতের কথা উচ্চারণই করেননি। উল্লেখ্য 'নাসিখের' (রহিতকারীর) বিধান তিন প্রকার— ১. নাসেখ কোনো মনসুখের (রহিতের) হুকুম রহিত করে দিবে, অবশিষ্ট থাকবে কেবল তার আবৃত্তি ২. ওই নাসেখ যা ওহির (প্রত্যাদেশের) পরিপূরক কিন্তু যা গায়রে মাতলু (হাদিস) ৩. ওই নাসেখ যার হুকুম কার্যকর থাকে, কিন্তু তার আবৃত্তি হয়ে যায় রহিত। যেমন— আশশায়খু ওয়াশ্শায়খাতু........। এই আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম রয়েছে কার্যকর। এই বিধানটি প্রমাণ করেছে যে, সঙ্গেসার একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্তি। সুতরাং এই বিধান ও বেত্রাঘাতের বিধান অবশ্যই একটি অপরটিকে রহিত করবে। আর একটি কথা, যদি আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিকে ওয়াজিব নির্ধারণ না করা হয়, তবে

উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই থাকে না এবং একটিকে রহিতকারী এবং অপরটিকে রহিত নির্ধারণের প্রয়োজনও আর পড়ে না। বরং এতে করে উভয় শাস্তিই ওয়াজিব প্রমাণিত হয়— বেত্রাঘাতের ও সঙ্গেসারের, যেমন বলেছেন ইমাম আহমদ।

এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত আলীর কার্যক্রম সম্পর্কে। তিনি কুফায় এক রমণীকে বেত্রাঘাত করার পর সঙ্গেসারও করেছিলেন। কিন্তু হজরত ওমরের আমল এরকম ছিলো না। তিনি বিবাহিত-বিবাহিতাদেরকে কেবল সঙ্গেসারই করতেন, বেত্রাঘাত করতেন না। সুতরাং বুঝা গেলো বিষয়টি ছিলো ইজতেহাদী (চিন্তা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত)। তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু ওয়াকেদ লাইছি আশজায়ী বলেছেন, আমরা একবার খলিফা ওমরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক লোক। বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রী ব্যভিচার করেছে। সে একথার স্বীকৃতিও দিয়েছে। খলিফা ওমর আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একথার সত্যতা যাচাই করে এসো। আমি কয়েকজনকে নিয়ে লোকটির স্ত্রীর কাছে গেলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে তার স্ত্রী বললো, আমার স্বামী ঠিকই বলেছেন। আমি ফিরে এসে খলিফাকে এই সংবাদ জানালাম। তিনি ওই রমণীকে সঙ্গেসারের নির্দেশ দিলেন। এর পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেননি। আর এরকম না করার কারণে কেউ আপত্তিও তোলেননি।

আমি বলি, হজরত আলী কুফায় যে রমণীকে বেত্রাঘাতের পর সঙ্গেসারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি হয়তো প্রথমে অবগত ছিলেন না যে, ওই রমণী বিবাহিত। বেত্রাঘাতের পর তিনি সম্ভবত একথা জানতে পেরেছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন তার সঙ্গেসার। আর তাঁর 'কিতাবুল্লাহ্ অনুসারে আমি বেত্রাঘাত করেছি এবং সঙ্গেসার করেছি রসুল স. এর সুন্নত অনুযায়ী' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তিনি হয়তো উপস্থিত সকলকে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বেত্রাঘাতের শাস্তি কোরআনের এবং সঙ্গেসারের শাস্তি হাদিসের। এরকমই ব্যাখ্যা এসেছে একটি বর্ণনায়। হজরত জাবের সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, এক লোক ব্যভিচার করেছিলো। রসুল স. এর নির্দেশে প্রথমে তাকে দেয়া হয়েছিলো বেত্রদণ্ড। অতঃপর তিনি স. জানতে পারলেন, লোকটি বিবাহিত। তখন তাকে দিলেন সঙ্গেসারের দণ্ড।

কোরআনের বক্তব্যানুসারে প্রকাশ থাকে যে, ইহ্সান শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এখানে 'ইহ্সান' অর্থ দয়া। অবশ্য কোরআন মজীদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকটি অর্থে। যেমন— ১. স্বাধীন, মুক্ত। ২. বিবাহ, যেমন— 'ওয়াল মুহসানাতু মিনান্নিসায়ি ইল্লা মা মালকাত আইমানুকুম'— এখানে

'আলমুহসানাতু' অর্থ বিবাহিত নারী এবং 'ফা ইজা উহসিন্না ফাইন আতায়না বিফাহিশাতিন ফা আ'লাইহিন্না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আজাব'— এখানে 'উহসিন্না' অর্থ বিবাহ করে নেয় আর 'মুহসানাত' উদ্দেশ্য স্বাধীন নারী। ৩. পবিত্র, সতীসাধ্বী, যেমন ওয়াল মুহসানাতু মিনাল মু'মিনাতি ওয়াল মুহসানাতু মিনাল্লাজীনা উতুল কিতাবা'— এখানে বুঝানো হয়েছে সতীসাধ্বী মুসলিম ও আহলে কিতাব রমণীদেরকে।

উল্লেখ্য, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে সঙ্গেসার করার ক্ষেত্রে 'ইহ্সান' এর অর্থ বিবাহিত হওয়া অথবা বিশুদ্ধ বিবাহে আবদ্ধ হওয়া। কেননা বিবাহের পর রমণীরা তার স্বামীর গৃহে সংরক্ষিত হয়। তাই রসুল স. 'মুহসিন' কে বিবাহিত এবং গায়রে মুহসিনকে অবিবাহিতরূপে উপস্থাপন করেছেন।

আলেমগণ সঙ্গেসারের শর্তরূপে নির্ধারণ করেছেন স্বাধীন হওয়া, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াকে। এর সঙ্গে আরো দু'টো শর্তকে তারা আবশ্যকীয় মনে করেছেন। সে দু'টো হচ্ছে— শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ হওয়া এবং বিবাহের পরে বাসরযাপন করা। এই পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে সঙ্গেসার সিদ্ধ হবে না। অবশ্য যে কোনো দণ্ড কার্যকর করার জন্য অপরাধীর জ্ঞানবান হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। তাই ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর ব্যভিচারের দণ্ড একশত বেত্রাঘাত নয়, বরং পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। তবে বিবাহ সঠিক হওয়া কেবল সঙ্গেসারেরই অত্যাবশ্যক শর্ত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম মোহাম্মদের নিকট ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মুসলমান হওয়াও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ আবার মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক মনে করেননি। ইমাম আবু হানিফার স্বপক্ষে দলিল এই— রসুল স. বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্র শরীক করে, সে 'মুহসিন' নয়। ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুইভাবে— সুপরিণতরূপে (মারফু) এবং পরিণত (মাওকুফ) হিসেবে। অর্থাৎ এক স্থানে কথাটি এসেছে রসুল স. এর সরাসরি বক্তব্যরূপে, অন্য স্থানে হজরত ইবনে ওমরের উক্তি হিসেবে। ইবনে জাওজী লিখেছেন ইসহাক ব্যতীত অন্য কেউ এই হাদিসকে সুপরিণতসূত্রে বর্ণনা করেননি। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসহাক পরবর্তী সময়ে হাদিসটিকে আর সুপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেননি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি পরিণত শ্রেণীর। অর্থাৎ এটা হজরত ইবনে ওমরের উক্তি, রসুল স. এর স্বমুখে উচ্চারিত বাণী নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, যদি এর

সূত্রপ্রবাহ যথাযথ হয়, তবে এরূপ হাদিসকে সুপরিণত বলা যাবে। কেননা বর্ণনাকারী যদি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হন, তবে তার অভিমতের ভিত্তি হবে নিশ্চয় কোনো বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।

আমি বলি, ইসহাক যদি হাদিসটির সুপরিণত হওয়ার দাবি পরিত্যাগ করেই থাকেন, তবে আর তাকে সুপরিণত বলার প্রয়োজনই বা কী। আর হাদিসটিকে সুপরিণত বলে স্বীকার করা হলেও 'লাইসা বি মুহসিনিন' কথাটির মাধ্যমে সঙ্গেসারের জন্য বিবাহিত হওয়ার শর্তটি আর থাকে না।

কোরআন মজীদে বিবিধ অর্থে 'ইহসান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর হাদিসে'মুহসিন' অর্থ 'পবিত্র' হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয় তবে বলা যেতে পারে মুশরিকেরা সঙ্গেসারের উপযুক্ত নয়। কারণ মুশরিকেরা অপবিত্র। সুতরাং মুশরিকদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারী অপবাদের শাস্তির যোগ্য নয়। কেননা চরিত্রবতী ও পবিত্র নারীকে অপবাদ দিলে অপবাদের শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু সে যদি চরিত্রবতী ও পবিত্র না হয়, তবে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী শাস্তিযোগ্য হবে না। তাই এই হাদিস দ্বারা সঙ্গেসারের জন্য মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক প্রমাণ করা যাবে না। আর একটি বিষয়ও প্রণিধাননীয় যে, 'বিবাহিত' 'বিবাহিতা' শব্দ দু'টো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভূত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় ইহুদী একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাদের এক নারী ও একজন পুরুষ ব্যভিচার করেছে। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? রসুল স. বললেন, রজম সম্পর্কে তোমরা তওরাতে কী পেয়েছো? তারা বললো, আমরা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে তা'জির করে থাকি (মুখে কালি মাখিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে আনি, বিশেষভাবে তাকে চিহ্নিত করি) এবং কশাঘাত করি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা ঠিক বলোনি। তওরাত নিয়ে এসো। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তওরাতে স্পষ্টাক্ষরে রজমের বিধান লেখা আছে। তওরাত আনা হলো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম পাঠ করতে শুরু করলেন। রজমের আয়াত বের করা হলে একজন ইহুদী তা তার হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, হাত সরাও। সে হাত সরিয়ে নিলো। স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগলো রজমের আয়াত। অন্য ইহুদীরা বললো, হে মুসলমানদের নবী! আবদুল্লাহ্ ঠিকই বলেছে। রসুল স. তখন সঙ্গেসার কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। যথারীতি তাঁর নির্দেশ প্রতিপালিতও হলো। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গেসারের ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদের অভিমত।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, অতীতের শরিয়তের বিধান এই উম্মতের জন্যও অবশ্যপালনীয়, যতক্ষণ তা আমাদের শরিয়ত দ্বারা মানসুখ (রহিত) না হয়। আর ওই বিধান তো পালন করা আরো অধিক অবশ্যপালনীয় হবে, যার উপরে আমল করেছেন রসুল স. স্বয়ং। তাঁর এমতো আমল একথাই প্রমাণ করে যে, ওই বিধান আমাদের শরিয়তেও কার্যকর। মনসুখ যদি হতো তবে রসুল স. নিশ্চয় তার উপরে আমল করতেন না এবং আল্লাহ্র শেষ অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে রায় দিতেন না। ইমাম আবু হানিফার এমতো অভিমতের ফলে আমাদেরকে এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে যে, এমন কোনো আয়াত অথবা হাদিস কি আছে, যা সঙ্গেসারের বিধানকে মনসুখ করে ? না, এরকম কোনো কিছুই আমরা পাইনি। আর যানি-যানিয়াহ (ব্যভিচারিণী-ব্যভিচারী), শায়েখ-শায়েখাহ্ (বৃদ্ধ-বৃদ্ধা), ছাইব-বিকর (বিবাহিত-বিবাহিতা) —এ সকল শব্দও তো সাধারণ অর্থবোধক। মুসলমান-অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি বলতে চাই 'মান আশরাকা বিল্লাহি ফালাইসাবি মুহসিন' এই হাদিস দ্বারা সঙ্গেসারের জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত প্রমাণিত হয় না। আর আলোচ্য আয়াতে 'ইহসান' না হওয়ার উদ্দেশ্য পবিত্র না হওয়া। অর্থাৎ মুশরিকেরা পবিত্র নয়, তাই তাদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলে অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা সঙ্গেসারের জন্য 'মুহসিন' (বিবাহিত) হওয়ার ব্যাপারে এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীকে বসবাস করতে হবে বিশুদ্ধ বিবাহসহ, আর তাদেরকে হতে হবে জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন। ইমাম আহমদ মুসলমান হওয়ার শর্তটি ছাড়া অন্য সকল শর্তে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে একমত। এমনকি কোনো জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন মুসলমান কোনো ক্রীতদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, উন্মাদিনী, অথবা আহলে কিতাব নারীর সঙ্গে যদি সঙ্গম করে, তবুও সে বিবাহিত ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে না এবং সঙ্গেসারের উপযুক্তও হবে না। এভাবে যদি কোনো স্বাধীনা নারী, কোনো গোলাম, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, অথবা পাগলকে বিবাহ করে এবং সহবাসও করে, তথাপিও সে বিবাহিতা ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সঙ্গেসারও কার্যকর করা যাবে না। যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মি রমণীকে বিবাহ করে, সহবাসও করে, তারপর ওই রমণী যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং মুসলমান হওয়ার পর তার স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে থাকে, তবে ওই নারী যদি অন্য কারো সঙ্গে সহবাস করে, তবুও সে বিবাহিতা ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য হবে না এবং তার উপরে সঙ্গেসারও প্রয়োগ করা যাবে না।

যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান আপন বাঁদীর সঙ্গে সহবাস করে, তারপর তাকে স্বাধীন করে দেয়, স্বাধীন করে দেয়ার পর যদি তার সঙ্গে সহবাস না করে, এমতাবস্থায় যদি ওই বাঁদী ব্যভিচার করে, তবুও সে সঙ্গেসারের উপযুক্ত হবে না।

হানাফীগণ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে দারাকুতনী ও ইবনে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস উপস্থাপন করেন, যা আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী মরিয়ম আলী ইবনে তালহার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে হজরত কা'ব ইবনে মালেকের উক্তিরূপে এভাবে— হজরত কা'ব বলেন, আমি একবার ইহুদী অথবা খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। রসুল স. আমাকে নিষেধ করলেন। বললেন, সে তোমাকে 'মুহসিন' (পবিত্র) বানাবে না। দারাকুতনী বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। আর আলী ইবনে আবী তালহা হজরত কা'ব ইবনে মালেকের সাক্ষাত পাননি। ইবনে হুম্মাম বলেন, বাক্বিয়া ইবনে ওলীদ— উতবা ইবনে তামীম—আলী ইবনে আবী তালহা—হজরত কা'ব ইবনে মালেক; এই সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রটিও কর্তিত।

আমি বলি, বাক্বিয়া ইবনে ওলীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল ও বর্ণনাকারীকে গোপনকারী। ইবনে হুম্মাম বলেন, আমাদের কাছে কখনো কখনো কর্তিত সূত্রও অপরিণত রূপে গ্রহণীয়। আর এরকম অপরিণত শ্রেণীর বর্ণনাও আমাদের কাছে দলিল, তবে শর্ত হলো সূত্রপরম্পরাভূত সকল বর্ণনাকারীকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ (আদেল)। আমি আরো বলি, একজন ইহুদী ব্যভিচারী ও একজন ইহুদী ব্যভিচারিণীকে রসুল স. সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। বর্ণিত হাদিসটি কিন্তু তত্তুল্য শক্তিশালী নয়। তাই এর উপরে আমল করা নাজায়েয। ইমাম আহমদ যেহেতু বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর মুসলমান হওয়াকে অত্যাবশ্যক শর্ত বলে গণ্য করেন না, তাই তিনি আপন অভিমতের সমর্থনে বর্ণিত হাদিসটিকে উপস্থাপন করতে পারেন না।

ইউনুস থেকে আবু ওয়াহাবের পদ্ধতিতে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জুহুরী বলেন, আমি নিজে শুনেছি, আবদুল মালেক একবার ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করলেও কি একজন স্বাধীন মানুষ বিবাহিত বলে গণ্য হবে? ওবায়দুল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ। আবদুল মালেক বললেন, আপনি এই অভিমত কোন সূত্র থেকে পেয়েছেন? ওবায়দুল্লাহ্ বললেন, জনৈক সাহাবী থেকে। বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, আমি একথাও জানতে

পেরেছি, মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আওজায়ীও এরকম অভিমত পোষণ করেন। বর্ণিত অভিমতটি আবার ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্র উক্তিরূপে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন জুহ্রী-ওমর সূত্রে এবং আবদুর রাজ্জাকের পদ্ধতিতেও।

মাসআলাঃ পুরুষ ও রমনীর একজন বিবাহিত ও অন্যজন যদি অবিবাহিত হয় তবে বিবাহিতকে করতে হবে সঙ্গেসার এবং অবিবাহিতকে কশাঘাত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। হজরত জায়েদ বিন খালেদ ও হজরত আবু হোরায়রার হাদিসে ইতো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে— রসুল স. শ্রমিককে করেছিলেন বেত্রাঘাত আর তার প্রভুপত্নীকে করেছিলেন প্রস্তরাঘাত।

মাসআলাঃ দুজনের মধ্যে যদি একজন পাগল ও একজন সুস্থমস্তিষ্ক হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রবর্তিত হবে তার উপর, যে পাগল নয়— এরকম বলেছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারী পাগলিনী আর পুরুষ জ্ঞানবান যদি হয়, তবে শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে পুরুষের উপর, কিন্তু যদি পুরুষ পাগল ও নারী জ্ঞানসম্পন্না হয় তবে ওই নারীর উপরে শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা ব্যভিচারের কর্তা হচ্ছে পুরুষ, নারী হচ্ছে ব্যভিচারের প্রেক্ষাপট বা পাত্র। নারীকে ব্যভিচারিণী বলা হয় রূপকার্থে, প্রত্যক্ষার্থে নয়। আর নারীকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হয় এ কারণে যে, সে ব্যভিচারের অনুমতিপ্রদাত্রী। অন্যান্য ইমাম বলেন, এমতোক্ষেত্রে নারীকে অব্যাহতি দিলে শাস্তি তো প্রয়োগ করতে হয় পুরুষের উপর। কিন্তু পাগলের উপরে শাস্তি কার্যকর হয় না। অথচ ব্যভিচার সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নারী যেহেতু জ্ঞানসম্পন্না এবং যেহেতু সে ব্যভিচারের অনুমতি দিয়েছে, তাই শাস্তি দিতে হবে তাকেই।

অন্যান্য ইমাম বলেছেন, রমণী যদি হয় শরিয়তসম্মত অজুহাতধারিনী, শাস্তি যদি তাকে না দেয়া হয় আর পুরুষটি যদি হয় অজুহাতশূন্য সেক্ষেত্রে ঐকমত্যানুসারে সে শরিয়তের বিধান থেকে রেহাই পেতে পারে না। আর যদি পুরুষটি হয় অজুহাতধারী আর মহিলাটি হয় সুস্থমস্তিষ্ক তবে অজুহাতধারী পুরুষের অজুহাতে শরিয়তের বিধান মহিলাটির উপর রহিত হবেনা। বরং তা কার্যকরী করতে হবে। আর আমরা এটা মানতে পারি না যে, মহিলাকে বলা হয় রূপকার্থে যেনাকারিণী। আবার যদি একথা মেনেও নেয়া যায়, তবু বলতে হয় পুরুষ লোকটিকে ব্যভিচারের অনুমতি দেয়ার কারণে মহিলার উপর শরিয়তের দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এমতোক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা বিকৃতমস্তিস্কধারীর যেনা করাকে ব্যভিচার বলা যাবে না, একথা অনুমোদনের অযোগ্য। কারণ, অভিধান ও শরিয়ত এটাকে ব্যভিচার বলেছে, যদিও শরিয়ত এদের উপর কার্যকর নয় বলেই দণ্ডবিধান ও অকার্যকর।

পরিচ্ছেদঃ শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার ছাড়া, অর্থাৎ আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সংগুপ্ত অঙ্গ দ্বারা সঙ্গমসুখ চরিতার্থ করার নাম যেনা বা ব্যভিচার। পশ্চাদ্দারে সঙ্গম করলে তাকে ব্যভিচার বলা যায় না— নারী বা পুরুষ যে কোনো কারো হোক না কেনো। এমতো কর্মকে বলা হয় সমকামিতা। আমি সুরা নিসার যথাস্থানে এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি।

মাসআলাঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে ঋতুগ্রস্তা অবস্থায়, রোজা পালনরতা অবস্থায়, হজ্ব বা ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়, অথবা তার যৌথ মালিকানাভূত ক্রীতদাসীর সঙ্গে, মুশরিক ক্রীতদাসীর সঙ্গে, কিংবা দুধপানের সম্পর্কে যার সঙ্গে বিবাহ হারাম এমন মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে ফেলে, তবে তাকে ব্যভিচার বলা যাবে না। তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তিও আরোপ করা যাবে না। তবে এরকম যে করবে সে অবশ্যই গোনাহ্‌র কাজই করবে। ইমাম চতুষ্টয় এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত যে, এমতো কর্ম সম্পাদনকারীরা পাপী হলেও শাস্তিযোগ্য নয়। কারণ রসুল স. নির্দেশ করেছেন, সন্দেহ সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত করে দাও। মুকসিমের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মসনদে আবী হানিফায়। জুহ্‌রীর পদ্ধতিতে ওরওয়ার মাধ্যমে তিরমিজি, হাকেম ও বায়হাকী হজরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো উপায় পাও, তবে মুসলমানদের উপর শাস্তিকে রহিত কোরো। কেননা বিচারকের ভুল রায় অপেক্ষা ক্ষমাপ্রদর্শন উত্তম। এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ দামেশকি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বোখারী ও নাসাঈ তাকে চিহ্নিত করেছেন অগ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য বলে। ওয়াকী বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত সূত্রে। এটাই সমধিক শুদ্ধ। তিরমিজিও এই অভিমতের প্রবক্তা। তিনি আরো বলেছেন, কতিপয় সাহাবীও এরকম বলেন। বায়হাকী বলেছেন, ওয়াকী'র বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতার নিকটবর্তী। রাশেদীনও আকিলের মাধ্যমে জুহ্‌রী সূত্রে এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে রাশেদীন বর্ণনাকারীরূপে শক্তিমান নন।

হজরত আলী থেকে সুপরিণত সূত্রে এসেছে, সন্দেহের স্থলে শাস্তিকে রহিত কোরো। শাস্তিকে রহিত করা বিচারকের জন্য বৈধ নয়। তবে সন্দিগ্ধাবস্থায় শাস্তি রহিত করা যায়। বোখারী মন্তব্য করেছেন এই বর্ণনার সূত্রপ্রবাহভূত মুখতার ইবনে নাফে'র হাদিস পরিত্যাজ্য।

এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম বিবরণ এসেছে সুফিয়ান সওরীর সূত্রপরম্পরায়, এভাবে— হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, সন্দেহজনিত পরিস্থিতিতে শাস্তিকে স্থগিত রেখো এবং যতদূর সম্ভব মুসলমানদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ো

জীবনসংহারক শাস্তি। ইবনে আবী শায়বা ও হজরত উকবা ইবনে আমের এবং হজরত মুয়াজ থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে পরিণত সূত্রে। হজরত ওমর থেকেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কর্তিত ও পরিণত সূত্রে। ইবনে হাজাম তাঁর কিতাবুল ইসালে যথাসূত্রে হজরত ওমর পর্যন্ত হাদিসটিকে উপস্থাপন করেছেন পরিণত শ্রেণীভূতরূপে। ইব্রাহিম নাখয়ীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত করা আমার নিকট শাস্তি কার্যকর করা অপেক্ষা উত্তম। জাহেরিয়া সম্প্রদায় বলে, প্রমাণিত অপরাধের শাস্তি সন্দেহের কারণে স্থগিত করা যায় না। কারণ শাস্তি রহিতকরণ প্রসঙ্গে রসুল স. থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রমাণ এসেছে কেবল কতিপয় সাহাবীর বক্তব্য থেকে, তাও এসেছে আবার কয়েকটি অসঙ্গত সূত্রপরম্পরায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল হজরত ইবনে মাসউদের পরিণত শ্রেণীভূত হাদিসটি। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে আবী শায়বা ছাড়াও হজরত মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুর রাজ্জাক। কিন্তু তাঁর সূত্রপ্রবাহ সংলিপ্ত ইসহাক ইবনে আবী ফরওয়া বর্ণনাকারী হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ।

ইবনে হুমাম লিখেছেন, সন্দেহজনক অবস্থায় শাস্তিস্থগিত বিষয়ক হাদিসকে এই উম্মতের সকলেই গ্রহণ করেছেন। রসুল স. এবং সাহাবীগণের এ সম্পর্কিত বক্তব্যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি অখণ্ডনীয় বিধানে। রসুল স. হজরত মায়ে'জকে শাস্তিপ্রদানের পূর্বে বার বার বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন করেছো, স্পর্শ করেছো, অথবা জড়িয়ে ধরেছো। তিনি স. চেয়েছিলেন, তাঁর কথার হাঁ সূচক উক্তি পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবেন। চুরির অপরাধে আনীত এক অপরাধী সম্পর্কেও তিনি স. মন্তব্য করেছিলেন, সম্ভবত সে চুরি যাকে বলে তা করেনি। গামেদীয়া গোত্রীয় মহিলা সম্পর্কেও তিনি স. এরকম অব্যাহতি প্রদানের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। হজরত আলীও ব্যভিচারের স্বীকৃতিপ্রদানকারিণী এক ক্রীতদাসীকে বার বার করে বলে যাচ্ছিলেন, সম্ভবতঃ ব্যাপারটা সেরকম কিছু নয়। ভেবে দেখো, মনে হয় তুমি শুয়েছিলে, হঠাৎ ওই লোকটি তোমার উপরে পড়ে গিয়েছিলো, না হয় লোকটা তোমার উপরে বলপ্রয়োগ করেছিলো। আর না হয় তোমার মালিক তার সঙ্গে তোমাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছিলো, সে কথা হয়তো তোমার মনে নেই, না হয় সে কথা তুমি চেপে যাচ্ছো। খুঁজলে সাহাবীগণের এধরনের বিবরণ অনেক পাওয়া যাবে। মোট কথা রসুল স. এবং সাহাবীগণের এধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত যে, শাস্তি রহিতকরণের সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা শরিয়তসমর্থিত।

মাসআলাঃ উল্লেখ্য যে, সন্দেহ দু'ধরনের— **সাদৃশ্য সন্দেহঃ** এমতোক্ষেত্রে কেবল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিই সন্দেহে নিপতিত থাকে, অন্যরা থাকে সন্দেহমুক্ত। এরকম সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে তখন, যখন বৈধতার প্রকৃত দলিল থাকে অনুপস্থিত। কিন্তু ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী এমন কোনোকিছুকে দলিল মনে করে যা বাস্তবে দলিল নয়। যেমন কেউ অনবধানতাবশতঃ সহবাস করে বসলো মাতা পিতা অথবা স্ত্রীর বাঁদীর সঙ্গে। এমতাবস্থায় মাতা-পিতা অথবা স্ত্রীর সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রাহ্য নয়। আবার— কেউ সঙ্গম করে ফেললো তার তিনতালাক দেয়া স্ত্রীর সঙ্গে ওই স্ত্রীর ইদ্দতাবস্থায়, যখন সে যথারীতি স্ত্রীকে দিয়ে চলেছে খোরপোশ। এমতাবস্থায় ওই মহিলা তার স্ত্রী যেমন নয়, তেমনি অন্যের স্ত্রীও নয়। কারণ ইদ্দত পালনকালে বিবাহ নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ কেউ সহবাস করে ফেললে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। তবে সজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যদি সে এরকম করে, তবে তার উপর কার্যকর করতে হবে ব্যভিচারের শাস্তি।

অধিকার বিষয়ক সন্দেহঃ এরকম সন্দেহ হতে পারে ওই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ অথবা অস্পষ্ট হলেও বৈধতার দলিল উপস্থিত থাকে। যেমন পুত্রের ক্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গম। এরকম সঙ্গম ব্যভিচারের পর্যায়ভূত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এক হাদিসে এসেছে রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র রসুল। আমার সন্তান সন্ততি ও সম্পদ আমার পিতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। তিনি স. বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ (সবকিছু) তোমার পিতার। ইবনে কাত্তান ও মানজারী বলেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হাদিসটি তিবরানী তাঁর 'আল আসগরে' এবং বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলে' উল্লেখ করেছেন। এই হাদিস দৃষ্টে অনুমিত হয়, পুত্রের ক্রীতদাসী সম্ভোগ করার অধিকার পিতার রয়েছে। দলিলটি ক্রটিপূর্ণ হলেও দলিল। আবার তালাকে কেনায়া প্রাপ্তা মহিলাকে তালাকদাতা যদি তার ইদ্দত পালনকালে পুনঃবিবাহ ব্যতীত সম্ভোগ করে, তবুও তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কেননা সাহাবীগণ এমতোক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করার ব্যাপারে একমত নন। তাই কেউ কেউ মনে করেন, তালাকে কেনায়া প্রদান করার পরেও তালাক প্রদাতা তালাক প্রাপ্তাকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নিতে পারেন। সাক্ষীবিবর্জিত বিবাহের ব্যাপারটিও সন্দেহজনক। এরকম বিবাহ শরিয়তানুগ নয়। তাই বলতে হয়, এরকম অধিকার বিষয়ক সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। অনুরূপ যদি কোনো রমণী প্রথমবার বিদায় নেয়ার পর পুনরায় কতিপয় সঙ্গিনীর সঙ্গে ফিরে আসে এবং সঙ্গিনীরা যদি বলে,

এ হচ্ছে তোমার স্ত্রী, এরপর স্বামী যদি তার সঙ্গে সহবাস করে, তবু ওই স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যাবে না, তবে তাকে মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। হজরত আলী এমতো একটি ঘটনায় এরকমই সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন এবং রমনীটিকে ইদ্দতও পালন করতে বলেছিলেন। এমতোক্ষেত্রে স্বামীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ না করার কারণ এই যে, স্বামী রমণীর সঙ্গিনীদের কথায় নির্ভর করেছিলো। কেননা বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ অস্বীকার না করাই স্বাভাবিক। তবে কেউ যদি তার শয্যায় কোনো অপরিচিতাকে পেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে যাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রথমবার একত্রবাসের পর স্ত্রী আর অপরিচিতা থাকে না। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে অপরিচিতা কাউকে স্ত্রী বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক নয়, অন্ধ পুরুষের ক্ষেত্রেও নয়। কারণ সে ওই অপরিচিতাকে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম, অথবা অন্য কোনো উপায়েও তার পরিচয় জেনে নিতে সক্ষম। তবে অন্ধ পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে ডাকে, আর সেই ডাকে অন্য কোনো মহিলা সাড়া দিয়ে কাছে আসে এবং বলে আমি তোমার স্ত্রী, এমতাবস্থায় যদি ওই লোক ওই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করে, তবে তাকে ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ একজনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্যজনের কণ্ঠস্বরের মিল থাকা সম্ভব। আর কণ্ঠস্বরের ধোকায় পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, যদি ইতোপূর্বে তার স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে অল্পক্ষণের জন্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেন, বিবাহ নিষিদ্ধ এরকম কোনো নারীকে যদি কেউ বিবাহ করার পর সম্ভোগ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না বটে, কিন্তু কার্যকর করতে হবে তদপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি।

আমি বলি, তাকে হত্যা করাই সঙ্গত। আর এরকম করলে তা হয়ে যাবে হাদিসের পূর্ণ অনুকূল। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, বিবাহ হারাম, একথা জানা সত্ত্বেও যদি কেউ বিবাহনিষিদ্ধ নারীকে বিবাহ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তার আমল ঐকমত্যবিরোধী, অর্থাৎ তার আমলের অবৈধতা সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, প্রত্যেক নারীই বিবাহের পাত্রী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পাত্রী হিসেবে যোগ্য নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে গেলেও তা গণ্য হবে বাতিল বলে। আর এমতো পরিস্থিতি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কারণ এতে রয়েছে বৈধ বিবাহের মতো একপ্রকার সাদৃশ্য, যদিও তা বৈধ নয়। তাই এমতো

অবস্থা ব্যভিচার বলে গণ্য নয়। সুতরাং ব্যভিচারের শাস্তিও এমতোক্ষেত্রে কার্যকর নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যভিচারের শাস্তির আওতায় পড়ে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানকারীর শাস্তি আশি বেত্রাঘাত; কিন্তু কুফরীর অপবাদকারীদের জন্য কোনো শাস্তি নেই, যদিও কুফরীর অপবাদ ব্যভিচারের অপবাদ অপেক্ষা অধিক গর্হিত।

রসুল স. গীবতকে (পরচর্চাকে) ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গর্হিত সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, গীবত ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী তাঁর শো'বুল ঈমানে। লক্ষণীয়, এতদসত্ত্বেও গীবতের জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারিত হয়নি।

এখানে বিবাহনিষিদ্ধ নারী অর্থ ওই সকল নিষিদ্ধ নারী যাদের সঙ্গে বিবাহ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, বংশগত সূত্রে, দুধপান সম্পর্কীয় সূত্রে অথবা বৈবাহিক সূত্রে। যেমন মা, বোন, দাদী, নানী, দুধমা, দুধদাদী, দুধনানী, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ইত্যাদি। কিন্তু বিশুদ্ধ বিবাহ যদি মতানৈক্যপূর্ণ হয়, যেমন— সাক্ষীবিহীন বিবাহ; এমতো বিবাহের সহবাস ব্যভিচার পদবাচ্য নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করা যায় না। শুধু বলা যায়, মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। এরকম অবৈধতা স্থায়ী নয়। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— স্বাধীনা স্ত্রীর বর্তমানে ক্রীতদাসী বিবাহ, অগ্নিপূজারিণীকে বিবাহ, ক্রীতদাসীকে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ, মালিকের অনুমতি ছাড়া তার ক্রীতদাসের বিবাহ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ, অন্যের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দত পালনকালে বিবাহ, স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে বিবাহ, নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় সরাসরি বিবাহ, স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকাকে বিবাহ, স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তার ইদ্দত পালনকালে শ্যালিকাকে বিবাহ, চার স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম বিবাহ। এ ধরনের সকল বিবাহ হারাম। কিন্তু এই হারাম আবার চিরস্থায়ী হারাম নয় । তাই এমতোক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক নয়— এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এসেছে দু'টি অভিমত। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল, আর অপরটি প্রতিকূল। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পোষকতায় রয়েছে তাহাবীর একটি বর্ণনা, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর সকাশে একবার এই মর্মে অভিযোগ করা হলো, এক লোক এক মহিলাকে বিবাহ করেছে তার ইদ্দত পালনের সময়। হজরত ওমর তখন ওই লোককে ডেকে নিয়ে এসে

প্রহার করলেন। কিন্তু সে প্রহার ব্যভিচারের শাস্তির মতো ছিলো না। এরপর তিনি ওই লোককে দিয়ে ওই মহিলাকে মোহরানা প্রদান করালেন। তারপর দু'জনকে দিলেন বিচ্ছিন্ন করে। বললেন, এ দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারবে না।

মুহরিম (বিবাহনিষিদ্ধ)দের সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, এরকম যারা করবে তাদের কণ্ঠকর্তন করতে হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং জাহিরিয়া সম্প্রদায়ের অভিমতও এরকম। কিন্তু ইবনে হাজাম বলেছেন, কণ্ঠকর্তন করতে হবে কেবল তাদের যারা তাদের পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করে। কেননা হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেছেন, এরকম লোকের কণ্ঠকর্তন করতে তো হবেই, তদুপরি বাজেয়াপ্ত করতে হবে তার সম্পদ। কেননা হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেন, আমার মামার সঙ্গে একদিন পথিমধ্যে সাক্ষাত হলো। তাঁর হাতে ছিলো একটি নিশান। বললাম, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক লোক তার মৃত পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। রসুল স. এর আজ্ঞানুসারে আমি তার শিরকর্তন করবো এবং বাজেয়াপ্ত করবো তার মালমাত্তা। আবু দাউদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। কতিপয় সূত্রে তাহাবীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো বর্ণনায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা নেই। আবার কোনো কোনোটিতে আছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুহরিম মহিলার উপরে উপগত হবে, তাকে হত্যা কোরো। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আমার পিতামহকে এমন এক লোকের মস্তককর্তন ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে বিবাহ করেছিলো তার মৃত পিতার স্ত্রীকে।

হানাফীগণ এ সকল হাদিসের প্রেক্ষিতে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ নেই— না বেত্রাঘাতের, না সঙ্গেসারের। আবার হাদিসগুলোতে সহবাসের কথাও নেই, কেবল রয়েছে বিবাহ করার কথা। মুহরিম নারীকে বিবাহ করলেই ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক হয় না। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। অতএব বলা যেতে পারে, রসুল স. এরকম লোককে হত্যা ও তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখতে। আবার এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ওই সকল লোক পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করাকে বৈধ মনে করে নিয়েছিলো। মূর্খতার যুগের মানুষ এরকমই করতো। কিন্তু এরকম কাজ শরিয়তসিদ্ধ নয়। আর শরিয়তে যা হারাম তাকে

হালাল মনে করায় তারা হয়ে গিয়েছিলো মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাছাড়া সম্ভবতঃ তারা হয়ে গিয়েছিলো ইসলামের সশস্ত্র প্রতিপক্ষও। তাই রসুল স. দিয়েছিলেন গর্দানকর্তন ও তাদের মালামাল ক্রোক করার নির্দেশ।

মাসআলাঃ কেউ যদি অর্থ প্রদানের চুক্তিতে কোনো মহিলাকে সম্ভোগ করে, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক হবে না। কেননা বিবাহের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এরকম যে করবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি। ইমাম আবু হানিফা এরকম বলেছেন। কিন্তু জমহুর বলেছেন, তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি অত্যাবশ্যক। অর্থ প্রদান দ্বারা ব্যভিচারকে বৈধ করা যাবে না। বিষয়টি এরকম— যেমন কেউ রান্নাবান্না করে দেয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত করলো কোনো মহিলাকে, তারপর তাকে সম্ভোগও করলো। অর্থহচ্ছে শ্রমের বিনিময়, আর ব্যভিচার ব্যভিচারই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বিনিময় নির্ধারণ করায় উপকৃত হয় সে-ই যে বিনিময় গ্রহণ করে। কিন্তু বিনিময়ের স্থান নির্ধারিত, যা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার স্থান। যেমন কেউ জায়গা অথবা ঘোড়া ভাড়া করলো। এমতাবস্থায় ভাড়াকৃত স্থান বা ঘোড়া হচ্ছে বিনিময়ের ফল। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এই বিনিময় প্রকৃত বিনিময়ের অনুরূপ। রান্নাবান্নার জন্য বিনিময় প্রদানের অবস্থা এরকম নয়। এরকম চুক্তি বিবাহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য। নারীদের সাক্ষ্য দ্বারা ব্যভিচারের সত্যায়ন হয় না। আবার চারজনের কম পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারাও ব্যভিচারকে প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'রমণীদের ব্যভিচার প্রমাণার্থে নিজেদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো'। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'তারা চারজন পুরুষের সাক্ষ্য কেনো উপস্থিত করে না'।

মাসআলাঃ যদি চারজন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সাক্ষ্য দেয়, তবুও ব্যভিচার প্রমাণিত হবে— এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। কিন্তু অপর তিনজন ইমাম বলেছেন, এভাবে সাক্ষ্য দিলে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে না। বরং সাক্ষ্যদাতাদেরকে গণ্য করতে হবে অপবাদকারীরূপে এবং তাদের উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা এমতোক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় চার জনের একত্র সাক্ষ্যের মাধ্যমে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। এরকম অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য নাকচ করা ওয়াজিব। আর এভাবে এক, দুই বা তিন জনের সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ যদি সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়, তবুও তাকে নাকচ হয়ে যাওয়া সাক্ষ্যের সঙ্গে মেলানো যাবে না, কারণ তা

ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। সকল সাক্ষী যদি আবার একত্র হয়ে সাক্ষ্যদান করে, তবে ইমাম আহমদের নিকটে তা গ্রহণীয়, কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানিফার নিকটে গ্রহণীয় নয়। কারণ প্রথমেই চারজন সাক্ষীর একত্র সাক্ষ্যদান ছিলো অপরিহার্য।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলেমের মতে ব্যভিচারিণী অথবা ব্যভিচারীর পুনঃপুনঃ স্বীকারোক্তি অত্যাবশ্যক। সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে তার কৃত অপরাধের স্বেচ্ছাস্বীকৃতি দিতে হবে চার বার। চার বারের কম স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে একই বৈঠকে চারবার স্বীকারোক্তিও যথেষ্ট নয়। স্বীকারোক্তির মজলিশ হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কারণ ব্যভিচার প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা প্রয়োজন। ইমাম আহমদ ও আবু লাইসের অভিমতে যদি একই সমাবেশে বার বার স্বীকারোক্তি করে তবে তা হবে ব্যভিচার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. মসজিদে উপস্থিত হতেই এক লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ব্যভিচার করেছি। রসুল স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় রসুল স. এর সম্মুখে হাজির হয়ে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি স. পুনরায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় রসুল স. এর সামনে গিয়ে একই কথা উচ্চারণ করলো। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তির পর রসুল স. তাকে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, একে নিয়ে যাও এবং সঙ্গেসার করে দাও।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের পোষকতায় উপস্থাপন করেন হজরত বুরাইদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই— হজরত মায়ে'জ রসুল স. এর নিকটে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলেন। রসুল স. তাঁর স্বীকারোক্তিকে নাকচ করে দিলেন। তিনি ফিরে গেলেন। পুনরায় হাজির হয়ে একই কথা বললেন। রসুল স. তখন তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য একজনকে পাঠালেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে। সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, আমরা তো তাঁকে জ্ঞানবান ও পুণ্যবান বলে জানি। হজরত মায়ে'জ রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন তৃতীয়বার। এবারো তিনি স্বীকারোক্তি দিলেন তাঁর অপরাধের। এবারো রসুল স. তাঁর মানসিক সুস্থতা যাচাইয়ের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা বললো, না, তাঁর মধ্যে কোনো দোষ নেই। তিনি বুদ্ধিভ্রষ্টও নন। এরপর চতুর্থবার যখন হজরত মায়ে'জ তাঁর অপরাধের স্বীকৃতি দিলেন, তখন রসুল স. প্রদান করলেন সঙ্গেসারের নির্দেশ।

ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ সেখানে মায়ে'জ এসে তার ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করলো। রসুল স. তাঁর স্বীকারোক্তি নাকচ করে দিলেন। মায়ে'জ চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এসে একই কথা বললো। এবারো রসুল স. তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয়বার এসে স্বীকৃতি প্রদানের পর আমি বললাম, চতুর্থবার তুমি স্বীকারোক্তি করলে কিন্তু রসুল স. তোমাকে সঙ্গেসার করার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু চতুর্থবারও সে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তখন রসুল স. তাঁকে বন্দী করলেন এবং তাঁর জনপদের লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, মায়ে'জ কেমন লোক? লোকেরা বললো, উত্তম?। আমরা তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। —এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর পবিত্র দরবারে হজরত মায়ে'জ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুনঃপুনঃ প্রস্থানের পর। তাই হানাফীগণ বলেন, একই বৈঠকের চারবার স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়। স্বীকারোক্তি দিতে হবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে।

ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহিহ্' পুস্তকে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, মায়ে'জ ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ব্যভিচারী। রসুল স. বললেন, বাজে বোকো না। তুমি হয়তো জানো না ব্যভিচার কী? এরকম ভর্ৎসনার পর তিনি স. তাঁকে বের করে দিলেন তাঁর মজলিশ থেকে। পুনরায় মায়ে'জ উপস্থিত হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসুল স. পুনরায় তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। তৃতীয়বারও যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন রসুল স. একজনকে নির্দেশ দিলেন, ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। কিন্তু তিনি চতুর্থবারও এলেন। রসুল স. তাঁর চতুর্থবারের স্বীকারোক্তি শুনে বললেন, তুমি কি তোমার যথাঅঙ্গ প্রবেশের পর বের করে নিয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. একথা শুনে প্রদান করলেন সঙ্গেসারের নির্দেশ। —এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরো অনেক সূত্রে। আর এগুলোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকারোক্তির স্থান ও সময় হতে হবে পৃথক। যে হাদিসে 'তিনি স. তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন' বলা হয়েছে, সেখানেও বুঝতে হবে তিনি স. হজরত মায়ে'জের কথা শুনে বার বার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন মজলিশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং হজরত মায়ে'জও তাঁর স. মুখোমুখি হয়ে বারংবার স্বীকারোক্তি করেছিলেন এক মজলিশে নয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবু সাওর, হাসান এবং হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান বলেন, একবার স্বীকারোক্তি করলেই ব্যভিচার প্রমাণিত হবে। কেননা হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ এবং হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, যখন

শ্রমিক ও তার প্রভুপত্নীর ব্যভিচারের অভিযোগে রসুল স. হজরত আনাসকে বললেন, ওই মহিলার কাছে যাও। সে যদি স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো। হজরত আনাস যথারীতি ওই মহিলার স্বীকারোক্তি গ্রহণের পর তাকে সঙ্গেসার করলেন। আলেমগণ বলেন, গামেদ গোত্রীয় মহিলার ক্ষেত্রেও একবার স্বীকারোক্তির কথা এসেছে।

আমরা বলি, 'যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে সঙ্গেসার কোরো'— রসুল স. এর এরকম নির্দেশের অর্থ হচ্ছে যদি সে এরকম স্বীকারোক্তি করে, যা ব্যভিচারের স্বীকৃতিরূপে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ চারবার), তবে তাকে সঙ্গেসার করে দিয়ো। চারবার স্বীকারোক্তির কথা সাহাবীগণ জানতেন বলেই তিনি স. সে কথা উল্লেখ করেননি। আর হজরত মায়ে'জের ঘটনা ঘটেছিলো সাহাবীগণের সামনেই। অবশিষ্ট রইলো গামেদ গোত্রের মহিলার কথা। তিনি যে একবার মাত্র স্বীকারোক্তি করেছিলেন, সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হজরত মায়ে'জ ও গামেদ গোত্রের মহিলা যদি স্বীকারোক্তির পরও তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিতেন, তবে রসুল স. তাঁদেরকে অভিযুক্ত করতেন না। সুতরাং বুঝতে হবে, তাঁদেরকে রসুল স. সঙ্গেসার করেছিলেন চারবার স্বীকৃতিদানের পর। অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে বায্যার তাঁর মুসনাদে জাকারিয়া ইবনে সলীমের মাধ্যমে জনৈক কুরায়েশ বৃদ্ধের বরাত দিয়ে লিখেছেন, হজরত আবু বকরা বলেছেন, গামেদ গোত্রের ওই মহিলা চার বার স্বীকারোক্তি করেছিলো। আর রসুল স. বারংবার তা নাকচ করে যাচ্ছিলেন। শেষে বলেছিলেন, যাও, সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত একজন বর্ণনাকারী অপ্রসিদ্ধ। তাই আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা অপূর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মাসআলাঃ বিচারকের জন্য এরকম করা মোস্তাহাব যে, তিনি অপরাধী বা অপরাধিনীকে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন, যেমন রসুল স. হজরত মায়ে'জকে বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তুমি কেবল চুম্বন করেছিলে, নয়তো কেবল স্পর্শ করেছিলে।

মাসআলাঃ চারবার স্বীকারোক্তির পর শাস্তি শুরুর পূর্বে, প্রাক্কালে অথবা শাস্তি চলাকালে অপরাধী-অপরাধিনী যদি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে অবশ্য ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক, দু'রকম বর্ণনাই এসেছে। ইমামগণের প্রমাণ এই যে, স্বীকারোক্তির মধ্যেও সত্য-মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। স্বীকৃতির পর তা সত্য কি মিথ্যা তা প্রতিপন্ন করার যেহেতু কেউ নেই, তাই বিষয়টি হারিয়ে ফেলবে তার নিঃসন্দিগ্ধতা। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করা যায় না। তবে যে সকল

বিষয়ে আল্লাহ্‌র হকের সঙ্গে বান্দার হক বিজড়িত থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ এমতোক্ষেত্রে অপরাধীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লোক থাকে। যেমন— কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা), ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদি। হজরত ইয়াজিদ ইবনে মুনঈমের সূত্রে আবু দাউদ যে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, তাতে বর্ণনাকারী একথাও বলেছেন যে, প্রস্তরনিক্ষেপের ফলে রক্তাক্ত হজরত মায়ে'জ পালাতে শুরু করলেন। শাস্তিদাতা তাঁকে ধরতে পারলেন না। ধরে ফেললেন হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আনিস। তিনি উটের পায়ের একটি হাড় ছুঁড়ে মারলেন। ওই হাড়ের আঘাতেই ইন্তেকাল করলেন হজরত মায়ে'জ। রসুল স. পরে একথা জানতে পেরে বললেন, তোমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিলেনা কেনো? সম্ভবতঃ সে তওবা করে নিতো, আর আল্লাহ্‌ তার তওবা কবুল করে নিতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায়ও একথাগুলো এসেছে।

মাসআলাঃ পীড়িত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে এবং সঙ্গেসারের উপযুক্ত হয়, তবে তাকেও সঙ্গেসার করে দিতে হবে। অসুস্থতার অজুহাতে শাস্তি রহিত হবে না। কারণ সঙ্গেসারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অপরাধীকে শেষ করে দেয়া। কিন্তু অসুস্থ ব্যভিচারী সতর্কীকরণ শাস্তির যোগ্য হয়, তবে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত রাখা যাবে, যেনো শাস্তি আবার তার মৃত্যুর কারণ না হয়। তবে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা যদি আদৌ না থাকে, অথবা সে যদি হয় জন্মগতভাবে দুর্বল, তবে একশতটি কঞ্চি আটি বেঁধে নিয়ে তাকে এমনভাবে একবার আঘাত করতে হবে যাতে সকল কঞ্চিই তার শরীর স্পর্শ করে। যেমন বাগবী তাঁর শরহে সুন্নাহ্‌র এবং ইবনে মাজা আবু উমামা, ইবনে সহল ইবনে হানীফের মাধ্যমে হজরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে থাকতো এক পুরুষ। সে ছিলো জন্মগতভাবেই দুর্বল। একদিন দেখলাম, সে এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে সঙ্গমরত। এসংবাদ পৌঁছানো হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তাকে একশত কশাঘাত করো। হজরত সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে তো অত্যন্ত দুর্বল। একশত কশাঘাত করলে সেতো মরেই যাবে। তিনি স. বললেন, একশত কঞ্চি দিয়ে একটি আঁটি বাঁধো। তারপর ওই আঁটি দিয়ে তাকে একবার আঘাত করো এবং বের করে দাও। আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু উমামা থেকে জনৈক আনসারী সাহাবীর বরাত দিয়ে । নাসাঈ বর্ণনা করেছেন আবু উমামা ইবনে সহল সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। আর তিবরানী আবু উমামা সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বর্ণিত সূত্রগুলোর পদ্ধতিগুলি মাহফুজ অর্থাৎ

একজন দৃঢ়মনা বর্ণনাকারীর বিপরীতে দৃঢ়তরমনা বর্ণনাকারীর বিবৃতি। উপরন্তু আবু উমামা বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণের একটি দল থেকে। আর বায়হাকী আবু উমামা থেকে অপরিণত সূত্রে।

মাসআলাঃ গর্ভবতী ব্যভিচারিণীকে তার সন্তান প্রসবের পূর্বে সঙ্গেসার করা যাবে না। আর যদি সে সতর্কীকরণ শাস্তির যোগ্য হয় তবে নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার আগে তাকে কশাঘাত করা যাবে না। হজরত আলী বলেছেন, লোকসকল! তোমরা তোমাদের ব্যভিচারী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর উপরে শরিয়তের হদ (শাস্তি) কার্যকর করো, বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত । রসুল স. এর এক ক্রীতদাসী ব্যভিচার করেছিলো। তাঁর নির্দেশে আমি তাকে কশাঘাত করেছিলাম। তখন সে ছিলো নেফাসগ্রস্তা। আমার ভয় হচ্ছিলো এমতাবস্থায় কশাঘাত করলে সে হয়তো মরে যাবে। আমি আমার আশংকার কথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, তুমি ঠিকই করেছো। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, ক্রীতদাসীর শাস্তি ওই সময় পর্যন্ত বন্ধ রাখো যতক্ষণ না তার রক্তপাত বন্ধ হয়। আপন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর উপরেও কশাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর ক্রীতদাসীর উপরে নেফাস অবস্থাতেও সঙ্গেসার কার্যকর করা যাবে, কেননা তার সন্তান প্রসব হয়েছে। মৃত্যুর আশংকা এমতোক্ষেত্রে বাতুলতা মাত্র। কেননা সঙ্গেসারের পরিণতি তো মৃত্যুই।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, সন্তান প্রসবের পরেও ততদিন পর্যন্ত ব্যভিচারের শাস্তি বিলম্বিত করা যাবে, যতদিন ওই সন্তান থাকবে তার মায়ের উপরে নির্ভরশীল। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার কেউ না থাকলে শাস্তি বিলম্বিত করা জরুরী। কারণ প্রতিপালনকারী ব্যতিরেকে ওই শিশুসন্তানের মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। হজরত বুরাইদা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. গামেদ গোত্রের মহিলার সঙ্গেসার স্থগিত রেখেছিলেন তার প্রসবকাল পর্যন্ত। সঙ্গেসার কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন আনসার সাহাবীকে। সন্তান প্রসবের পর তিনি রসুল স. কে একথা জানালেন। রসুল স. বললেন, এখনই তাকে শাস্তি দিয়ো না। দুগ্ধপোষ্য শিশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা শুনে অন্য একজন আনসারী সাহাবী বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিশুটি প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম আমি। তখন রসুল স. তার শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ওই রমণীকে বললেন, যাও, প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যথাসময়ে সন্তান প্রসবের পর ওই রমণী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। তিনি স. বললেন, যাও, বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকো। বাচ্চা যখন দুধ পান করা ছেড়ে দিবে তখন আবার এসো। বাচ্চা কোলে নিয়ে পুনরায় যখন সে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো, তখন তার বাচ্চার হাতে ছিলো রুটির টুকরা। সে বললো, হে

আল্লাহ্‌র রসুল! আমি একে দুধপান ছাড়াতে পেরেছি। এখন সে অন্য খাদ্য খেতে পারে। রসুল স. তখন শিশুটির প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন জনৈক সাহাবীর উপরে। এরপর হুকুম দিয়ে খনন করলেন রমণীটির বুক সমান একটি গর্ত। তারপর ওই গর্তে তাকে নামিয়ে বললেন, সঙ্গেসার করো।

জ্ঞাতব্যঃ গামেদ গোত্রীয় রমণী এবং হজরত মায়ে'জের ঘটনায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। কেননা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাঁরা সত্যকেই আশ্রয় করেছিলেন। জীবনের চেয়ে সত্যই ছিলো তাঁদের কাছে বড়। তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত ইমানদার ছিলেন বলেই আল্লাহ্‌র পরিতোষ লাভের আশায় কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে পেরেছিলেন। একটি হাদিসে হজরত মায়ে'জের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদও এসেছে। অধিকাংশ মানুষ পাপী। তাই তারা মহান সাহাবীগণের এমতো আদর্শকে সত্যের মাপকাঠি বলে মেনে নিতে পারে। এমতাবস্থায় রসুল স. সরাসরি পাপী মানুষের জন্য সত্যের মাপকাঠি নন। কারণ রসুল স. ছিলেন নিষ্পাপ। সুতরাং তিনি সত্যের প্রবক্তা। আর তার সাহাবীগণ হচ্ছেন সত্যের মাপকাঠি। অনুবাদক।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতে 'ফাজলিদু' (কশাঘাত করবে) বলে সম্বোধন করা হয়েছে বিচারকগণকে। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কেউ তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক বলেন, মালিক তার ক্রীতদাসীকে বিচারকের অনুমোদন ব্যতিরেকেই হদ জারী করতে পারবে। তবে বিবাহিতা ক্রীতদাসীর উপরে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, মালিক যদি জিম্মি কাফের হয়, অথবা হয় নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস কিংবা মহিলা, তবে বিচারকের অনুমতি ছাড়া সে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী শরিয়তের সকল শাস্তির ক্ষেত্রে অন্য ইমামগণের সঙ্গে মতানৈক্য করেছেন। বলেছেন, মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড, ছিনতাইকারীর দণ্ড, চোরের হস্তকর্তন সকল শাস্তিই বিচারকের অনুমোদন ব্যতীত কার্যকর করা যাবে। তিনি আরো বলেন, শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করার অধিকার রয়েছে সকল মুসলমানের। ইমাম নববী শাফেয়ী বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে বিচারকের অনুমতি ব্যতীত দণ্ডবিধান কার্যকরী করা একটি সাধারণ বিধান। কেননা হাদিসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে দণ্ডবিধানের বিবরণাবলী চূড়ান্ত অর্থবোধক। তাই সাধারণ অর্থে সকল মুসলমান হতে পারে এর প্রয়োগকারী । সুতরাং বুঝতে হবে নির্দেশটি সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য। 'তাহযীব' গ্রন্থে রয়েছে, হস্তকর্তন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। এটাই বিশুদ্ধ মত।

ত্রয়ী ইমাম প্রমাণ গ্রহণ করেছেন নিম্নে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে একবার এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হলো, অবিবাহিত ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে, তবে তার বিধান কী? রসুল স. বললেন, বেত্রাঘাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ব্যভিচারেও বেত্রাঘাত। আর চতুর্থবার যদি সে এরকম করে, তবে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে, এক গাছি চুলের বিনিময়ে হলেও। তিনি স. একথাও বলেছেন, তোমরা তোমাদের অধিকৃত গোলাম-বাঁদীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ কোরো। হাদিসটি নাসাঈ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে।

ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, নবীনন্দিনী হজরত ফাতেমা তাঁর এক ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনে ওয়াহাব ইবনে জারীহের মাধ্যমে ওমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুলতনয়া হজরত ফাতেমা তাঁর ব্যভিচারিণী বাঁদীকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের বরাত দিয়ে নাফে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। তিনি ওই চোরকে হস্তকর্তনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন মদীনার বিচারক সাঈদ ইবনে আসের নিকটে। সাঈদ তখন বলেছিলেন, চুরি করলেও গোলামের হস্তকর্তন করা যায় না। হজরত ইবনে ওমর বলেছিলেন, আপনি একথা কোন কিতাবে পেয়েছেন? একথা বলে তিনি নিজেই হাত কেটে দিয়েছিলেন ওই গোলামের ।

আব্দুর রাজ্জাক তদীয় 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন মুয়াম্মারের মাধ্যমে আইয়ুব সূত্রে নাফে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমরের এক গোলাম চুরি করেছিলো। আর এক গোলাম করেছিলো ব্যভিচার। তিনি তাদেরকে বিচারকের নিকট প্রেরণ না করে নিজেই একজনের কেটে দিয়েছিলেন হাত এবং আর একজনকে করেছিলেন কশাঘাত। ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই গোলাম দু'জন ছিলো জননী আয়েশার। সাঈদ ইবনে মনসুর—হাশেম—ইবনে আবী লায়লা—নাফে সূত্রেও এরকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা মক্কায় আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পুত্রের এক গোলাম। ওই গোলাম চুরি করেছিলো এবং চুরির কথা স্বীকারও করেছিলো। জননী আয়েশার নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। ইমাম মালেক লিখেছেন, জননী হাফসা তাঁর এক বাঁদীকে হত্যা করিয়েছিলেন। সে যাদু করেছিলো। আবদুর রাজ্জাক এ ঘটনার বিবরণ দানের পর বলেছেন, হজরত ওসমান এ কাজকে শরিয়ত-পরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, উম্মত-জননীর ওই কাজকে শরিয়তবিরোধী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন হজরত ওসমান।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের প্রমাণ স্বরূপ সুপরিণত ও পরিণত সূত্রে লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যোবায়ের চারটি বিষয়কে বিচারকের অধিকারভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন— ১. হুদুদ ২. জাকাত আদায় ও বণ্টন ৩. জুমআর নামাজ ৪. গনিমত জমা ও বণ্টন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিভূত না করে'। একথার অর্থ— শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি মমতাবশতঃ তোমরা যেনো আল্লাহ্র বিধান পরিত্যাগ না করো। এরকম তাফসীর করেছেন মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, নাখয়ী, শা'বী ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের।

হজরত আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী মাখজুমের এক মহিলা একবার চুরি করে বসলো। কুরায়েশদের জন্য বিষয়টি হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত বিব্রতকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো, উমামা ইবনে জায়েদ রসুল স. এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাকেই এব্যাপারে সুপারিশকারী নিযুক্ত করা হোক। উমামা ইবনে জায়েদ তাদের অনুরোধে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন। তাঁর কথা শুনে রসুল স. বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র বিধান অকার্যকর করার জন্য সুপারিশ করতে চাও? এরপর তিনি স. মিম্বরে আরোহণ করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বললেন, অতীতে সম্মানিত লোকেরা কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিতো। আর শাস্তি প্রয়োগ করতো দুর্বল লোকদের উপর। আল্লাহ্র কসম! আমার কন্যা ফাতেমা চুরি করলেও তো আমি তার হাত কেটে দিবো।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করবে না। হালকাভাবেও প্রহার করবে না, প্রহার করবে কঠোরভাবে। এরকম তাফসীর করেছেন হাসান এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবও। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে কঠোরতার সঙ্গে। মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতার সঙ্গে এবং ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি আরো কম কঠোরতার সঙ্গে। কেননা এরকমও হতে পারে যে, ব্যভিচারের অপবাদদাতা বাস্তবে সত্যবাদী (কিন্তু সে পরিপূর্ণ সাক্ষ্যের অভাবে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারছে না)। মদ্যপানের শাস্তিতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর ব্যভিচারের শাস্তি মদ্যপানের শাস্তি অপেক্ষা অধিক গুরুতর। তাই ব্যভিচারের শাস্তি অধিক কঠোর।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের এক দাসী ব্যভিচার করেছিলো। তিনি তাকে কশাঘাত করান। কশাঘাতকারীকে বলেন, তার পিঠে ও উরুদেশে প্রহার করো। তাঁর এক পুত্র আবৃত্তি করলেন 'আল্লাহ্র বিধান

কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে অভিভূত না করে'। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, বৎস! আল্লাহ্ আমাকে এ নির্দেশ দেননি যে, আমি তাকে হত্যা করি। আমি তাকে কশাঘাত করালাম। কষ্ট দিলাম (এটাই তো যথেষ্ট)।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা আল্লাহ্য় ও পরকালে বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— যদি তোমাদের আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধান পালনে তোমরা নম্রতা প্রদর্শন করবে না। শরিয়তের শাস্তি কার্যকর করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এটাই ইমানের দাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। জনসমক্ষে শাস্তি কার্যকর করা হলে তা হয় অধিকতর লাঞ্ছনা এবং অনেকের শিক্ষার কারণ। তাই এখানে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসীদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে'। এখানে 'ত্বইফাতুন' অর্থ দল। অর্থাৎ ওই দল যা চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকে। 'ত্বইফাহ' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ত্বওফুন' থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'ত্বইফাহ্' এর ন্যূনতম সংখ্যা চারজন, যারা দণ্ডায়মান থাকবে চারদিকে। কেউ কেউ বলেছেন, দল হওয়ার জন্য তিন জনই যথেষ্ট। কারণ বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা তিন। আর এখানে 'ত্বইফাতুন' ব্যবহৃত হয়েছে 'ত্বয়িফুন' এর বহুবচন হিসেবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'দুটিদল' অর্থেও 'ত্বইফাতুন' ব্যবহৃত হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্ ত্বইফানি মিনাল মু'মিনীনা কৃতালূ' (যদি মুসলমানদের দুটি দল যুদ্ধ করে)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'ত্বইফাতুম্ মিনাশ্শাইয়ি' অর্থ কোনোকিছুর টুকরা, অথবা একের অধিক, অথবা এক থেকে হাজার পর্যন্ত বা কমপক্ষে দুই ব্যক্তি কিংবা একই ব্যক্তি। একজন উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে নিজে বা স্বয়ং।

আমি বলি, শব্দটি বহুবচন হওয়াও সম্ভব, যাকে ইঙ্গিত স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে একবচনরূপে। একথাও ঠিক যে, 'রদিয়াহ্' ও 'গোলামাহ্' এর মতো এই শব্দটিও আধিক্যবাচক। নাখয়ী ও মুজাহিদ বলেছেন, কমপক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বলে ত্বইফাহ'। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এই অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে।

ইমাম আহমদ, আতা, ইকরামা ও ইসহাক বলেছেন, দুই অথবা ততোধিক লোকের দলকে বলে 'ত্বইফাহ'। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেন। জুহরী ও কাতাদার অভিমতও এরকম। ইমাম মালেক ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, 'দল ' এর সংখ্যা চারজন। ব্যভিচারের সাক্ষ্যপ্রদাতার সংখ্যাও চারজন। হাসান বসরীর মতে 'দল' অর্থ দশ অথবা ততোধিক সংখ্যক লোকের দল। আমি বলি, এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রচার।

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করিবে এবং ব্যভিচারিণী— তাহাকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করিবে, বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহাদিগকে বিবাহ করা অবৈধ।

আবু দাউদ, তিরমিজি ও হাকেম আমর ইবনে শোয়াইব থেকে, তিনি শোয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, মারছাদ নামক এক লোক মক্কা থেকে কতিপয় বন্দীকে নিয়ে হাজির হলো মদীনায়। মক্কায় ছিলো তার এক বান্ধবী। সে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার ওই বান্ধবীকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলো। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। তিনি স. মারছাদকে আয়াত খানি পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিবাহ কোরো না।

নাসাঈ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেন, উম্মে মাহযুল নাম্নী এক ভ্রষ্টা মহিলাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন জনৈক সাহাবী। তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্ যখন ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করলেন, তখন কয়েকজন সুন্দরী ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কেউ কেউ। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীগণের অনেকেই ছিলেন রিক্ত, নিঃস্ব, আপনজন ও আশ্রয়চ্যুত। মদীনায় তখন বাস করতো কতিপয় ধনাঢ্য মহিলা। নিঃসম্বল সাহাবীগণ স্বচ্ছলতা লাভের আশায় তাঁদেরকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যখন তাঁরা রসুল স. সকাশে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো তখনই। বলা হলো, ওই সকল রমণীকে বিবাহ করা বিশ্বাসীদের পক্ষে সঙ্গত নয়। কারণ তারা পৌত্তলিক। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আতা ইবনে আবী রেবাহ্, মুজাহিদ, কাতাদা, জুহরী ও শা'বী। আউফীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যাও এরকম।

আমি বলি, অপরিণত সূত্রে সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন, মক্কা ও মদীনার কতিপয় মহিলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তন্মধ্যে

নয়জন মহিলা ছিলো চিহ্নিত পতিতা। তারা তাদের তাঁবুর সামনে পতাকা উত্তোলন করে রাখতো। তাদের একজনের নাম ছিলো উম্মে মাহজুল। সে ছিলো সায়েব ইবনে সায়েব মাখজুমীর দাসী। মূর্খতার যুগে অনেকে তাদের দাসীদেরকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতো এবং ভক্ষণ করতো তাদের উপার্জন। ইসলামের আবির্ভাবের পর পর কোনো কোনো মুসলমানের ইচ্ছা হলো, তাঁরা ওই সকল পতিতাকে বিবাহ করবেন এবং তাদের দ্বারা অর্থ উপার্জন করবেন। তাঁদের একজন উম্মে মাহজুলকে বিবাহ করার জন্য রসুল স. এর অনুমতিপ্রার্থী হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

আলোচ্য আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের আলোকে ইমাম আহমদ বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তওবা না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নয়। তওবা করার পর তাদেরকে আর ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বলাও যাবে না। (কারণ হাদিস শরীফে এসেছে, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী নিষ্পাপ)। অন্য ইমামত্রয় বলেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ শুদ্ধ। বাহ্যতঃ একথা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপন্থী নয়। কারণ এখানকার নিষিদ্ধতা এসেছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই সাধারণভাবে এই বিধানটি প্রযোজ্য নয়। এটাই আলোচ্য আয়াতের ভাবগত ব্যাখ্যা। স্বভাবতই ব্যভিচারীরা হয় দুষ্ট প্রকৃতির। তাই পুণ্যবতী নারীর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় না। ব্যভিচারিণীরাও সাধারণতঃ চায়না পুণ্যবান স্বামী।

লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমে ব্যভিচারিণীর উল্লেখ হওয়াই ছিলো সুসমঞ্জস। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যভিচারীর কথা। এরকম করার উদ্দেশ্য, এখানে প্রধানতঃ পুরুষদের বিবাহেচ্ছার কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচারের কথা বলা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই বিবরণ এসেছে এখানে বিপরীত দিক থেকে।

সর্বশেষ আলোচিত তাফসীরের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণকে অপ্রীতিকর বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ইমাম মালেক তাই বলেছেন, ইমানদার পুরুষ-নারীর জন্য ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হওয়া মাকরূহে তাহ্‌রিমা।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে আলোচ্য আয়াতের 'বিবাহ' শব্দটির অর্থ 'সহবাস'। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীরা তাদের সমস্বভাবসম্পন্ন নারী-পুরুষ অথবা অংশীবাদী নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে যৌনক্ষুধা মেটায় না। এরকম ব্যাখ্যার প্রবক্তা সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক। তাঁরা আবার এমতো ব্যাখ্যাকে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে।

জায়েদ ইবনে হারুন বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একথা বলা যে— ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি হালাল মনে করে পরস্পরের সঙ্গে তাদের কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করে, তবে তারা অবিশ্বাসী, আর যদি হারাম মনে করে এ কাজ করে, তবে তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী।

আলেমগণের একটি দল মনে করেন, এখানে না সূচক বাক্য 'লা ইয়ানকিহ্' (বিয়ে করবেনা) কথাটির অর্থ হবে নিষেধাজ্ঞাসূচক— অথাৎ সে যেনো বিয়ে না করে। কোনো কোনো ক্বেরাতে এমন পাঠ বিদ্যমান। যেনা কারিনীর সাথে বিবাহের নিষিদ্ধতা তো স্ব স্থানে বিদ্যমান। তবে এ নিষিদ্ধতা সর্ব সাধারণের জন্য নয়। এখানকার নিষিদ্ধতা প্রযোজ্য কেবল ওই সকল সহায়-সম্বলহীন মুহাজির সাহাবীগণের বেলায় যারা ব্যভিচারিণীদেরকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

আমি বলি, একথা ঠিক নয়। অর্থাৎ এখানকার নিষিদ্ধতা কেবল সাহাবীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তাই হতো তবে আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়াতো এরকম— বিশ্বাসীগণ বিবাহ করবে কেবল বিশ্বাসিনীগণকে; ব্যভিচারীনি অথবা অংশীবাদীনিদেরকে নয়। তাছাড়া সাহাবীগণের উক্তিও সীমাবদ্ধতাবিরোধী। হজরত ইবনে মাসউদ ব্যভিচারিণীকে বিবাহবদ্ধ হওয়াকে হারাম সাব্যস্ত করতেন এবং বলতেন, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহবদ্ধ হলে সর্ব অবস্থায় ব্যভিচারলিপ্তই থেকে যায়।

হাসান বলেছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী বিবাহ করে না অথবা করবে না শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারিণী ছাড়া অন্য কাউকে এবং শাস্তিপ্রাপ্তা ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী ব্যতীত অন্য কাউকে। আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে আবু মাকবরী সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী বিবাহ করে না অথবা করবে না তাদের সমস্বভাব সম্পন্ন ছাড়া অন্য কাউকে। এসকল উক্তির সারসংক্ষেপ এই যে, এখানকার নিষিদ্ধতা অনির্দিষ্ট। আর এই আয়াত রহিতও নয়।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও তাফসীরকারগণের একটি দলের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত মনসুখ। এর নাসেখ (রহিতকারী) আয়াত হচ্ছে 'ওয়ানকিহুল আয়ামা মিনকুম'(তোমাদের মধ্য থেকে বিধবাদের বিয়ে করো)। এভাবে বিধবাবিবাহের অনুমতির সাথে সাথে ব্যভিচারিণী বিবাহেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যভিচারিণীরাও বিধবাগণের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যভিচারিণীর বিবাহ হজরত জাবের থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। হাদিসটি এই— একবার এক লোক রসুল স. এর মহান

সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না। রসুল স. বললেন, ওকে তালাক দিয়ে দাও। লোকটি বললো, সে তো সুন্দরী। আর তাকে আমি ভালোওবাসি। তিনি স. বললেন, তাহলে আস্বাদন করো। অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বললেন, তাহলে তুমি তাকে রেখে দাও। তিবরানী ও বায়হাকীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে, তিনি আবদুল করিম ইবনে মালেক থেকে, তিনি আবু জোবায়ের থেকে, তিনি হজরত জাবের থেকে। ইবনে আবু জাবের বলেন, আমি এই হাদিস সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট মোহাম্মদ বিন আবদে কাছীর মু'তামাবের বরাত দিয়ে আবদুল করিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল করিম বলেন, আমার কাছে বনী হাশেমের একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস থেকে বলেছেন, আবু জোবায়ের এক লোক রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলো। এর পরের বিবরণ পূর্ববৎ।

সুফিয়ান সওরীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ওই লোকটির নাম ছিলো হিশাম। তিনি ছিলেন বনী হাশেমের আজাদ করা গোলাম। আবু দাউদ ও নাসাঈও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমাইরের পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। নাসাঈ একথাও লিখেছেন যে, একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হাদিসটির সূত্রপরম্পরাকে উন্নীত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস পর্যন্ত। অপর বর্ণনাকারী হাদিসটিকে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। সুতরাং বলা যেতে পারে, বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর নয়, বরং অপরিণত শ্রেণীর। নাসাঈ ও আবু দাউদ এর সূত্রপ্রবাহকে সংযুক্ত করতে পেরেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণনাটির সূত্রপ্রবাহ বিশুদ্ধ। নববীও একে বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জাওজী হাদিসটি মূলগতভাবে লিখেছেন শুদ্ধ সূত্রের সঙ্গে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট করেছেন মাওদ্বুয়াতের(কল্পিত হাদিসের) মধ্যে। ইমাম আহমদ বলেছেন, এ প্রসঙ্গে কোনো হাদিস নেই, বরং পুরো বিবরণটিই ভিত্তিহীন।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত হাদিসের 'আমার স্ত্রী স্পর্শকারীর (আহ্বানকারীর) হাতকে প্রতিহত করে না' কথাটির অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে কতিপয় আলেম বলেছেন, বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— কেউ যদি তাকে স্পর্শ করতে চায় তবে সে তাকে বাধা দেয় না। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন নাসাঈ, আবু উবাইদা, ইবনুল আরাবী খাত্তাবি, ফারইয়াবি ও নববী। এই অর্থটিকে গ্রহণ করে বাগবী ও রাফেয়ী বলেছেন, ব্যভিচারিণীর সঙ্গে বিবাহবদ্ধ হওয়া জায়েয। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে — আমার স্ত্রী যাচ্ঞাকারীদেরকে ফেরায় না।

যে যা চায় সে তাকে তাই দিয়ে দেয়, অতিরিক্ত খরচ করে। ইমাম আহমদ, আসমায়ী ও মোহাম্মদ ইবনে নসর এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছেন। এই অর্থটিকে গ্রহণ করলে ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ— একথা মানা যায় না।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এক যুবক ও এক যুবতীকে ব্যভিচারের অপরাধে প্রহার করার পর তাদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু যুবকটি অসম্মত হয় (এতে করে বুঝা যায় ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর বিবাহ জায়েয)। তিবরানী ও দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! পুরুষ-রমণী ব্যভিচারের পর যদি পরস্পরকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, তবে তার বিধান কী? তিনি স. বললেন হারাম কখনো হালালকে হারামে পরিণত করতে পারে না। আবদুর রাজ্জাক ও আবী শায়বা তাদের আপন আপন গ্রন্থে লিখেছেন, এক লোক একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোনো মহিলাকে সম্ভোগ করার পর তাকে বিয়ে করতে চায়, তবে তার সম্পর্কে বিধান কী? তিনি বললেন প্রারম্ভে ব্যভিচার পরিশেষে বিবাহ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

❒ যাহারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং কখনো তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না; ইহারাই সত্যত্যাগী।

'ইয়ারমূনা' অর্থ অপবাদ আরোপ করে, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। যেমন বলে— তুমি ব্যভিচার করেছো, অথবা তুমি ব্যভিচারিণী। এই ব্যাখ্যাটি সকল তাফসীরকার ও ফেকাহ্‌বিদগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। কেননা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার শর্ত কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং চারজনের একত্র সাক্ষ্য ছাড়া কাউকেই ব্যভিচারিণী বলা যাবে না। আর এ বিধান প্রযোজ্য হবে কেবল ব্যভিচারের বেলায়। তাই আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, অন্য কোনো গোনাহের অপবাদপ্রদাতার উপরে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। বরং বিচারক অন্য সকল ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তেমনি ইশারা-ইঙ্গিতে যদি কেউ কোনো রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবু তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন কেউ বললো 'আমি তোমার সঙ্গে ব্যভিচার

করিনি'। এরকম কথার অর্থ দাঁড়ায়— তোমার যৌনসঙ্গী আমি নই, অন্য কেউ। এমতো অভিমত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে সিরীন এবং হাসান ইবনে সিলাহ। কিন্তু ইমাম মালেক ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের মত এই যে, ইঙ্গিতজাত অপবাদের ক্ষেত্রেও শাস্তি আরোপ করা যাবে। কেননা জুহরী মালেকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, হজরত ওমরও এমতোক্ষেত্রে হদ প্রয়োগ করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলীও ইঙ্গিতে ব্যভিচারের অপবাদদানকারীর উপরে হদ আরোপ করতেন।

ইঙ্গিতে অপবাদ আরোপ প্রকাশ্যে অপবাদ আরোপের মতোই। কিন্তু এদু'টো বিষয় অবিকল এক নয়। তাই আমি বলি ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। আর ইঙ্গিত ইঙ্গিতই। প্রকাশ্য বিধানের আওতায় তা আসে না। তাই ইদ্দত পালনকারিণীকে ইঙ্গিতে বিবাহের বারতা জানিয়ে দেয়া যায়, প্রকাশ্যে যায় না। যেমন এরশাদ হয়েছে — 'ওয়ালা জুনাহা আ'লায়কুম ফী মা আরদ্বতুম বিহী মিন খিত্ববাতিন নিসা'।

'আল মুহসানাত' অর্থ সাধ্বী রমণী। উল্লেখ্য, সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান যেমন অপরাধ, তেমনি অপরাধ নিষ্কলংক পুরুষের চরিত্র হনন করাও। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, দু'টো অপরাধই সমগুরুত্বসম্পন্ন। আর আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এখানে এসেছে কেবল সাধ্বী রমণীর কথা। এরকমও হতে পারে যে, নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপরাধ মানুষের দৃষ্টিতে পুরুষের প্রতি অপবাদারোপ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। তাই এখানে বলা হয়েছে কেবল সাধ্বী রমণীর অপবাদের কথা।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে 'ইহসান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা, জ্ঞানবতী, মুসলমান হওয়া ও সচ্চরিত্রা হওয়াকে, ইতোপূর্বে ব্যভিচারের অপবাদপ্রাপ্ত না হওয়াকে। রসুল স. ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতের সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, সে 'মুহসিন' নয়। একথার অর্থ— সে মুসলমান নয়।

কেউ জীবনে কখনো ব্যভিচার করার পর যদি তওবা করে, এমতাবস্থায় এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেউ তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে অপবাদকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা তার কথা সত্যও হতে পারে। তবে তাকে ভর্ৎসনা করা যাবে। কারণ সে একজন তওবাকারীকে তার অতীতের পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছে, যে পাপ থেকে সে তওবার মাধ্যমে মুক্ত। এভাবে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, শিশু ও পাগলকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, সে-ও

শাস্তিযোগ্য নয়। তবে দাউদ জাহেরী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে যে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, সে শাস্তিযোগ্য। উল্লেখ্য, ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত।

আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে'। একথার অর্থ— যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়, সে যদি তা অস্বীকার করে তবে অপবাদকারীকে তার বক্তব্যের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। এরকম করতে পারলে সে আর অপবাদদাতা হিসেবে পরিগণিত হবে না, তাই আশি বেত্রাঘাতের শাস্তিও তার উপরে বর্তাবে না। তখন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর উপর। কিন্তু যদি সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবুও সে দোষমুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু সে এড়িয়ে যেতে পারবে আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হলেও সাক্ষীর সংখ্যা সে পূর্ণ করতে পেরেছে। ইমাম আবু হানিফা এরকমই বলেছেন। উল্লেখ্য, চারজন সাক্ষীর একত্রায়নের বিধান বলবৎ করা হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য, যাতে অভিযুক্তরা অব্যাহতি পেয়ে যায়। কিন্তু এ শর্ত এজন্য করা হয়নি যে শর্ত পুরোপুরি পূরণ না করতে পারলে অপবাদকারীকে শাস্তি পেতে হবেই। আর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই তার অপরাধ একবার স্বীকার করে, তবু সে শাস্তিযোগ্য হবে না, অপবাদকারীও হবে না শাস্তির উপযুক্ত।

এখানে 'শুহাদা' (সাক্ষ্য) অর্থ ওই লোকের সাক্ষ্য যে শরিয়ত অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। সুতরাং অন্ধ, অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, ক্রীতদাস— এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কাউকে অপবাদ দিলে নির্বিচারে তাদের উপরেই শাস্তি আরোপ করতে হবে। আর ক্রীতদাস তো কখনোই সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য নয়। কিন্তু যারা দুষ্ট (ফাসেক), তাদের সাক্ষ্য দ্বারাও ব্যভিচার প্রমাণ করা যাবে না। তাই তাদের উপর অপবাদের শাস্তিও প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ ফাসেক হওয়ার কারণে স্বভাবতই তাদের সাক্ষ্য দুর্বল। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, ফাসেক অপবাদদাতার উপরেও অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। কারণ সে ক্রীতদাসের মতো সাক্ষ্যদানের যোগ্যই নয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না জেনেও কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত করে তাদের উদ্দেশ্য মন্দ। তাদের এমতো কর্ম মুসলমানের সম্মানহানির কারণ। তাই তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে আশি বেত্রাঘাত। হাকেম, আবু নাঈম, আবু মুসা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমরের সামনে হজরত মুগীরা

ইবনে শো'বার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন হজরত আবু বকরা, নাফে ও শিবল ইবনে মা'বাদ। চতুর্থ সাক্ষী ছিলেন যিয়াদ। তাঁর সাক্ষ্য ছিলো অস্পষ্ট। তাই হজরত ওমর তিনজনকে কশাঘাত করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো সাহাবীগণের একটি দলের সামনে। তাঁদের কেউই হজরত ওমরের এমতো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং বুঝতে হবে সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। বোখারী ঘটনাটি বিবৃত করেছেন তা'লীক পদ্ধতিতে। আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন সওরীর মাধ্যমে সুলায়মান তাইমির বরাত দিয়ে নাহজির বর্ণনাক্রমে। এ বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে বলা হয়েছে, যখন যিয়াদ তাঁর সাক্ষ্য পরিবর্তন করেন, তখন হজরত ওমর বলেন, এ লোক সাক্ষ্যপ্রদানের উপযুক্ত নয়। একথা বলেই তিনি অন্য তিনজনকে করেন কশাঘাত।

'ফাজলিদুহুম' অর্থ তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে। অর্থাৎ তাদেরকে একারণে কশাঘাত করবে যে, অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ক্ষুণ্ন হয় বান্দার হক, খর্ব হয় মান-সম্মান। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হকই অগ্রগণ্য। কিন্তু বান্দার সম্মান অসম্মানের বিষয়টিও আল্লাহ্‌র হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সাক্ষ্যদাতাকে হতে হবে স্বাধীন। ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। তবে ফকিহ্‌গণের ঐকমত্য এই যে, ক্রীতদাস কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ রটালে তাকে কশাঘাত করতে হবে চল্লিশটি। তাঁরা বিষয়টিকে তুলনা করেছেন ব্যভিচারের শাস্তির সঙ্গে। অবিবাহিত স্বাধীন ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর শাস্তি একশত কশাঘাত। আর ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর শাস্তি অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। ব্যভিচারিণী ক্রীতদাসী সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাআ'লাইহিন্‌না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি'।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বলেছেন, আমি হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর শাসনামল দেখেছি। তাঁরা ব্যভিচারের অপবাদদানকারী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করতেন। বর্ণনাটি ইমাম মালেকও লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মুয়াত্তায়। কিন্তু সেখানে হজরত আবু বকরের নাম নেই। ইমাম আওজায়ী বলেন, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর অপবাদকারীর শাস্তি স্বাধীন অপবাদদাতার মতোই— আশিটি কশাঘাত।

অপবাদপ্রদাতাদের শাস্তি দু'টি— আশিটি কশাঘাত এবং তাদের সাক্ষ্য ভবিষ্যতে গ্রহণ না করা। তাই এখানে বিচারককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'আশিটি কশাঘাত করবে' এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না'।

'তারাই সত্যত্যাগী' বলে এখানে দূর করা হয়েছে একটি সন্দেহকে। সন্দেহটি এই— সন্দেহ সৃষ্টি হলেই তো অভিযুক্তদের উপর শাস্তি রহিত হয়ে যায়। তাহলে আবার অভিযোগকারীকে অপবাদদাতা সাব্যস্ত করা হবে কেনো। আর কেনোই বা সে হবে শাস্তির উপযোগী। পূর্ণ সাক্ষী (চারজন) সে উপস্থিত করতে পারেনি বটে, কিন্তু এমন হওয়াও তো সম্ভব যে তার কথা সত্য। আর সে কেবল আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুচ্চ করার অভিপ্রায়েই ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো। অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিলো না। কিন্তু এমতো সন্দেহ যে অযথার্থ সে কথা বুঝাতে সব শেষে বলা হয়েছে 'তারাই সত্যত্যাগী'। অতএব বুঝতে হবে, ব্যভিচারের অপবাদ প্রদাতার নিয়ত কিছুতেই ভালো হতে পারে না। কেবল মুসলমানের সম্মানহানিই ছিলো তার এমতো অপবাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই সে শাস্তিরও যোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, এখানকার 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' বাক্যটি একটি ভিন্ন বাক্য। ব্যভিচারের অপবাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি প্রদানের শাস্তি কেবলই আশিটি কশাঘাত। সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই শাস্তি প্রয়োগ করা বিচারকের কাজ, কিন্তু কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কিনা— এরকম বলা তাঁর কাজ নয়। বরং এখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কারণ বলা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে 'তারাই সত্যত্যাগী'। অর্থাৎ সত্যত্যাগী যারা, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আমি বলি, সাক্ষ্য গ্রহণ না করার নির্দেশটি অপবাদের শাস্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' কথাটির মধ্যে রয়েছে বেত্রাঘাতের নির্দেশ অপেক্ষা অধিক হুঁশিয়ারি ও ভর্ৎসনা। কারণ এ লাঞ্ছনা স্থায়ী। সে কথা প্রকাশ করতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আবাদান' (কখনো)। প্রকাশ থাকে যে, ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য অগ্রাহ্য নয়। অগ্রাহ্য ততদিন পর্যন্ত, যতদিন তাদের সত্যত্যাগপ্রবণতা অটুট থাকে।

একটি সন্দেহঃ 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ অপবাদপ্রদাতা অপবাদকর্মে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। যখন তওবা করবে তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। যেমন বলা হয়, কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ তারা কাফের থাকে। কিন্তু যখন সে কুফরী থেকে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। এভাবে কাফেরের সঙ্গে ফাসেকের (সত্যত্যাগীর) তুলনা উত্থাপন করা কতটুকু সঙ্গত?

সন্দেহের জবাবঃ এরকম তুলনা ঠিক নয়। কাফেরের সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ সে কাফের থাকে— একথা ঠিক। তাই এমতোক্ষেত্রে 'আবাদান (কখনো) শব্দটি ব্যবহার্য নয়। কিন্তু ফাসেকের ক্ষেত্রে এখানে এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা। আর ফাসেকীকেই নির্ণয় করা হয়েছে এর প্রধান কারণ। যেমন বলা হয়— তোমার বন্ধু জায়েদের সঙ্গে সদাচরণ করো। এর অর্থ— জায়েদ যেহেতু তোমার বন্ধু, সেকারণেই তার সঙ্গে সদাচরণ করো।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

তবে যদি ইহার পর উহারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে — আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেন, এখানকার 'ইল্লাল্লাজীনা' (তবে যদি তারা) ব্যতিক্রমবোধক কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের শেষ বাক্য (তারা সত্যত্যাগী) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয়, তারা আর সত্যত্যাগী বা ফাসেক থাকে না। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র। এই মর্মার্থটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তওবা দ্বারা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, কেবল ফাসেক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ফেকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুসারে ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, কয়েকটি বাক্যের পরে যদি ব্যতিক্রমবোধক কোনো বাক্য শুরু হয়, তবে তা সম্পর্কযুক্ত হবে সর্বশেষ বাক্যটির সঙ্গে। কিন্তু কোনো বিশেষ ইঙ্গিত থাকলে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক ঘটতে পারে পূর্ববর্তী সকল বাক্যের সঙ্গে।

ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত তাফসীরে রয়েছে কয়েকটি দলিল। যেমন— ১. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্পর্ক কেবল পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের শেষ বাক্যের সঙ্গে। ২. শেষ বাক্যটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক, তার বাকরীতিও স্বতন্ত্র, যদিও সর্বনাম ইঙ্গিতসূচক পদের দিক থেকে এর সম্পৃক্তি রয়েছে পূর্বোক্ত সকল বাক্যের সঙ্গে। ৩. ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের জন্য শর্ত হচ্ছে— ব্যতিক্রম ও ব্যতিক্রমক উভয়টি থাকবে সম্মিলিত। এমতোক্ষেত্রে শেষ

বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যসমূহ ও ব্যতিক্রম বোধক বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছে অন্তরায়। ৪. শুধুমাত্র ব্যতিক্রমের একটি স্বতন্ত্র অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বলেই পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সম্বন্ধ করা হয়। এই আবশ্যকতা পরিপূরিত হতে পারে কেবল আর একটি বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে। এখন কথা হচ্ছে, এমতো সম্পৃক্তি ঘটেছে শেষ বাক্যটির সঙ্গে যা বিদ্বজ্জন কর্তৃক সমর্থিত। সুতরাং অন্য বাক্যের সঙ্গে এর সম্পৃক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব বুঝতে হবে, পূর্ববর্তী বাক্যগুলো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের উপরে নির্ভরশীল। কারণ সেগুলোর বিধান পরিবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের দ্বারাই বিধান রূপান্তরিত হয়। তাই শেষ বাক্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটিকে সম্পর্কযুক্ত করলেই এই রূপান্তরণের পূর্ণতা সাধিত হয়।

একটি সন্দেহঃ 'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমেই বাক্যসমূহ সংযোজিত হয়। এখানেও তাই হয়েছে। সুতরাং সকল বাক্যই তো ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তবে কেনো বলা হবে, কেবল শেষ বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত?

সন্দেহের অপনোদন ঃ সংযোজনের উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, সংযোজিত বাক্যগুলো কেবল একটি বিধানকে প্রকাশ করবে। বরং প্রতিটি বাক্যের বিধান হতে পারে পৃথক পৃথক। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। মনে রাখতে হবে, সংযোজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বাক্যকে একটি বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যেক বাক্যকে একটি ব্যতিক্রমবোধক বাক্যের অন্তর্ভূত করা নয়।

তওবার দ্বারা ফাসিকী (সত্যত্যাগপ্রবণতা) অপসারিত হয়, শাস্তি রহিত হয় না। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের অভিমত হচ্ছে, অন্তরায়বিবর্জিত অবস্থায় আলোচ্য সংযোজ্য ও সংযোজিতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্বন্ধিত হয়। তাই তাঁর মতে তওবার দ্বারা অপসারিত বা রহিত হয় অপবাদের শাস্তি। আর জমহুরের মতে শাস্তি রহিত হয় না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্বন্ধ হবে শেষ বাক্য দুটোর সঙ্গে। 'কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না' বাক্যটি 'আশিটি কশাঘাত করবে' বাক্যটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাই এখানে ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটির সম্পর্ক 'আশিটি কশাঘাত করবে' এর সঙ্গে হবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, আগের তিনটি বাক্যের সঙ্গেই ব্যতিক্রমবোধক বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত হবে। তবে একথা বলা যাবে না যে, তওবা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়। কারণ শাস্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ তওবা অর্জিত হয় না। অথবা তওবা

অর্জিত হয় যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে, তার নিকটে ক্ষমা চাইলে এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দিলে।

আমি বলি, তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং তওবার দ্বারা শাস্তি রহিত হলে শরিয়তের শাস্তি আর ওয়াজিব বলে স্বীকৃতি পাবে না। একথার উপরে ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী বলেন, অপবাদপ্রদাতার শাস্তি কেবল অপবাদের কারণেই নাকচ হয়ে যাবে, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করুন, অথবা না করুক। কেননা অপবাদপ্রদাতা ফাসেক। তাই তার সাক্ষ্য অগ্রহনীয়। তবে সে যদি আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তওবা করে এবং তার স্বভাব- চরিত্র সংশোধন করে নেয় তবে তার সাক্ষ্য আর অগ্রহণীয় থাকবে না। আশা করা যায় শাস্তিভোগের পর সে লজ্জিত হবে এবং তওবা করবে অথবা শাস্তিভোগের পূর্বেই তওবার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যাবে তার ফাসেকী এবং সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কলংক।

বাগবী লিখেছেন, এরকম ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হজরত ওমর ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, শা'বী, ইকরামা, জুহুরী এবং ওমর ইবনে আযীযের অভিমতও এরকম।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী বলেন, শাস্তিভোগের পর অপবাদের কাফ্‌ফারা পূরণ হয়ে যায়। অপবাদদাতার স্বভাব-চরিত্র হয়ে যায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তম। তাকে আর তখন পাপী বলা যায় না। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার আর কী কারণ থাকতে পারে? সে তো তখন নির্দোষ?

আমরা বলি, আমাদের নিকট অপবাদপ্রদাতার সাক্ষ্য কেবল অপবাদ দেয়ার কারণেই শাস্তি প্রয়োগের পূর্বেই অগ্রাহ্য হয়ে যায়, অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তার শাস্তি দাবি করুক আর না করুক, কেননা অপবাদ দেয়ার কারণেই সে ফাসেক। এখন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি শাস্তি দাবি না করলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করবে, সংশোধিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাবে না। হজরত ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, অপবাদদাতার তওবা করার অর্থ প্রদত্ত অপবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এভাবে সে যদি তার নিজের কথাকেই (অপবাদকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্যকে আর অগ্রহণীয় ভাবা যাবে না। বর্ণনাটিকে যদি যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসের শ্রেণীভূত করা যায়, তবে এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।

আমি বলি, একক বর্ণিত হাদিস যদি কোরআনের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থী হয়, তবে তাকে গ্রহণ করা যায় না। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না'। একথাও সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তওবা করলে এবং

সংশোধিত হলেই কেবল তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। দূর হয়ে যাবে তার ফাসেকীর কলংক। কিন্তু যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে আর কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, চাই সে তওবা করুক অথবা না করুক। কেননা তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা হয়েছে বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ন করার কারণে। আর বান্দার অধিকার তওবা দ্বারা রহিত হয় না।

দ্রষ্টব্য ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অপবাদের শাস্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের হক। বান্দার সম্ভ্রমহানির লজ্জাকে বিদূরিত করার জন্যই তাই দণ্ডবিধান করা হয়েছে আশিটি কশাঘাতের। এই দণ্ডবিধান প্রয়োগের ফলে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিশেষ উপকার অর্জিত হয়। এটাকেই আলেমগণ বান্দার হক বলে সাব্যস্ত করেছেন। এর মধ্যে এই রহস্যটিও নিহিত রয়েছে যে, এতে করে অপবাদপ্রদানপ্রবণতার অবসান ঘটে। মানবজাতি রক্ষা পায় ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে। তাই এটা আল্লাহ্রও হক। আবার বান্দার হক বলেই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে বান্দাকেই হতে হবে বিচারপ্রার্থী। এভাবে বিচারভূত দাবি আর বাতিল হবে না। বিচারক বাদীর দাবি অনুসারে দণ্ডবিধান করবেন। আশ্রিত কাফেরের অপবাদের ক্ষেত্রেও তিনি এমতো দণ্ড বিধান করতে পারবেন। তবে শর্ত হচ্ছে মামলাটি হতে হবে তার দায়িত্বকালের মধ্যে। অর্থাৎ তাঁর সামনে সাক্ষ্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দণ্ড কার্যকর করতে পারবেন না। আর যদি কেউ অপবাদ ও ব্যভিচার উভয় শাস্তির উপযুক্ত হয়, অথবা উপযুক্ত হয় চুরি ও অপবাদের শাস্তির, তবে প্রথমে কার্যকর করতে হবে অপবাদের শাস্তি। কেননা ব্যভিচার ও চুরি উভয় অপরাধের শাস্তি কেবলই আল্লাহ্র হক। আর অপবাদের শাস্তি হচ্ছে বান্দার হক। বান্দার হকই অগ্রগণ্য। উল্লেখ্য, অপরাধ স্বীকারের পর তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় বটে, কিন্তু ব্যভিচারের সাক্ষ্যদান থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। আর অপবাদের শাস্তির সঙ্গে যেহেতু আল্লাহ্র হকও জড়িত, তাই অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অপবাদদাতাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এ অধিকার রয়েছে কেবল বিচারকের। তবে সন্দেহ সৃষ্টি হলে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এতে রয়েছে আল্লাহ্রও হক। আবার এ শাস্তি রহিত হলেও তা রক্তপণ বা জরিমানার মতো বিনিময়ে পরিণত হয় না। আর অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা যাবে। স্মর্তব্য, যদি এটা কেবলই বান্দার হক হতো, তবে সাক্ষ্যবিহীন অবস্থায় অপবাদদাতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করা হতো এবং গোলাম অপবাদদাতা হলে তার শাস্তি অর্ধেক হয়ে যেতো। আরো স্মর্তব্য, হক্কুল্লাহ্র ক্ষেত্রে যে শাস্তি ওয়াজিব হয়, সে শাস্তি গোলামের জন্য অর্ধেক হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেলো, অপবাদের শাস্তিও আল্লাহ্র হক। অবশ্য হক্কুল ইবাদের ব্যাপারে যে সকল শাস্তি রয়েছে সে সকল

শাস্তির পরিমাণে কমবেশী করা হকের বিষয়ে কমবেশী করার সমতুল। তাই বুঝতে হবে, স্বাধীন-গোলাম কারো সঙ্গে শাস্তির ন্যূনাধিক্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

উপরে বর্ণিত সকল শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ একমত হয়েছেন। আর অপবাদের শাস্তিতে হককুল্লাহ্ এবং হককুল ইবাদের একত্রায়ণের বিষয়টিও ইমামগণের দৃষ্টিতে ঐকমত্যসম্মত। কিন্তু এর মধ্যে কার হক অগ্রগণ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, বান্দার হক অগ্রগণ্য। যেহেতু বান্দা মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার অভিমত এর বিপরীত। কেননা বান্দার হকের সংরক্ষণকারী হচ্ছে আল্লাহ্র হক। বান্দার হক আল্লাহ্র হকের সংরক্ষণকারী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র হক বান্দা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। তবে এই হক সে বাস্তবায়ন করতে পারে আল্লাহ্র প্রতিনিধিরূপে। উদ্ভূত মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হয়েছে আরো অনেক মাসআলা। যেমন—

১. অপবাদের বিচারপ্রার্থী হওয়ার অধিকার অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম অধিকার উত্তরাধিকারীদের নেই। কারণ আল্লাহ্র অধিকারে উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকারীরা সম্পৃক্ত হতে পারে কেবল বান্দার হকের সঙ্গে, সে হক সম্মান বা সম্পদ যে বিষয়েরই হোক না কেনো। যেমন জিম্মাদারী, অভিভাবকত্ব ও সম্পদগত। অপবাদের শাস্তি এই তিন শ্রেণীর কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। তাই উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী হতে পারে না। বরং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপবাদের শাস্তি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে অপবাদদাতার উপর থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য এর বিপরীত অভিমতের প্রবক্তা।

২. অপবাদদাতার উপরে শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার পর যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি তা মাফ করে দেয়, তবুও শাস্তি রহিত হবে না। এরকম বলেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে, শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বলে, সে আমাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়নি এবং তার সাক্ষ্য মিথ্যা, তবে সর্বসম্মত অভিমতে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কারণ তার এমতো অস্বীকৃতির কারণে অপবাদের অস্তিত্বই আর থাকে না। তা হলে শাস্তি আর ওয়াজিব থাকে কীভাবে? সুতরাং একথাও তখন বলা যাবে না যে, ওয়াজিবকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে, হ্যাঁ

কেসাসের প্রসঙ্গটি আবার ভিন্ন। এমতোক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ দিয়ে হত্যাকারীকে অব্যাহতি দিতে পারে। কেননা কেসাসে বান্দার হকই অগ্রগণ্য।

৩. ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, ধন-সম্পদ অথবা অন্যান্য সামগ্রী অপবাদের শাস্তির বিনিময়রূপে স্বীকৃত নয়। কেননা এমতোক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হকই অগ্রগণ্য। ইমাম আহমদ এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর নিকট অপবাদের শাস্তির বিনিময় হতে পারে।

৪. ইমাম আবু হানিফার মতে অপবাদের শাস্তিতে অনুপ্রবেশ সম্ভব। অর্থাৎ একাধিক অপবাদের শাস্তি অপবাদদাতাকে একবারেই দেয়া যাবে। এমন কি কেউ যদি একই ব্যক্তির উপরে কয়েকবার ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অথবা কয়েকজনের উপর অপবাদ দেয়, তবে সকল অপবাদের শাস্তিই তার উপরে একবারে প্রয়োগ করা যাবে। আর এমতো শাস্তিভোগের পর সে যদি অন্য কারো উপর অথবা পূর্বোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উপর অপবাদ দেয়, তবে পুনরায় তার উপরে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম শাস্তি পরবর্তী অপবাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। একজনের অপবাদের শাস্তি চলাকালে যদি অন্য আর একজন অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হয়ে আসে তবে পূর্ণ করতে হবে কেবল অবশিষ্ট শাস্তি। অর্থাৎ কার্যকর করতে হবে আশিটি কশাঘাতের মধ্যে যেটুকু বাকী থাকে, কেবল সেটুকু। ইমাম শাফেয়ী আবার অনুপ্রবেশের বৈধতাকে স্বীকার করেন না।

আমি বলি, এটা গ্রহণযোগ্য মত যে, অপবাদের শাস্তিতে আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের হকই বিজড়িত। আর একথাও সুপ্রমাণিত যে, সন্দেহজনক অবস্থা সৃষ্টি হলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেনো বিষয়টি এরকম— এক হক শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার। আর এক হক দাবিদার শাস্তি রহিত হওয়ার। সুতরাং শাস্তি রহিত হওয়ার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা ভুলের উপরে শাস্তি দেয়া অপেক্ষা ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের উক্তিও ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইমাম আবু হানিফার 'অপবাদের শাস্তি উত্তরাধিকারীরা দাবি করতে পারে না' এই অভিমতটি সঠিক। আর অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও শাস্তি রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার পক্ষ থেকে তখন আর কোনো দাবিই থাকবে না। আবার শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য বিচারপ্রার্থী হওয়াও একটি শর্ত। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর ওই অভিমতটি সঠিক, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি রহিত হওয়ার মাসআলায়। আর ইমাম আবু হানিফার ওই অভিমতটি বিশুদ্ধ, যে অভিমত তিনি পোষণ করেন শাস্তি প্রয়োগ হওয়ার মাসআলায়। সুতরাং অপবাদগ্রস্ত ও অপবাদদাতা যদি কোনো বিনিময়ের

মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়, তবে যেহেতু অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হদ রহিত করণে সম্মত হয়েছে, তাই হদ রহিত হয়ে যাওয়াও বাঞ্ছনীয়। আবার যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আল্লাহ্‌র হক তাই এখানে বিনিময় সিদ্ধ না হওয়াই উচিত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী লিখেছেন, হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়া একবার রসুল স. সকাশে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, তাঁর স্ত্রী শরীক ইবনে সামহারের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। রসুল স. বললেন শরয়ী সাক্ষ্য (চারজন সাক্ষী) উপস্থিত করো। নতুবা তোমার পিঠে কশাঘাত করা হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেউ যদি নিজে তার স্ত্রীর উপরে কাউকে উপগত অবস্থায় দেখে, তবে তাকেও কি সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে? রসুল স. বললেন, সাক্ষী অথবা কশাঘাত। তিনি বললেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমি সম্পূর্ণ সত্য। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ অবশ্যই এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যাতে করে আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা পাবে। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৬, ৭

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

❒ এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহের নামে চারি বার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী,

❒ এবং পঞ্চম বার বলিবে, 'সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহের অভিশাপ।'

প্রত্যাদেশের প্রভাব ক্রমশঃ বিদূরিত হলো। রসুল স. প্রথমোক্ত আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। ডেকে আনলেন হজরত হেলাল ও তাঁর স্ত্রীকে। প্রথমে হজরত হেলাল চারবার তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করলেন। পঞ্চমবার বললেন, আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্‌র অভিশাপ (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে)। উল্লেখ্য, এরকম শপথের নাম লেয়ান। এরপর লেয়ান করলো তার স্ত্রী। চারবার তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য

প্রদান করতেই উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে থামিয়ে দেন। বলেন, তোমার পঞ্চম সাক্ষ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তপ্রদায়ক (ভেবে দেখো, এখনো পঞ্চম সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করবে কিনা, যদি তুমি অপরাধিনী হও)। মহিলাটি একটু থামলো। ঘুরে দাঁড়ালো। উপস্থিত সাহাবীগণের মনে হলো, সে হয়তো এবার সত্যি সত্যিই থেমে যাবে। কিন্তু সে থামলো না। বললো, আমি আমার সন্তান-সন্ততিকে চিরদিনের জন্য লজ্জিত ও কলংকিত করতে পারি না। একথা বলেই সে উচ্চারণ করলো পঞ্চম সাক্ষ্য। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, এর প্রতি লক্ষ্য রেখো। প্রসবের পর যদি দেখো তার সন্তান হয় কটাচক্ষুধারী, ভারী কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট হয়, হাঁটু ও পায়ের গ্রন্থির মধ্যবর্তী স্থান যদি তার হয় নরম, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে মাসহার। নির্ধারিত সময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো, রসুল স. কথিত সকল লক্ষণগুলোই রয়েছে ওই শিশুটির শরীরে। তিনি স. তখন বললেন, কিতাবুল্লাহ্র ফয়সালা যদি অবতীর্ণ না হতো, তবে আমি ওই মহিলার সঙ্গে পুনরায় বুঝাপড়া করতাম।

'সহিহ্' গ্রন্থে সহল ইবনে সা'দীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে উয়াইমির উজলানী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষকে ব্যভিচার করতে দেখে, তবে সে কী করবে? যদি তাদেরকে হত্যা করে তবে মানুষ তাকে হত্যা করবে কেসাসের দাবি উত্থাপন করে। আর যদি সে সাক্ষী আনার জন্য স্থান ত্যাগ করে তবে পালিয়ে যাবে ওই ব্যভিচারী। তাহলে বলুন, সে কী করবে তখন? রসুল স. বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর নামে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। যাও, তাকে ডেকে আনো। হজরত সহল তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলেন। উভয়ে লেয়ান করলেন মসজিদের ভিতরে রসুল স. এর উপস্থিতিতে। লেয়ান শেষে হজরত সহল বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরপরেও যদি আমি একে বিবাহবন্ধ রাখি, তবে আমি তো তার উপর অপবাদ আরোপ করলাম। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যভিচারের কলংকে কলংকিনীকে কখনো বিবাহবন্ধ রাখে না। একথা বলেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিলেন তিন তালাক। রসুল স. বললেন, অপেক্ষা করো, দেখবে তার সন্তান হবে কালো চক্ষু, থলথলে শরীর ও নরম নিম্নপদ বিশিষ্ট। আর তা না হয়ে সন্তান যদি হয় তার পিতার মতো লালবর্ণবিশিষ্ট তবে বুঝবে সে-ই তার স্ত্রীর উপরে কলংক আরোপ করেছে। যথাসময়ে সন্তান প্রসবের পর দেখা গেলো সন্তানটি তার পিতার মতো লালবর্ণের নয়। তখন প্রমাণিত হলো হজরত উয়াইমিরই সত্যবাদী। তাই কেউ আর ওই শিশুকে হজরত উয়াইমিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতো না, সম্পৃক্ত করতো তার মায়ের সঙ্গে।

ইকরামা সূত্রে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আনসারগণের নেতা হজরত সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আয়াতখানি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, হে আনসারের দল! দেখো তোমাদের নেতা কী বলে? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাঁকে মন্দ ধারণা করবেন না। ইনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি সর্বদা কুমারীদের বিবাহ করেছেন। আর কোনো স্ত্রীকে তিনি কখনো তালাক দেননি, যাতে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য কেউ বিবাহ করতে পারে। তাঁর এরকম সম্ভ্রমবোধের কারণে আমরা তাঁর ছেড়ে দেয়া স্ত্রীকে বিবাহও করতে পারিনি। এরপর হজরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমার পিতামাতা আপনারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আমি বিশ্বাস করি, এই আয়াত অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, আমি কোনো ভ্রষ্টা রমণীকে পরপুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখতে পেলেও তো তাকে ধরতে পারবো না, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে আরো চারজন তা না দেখবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি লোক ডেকে আনতে গেলেই তো ওই লোক তার কাজ শেষ করে চলে যাবে। এ ঘটনার পর বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনাটি ঘটে। তিনি ছিলেন ওই সাহাবীত্রয়ের একজন যারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করার কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন এবং তাঁদের তওবা কবুল করা হয়েছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— একদিন গভীর রাতে তিনি বাড়ী ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী এক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরতা। তিনি নিজ কানে তাদের কথাবার্তাও শুনলেন। এদিকে রাত প্রায় ভোর। তিনি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. রাগান্বিত হলেন। আনসারগণ উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সা'দ ইবনে উ্বাদার উক্তি আমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছে। রসুল স. মনস্থ করলেন, হজরত হেলালকে কশাঘাত করবেন। লোকজনও তাঁর সাক্ষ্যকে বাতিল ঘোষণা করবে। হজরত হেলাল বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ আমার মুক্তির কোনো পথ অবশ্যই বের করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসুল স. কশাঘাত করার প্রস্তুতি নিলেন। ওই সময় তাঁর উপরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. ওই আয়াত পাঠ করে শোনালেন উপস্থিত সাহাবীবৃন্দকে। হজরত আনাসের উক্তিরূপে আবু ইয়ালীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বাগবী এ ঘটনা বর্ণনা করার পর একথাও লিখেছেন যে, রসুল স. তখন বললেন, হেলাল!

তোমার জন্য রয়েছে শুভ বার্তা। আল্লাহ্ তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। হজরত হেলাল বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি এমতো বিশ্বাসই রেখেছিলাম। রসুল স. বললেন, তাকে ডাকো। মহিলাটিকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। রসুল স. তাকে হজরত হেলালের অভিযোগ জানালেন। সে অস্বীকার করলো। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। সে কি একথা স্বীকার করবে? হজরত হেলাল বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমার জনক-জননী আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। রসুল স. ঘোষণা দিলেন, দু'জনকেই লেয়ান করানো হোক। প্রথমে হজরত হেলাল আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বললেন, আমি অবশ্যই সত্য। রসুল স. তাঁর পঞ্চম সাক্ষ্য ঘোষণার পূর্বে বললেন, হেলাল! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। জাগতিক শাস্তি পারলৌকিক শাস্তি অপেক্ষা সহজ। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্‌র শাস্তি মানুষের শাস্তির চেয়ে কঠোর। সুতরাং তোমার পঞ্চম সাক্ষ্য যদি অসত্য হয়, তবে তোমার কী অবস্থা হবে? হজরত হেলাল বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এ সাক্ষ্যের জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপরে আল্লাহ্‌র লানত। এরপর সাক্ষ্য প্রদান করতে শুরু করলো ওই মহিলা। তার চতুর্থ সাক্ষ্যের পর রসুল স. তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র শাস্তি মানুষের শাস্তি অপেক্ষা ভয়াবহ। মহিলাটি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলো। তারপর বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার খানদানকে লজ্জিত করবো না। পঞ্চম ও শেষ সাক্ষ্য সে উচ্চারণ করলো এভাবে— হেলাল যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর আপতিত হোক আল্লাহ্‌র রোষ। রসুল স. দু'জনকে পৃথক করে দিয়ে বললেন, এর গর্ভজাত সন্তান হবে তার মাতার । পিতার সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কিন্তু ওই শিশুসন্তানকে অবৈধও বলা যাবে না। এরপর তিনি স. শিশুর লক্ষণ বর্ণনা করে বললেন, শিশুটি এরকম দেখতে হলে হবে মহিলাটির স্বামীর। আর এরকম দেখতে হলে হবে ওই পরপুরুষের। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শিশুটি ছিলো মেটে রঙের উটের মতো কদাকৃতির। পরবর্তীতে সে হয়েছিলো মিসরের বিচারক। সে জানতো না তার পিতা কে? বাগবী লিখেছেন, এ প্রসঙ্গে সকল বর্ণনায় এসেছে এবং মুকাতিলের বর্ণনাতেও একথা উল্লেখিত হয়েছে, যখন আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত নাজিল হয়, তখন রসুল স. তাঁর মিম্বরের উপরে আরোহণ করে তা পাঠ করে শোনালেন। হজরত আসেম ইবনে আদী আনসারী দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনার জন্যই উৎসর্গীকৃত। আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর উপরে অন্য কোনো পুরুষকে উপগত হয়েছে

দেখতে পায়, তবে সে কী করবে? একথা প্রকাশ করলে তাকে করা হবে আশিটি কশাঘাত। মুসলমানেরা তাকে বলবে ফাসেক। আর তার সাক্ষ্যও হবে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত। এমতাবস্থায় সে তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষী কোত্থেকে আনবে? সাক্ষীর খোঁজে বের হলেই তো পলায়ন করবে অপরাধী।

হজরত আসেমের এক চাচাত ভাইয়ের নাম ছিলো হজরত উয়াইমির। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো খাওলা বিনতে কায়েস। তিনি একদিন আসেমের কাছে গিয়ে বললেন, ভাই, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহাকে অপকর্ম করতে দেখেছি। হজরত আসেম পাঠ করলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। পরবর্তী জুমআর দিন তিনি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! গত জুমআয় আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার আপনজনের একজনের ক্ষেত্রেই সেরকম কাণ্ড ঘটেছে। উয়াইমির, খাওলা ও শরীক ছিলো একই বংশের। রসুল স. সকলকে একত্র করলেন। হজরত উয়াইমিরকে বললেন, খাওলা তোমার চাচাত বোন, আবার স্ত্রীও। আল্লাহ্কে ভয় করো। তাকে কলংকিত কোরো না। হজরত উয়াইমির বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কসম কেটে বলছি, আমি শরীককে তার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি। আর আমি চার মাস ধরে খওলার সঙ্গে মিলিত হইনি। এখন সে যদি গর্ভবতী হয়, তবে তার কারণ হবে অন্য কেউ, আমি নই। রসুল স. খাওলাকে বললেন, আল্লাহ্কে ভয় করো, যদি তুমি এরকম কিছু করে থাকো, তবে আমার কাছে স্বীকার করো। খাওলা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! উয়াইমিরের রয়েছে সন্দেহের বাতিক। সে আমার ও শরীকের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে। তাই সে সন্দেহবশতঃ এই অভিযোগ এনেছে। রসুল স. শরীককে বললেন, তুমি কী বলো? তিনি বললেন, খাওলা যা বলেছে, সেটাই আমার কথা। ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৪ সংখ্যক আয়াত। রসুল স. মুয়াজ্জিনকে বললেন, আজান দাও। আজান ধ্বনিত হলো। লোকজন সমবেত হলো। তিনি স. সকলকে নিয়ে আসরের নামাজ পাঠ করলেন। নামাজ শেষে হজরত উয়াইমিরকে বললেন, দাঁড়াও। আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলো, খাওলা ব্যভিচারিণী। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। হজরত উয়াইমির প্রথমবার একথাই উচ্চারণ করলেন। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি শরীককে খাওলার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেছি এবং আমি নিঃসন্দেহে সত্য। তৃতীয়বার বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এই নারীর গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, হয়েছে অন্য কারো দ্বারা। চতুর্থবার বললেন, আমি আল্লাহ্র সদাবিদ্যমানতাকে মেনে বলছি, আমি বিগত চারমাস তার সঙ্গে সহবাস করিনি এবং অবশ্যই আমি সত্য। পঞ্চমবার বললেন, এই বক্তব্যে যদি উয়াইমির

মিথ্যা হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্র লানত। রসুল স. এবার খাওলাকে বললেন, এবার তুমি দাঁড়াও ও সাক্ষ্য দাও। খাওলা দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি ব্যভিচারিণী নই এবং উয়াইমির মিথ্যাবাদী। দ্বিতীয়বার বললেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, উয়াইমির শরীককে আমার উপরে উপগত অবস্থায় দেখেনি এবং উয়াইমিরের উক্তি অসত্য। তৃতীয়বার উচ্চারণ করলেন, আমি উয়াইমিরের দ্বারাই গর্ভবতী, অন্য কারো দ্বারা নই। চতুর্থবার বললেন, উয়াইমির আমাকে ব্যভিচারলিপ্ত অবস্থায় দেখেনি, তার কথা অসত্য। পঞ্চমবার বললেন, উয়াইমিরের কথা যদি সত্য হয়, তবে খাওলার উপরে নেমে আসুক আল্লাহ্র শাস্তি। এভাবে দু'জনের শপথ সম্পন্ন হলে রসুল স. তাদেরকে পৃথক করে দিলেন। বললেন, এভাবে দু'জন কসম না করলে এই নারীর বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারতো। এরপর উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্তান জন্মগ্রহণের পর তোমরা দেখবে শিশুটির ভ্রূযুগল হবে প্রশস্ত, বিচ্ছিন্ন ও ঘন। আর তার গায়ের রঙ হবে কালো। এরকম যদি দেখো, তবে বুঝবে ওই সন্তান শরীক ইবনে সামহার। আর যদি মেটে বর্ণের কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট ও উটের মতো অঙ্গসন্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে বুঝবে ওই সন্তান উয়াইমিরের। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, যথাসময়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো। দেখা গেলো তার চেহারা শরীকের সঙ্গেই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হজরত হেলালের ঘটনাটিই ছিলো এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত।

কুরতুবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার। কেউ কেউ সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলেছেন, প্রথমে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত হেলালের ঘটনাকে লক্ষ্য করে। ওই সময় হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটিও ঘটে যায়। তাই বলা যেতে পারে দু'টো ঘটনাই ছিলো আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল। ইমাম নববী এমতো সমাধানকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, প্রথমে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় হজরত হেলালের বিষয়ে। এরপর সংঘটিত হয় হজরত উয়াইমিরের ঘটনা। তিনি হজরত হেলালের ওই বিষয়ে জানতেন না। তাই রসুল স. তাঁকে এই আয়াত পুনরায় পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উয়াইমির প্রসঙ্গে এসেছে, হজরত জিবরাইল যখন এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন রসুল স. বললেন, হে উয়াইমির!

তোমার মতোই আরো একজন এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো। তার ব্যাপারেও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। ইবনুস্ সিবাগও তাঁর 'আশ্‌শামিল' গ্রন্থে এরকম লিখেছেন।

মাসআলা ঃ যেহেতু আলোচ্য আয়াতে সুনির্দিষ্টরূপে কোনো বিশেষ দম্পতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, তাই ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদের অভিমতে যে কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে বিধানটি প্রয়োগিত হতে পারে— তারা তালাক যোগ্য হলে, চাই তারা স্বাধীন হোক, অথবা গোলাম, অথবা একজন স্বাধীন, অপরজন অস্বাধীন, অথবা উভয়ে ন্যায়পরায়ণ, কিংবা উভয়ে ফাসেক। এমনকি দু'জনের মুসলমান হওয়াও অত্যাবশ্যক নয়। হতে পারে একজন মুসলমান, একজন আহলে কিতাব, অথবা উভয়েই আহলে কিতাব। ইমাম মালেক উভয়ের কাফের আহলে কিতাব হওয়াকে এক্ষেত্রে সমর্থন করেননি। কেননা তাঁর নিকট কাফেরদের বিবাহই শুদ্ধ নয়। তাই তাদের তালাকও অশুদ্ধ। আর তালাক শুদ্ধ না হলে লেয়ানও জায়েয নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, দু'টি শর্ত পাওয়া না গেলে লেয়ান বিশুদ্ধ হবে না। প্রথম শর্ত হচ্ছে পুরুষকে হতে হবে সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাধারী। অর্থাৎ তাকে হতে হবে মুসলমান, স্বাধীন, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের অপবাদ গ্রস্তাকেও হতে হবে শাস্তিগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন। অর্থাৎ তাকেও হতে হবে মুসলমান, আজাদ, আকেল ও বালেগ। আর ইতোপূর্বে মহিলাটির উপর অপবাদের প্রলেপ দেয়াও হয়নি, এভাবে যদি কোনো মহিলা এরকম হয় যে, তার অপবাদদানকারীকে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় এবং সে হয় ক্রীতদাস অথবা কাফের কিংবা ইতোপূর্বে ব্যভিচারের অপবাদ দানের কারণে শাস্তিপ্রাপ্তা, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাকে লেয়ান করার হুকুম দেয়া যাবে না। বরং বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোনো শাস্তি দিতে পারে। তবে যদি তার স্বামী অন্ধ ও ফাসেক হয়, তবে উভয়কেই লেয়ানের নির্দেশ দেয়া যাবে। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করার অধিকার বিচারকের রয়েছে। আর অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না একারণে যে, সে বাদী-বিবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। কিন্তু অপবাদ প্রদানের ব্যাপারে যেহেতু সে নিজে নিজেকে জানে, এবং স্ত্রীর সঙ্গে নিজেকে পার্থক্য করতে পারে, তাই সে নিজের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কিন্তু অপরের জন্য সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। ইবনে মোবারক ইমাম আবু হানিফার যে উক্তি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্ধ অপবাদকারী হলে তাকে লেয়ান করানো যাবে না। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফার নিকট উল্লিখিত বিষয়সমূহে অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, প্রযোজ্য হবে লেয়ান। আর মহিলা

ক্রীতদাসী হোক, অথবা অবিশ্বাসিনী, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, কিংবা উম্মাদিনী, কিংবা অশুদ্ধভাবে বিবাহবদ্ধা, অথবা অশুদ্ধ বিবাহের স্বামীর সঙ্গে সহবাসকৃতা, অথবা অজানা পুরুষের সন্তানের মাতা, অথবা জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবারও ব্যভিচার লিপ্তা, অতঃপর তওবাকারিণী, অথবা সন্দেহবশতঃ এমন পুরুষ কর্তৃক সম্ভোগিতা, যে তার জন্য হারাম অথবা সন্দিগ্ধ— এসকল অবস্থায় অপবাদকারীকে অপবাদের শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং লেয়ানও করানো যাবে না। তবে বিচারক ইচ্ছে করলে মহিলাকে সতর্ককতামূলক কোনো শাস্তি দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা যে মহিলার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন, সে হবে এরকম— যার অপবাদকারী শাস্তিযোগ্য হবে। এজন্য যে, স্বামীর উপর থেকে অপবাদের শাস্তি দূর করণের জন্য তাকে লেয়ানের হুকুম দেয়া হয়েছে। যে সকল হাদিসে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে এরূপই প্রতীয়মান হয়। যেমন রসুল স. বললেন, হেলাল! তোমার জন্য শুভসংবাদ। আল্লাহ্ তোমার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। এতে করে বুঝা যায়, অপবাদের শাস্তি থেকে বাঁচাতেই স্বামীকে দেয়া হয়েছে লেয়ানের সুযোগ। অর্থাৎ লেয়ান হচ্ছে তার জন্য অপবাদের শাস্তি গ্রহণের বিকল্প। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্কে ভয় করো। দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক সহজ। সুতরাং এরকম স্ত্রীই যদি না হয়, যার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগযোগ্য নয়, তবে তার জন্য আবার লেয়ান কীরূপে জায়েয হতে পারে? ইমাম আবু হানিফার একটি শর্ত এরকম যে, স্বামীকে হতে হবে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের কোনো সাক্ষী নেই'। এখানে দেখা যায়, আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং স্বামীদেরকে সাক্ষ্যদান নির্ধারণ করেছেন। কেননা 'নিজেরা ব্যতীত' কে এখানে করা হয়েছে নেতিবাচকতা থেকে ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম হচ্ছে ইতিবাচক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, অর্থাৎ তারা নিজেরাই সাক্ষী।

এখানে এমতো সন্দেহও পোষণ করা যাবে না যে, এই আয়াতে 'শুহাদা' এর রূপক অর্থ শপথকারী। বরং অর্থ হবে— তাদের নিকটে তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো শপথকারী নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য শপথকারী। কিন্তু এরকম অর্থ অযথার্থ। প্রকৃতপক্ষে এখানে শাহাদাত অর্থ শপথ গ্রহণ করা, যা একটি সমষ্টির অংশবিশেষ, যাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বই নেই। ওই সামগ্রিকতার অর্থ নিজের জন্য নিজের সাক্ষ্য নাজায়েয এবং অন্যের জন্য জায়েয।

আর শাহাদাতের প্রকৃত অর্থ যদি শপথও হয়, তথাপিও এস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রূপক অর্থ অর্থাৎ সাক্ষ্যের প্রতি। কেননা অন্যের জন্য শপথ করার কোনো অস্তিত্বই এখানে নেই। আর 'শাহাদাত' এর প্রকৃত অর্থ যখন শপথ নয়, বরং এর রূপক অর্থ যখন শপথ, তখন বলা যেতে পারে এখানে 'শাহাদাত' অর্থ শপথ নয়, সাক্ষ্য।

ইমাম আবু হানিফা স্বামীর জন্য সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকেও আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। আরো বলেছেন, স্ত্রীকে এমন হতে হবে যেনো তার অপবাদকারীর উপরে শাস্তি প্রয়োগ করা যায়। উভয় বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের একটি বর্ণনায়। কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন ইবনে মাজা ও দারাকুতনী। যেমন—

১. ওসমান ইবনে আবদুর রহমান জুহুরী সূত্রে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, চারটি ক্ষেত্রে লেয়ান নেই— স্বাধীন স্বামী ও ক্রীতদাসী স্ত্রীর মধ্যে, ক্রীতদাস স্বামী ও স্বাধীনা স্ত্রীর মধ্যে, মুসলমান স্বামী ও ইহুদী স্ত্রীর মধ্যে এবং মুসলমান স্বামী ও খৃষ্টান স্ত্রীর মধ্যে। ইয়াহ্ইয়া, বোখারী, আবু হাতেম রাজী ও আবু দাউদ বলেছেন, ওসমান ইবনে আবদুর রহমান অপরিচিত ও অগ্রহণযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া একবার বলেছিলেন, সে অসত্যভাষী। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে জাল হাদিসের সূত্রপরম্পরাকে যুক্ত করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সঙ্গে। তাই তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন, তার বর্ণনা পরিত্যজ্য।

২. ওসমান ইবনে আতা খোরাসানী সূত্রে দারাকুতনী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, চার প্রকার রমণী-পুরুষের জন্য লেয়ান নেই। যেমন— খৃষ্টন স্ত্রী-মুসলমান স্বামী, ইহুদী স্ত্রী-মুসলমান স্বামী, স্বাধীনা স্ত্রী-ক্রীতদাস স্বামী ক্রীতদাসী স্ত্রী এবং স্বাধীন স্বামী। ইয়াহ্ইয়া ও দারাকুতনী ওসমান ইবনে আতাকে চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে। আবু হাতেম ও ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বর্ণনাকে দলিলরূপে গণ্য করা নাজায়েয। আলী ইবনে জুনাইদ বলেছেন, সে পরিত্যজ্য। দারাকুতনী বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব ওসমানের অনুগামী। তিনিও আতা সূত্রে এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ইয়াজিদ ইবনে জুরাইব বর্ণনাকারীরূপে সবল নন।

৩. দারাকুতনী ইমাদ ইবনে মাতারের মাধ্যমে ওমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে— রসুল স. ইতাব ইবনে উসাইদকে একস্থানে প্রেরণ করলেন। তার পরের বর্ণনা উপরের বর্ণনার মতোই। আবু হাতেম রাজী বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার ভিত্তিহীন হাদিস নির্মাণ করে।

ইবনে আদী বলেন, তার বর্ণনা ভিত্তিবিবর্জিত। আর সে-ও পরিত্যাজ্য। ইমাম আহমদ বলেন, ইমাদ ইবনে মাতার যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন, সেই হাম্মাদ ইবনে আমরও কাল্পনিক হাদিস বানাতো। সাজী বলেন, হাদিস বর্ণনাকারীগণের ঐকমত্য এই যে, সে পরিত্যাজ্য। হাম্মাদ ইবনে আমর যার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন, সেই জায়েদ ইবনে রফী বর্ণনাকারী হিসেবে অশক্ত।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, ইমাম আওজায়ী এবং ইবনে জুরাইজ, যাদেরকে গণ্য করা হয় হাদিস শাস্ত্রের ইমামরূপে, তিনি এই হাদিস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে। কিন্তু বর্ণনাটিকে তিনি অভিহিত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের দাদার উক্তিরূপে। রসুল স. এর সঙ্গে তিনি বক্তব্যটিকে সম্পৃক্ত করেননি।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, শিথিলসূত্রবিশিষ্ট হাদিস যদি কয়েকটি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, তবে শিথিলতা সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বর্ণিত হাদিসটিও সেরকম। আর এর পোষকতা হয়েছে ইমাম আওজায়ী ও ইমাম ইবনে জুরাইজের বর্ণনা থেকে। তাঁরা উভয়েই আবার বর্ণনাটিকে সনাক্ত করেছেন আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের উক্তিরূপে। অর্থাৎ সুপরিণতরূপে নয়, পরিণতসূত্রসম্বলিতরূপে।

এরপর বলা হয়েছে—'ফাশাহাদাতু আহাদিহিম'— 'সে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ্‌র শপথ করে চারবার। সে অবশ্যই সত্যবাদী' একথাটিকে ইমাম শাফেয়ী গ্রহণ করেছেন তাঁর মতের দলিলরূপে। অর্থাৎ তাঁর মতে এখানকার 'শাহাদাত' অর্থ কসম বা শপথ, সাক্ষ্য নয়, যদি ও 'শপথ' ও 'সাক্ষ্য' উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরপরের 'বিল্লাহ্' শব্দটি 'শাহাদাতে'র শপথ অর্থকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কারণ শপথ করতে হয় আল্লাহ্‌রই নামে, নিজের নামে বা অন্য কারো নামে নয়। আর নিজের সাক্ষ্য নিজের জন্যও গ্রহণীয় নয়। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের নামেও শপথ করা যায়। আর শরিয়তে এমন কোনো দৃষ্টান্তও নেই যে, একই স্থানে একই সময়ে একই ব্যক্তি বার বার সাক্ষ্যদান করবে। তবে শপথের পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন কাসামাত। এছাড়া একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, সাক্ষ্য দিতে হয় কোনো কিছুকে প্রমাণ করার জন্য, আর শপথ করতে হয় কোনো ধারণাকে অপসারণের জন্য। এটাও আবার অগ্রহণীয় ধারণা যে, প্রকৃত শাহাদাতের সম্পর্ক হবে কেবল একটি বিষয়ের সঙ্গে। আর অবশ্যম্ভাবী একটির প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করতে হবে রূপক অর্থরূপে। তাই যখন মূল উদ্দেশ্য হবে শপথ করা, তখন রূপক অর্থই (শপথ) হবে গ্রহণীয়। তখন লেয়ানের জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন আর পড়বে না।

আমরা বলি, একথা নিশ্চিত যে, নিজের জন্য নিজে সাক্ষ্য দেয়া এবং একই স্থানে বার বার সাক্ষ্য দেয়ার দৃষ্টান্ত শরিয়তে নেই। আবার অন্যের জন্য কসম খাওয়ার দৃষ্টান্তও শরিয়তে অনুপস্থিত। আরো লক্ষণীয়, কোনো বিধানকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য কসম খাওয়ার কথাও কোথাও নেই। কসম তো করা হয়ে থাকে বিধানকে প্রতিহত করার জন্য, বিধানকে স্বীকার করার জন্য নয়। সুতরাং যার উপস্থিত করা, বিদূরিত করা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যখন একই স্থানে উভয় কাজকে প্রাথমিক অবস্থায় শরিয়তসম্মত করে দেয়া যার জন্য জায়েয, তখন তার জন্য এটাও জায়েয যে, প্রথমে সে ওই বিধানকে শরিয়তসম্মতই করে দিবে। এর জন্য অন্য দৃষ্টান্ত অন্বেষণের প্রয়োজনই নেই।

অবশিষ্ট রইলো স্বয়ং সাক্ষ্যদানের প্রসঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত তো রয়েছে কোরআন মজীদেই। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'শাহিদাল্লহু আন্নাহু লাইলাহা ইল্লাহুয়া' (আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই)। আবার আজানের দৃষ্টান্তও এখানে টেনে আনা যেতে পারে। মুয়াজ্জিন যখন বলতেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্' তখন রসুল স. বলেন 'আনা আশহাদু' (আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি)। এতে করে প্রমাণিত হয় রসুল স. তাঁর রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন নিজে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে কেনো? এর জবাব এই যে, যখন কেউ ব্যভিচারের সাক্ষ্য উপস্থিত করতে অসমর্থ হয়, তখন এই চার সাক্ষ্য হয় তার স্থলাভিষিক্ত। কেননা অপবাদের ক্ষেত্রে নিজের সাক্ষ্য (এক সাক্ষ্য) যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য এক সাক্ষ্য গ্রহণীয়। আলোচ্য আয়াতে চার বার কসম করার কথা বলা হয়েছে নিজের সত্যতাকে দৃঢ়তর করবার জন্য এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্যের মাধ্যমে মিথ্যা হলে আল্লাহ্র অভিশাপ স্বতোপ্রণোদিত হয়ে চেয়ে নেয়ার জন্য।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র অভিশাপ'।

মাসআলা ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর নামে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা বলে তার স্ত্রীর গর্ভ তার নয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি হয় লেয়ানের যোগ্য, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার উপরে আরোপিত অপবাদের শাস্তির জন্য বিচারপ্রার্থিনী হয়, তবে স্বামীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যাবে ওয়াজিব। তখন স্বামী যদি লেয়ান করতে অসম্মত হয়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে বিচারক তাকে লেয়ান না করানো পর্যন্ত অথবা সে যে মিথ্যাবাদী তা স্বীকার না করানো পর্যন্ত বন্দী করে রাখবে। যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে, তবে তার উপরে প্রয়োগ করবে আশিটি বেত্রাঘাত।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের নিকট এমতাবস্থায় ওই লোককে বন্দী করা যাবে না। বরং লেয়ান করতে অস্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে কার্যকর করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত। কেননা অপবাদ তো শাস্তিই ডেকে আনে। লেয়ানের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে কেবল স্বামীর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্তে। স্বামী এমতোক্ষেত্রে তার সত্যতা প্রকাশে অক্ষম বলেই তো তাকে নিতে হয় লেয়ানের আশ্রয়। সুতরাং লেয়ানে অস্বীকৃত হলেই বুঝতে হবে সে অপবাদপ্রদাতা। তাই বন্দী করার কথা ভাববার অবকাশই এখানে নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, লেয়ান যে করতে চায় না, সে ফাসেক। ইমাম মালেক বলেন, কেবল লেয়ানে অস্বীকৃতি জানালেই তাকে ফাসেক বলা যায় না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ান করতে অসম্মত হওয়ার অর্থ নিজের মিথ্যাবাদী হওয়াকে অস্বীকার করা। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে কিছু সন্দেহও রয়েছে। কেননা সে যে মিথ্যাবাদী সে কথা সে নিজ মুখে স্বীকার করেনি। আর সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপ করা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে তাকে কয়েদ করে রাখা যাবে, যেনো সে লেয়ানের জন্য প্রস্তুত হয়, অথবা প্রকাশ্যে স্বীকার করে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা, যাতে করে পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ অবস্থায় তার উপরে আশি বেত্রাঘাত কার্যকর করা যায়।

স্বামী যদি লেয়ান করে নেয়, তবে স্ত্রীর উপরে লেয়ান করা হয়ে যায় ওয়াজিব। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। তখন স্ত্রী যদি তা না করতে চায়, তবে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে লেয়ান করতে সম্মত হয়, অথবা স্বীকার করে তার স্বামীর কথার সত্যতা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী লেয়ান করে নিলেই ওই স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরতরে হারাম। ভূমিষ্ঠ সন্তানের সঙ্গেও তার পিতৃত্বের সম্পর্ক আর থাকবে না। কেননা রসুল স. বলেছেন, দুই লেয়ানকারী কখনো একত্র থাকে না।

আমরা বলি, স্বামীর পরে স্ত্রী লেয়ান না করা পর্যন্ত লেয়ান সম্পূর্ণ হবে না। কেননা লেয়ান এসেছে বাবে মুফা'আলাত থেকে। তাই উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া মুফা'আলাত যথার্থ হবে না। সুতরাং কেবল স্বামীর লেয়ানের দ্বারা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে না, ঘটবে উভয়ের লেয়ান সম্পন্ন হলে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৮, ৯

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

❒ তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহের নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

❒ এবং পঞ্চমবার বলে, 'তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহের ক্রোধ।'

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আলআ'জাব'(শাস্তি) অর্থ ব্যভিচারের শাস্তি, যেমন বলা হয়েছে 'ফা আ'লাইহিন্না নিসফু মা আ'লাল মুহসানাতি মিনাল আ'জাবি'— এই আয়াতে। রসুল স. হজরত হেলালকে বলেছিলেন, আল্লাহ্র শাস্তি মানুষের শাস্তি অপেক্ষা অত্যন্ত কঠোর। এই শাস্তি রহিত করার কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— 'তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী'।

'স্বামীই মিথ্যাবাদী' অর্থ— স্ত্রী বলবে, আমার স্বামীই আমাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে, আমার গর্ভ যে তার, সে কথাকে অস্বীকার করেছে। তার এমতো উক্তি মিথ্যা। অথবা অর্থ হবে— তার প্রথমোক্ত উক্তি মিথ্যা, কিংবা মিথ্যা শেষোক্ত উক্তি। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, স্বামী লেয়ান করলেই স্ত্রীর উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে ব্যভিচারের শাস্তি। আবার ওই শাস্তি রহিত হয়ে যাবে স্ত্রী লেয়ান করলে। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, স্ত্রীর লেয়ানের মাধ্যমে শুধু একটি হুকুমের সম্পর্ক হয়। অর্থাৎ রহিত হয়ে যায় ব্যভিচারের শাস্তি। আর যদি স্বামী চারজন পুরুষ প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে ব্যভিচারকে প্রমাণ করে, তবে লেয়ানের অবকাশ আর থাকে না। এমতাবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তি রহিত হবে না। আবার স্ত্রী যদি লেয়ান করতে অস্বীকার করে, তবে ব্যভিচারের শাস্তি হবে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এমতাবস্থায় লেয়ানে সম্মত হওয়া অথবা স্বামীর অভিযোগকে স্বীকার না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা যাবে। স্বামীর অভিযোগকে একবার স্বীকার করলে লেয়ানেরও আবশ্যকতা থাকে না। আবার তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তিও ওয়াজিব থাকে না। কারণ একবারের স্বীকারোক্তিতে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া যায় না। আর এখানে 'আনহাল আ'জাব' (স্ত্রীর থেকে শাস্তি) অর্থ যে ব্যভিচারের শাস্তি তা-ও নয়। এর অর্থ বন্দী করাও হতে পারে। কারণ বন্দীত্বও শাস্তি। এমতোক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ বিদ্যমান, তাই বলতে হয় সন্দেহের স্থলে শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ স্ত্রী যদি একথা স্বীকার করে যে, তার গর্ভস্থিত সন্তান তার স্বামীর নয়, তবে তার এ অস্বীকৃতি সত্য হলেও তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি

অথবা লেয়ান কোনোটাই প্রযোজ্য হবে না। এমতাবস্থায় গর্ভস্থিত শিশু হবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের। কেননা লেয়ান সম্পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভস্থিত শিশুর পিতৃত্বের সম্পর্ক তার স্বামীর সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু লেয়ান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্ক থাকে অটুট। আর এ হচ্ছে ওই শিশুর বংশগত অধিকার, যে অধিকার স্বামী স্ত্রীর উক্তিতে বিনষ্ট হতে পারে না। এমতো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা।

আমি বলি, এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী দু'জনের উক্তিই আমার কাছে বিস্ময় উদ্রেকক। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁর নিকট লেয়ান হচ্ছে শপথ। তাই তিনি স্বামীর সাক্ষ্যপ্রদানের যোগ্যতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেন না। বলেন, সকল পুরুষই লেয়ান করতে পারবে, সে অপবাদকারী গোলাম, কাফের, ইতোপূর্বে অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, যে-ই হোক না কেনো। কেননা এরা সকলেই সাক্ষ্যদানের যোগ্য না হলেও শপথ উচ্চারণের অযোগ্য নয়। প্রকাশ থাকে যে, শপথ আবার সম্পদ প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও কার্যকর নয়। যেমন— কেউ বললো, আমি অমুকের নিকট এতো টাকা পাই, কিন্তু ওই লোক একথা অস্বীকার করলো, এমতাবস্থায় বাদীর পক্ষে যদি কোনো সাক্ষী না থাকে তবে কেবল তার শপথের মাধ্যমে বিবাদীর উপরে তার সম্পদ প্রত্যর্পণ ওয়াজিব হয় না। যদি তা-ই হয়, তবে স্বামীর শপথের দ্বারা স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তিই (সঙ্গেসার) বা কার্যকর হতে পারবে কীভাবে। আর সঙ্গেসার তো সকল শাস্তি অপেক্ষা অধিক কঠিন।

ইমাম আবু হানিফার উক্তি আমার কাছে আশ্চর্যজনক একারণে যে, তাঁর নিকট লেয়ান শপথ নয়, সাক্ষ্য। তাই তাঁর মতে লেয়ানকারীকে হতে হবে সাক্ষদানের যোগ্য। তিনি একথাও বলেন যে, লেয়ানকারীর চারটি সাক্ষ্য ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত। আরো বলেন, স্বামীর চার সাক্ষ্য অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। আর স্ত্রীর চার সাক্ষ্য স্থলাভিষিক্ত ব্যভিচারের শাস্তির। এটাও বিস্ময়কর যে, স্বামীর চার সাক্ষ্যের পরেও স্ত্রীর উপরে ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হয় না। অথচ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়াদরাউ আনহাল আ'জাবা' (এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে)। এখানকার 'দারউন' সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক। অর্থাৎ শাস্তি রহিত হওয়া এখানে সুনিশ্চিত। আর স্ত্রীর জন্য যে লেয়ানকে ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যদি স্ত্রী লেয়ান করে তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। আর লেয়ান করতে অস্বীকৃত হলে আরোপিত হবে ব্যভিচারের শাস্তি। সুতরাং এর মধ্যে আবার বন্দী করে রাখার প্রসঙ্গ আসবে কোত্থেকে? স্ত্রীর লেয়ান তো ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত, বন্দীত্বের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত নয়। অতএব, লেয়ান অস্বীকার করলেতো ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একটি সন্দেহ : স্বামীর চারটি সাক্ষ্য ব্যভিচারের প্রমাণের চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়। বরং তার ওই চার সাক্ষ্যের মাধ্যমে সে-ই কেবল রেহাই পেতে পারে অপবাদের শাস্তি থেকে। সুতরাং তার চারটি সাক্ষ্যের এমতো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক।

সন্দেহভঞ্জন : বাদীর চার সাক্ষ্য চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি কোরআন, হাদিস ও উম্মতের ঐকমত্যসমর্থিত। আর বাদীর চারটি সাক্ষ্যের দ্বারা ব্যভিচার প্রমাণিত হয় না সত্য, কিন্তু এ কথাও অসত্য নয় যে, চারজন সাক্ষীর দ্বারাও ব্যভিচার তো সুপ্রমাণিত না-ও হতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, চারজন সাক্ষীই হয়তো মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য একজোট হয়েছে। আর এমতো মিথ্যাচারের প্রমাণের সুযোগও তো তেমন নেই। আসল কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারক যে দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তা তো কেবল শরিয়ত পালনার্থেই। এতে করে সন্দিগ্ধতা উত্তরিত হয় দৃঢ়বদ্ধ একটি ধারণায়। আর ওই দৃঢ়বদ্ধ ধারণার উপরে ভিত্তি করে বিচারক দিয়ে থাকেন তাঁর সিদ্ধান্ত। আবার এর উদ্দেশ্য এরকমও নয় যে, বিচারক তাঁর সুদৃঢ় কোনো বিশ্বাসকে শরিয়তের বিধানের কারণে রূপ দিতে অক্ষম।

যখন চার পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা শরিয়তসম্মতভাবে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তখন বাদীর চার বার শপথযুক্ত সাক্ষ্য তো আরো বেশী প্রামাণ্য হওয়া উচিত। কারণ সে এভাবে একথাও স্বীকার করে নেয় যে, তার সাক্ষ্য মিথ্যা হলে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত। এরপর সে আবার আদেল (ন্যায়বান) থাকে, ফাসেক হয় না। ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকে তার সাক্ষ্য দানের অধিকার এবং যোগ্যতা। স্ত্রী লেয়ান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে তো তার ন্যায়পরায়ণতা হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল। আবার দেখুন চার জন সাক্ষীর মিথ্যার উপর একমত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয় এবং অপবাদগ্রস্তা লেয়ান করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে জেনেও যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে তো সে তার স্বামীর অভিযোগ স্বীকারই করে নিলো। এখন অবশিষ্ট রইলো সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তি রহিত হওয়ার কথা। তবে মনে রাখতে হবে, এমতো সন্দেহের অবকাশ তো সব ক্ষেত্রেই থাকে। সাক্ষ্য, লেয়ান, লেয়ানে অস্বীকৃতি কোনো কিছুই তো সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু শরিয়তের শর্তসমূহ পূরণ হওয়ার পর সন্দেহ আর প্রশ্রয়যোগ্য ও ধর্তব্য নয়। ইমাম আবু হানিফা স্বামীর জন্য সাক্ষ্য দানের যোগ্য হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন এবং বলেছেন অপবাদ প্রমাণিত হওয়ার অবস্থায় স্ত্রীকে হতে হবে শাস্তি

গ্রহণের যোগ্যতাধারিণী, আমার মতে এই ধারণাটি যথার্থ। আবার ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রী যদি লেয়ান থেকে বিরত থাকে অথবা লেয়ান করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তার উপরে ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর একথাও অযথার্থ নয়।

মাসআলা : 'শুধু স্বামী লেয়ান করলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে' ইমাম শাফেয়ীর এমতো উক্তি প্রামাণ্য নয়। ইমাম জোফার, ইমাম মালেক এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদেরও অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান না করলেও। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং এক বর্ণানানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত, বিচারক সিদ্ধান্ত দানের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। উভয়ে লেয়ান করলেও। তবে দু'জনের লেয়ান শেষে তাদের তালাক কার্যকর করা বিচারকের উপর হয়ে যায় ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন, এরকম তালাক হবে এক তালাক বায়েন । আর অন্যান্য ইমামগণ বলেন, এমতো তালাককে বলতে হবে বিবাহবিচ্ছেদ। শেষোক্ত উক্তির দলিল এই বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ। দুধপান বিধানের মতো লেয়ানজাত স্ত্রীও চিরতরে হারাম। আর এটাকেই বলা হয় ফিস্‌খ্। হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক লেয়ানকারী দম্পতিকে বললেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহ্‌র অধিকারে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারপর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন তার সঙ্গে তোমার পুনর্মিলনের সকল উপায় চিরতরে রুদ্ধ। স্বামী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার প্রদত্ত মোহরানার কী হবে? রসুল স. বললেন, যদি তুমি তাকে সত্যি সত্যিই অপরাধিনী মনে করো, তবে তা হয়ে গিয়েছে তোমার ইতোপূর্বের সহবাসের বিনিময়। আর যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো, তবে তো তুমি তার নিকট আরো অধিক দায়বদ্ধ। সুতরাং তার জিম্মায় তোমার আর কোনো পাওনা নেই। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে আবু দাউদ কর্তৃক লেয়ানকারী এক দম্পতির কথা বর্ণিত হয়েছে। রসুল স. ওই দম্পতির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ভবিষ্যতে আর কখনো তোমরা মিলিত হতে পারবে না। হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে দারাকুতনীও এরকম বর্ণনা করেছেন। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত আলী, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে শায়বার 'আলমুসান্নিফ' গ্রন্থেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত হেলাল ইবনে উয়াইমিরের ঘটনার শেষাংশে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন স্ত্রীর উপরে আর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া যাবে না এবং তার সন্তানকেও বলা যাবে না ব্যভিচারজাত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর যুগে এক লোক তার স্ত্রীর বিষয়ে লেয়ান করেছিলো। লেয়ানের পর রসুল স. তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। লেয়ানকারীকে তার পিতা সাব্যস্ত করেননি এবং সন্তানকেও সাব্যস্ত করেননি ব্যভিচারজাত। এ প্রসঙ্গে জমহুরের উক্তির পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে রয়েছে হজরত উয়াইমিরের ঘটনাটি, যা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ তার 'সুনান' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন এভাবে—রসুল স. লেয়ান সম্পন্ন হওয়ার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত দান করলেন যে, তোমরা চিরতরে পৃথক। স্বামীর উপরে স্ত্রীর আশ্রয় ও খোরপোষের দায়িত্ব নেই। কেননা এই বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক তালাকের মতো নয়, আর স্ত্রীও এমতোক্ষেত্রে বরণ করেনি বৈধব্য। অর্থাৎ স্বামী তাকে তালাকও দেয়নি, মরেও যায়নি। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে তালাক কার্যকর করার দায়িত্বও বিচারকের উপরে বর্তায় না। এমতাবস্থায় ওই নারী ওই পুরুষের জন্য চিরনিষিদ্ধ। তাই এমতো বিচ্ছিন্ন ফিস্‌খ্, তালাকে বায়েন নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হওয়া বিবাহবিচ্ছেদের দাবি করেনা। যেমন জেহার। জেহারের দ্বারা স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহ বাতিল হয় না। জেহারের কাফফারা প্রদানের পর পুনরায় স্ত্রী হয়ে যায় হালাল। তবে হারাম হওয়ার পর যখন তার স্বামী শরিয়ত অনুসারে তাকে বিবাহবন্ধ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উত্তম পন্থায় সদাচরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক দেয়া তার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। তখন সে যদি এরকম না করে, তবে বিচারক ওই স্ত্রীকে তার নিকট থেকে তালাক করিয়ে দিবেন, যাতে করে স্ত্রী বেঁচে যেতে পারে জুলুম থেকে। এর প্রমাণ রয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায়। হজরত সহল ইবনে সাঈদ বর্ণনাটিকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে— উভয়ের লেয়ান সম্পাদনের পর হজরত উয়াইমির বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এখন যদি আমি তাকে আমার কাছে রাখি তবে আমি তো হয়ে যাবো অপবাদদাতা। একথা বলে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিলেন। রসুল স. তাঁর এমতো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি।

হজরত ইবনে ওমর থেকে দারাকুতনির বর্ণনায় এসেছে রসুল স. দু'জনকে আলাদা করে দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে এরা আর কখনো মিলিত হতে পারবে না। কিন্তু এই নির্দেশটি রসুল স. এর কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এমতো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন শায়েখ আবু বকর রাজী।

'তানকিহ্' রচয়িতা লিখেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা পরিশুদ্ধ। তাই নির্দেশটি রসুল স. এরই নির্দেশ। আর এর উদ্দেশ্যই বলে দিচ্ছে, কেবল লেয়ান সম্পন্ন হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। ঘটে বিচারকের নির্দেশে, অথবা স্বামীর তালাক প্রদানের ঘোষণায়। হাদিসটি ইমাম শাফেয়ীর মতের বিপক্ষে একটি উত্তম দলিল। এখন অবশিষ্ট রইলো হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে রসুল স. সিদ্ধান্ত দিলেন; এখন থেকে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর উপরে নেই, কারণ লেয়ানের কারণে তাদের বিবাহবিচ্ছিন্ন। উল্লেখ্য এমতাবস্থায় স্বামীর উপরে স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণের দায়িত্ব রয়েছে বলে হজরত ইবনে আব্বাস যে অভিমত দিয়েছেন, তা তার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানজাত। হাদিসে তো এরকম কিছু বলা হয়নি। আমি বলি, লেয়ানের পর আপনাআপনি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম জোফার ও অন্যান্য ইমামগণের অভিমত তো এ ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট। তাঁরা লেয়ানকেই বিবাহবিচ্ছেদ বলে মনে করেন। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমতেও স্ত্রী হারাম হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। বিচারকের দায়িত্ব কেবল বিষয়টির ঘোষণা প্রদান। একারণেই তো রসুল স. লেয়ানকারীদেরকে পৃথক করে দিতেন। উল্লেখ্য, এমতো বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী। অর্থাৎ লেয়ানকারীরা আর কখনোই স্বামী-স্ত্রী হতে পারবে না। বিষয়টি জেহারের মতো সাময়িক বিবাহবিচ্ছেদের মতো নয়। সুতরাং লেয়ানের দ্বারাই যখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন বিচারকের ঘোষণার আবশ্যকতাই বা রইলো কোথায়?

ইবনে হুম্মাম স্বয়ং লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, বিচারকের সিদ্ধান্তের উপরে এমতাবস্থায় তালাক নির্ভরশীল নয়। কারণ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বিচারকের হস্তক্ষেপের পূর্বেই ওই বিবাহ হয়ে যায় বাতিল।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, লেয়ানের পর যেহেতু শরিয়ত মতে স্বামী আর স্ত্রীকে বিবাহে রাখতে সম্মত নয়, তাই বিচারকই তালাকের ঘোষণা প্রদান করবেন। 'তাসরিহুম বিল ইহ্সান' (উত্তমতার সঙ্গে বিদায়) —এই রীতি অনুসারে বিচারকই তখন হবে স্বামীর পক্ষে তালাকের ঘোষণা প্রদানকারী। তাই নিয়ম

হচ্ছে, লেয়ানের পর বিচারক স্বামীকে তালাক দিতে বলবেন। যদি সে এ নির্দেশ পালন না করে তবে বিচারকই তাদেরকে পৃথক করে দিবেন। অস্বীকৃতির পর তালাকের হুকুম জারী রাখার প্রবক্তা কেউই নন। রসুল স.ও তালাকের হুকুম দেননি। তালাক দিয়েছিলেন হজরত উয়াইমির স্বয়ং।

এবার আসা যায় 'স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদান' হজরত ইবনে আব্বাসের এই অভিমত প্রসঙ্গে। তাঁর মতে লেয়ানের দ্বারাই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। উল্লেখ্য, হাদিসে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আবাসন ও ভরন পোষণ না দেয়ার কথা। তিনি স. তো ওই বিষয়ের সকল কিছুই জানতেন। তবু তিনি আবাসন ও ভরন পোষণ প্রদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন কেনো? আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, লেয়ানের দ্বারাই যদি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, তবে হজরত উয়াইমির তালাক দেয়ার আবশ্যকতাই বা বোধ করলেন কেনো? এমতো প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে তিনি হয়তো তখন একথা জানতেন না যে, লেয়ানই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়।

এবার আলোচনা করা যাক ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্যের শর্তের দলিল হওয়া প্রসঙ্গে। তিনি মাফহুমে শর্তকেই দলিল মনে করেন। কিন্তু এস্থলে বিবাহ চিরতরে হারাম হওয়ার বিষয়টি যেহেতু সুপ্রমাণিত, সেহেতু মাফহুমে শর্তের আমল করে দেয়া হয়েছে স্থগিত। অথবা বলা যেতে পারে 'আল মুতালায়ি'নানি ইজাফতারাকা লা ইয়াজতামীয়ানী আবাদা' এর উদ্দেশ্য— যখন উভয়ে লেয়ান করে, তখনই উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কখনো তারা বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার মতে হাদিসে উল্লেখিত 'আলমুতাবাই'নানী বিল খিয়ারি মালাম ইয়াতাফাররাক্বা' এর উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইজাব ও কবুল সম্পন্ন না হবে এবং বাচনিকভাবে পৃথক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় করার অধিকার আছে। সে কারণেই ইমাম আবু হানিফা মনে করেন পৃথকতা অর্থ বাচনিক পৃথকতা।

মাসআলাঃ লেয়ান সমাপ্ত করার পর স্বামী নিজেকে যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে সে তার বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করতে পারবে কিনা, সে সম্পর্কে রয়েছে যথেষ্ট মতপৃথকতা। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরকম করলে তার ক্ষতি হবে লাভ। অর্থাৎ অপবাদপ্রদাতা হিসেবে ভোগ করতে হবে আশিটি বেত্রাঘাত, কিন্তু সে হবে ওই গর্ভস্থিত শিশুর প্রকৃত পিতা। আর তার স্ত্রী তার জন্য হয়ে যাবে চিরনিষিদ্ধ।

ইমাম আবু হানিফা ও এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের উক্তি এই, যে তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে অপবাদের শাস্তি এবং যেহেতু অপবাদের স্বীকারোক্তির

পর তার আর লেয়ান করার অধিকার থাকে না, তাই তার লেয়ান হবে পরিত্যক্ত। তখন লেয়ানের সঙ্গে বিবাহের যে নিষিদ্ধতা ছিলো, তাও হয় যাবে বিলুপ্ত। তাই সে তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। অনুরূপ যদি কেউ অন্য কারো স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং সে জন্য তার উপরে শাস্তিও প্রয়োগ করা হয়, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকে না। এই বিধানটি বলবৎ হতে পারবে তখন, যখন স্ত্রী ব্যভিচার করে এবং শাস্তিপ্রাপ্তা হয়, তখন সে-ও আর লেয়ানের অধিকার রাখে না। তাই স্বামী নিজের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে উভয়ের পুনর্বিবাহ হয়ে যায় জায়েয।

আমি বলি, লেয়ানের যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, লেয়ানই হয়নি। তবে লেয়ানের পুনরাবৃত্তি অবৈধ। লক্ষণীয়, কেউ যদি কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানের পর তা প্রমাণ করতে সমর্থ না হয়, পরে নিজেই তার উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং এজন্য শাস্তিভোগ করে, এরপর যদি কখনো নিজেই ব্যভিচার করে ফেলে, তবে সে আর লেয়ানের যোগ্য থাকবে না এবং তার অপবাদদাতার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না।

হানাফীগণ বলেন, 'আল মুতালায়ি'নানি লা ইয়াজ্বতামিয়া'নি আবাদা' রীতি অনুসারে কাজইয়ায়ি উরফিইয়া এবং আরকাজইয়ায়ি উরফিয়ায় হুকুমের ভিত্তি হয়ে থাকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য হবে, লেয়ানকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে, ততক্ষণ তারা একত্রিত থাকতে পারবে না। লেয়ানের বৈশিষ্ট্য দূর হওয়ার সাথে সাথে আবার একত্রিত না হওয়ার নিষিদ্ধতাও দূর হয়ে যাবে। কেননা স্বামী নিজেই তার কথাকে মিথ্যা বলে স্বীকার করেছে। আমরা বলি, এটা কাজইয়া উরফিয়া নয়। কেননা এর বৈশিষ্ট্য হয় অধিকতর দৃঢ়। আর লেয়ান স্থায়ী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু নয়। তাই এখানে এর বিধান শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী কোনো সময় লেয়ান করলে আর কখনোই তারা বিবাহবদ্ধ হতে পারবে না। এরকম নয় যে, বিবাহ নিষিদ্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তারা থাকবে লেয়ানের উপরে বিদ্যমান এবং একে অপরকে সাব্যস্ত করতে থাকবে মিথ্যাবাদীরূপে, আর যে কোনো একজন তার মিথ্যাবাদী হওয়াকে স্বীকার করলেই তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ হবে জায়েয।

মাসআলা ঃ স্বামী যদি বলে, এই সন্তান আমার নয়, তবে তার লেয়ানের পর বিচারক ওই সন্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবেন, বলবেন, এই সন্তান তার মাতার। যারা লেয়ানের পর বিচ্ছেদের জন্য মহামান্য আদালতের সিদ্ধান্ত আবশ্যক মনে করে না; তাদের মতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য স্বামীর অস্বীকৃতিই যথেষ্ট। তাঁদের মতে লেয়ানের সময় স্বামীকে বলতে হবে

একথাগুলো— তার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি আমার সন্তান বলে স্বীকার করি না, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমার উক্তি সত্য। স্ত্রীও এরকম বলবে। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এক দম্পতিকে লেয়ান করান। স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে অস্বীকার করেছিলো। তিনি স. ওই দম্পতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের সম্পর্ক যুক্ত করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমার এ গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি, তবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম জোফার ও ইমাম আহমদের মতে লেয়ানের নির্দেশ দেয়া যাবে না, স্বামীর উপরে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না এবং স্ত্রীকেও দেয়া যাবে না ব্যভিচারের শাস্তি। কেননা তার গর্ভ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। এমনো হতে পারে যে স্ত্রী গর্ভবতীই হয়নি। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে এমতাবস্থায় লেয়ান করা যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব হয়, তবে লেয়ান করাতে হবে। একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত লেয়ান করানো যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলালের ক্ষেত্রে লেয়ান করানো হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত হেলালের ঘটনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ্! সুস্পষ্ট করে দাও। দেখা গেলো সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে কথিত ব্যভিচারীর সঙ্গে। তখন রসুল স. উভয়কে লেয়ান করালেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী তাদের মতের অনুকূলে উপস্থাপন করেন আবু দাউদের বর্ণনাটি, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. হেলাল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালেন এবং ঘোষণা দিলেন, সন্তানকে তার পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না, বলা যাবে না যে, সে ব্যভিচারজাত এবং তার মাতাকেও বলা যাবে না ব্যভিচারিণী। যে ব্যক্তি ওই সন্তানকে ব্যভিচারজাত এবং তার মাতাকে ব্যভিচারিণী বলবে, তার উপরে প্রয়োগ করতে হবে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি। ইকরামা বলেছেন, ওই সন্তান পরবর্তীকালে হয়েছিলো মিসরের বিচারপতি। সে জানতো না, তার পিতা কে?

অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, লেয়ান করানোর সময় হজরত হেলালের স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। নাসাঈ হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজলানী ও তার স্ত্রীকে লেয়ান করিয়েছিলেন। ওই সময় তার স্ত্রী ছিলো গর্ভিনী। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং লিখেছেন, তখন স্বামীটি বলেছিলো

'ইফারুন্ নাখল' থেকে আমি তার নিকটে যাইনি। 'ইফারুন নাখল' অর্থ বৃক্ষের ডালপালা ছেটে দেয়ার পর দুইমাস তার কাছে না যাওয়া। রসুল স. তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! প্রকাশ করে দাও। সন্তান জন্মের পর দেখা গেলো শিশুটি দেখতে অতি কুৎসিত। এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভবতী অবস্থাতেও লেয়ান করানো যায়।

বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, হজরত হেলাল তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অন্তঃসত্তা হওয়াকে অস্বীকার করেননি। লেয়ান করানো হয়েছিলো সেকারণেই। ওয়াকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত হেলাল তার স্ত্রীর গর্ভ নিজের বলে স্বীকার করেননি, তাই তিনি লেয়ান করেছিলেন। ইমাম আহমদ এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাগত যথার্থতাকে স্বীকার করেননি। বলেছেন, এটাই ওয়াকীর ভুল যে, তিনি গর্ভ অস্বীকারকে লেয়ানের কারণ মনে করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত হেলাল যখন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর ব্যভিচার সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করলেন, তখন রসুল স. তাঁকে লেয়ান করালেন। সুতরাং গর্ভ অস্বীকার লেয়ানের কারণ ছিলো না।

আমি বলি, একথা সুস্পষ্ট যে, হজরত হেলাল উভয় অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা সূত্রে বাগবীর বর্ণনা দৃষ্টে সে কথাই প্রতীয়মান হয়। যদি হজরত হেলাল কেবল ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করতেন, তবে রসুল স. তাঁর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কচ্ছিন্নতার কথা বলতেন না। কেননা সন্তান তো হজরত হেলালেরও হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। সুতরাং কেবল গর্ভ অস্বীকারের কারণে লেয়ানের বৈধতা তাঁর ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অনুরূপ হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আজলানী ও তার স্ত্রীর লেয়ানের বিষয়টিও। সেখানেও বলা হয়েছে আজলানীর স্ত্রী তখন ছিলো গর্ভবতী। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আজলানী কেবল গর্ভ অস্বীকার করেছিলো, ব্যভিচারের অভিযোগ তোলেনি। বরং ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর বলেছেন, ওয়ায়েল ইবনে হারেছ আজলানী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শরীক ইবনে সামহার ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো আমার সামনে। তাঁর স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। ওই গর্ভকে ওয়ায়েল নিজের বলে স্বীকার করেনি। রসুল স. স্বামী-স্ত্রীকে লেয়ান করিয়েছিলেন। তারা দু'জনে মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে লেয়ান করেছিলো। কিছুদিন পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। ওই নবজাতকের চেহারা ছিলো শরীক ইবনে সামহার মতো। রসুল স. ওই শিশুটির সম্পর্ক করে দিয়েছিলেন তার মায়ের সঙ্গে।

হজরত উয়াইমির যখন তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলেন, তখন তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। বলাবলি করতে লাগলো, তোমার স্ত্রীকে তো আমরা ভালো বলেই জানি। কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখলো নবজাতকের আকৃতি শরীকের মতো। ওই সন্তান দু'বছর পর মারা যায়। ওই ঘটনার পর শরীক লোকসমাজে হয়ে যায় অত্যন্ত নিন্দিত। এ ঘটনার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, হজরত উয়াইমির তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ যেমন তুলেছিলেন, তেমনি অস্বীকার করেছিলেন তার গর্ভকেও।

ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের দলিল এই যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর গর্ভকে অস্বীকার করে এবং ছয়মাসের মধ্যে স্ত্রীর সন্তান লাভ হয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অস্বীকৃতির সময়েই তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। তাই তার উত্থাপিত অভিযোগ সত্য। আর অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যই সে লেয়ান করেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, গর্ভের অস্তিত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত নয়। তবে এটা হয়েছে সন্তান অস্বীকারের শর্ত এবং উদ্দেশ্য হয়েছে একথা বলা যে, যদি তুমি গর্ভবতী হয়ে থাকো, তবে সে গর্ভ আমার দ্বারা হয়নি। আর অপবাদকে শর্ত করাও ঠিক নয়।

মাসআলা : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, তুমি ব্যভিচার করেছো এবং তোমার গর্ভ ব্যভিচারজাত, তবে সর্বসম্মত মতানুসারে তাকে লেয়ান করাতে হবে। কেননা সে প্রকাশ্যে ব্যভিচারের কথা বলেছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এমতাবস্থায় বিচারক বংশীয় সম্পর্কের নিষিদ্ধতার সিদ্ধান্ত দিবেন না। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি এর বিপরীত। কেননা রসুল স. এমতাবস্থায় সন্তানের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। হজরত হেলালের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিলো। তাঁর স্ত্রীও তখন ছিলো গর্ভবতী। ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিধান প্রবর্তিত হয়েছিলো সন্তান জন্মগ্রহণের পর। কারণ পূর্বের গর্ভ তো অনিশ্চিত। কিন্তু রসুল স. এক্ষেত্রে নিশ্চিত গর্ভের কথা জানতে পেরেছিলেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাই তিনি আভাস দিয়েছিলেন বংশগত সম্পর্কচ্ছিন্নতার।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার এমতো উক্তি দূরদর্শিতাসমৃদ্ধ নয়। কেননা রসুল স. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন প্রকাশ্য কার্যকলাপের ভিত্তিতে, যাতে করে সে সিদ্ধান্ত হতে পারে উম্মতের অনুসরণযোগ্য। অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশ তাঁর ফয়সালার ভিত্তি ছিলো না। এরকম না হলে তিনি স. একথা বলতেন না যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী।

মাসআলা : সন্তান জন্মের পর যদি স্বামী তাকে তার নিজের সন্তান বলে স্বীকার না করে, তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে তার অস্বীকৃতিকে সঠিক বলে মেনে নেয়া যাবে। কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ শোনার সাথে সাথে যদি অস্বীকার করে, তবে বিষয়টি হবে শর্ত সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় তাকে লেয়ান করাতে হবে। আর যদি সে সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে, পরবর্তীতে বংশীয় সম্পর্কের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। অর্থাৎ ওই সন্তান বিবেচিত হবে তারই বংশধররূপে। আর অপবাদ প্রদানের কারণে তাকে লেয়ানও করাতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, জন্মের সুসংবাদ দানের সময় সম্পর্ককে অস্বীকার করলে সে অস্বীকৃতি হবে সঠিক। এক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে অবশ্য ইমাম আবু হানিফার কোনো অভিমত বর্ণিত হয়নি। আবুল লাইছের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা অস্বীকৃতির জন্য তিনদিন সময় প্রদানের পক্ষপাতি। হাসানের বর্ণনায় এসেছে সাতদিনের কথা। সাহেবাইনের মতে নেফাসের পুরো সময়টাই অস্বীকৃতির সময়সীমা। কিয়াসের দাবি হচ্ছে, সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে যদি অবিলম্বে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তা হবে গ্রহণযোগ্য। আর কিছু সময় ক্ষেপণের পর অস্বীকার করলে তা হবে অগ্রাহ্য। কেননা ওই সময়ের নীরবতা ছিলো তার সম্মতির নিদর্শন। কিন্তু সূক্ষ্মচিন্তাজাত মীমাংসা এই যে, চিন্তা-ভাবনার জন্যও তো কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরকম চিন্তা ছাড়া কিছু বললে এমনও তো হতে পারে যে, ওই সন্তান আসলে তারই। যদি তাই হয়, তবে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা হবে হারাম। আবার অন্যের সন্তানকেও নিজের বলে স্বীকার করা হালাল নয়।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, অন্য গোত্রের সন্তানকে অর্থাৎ অবৈধসন্তান কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর গোত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তবে সে হয়ে যায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ জেনে শুনে আপন সন্তানের পিতা হতে অস্বীকার করে, পরকালে আল্লাহ্ তাকে দর্শনদান করবেন না, পূর্বাপর সকলের কাছে তাকে করবেন লাঞ্ছিত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, নাসাঈ, শাফেয়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত আবু বকরা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আপন পিতা নয় জেনেও যে অন্য ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।

মাসআলা : সন্তান জন্মের সময় যদি স্বামী দূরে কোথাও অবস্থান করে, তবে তার স্বীকৃতির সময় ধরতে হবে তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে। সাহেবাইনের মতে

ফেরার পর তাকে দেয়া হবে নেফাসের সময়সীমার পরিমাণ সময়। ইমাম আবু হানিফার মতে চিন্তা ভাবনার জন্য সুসংবাদ প্রদানের সময়ের পরিমাণ অবকাশই যথেষ্ট।

মাসআলা : স্বামীর যদি তার স্ত্রীর ব্যভিচার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অথবা সে দৃঢ় ধারণা লাভ করে ব্যাপক জনশ্রুতির মাধ্যমে এবং যদি এমতোক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে সহায়ক কোনো কারণ— যেমন জায়েদকে সে দেখেছে তার স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে, এমতাবস্থায়, সে তার স্ত্রীর নামে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। আবার সহবাস না করা সত্ত্বেও যদি তার স্ত্রীর সন্তান প্রসব হয়, তবে ওই সন্তানের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করতেই পারে। তবে সে সহবাস করেছে, কিন্তু তখনো ছয়মাস অতিবাহিত হয়নি, অথচ সন্তান জন্মেছে, এমতাবস্থায়ও তার জন্য সন্তানকে অস্বীকার করা জায়েয। তবে ছয় মাসের উর্ধ্বে দুই বৎসরের মধ্যে যদি সন্তান জন্মে, অথবা ঋতুস্রাব না হওয়ার কারণে গর্ভসঞ্চার ঘটেনি, এমতাবস্থায় পিতৃত্বের অস্বীকৃতি নাজায়েয। আর ঋতুস্রাবের সময় থেকে যদি ছয় মাসের অধিক সময়ের পর সন্তান জন্ম নেয়, তবে তা নিজের হওয়াকে অস্বীকার করা জায়েয।

মাসআলা : যদি সহবাস করে অথবা আজল করে অথবা স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি সন্তান তার না অন্যের বলে সন্দেহ করে, তবে এমতাবস্থায় সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, আপন সন্তানকে অস্বীকার করা হারাম। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত।

সূরা নূর : আয়াত ১০

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ

❒ তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

আলোচ্য আয়াতের **মর্মার্থ** হচ্ছে— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অনুগ্রহপ্রদাতা, করুণানিধান, তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়। যদি এরকম না হতো তবে পৃথিবীতেই তোমাদের প্রতি নেমে আসতো লাঞ্ছনা ও শাস্তি।

'তাওয়াবুন' অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন অপকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। বলা বাহুল্য, এরকম প্রত্যাবর্তনকারীর উপরে আল্লাহ্ রহমত করেন, গ্রহণ করেন তাদের প্রত্যাবর্তনকে।

'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তোমাদের উপরে তিনি শরিয়তের যে বিধানাবলী প্রবর্তন করেছেন, সেগুলো তাঁর অপার প্রজ্ঞার ফল।

বোখারী, মুসলিম প্রমুখ জুহুরী সূত্রে ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে ওতবা হজরত ইবনে মাসউদের মাধ্যমে জননী আয়েশার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তিনি প্রকাশ করেন তখন, যখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রমাণ করেন তাঁর নিষ্কলুষতাকে। জুহুরী বলেন, আমার নিকটে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কয়েকজন হাদিসবেত্তা। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, রসুল স. কোনো সফরে যেতে মনস্থ করলে লটারীর মাধ্যমে সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করতেন তাঁর সফরসঙ্গিনী। এক সফরের লটারীতে উঠলো আমার নাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। ঘটনাটি ছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের। আমি উঠে বসলাম একটি পর্দাবৃত হাওদায়। হাওদাটি প্রয়োজনমতো উটের পিঠে ওঠানো হতো। আর নামানো হতো যাত্রাবিরতির সময়। সফরটি ছিলো একটি যুদ্ধযাত্রা। যথাসময়ে যুদ্ধ শেষ হলো। ফিরতি পথে একস্থানে থামলো আমাদের কাফেলা। ঘোষণা দেয়া হলো, যাত্রা শুরু হবে রাত্রিকালে। যাত্রার সময় সন্নিকটবর্তী হলে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য একটু দূরে গমন করলাম। ফিরে আসার পর দেখলাম, আমার গলার ইয়ামানী আকিকের হারটি নেই। কোথায় যেনো ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। হারটি খুঁজতে গেলাম তৎক্ষণাৎ। এদিকে আমার হাওদা ওঠানো হলো উটের পিঠে। লোকেরা মনে করলো আমি হাওদার মধ্যেই আছি। আমি ছিলাম তখন ক্ষীণাঙ্গিনী বালিকা। তাই তারা আমার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ওজনগত পার্থক্য করতে পারলো না। হারটি আমি খুঁজে পেলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম সেখানে কেউই নেই। কাফেলা তখন অনেক দূরে। বাধ্য হয়ে আমি সেখানেই বসে রইলাম। ভাবলাম, পরবর্তী যাত্রাবিরতির সময় নিশ্চয় আমার অনুপস্থিতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন অনুসন্ধান করে খুঁজে নেয়া হবে আমাকে। বসে থাকতে থাকতে আমি বার বার নিদ্রাক্রান্ত হচ্ছিলাম। তাই শুয়ে পড়লাম।

সাফওয়ান ইবনে মু'তাল জাকওয়ানীকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো কাফেলার পশ্চাদবর্তী অনুসন্ধানকারীরূপে। তার দায়িত্ব ছিলো সেনাদলের পরিত্যক্ত জিনিস উদ্ধার করা। সে তার পশ্চাদবর্তী অবস্থান থেকে যাত্রা করেছিলো শেষ রাতে। ভোরে পৌঁছলো আমার অবস্থান স্থলে। আমি তখনো শুয়েছিলাম। পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেছিলো। তাই চিনতে পারলো। আমাকে দেখেই চমকিত হয়ে পাঠ করলো, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন'। তাঁর এই আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। তৎক্ষণাৎ উঠে বসলাম আমি।

নিজেকে করলাম চাদরাবৃত। আল্লাহ্‌র কসম! সে আমার সঙ্গে কথা বললো না। আমার পাশে বসালো তার উষ্ট্রী। আমি উঠে বসলাম। সে উটের রশি ধরে পদব্রজে এগিয়ে চললো সম্মুখের দিকে। দ্বিপ্রহরে আমরা পেলাম আমাদের সেনাদলের সাক্ষাৎ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন অপবিত্র লোক আমার নামে অপবাদ রটালো। তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। মদীনায় পৌঁছে আমি পীড়িত হলাম। সে কারণে অপবাদপ্রদাতারা হয়ে উঠলো আরো সমালোচনামুখর। আমি এসব কিছুই জানতাম না। কেবল লক্ষ্য করতে লাগলাম আমার প্রতি রসুল স. এর মনোযোগ শিথিলতর হচ্ছে। তিনি স. কখনো এসে বলতেন 'সালামুন আলাইকে'। কখনো বলতেন 'এখন কেমন আছো'? এরপর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই চলে যেতেন তিনি। কিছু দিনের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্বলতা তখনো কাটেনি। এক রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি উম্মে মেস্তাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম অনতিদূরের এক স্থানে। ফেরার পথে উম্মে মেস্তাহ্‌র পা তারই চাদরে আটকে যায়। ফলে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তাঁর মুখ থেকে আপনাআপনি উচ্চারিত হয় 'মেস্তাহ্ মরুক'। আমি বলি, তুমি তোমার ছেলেকেই বদদোয়া করে বসলে? সেতো বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলো। উম্মে মেস্তাহ্ বললো, পুত্রী! তুমি কি জানো না, সে কী অপকর্ম করেছে? আমি বললাম, না তো। তিনি তখন সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে ক্ষোভে দুঃখে আমি পুনরায় পীড়িত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় একদিন রসুল স. আমার ঘরে এলেন। বললেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আপনার অনুমতি পেলে আমি কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে আসতে পারতাম। আমার ধারণা ছিলো মা-বাবার কাছে আমি সবকিছু জানতে পারবো। তিনি স. অনুমতি দিলেন। পিতৃগৃহে গিয়ে আমি মাকে বললাম, মানুষ আমাকে নিয়ে কী সব আলোচনা-সমালোচনা শুরু করেছে? মা বললেন, প্রিয় কন্যা আমার! চিন্তিত হয়ো না। স্বামীর দৃষ্টিতে যে অধিক প্রিয়, তার দুর্নাম তো তার সপত্নীরা ছড়াবেই। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! বাইরের লোকেরাও তো কতোকিছু বলছে। রাতভর আমি কেঁদেছি। যাপন করেছি বিনিদ্র রজনী। এখনো তো কেঁদেই চলেছি।

বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছিলো না। রসুল স. তাই আলী ও উসামা ইবনে জায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। উসামা আমার ও আমার সপত্নীগণের চারিত্রিক পবিত্রতার কথা খুব ভালো করেই জানতো। অপর বর্ণনায় এসেছে, উসামা রসুল স.কে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তাই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি তো আপনার জীবনসঙ্গিনী। তিনি তো সাধ্বী। হজরত আলী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! (আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন কেনো) আপনার কী সঙ্গিনীর অভাব?

এরপর তিনি স. ডাকলেন তাঁর পরিচারিকাকে। বললেন, তুমি কি কখনো আয়েশার কোনো সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করেছো? সে বললো, যে আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সত্য বচনবাহকরূপে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! আমি সেরকম কোনোকিছুই দেখিনি। তবে সে এখনো সংসারকর্মে অনভিজ্ঞা। তাই দেখা যায়, কখনো হয়তো সে আটার খামির মেখে শুয়ে পড়েছে, আর সে আটা খেয়ে গিয়েছে কোনো ছাগল। এভাবে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রসুল স. একদিন মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন। বললেন, হে মুসলিম জনতা! আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই থেকে দুঃখ কষ্ট পেয়েছি। তোমরা কেউ কি আমার পক্ষ থেকে তাকে শান্ত করতে পারো? আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পত্নীর মধ্যে অনুত্তম কোনোকিছুই লক্ষ্য করিনি। আর, অপবাদকারীরা তার সঙ্গে যার নাম সংশ্লিষ্ট করেছে, সে-ও অত্যন্ত সৎ। সে কখনো কখনো আমার গৃহে প্রবেশ করে আমারই সঙ্গে। একাকী কখনোই নয়। সা'দ ইবনে মুয়াজ আশহালী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও এভাবে মনোকষ্টে ভুগবেন কেনো? অপবাদকারীর নামোচ্চারণ করুন। সে যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি এক্ষুণি তার গর্দান উড়িয়ে দিবো। আর সে খাজরাজী গোত্রের হলেও প্রতিপালন করবো আপনার নির্দেশ। সাথে সাথে দণ্ডায়মান হলো খাজরাজ গোত্রের সরদার সা'দ ইবনে উবাদা। হাস্সানের মা ছিলো তার চাচাত বোন। গোত্রগৌরবে অন্ধ হয়ে সে সা'দ ইবনে মুয়াজকে বললো, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। এরকম ক্ষমতা তোমার নেই। সে লোক তোমার গোত্রের হলে নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করতে চাইতে না। সা'দ ইবনে মুয়াজের চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর খাজরাজী সরদারকে বললো, তুমিই মিথ্যাবাদী। নিশ্চয় আমরা মুনাফিককে হত্যা করতাম, সে যে গোত্রেরই হোক না কেনো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সমবেত জনতা। আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। রসুল স. মিম্বরে দাঁড়িয়েই সকলকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টায় প্রশমিত হলো সকলে। তিনিও নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

জননী আয়েশা বলেন, ওই দিনও সারাদিন কেঁদেই কাটালাম। মা-বাবা বসেছিলেন আমার পাশে। তাঁরা আশংকা করছিলেন কাঁদতে কাঁদতে কলিজা ফেটে হয়তো আমি মরেই যাবো। এমন সময় এক মহিলা গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি দিলাম। সে-ও ক্রন্দন শুরু করলো আমার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর এলেন রসুল স. স্বয়ং। পাশে বসলেন। অপবাদ রটনার পর থেকে তিনি এপর্যন্ত এভাবে আমার পাশে বসেননি। এর মধ্যে গত হয়েছিলো প্রায় পুরো একটি মাস। প্রত্যাদেশও হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। রসুল স. আমার পাশে বসে

প্রথমে উচ্চারণ করলেন কলেমায়ে শাহাদাত। তারপর বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এরকম এরকম সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি তুমি কোনোপ্রকার দোষ করেই থাকো, তবে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হও। তিনি তোমার তওবা কবুল করবেন। রসুল স. এর কথা শুনে আমার কান্না থেমে গেলো। রুদ্ধ হয়ে গেলো অশ্রুধারা। পিতাকে বললাম, জবাব দিন। পিতা বললেন, কী বলবো, আমি তো কোনো জবাবই খুঁজে পাচ্ছি না। মাতাকেও একই কথা বললাম আমি। তিনিও বললেন, জবাব যে খুঁজে পাচ্ছি না মা। আমি তখন নয় বছরের বালিকা মাত্র। কোরআন মজীদও আমি তখন তেমন বেশী পাঠ করিনি। তবু আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি বুঝলাম আপনিও সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে চান। এখন আমি যদি বলি, আমি পবিত্রা, তবু তা আপনার বিশ্বাস হবে না। অথচ আল্লাহ্ জানেন, আমি অবশ্যই পবিত্রা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি তুষ্ট হবেন, এই আশায় আমি কেমন করে বলবো, আমি অপরাধিনী? তাই এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না। আমার অবস্থা তো এখন নবী ইউসুফের পিতা নবী ইয়াকুবের মতো যখন তিনি বলেছিলেন 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল'। একথা বলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে বিছানায় পড়ে গেলাম। জননী বলেন, আমি নিশ্চিত ছিলাম, যেভাবেই হোক আল্লাহ্ আমার সতীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এমন কখনো মনে হয়নি যে, আমার জন্য এমন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে, যা সর্বযুগে পঠিত হবে কোরআনের আয়াত হিসেবে। আমি মনে করেছিলাম রসুল স.কে হয়তো স্বপ্নযোগে বিষয়টির সত্যাসত্য সম্পর্কে অবগত করানো হবে। আল্লাহ্র শপথ! রসুল স. এর উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবতীর্ণ হলো প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের প্রভাবে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে কাটালেন কিছুটা সময়। স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার পর সহাস্য বদনে বললেন, আয়েশা! প্রসন্ন হও। আল্লাহ্ তোমার সতীত্বের সাক্ষ্য প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ করেছেন। মা বললেন, এবার ওঠো। আল্লাহ্র রসুলের পাশে বসো। আমি উঠলাম না। শুয়ে শুয়েই বললাম, না বসবো না। আর আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে আমি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবো না। কারণ, আমাকে উদ্ধার করেছেন আল্লাহ্ই।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১১

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

❐ যাহারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইন্নাললাজীনা জাউ বিল ইফকি উ'সবাতুম্ মিনকুম' (যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল)। এখানে 'ইফ্ক' অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যা। এর শাব্দিক অর্থ বিপরীতমুখী করে দেয়া। উম্মত-জননী হজরত আয়েশার উপরে আরোপিত অপবাদকেই এখানে বলা হয়েছে ইফ্ক। চরিত্রবতী ও মর্যাদাবতী হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রী। ছিলেন সিদ্দীকদুহিতা, রসুল স. এর প্রিয় পত্নী এবং সকল মুসলমানের জননী। অথচ একদল অপবিত্র মানুষ তাঁর মহান চরিত্রের উপরে আরোপ করেছিলো কলংক। অর্থাৎ উল্টিয়ে দিয়েছিলো তাঁর অধিকারকে। তাদের এমতো কর্মকেই এখানে বলা হয়েছে ইফক বা মিথ্যা অপবাদ।

'উসবাতুন' অর্থ দশ থেকে চল্লিশ জনের একটি দল। এর কোনো একক নেই। 'নেহায়া' গ্রন্থের ভাষ্য এরকমই। 'মিনকুম' অর্থ তোমাদেরই। এভাবে 'উসবাতুম মিনকুম ' এর অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদেরই একটি দল।

বোখারী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলতেন, আমার সপত্নী জয়নাব বিনতে জাহাশকে তাঁর ধর্মপরায়ণতার কারণে আল্লাহ্পাক রক্ষা করেছেন। উত্তম কথা ছাড়া তিনি অন্য কিছু উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর ভগ্নি হামনা হয়ে গিয়েছিলো অপবাদ আরোপকারীদের সহচরী। মুনাফিক মেস্তাহ্, হাসসান ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিলো অপবাদ আরোপকারীদের প্রধান। আর অপবাদ রচনা করতো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই স্বয়ং।

বাগবী লিখেছেন, ওরওয়া কেবল অপবাদ আরোপকারীদের নামের সাথে হাস্সান ইবনে সাবেত, মেস্তাহ্ ইবনে উছাছা ও হামনা বিনতে জাহাশের নামোল্লেখ করেছেন। অন্যদের নাম আমার স্মরণ নেই । কেবল এতটুকু জানা আছে যে, তাদের ছিলো একটি সংঘবদ্ধ দল। আর ওই দলের লোকসংখ্যা ছিলো দশের অধিক। কারণ দশজনের কমসংখ্যার দলকে 'উসবাতুন' বলা হয় না।

ওরওয়া বর্ণনা করেন, জননী আয়েশা হাস্সানকে মন্দ বলা পছন্দ করতেন না। কারণ নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনিই।

ফাইন্না আবী ওয়া ওয়ালিদাতী ওয়া ই'রদ্বি
'লিই'রদ্বি মুহাম্মাদিম্ মিনকুম ওয়াক্বা-উ

অর্থঃ আমি ও আমার জনক-জননীর মর্যাদা মোহাম্মদের মর্যাদার দ্বারাই মর্যাদায়িত, মোহাম্মদের জন্যই উৎসর্গীকৃত আমার ও আমার জনক-জননীর সম্মান।

এরপর বলা হয়েছে— 'লা তাহসাবুহু শাররাল্ লাকুম' অর্থাৎ এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না। এখানে 'তাহসাবু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. ও সাহাবীগণকে তথা সকল উম্মতকে। কারণ জননী আয়েশার উপর মিথ্যা কলংক আরোপ করার কারণে তাদের হৃদয় ছিলো দুঃখ ভারাক্রান্ত। কারণ তিনি ছিলেন সকল বিশ্বাসীর মহাসম্মানিতা জনয়িত্রী।

এরপর বলা হয়েছে— 'বাল্ হুয়া খয়রুল্ লাকুম' (বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কথাটির মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! এ মিথ্যা অপবাদ বাহ্যতঃ বেদনাদায়ক হলেও অনিষ্টকর কিছু নয়। বরং এতে রয়েছে তোমাদের জন্য মহাকল্যাণ। কারণ এ ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তোমরা লাভ করলে আল্লাহ্র বিধান। তোমাদের জননী ও তোমাদের মর্যাদা হলো আল্লাহ্র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এই বিধান সম্ভূত আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চারিত হতে থাকবে বিশ্বাসীগণের নামাজে, মিম্বরে ও অন্তরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি'। একথার অর্থ— অপবাদ রটনার মধ্যে তাদের এক একজনের অংশগ্রহণ একএক রকমের। কেউ স্বয়ং অপবাদ রটনাকারী, কেউ রটনা করেছে অন্যের কাছে শুনে, কেউ কেউ আবার ছিলো নীরব সমর্থক। কেউ কেউ আবার রটনাকে পছন্দ করেছে, মিথ্যা জেনেও প্রতিবাদ করেনি। কেউ কেউ মুখে কিছু না বললেও বলেছে ইশারা ইঙ্গিতে। এদের সকলেই মিথ্যা রটনাকারী। তাই অপরাধের তারতম্যানুসারে এদের প্রত্যেকেই ভোগ করবে শাস্তি। এ শাস্তি অবধারিত।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশাকে যারা অপবাদ দিয়েছিলো, রসুল স. তাদের প্রত্যেকের উপরে কার্যকর করেছিলেন আশি বেত্রাঘাতের শাস্তি। আমি বলি, ওই শাস্তি ও লাঞ্ছনা ছিলো জাগতিক। আখেরাতেও তাদের জন্য শাস্তি সুনির্ধারিত। আর যে ব্যক্তি এই মিথ্যা অপবাদের উদ্যোক্তা ও প্রধান হোতা তার শাস্তি হবে আরো অধিক ভয়াবহ। জুহ্রী লিখেছেন, তাদের প্রধান ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। আর এখানে 'আজাবুন আজীম' (কঠিন শাস্তি) বলে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামের শাস্তিকে।

ইবনে আবী মালিকা ওরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, ইফকের ঘটনা জননী আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি উটে আরোহণ করলাম। আর সাফওয়ান উটের রশি ধরে

চলতে লাগলেন সামনে সামনে। চলতে চলতে সাক্ষাৎ হলো মুনাফিকদের একটি দলের সঙ্গে। বাহ্যত তারা মুসলমান বলেই পরিচয় প্রকাশ করতো। কিন্তু থাকতো মুসলমান বাহিনীর পিছনে পৃথক অবস্থান নিয়ে। মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই জিজ্ঞেস করলো, রমণীটি কে? সাফওয়ান জবাব দিলেন, জননী আয়েশা। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দু'জনের কেউ কারো কাছ থেকে রক্ষা পায়নি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমাদের নবীর স্ত্রী রাত্রিযাপন করলো এক পরপুরুষের সঙ্গে! কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে 'তাদের মধ্যে' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো চারজন— আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল, হাস্সান ইবনে সাবেত, মিসতাহ্ ইবনে উছাছা ও হামনা বিনতে জাহাশ। কিন্তু কথাটি দুর্বল। যদি এরকমই হতো তবে 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লা' এর স্থলে এখানে বসতো 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লু'। তাছাড়া মিসতাহ্ ও হাস্সান ছিলেন বদরযোদ্ধা। আর কোরআন মজীদে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের পূর্বাপর সকল অপরাধ ক্ষমা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই এখানকার 'আজাবুন আজীম' (কঠিন শাস্তি বা জাহান্নামের শাস্তি) কথাটি তাদের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে না।

রসুল স. স্বয়ং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা খুশী করোনা কেনো, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সকল সাহাবী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া কুল্লাঁও ওয়াদাল্লহুল হুসনা' (প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন)। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, শাস্তি হবেই না। কারণ কেউ কেউ তো জান্নাতে প্রবেশ করবেন জাহান্নামের শাস্তিভোগের পর। তাঁরাও তো জান্নাতের অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ওয়াল্লাজী তাওয়াল্লা' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে হাস্সানকে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মাসরুক বলেছেন, আমি একদিন জননী আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি হাস্সান স্বয়ং। তিনি জননী আয়েশার প্রশংসায় আবৃত্তি করলেন তাঁর স্বরচিত কবিতা—

হিস্সানুন ওয়া জান্নুন মা তুজান্নু বিরায়বাতিন'

তুসবিহু গুরছা মিন লুহুমিল গওয়াফিলি

অর্থঃ তিনি অতিশয় পবিত্রা, অতীব ধৈর্যশীলা, কারো সন্দেহ তাঁকে অপবাদের পাত্রীতে পরিণত করতে পারে না, তাঁর উদর উদাসীনাদের গোশত থেকে মুক্ত (তিনি পরচর্চিনী নন)।

কবিতা শুনে জননী বললেন, তুমি কিন্তু এরকম নও। মাসরুক বলেন, আমি বললাম, আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন কেনো? আল্লাহ্ তো তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন 'এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি'। জননী বললেন, অন্ধ হয়ে যাওয়া অপেক্ষা অধিক কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? এ লোক তো তার কবিতার মাধ্যমে রসুল স. এর প্রতিপক্ষদেরকে প্রতিহত করে থাকে। উল্লেখ্য, মাসরুকের বর্ণনাটির মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কথাটির অর্থ জাগতিক কঠিন কোনো শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, প্রথমোক্ত তাফসীরই অধিকতর যথার্থ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১২, ১৩

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

❐ এই কথা শুনিবার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজদিগের বিষয়ে সৎ ধারণা করে নাই এবং বলে নাই 'ইহা তো নির্জলা অপবাদ।'

❐ তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই সে কারণে তাহারা আল্লাহের বিধানে মিথ্যাবাদী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অপবাদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী পুরুষ ও রমণীগণ কেনো তাদের ধর্মীয় ভ্রাতা-ভগ্নি সম্পর্কে সৎ ধারণা রাখলো না, কেনো স্পষ্ট করে বললো না যে, এটা সম্পূর্ণতই অপবাদ। এখানে 'নিজেদের বিষয়ে' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সকল বিশ্বাসী এবং মাযহাবের আলেমগণ একক সত্তার মতো। এমতো উল্লেখ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ১. 'লা তাল্‌মিজূ আনফুসাকুম' (তোমরা পরস্পর দোষারোপ করো না)। ২. 'লা তাক্বতুলূ আনফুসাকুম' (পরস্পর প্রাণসংহার কোরো না)। ৩. 'লা তুখরিজূ আনফুসাকুম মিন দিয়ারিকুম' (তোমরা পরস্পরকে দেশ থেকে বহিষ্কার কোরো না)। ৪. 'সাল্লিম আ'লা আনফুসিকুম' (তোমরা পরস্পরে সালাম দাও)। এসকল আয়াতে এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, ইমানের দাবি হচ্ছে সকল মুসলমান সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখতে হবে। বিরত থাকতে হবে তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা থেকে। আর প্রতিহত করতে হবে

তাকে, যে বিশ্বাসীগণকে অপবাদ দেয়, যেমন প্রতিহত করা হয় নিজের দোষক্রটি বর্ণনাকারীদেরকে। অর্থাৎ মুসলমান ভ্রাতাকে মনে করতে হবে নিজ সত্তার মতো। এটাই ইমানের দাবি।

ইমানই হচ্ছে প্রশংসা ও মর্যাদার কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমানদারের দোষ বর্ণনা করে, সে প্রকৃত সত্যকেই উল্টে দেয়। অপবাদ ও পরচর্চার কারণে হয়ে যায় ফাসেক। আর ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না শরিয়তের দলিল তার বিপক্ষে যায়।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা কেনো এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী'। একথার অর্থ— যেহেতু তারা ব্যভিচারের অপবাদ প্রচার করেছে, বুঝতে হবে তারা সওয়াবের নিয়তেই এরকম করেছে, কারণ আল্লাহ্র বিধান (অপবাদের শাস্তি) প্রয়োগের প্রচেষ্টা সওয়াব লাভের কারণ, যদি তাই হয়, তবে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলো না কেনো? এরকম যদি তারা করতো, তবে বোঝা যেতো তাদের উদ্দেশ্য উত্তম। তারা অবাধ্যাচরণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ব্যতিরেকেই যদি তারা এরকম করে থাকে, তবে একথা নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য অতি মন্দ। তারা মুসলমান নর-নারীকে অপদস্থ করতে চায়। সত্যোদ্ধার বা শরিয়তের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র বিধানানুসারে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. চারজনের উপরে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি কার্যকর করেন। তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত, হজরত মিসতাহ্ ইবনে উছাছা এবং হজরত হামনা বিনতে জাহাশ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৪, ১৫

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝

❒ ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত,

❒ যখন তোমরা মুখে মুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহের দৃষ্টিতে ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের রসুলের সান্নিধ্য হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম অনুগ্রহ। এই অনন্য অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্যান্য জাগতিক দয়া ও দানসমূহ যদি তোমাদের সঙ্গে না থাকতো, তবে অপবাদচর্চা ও তার প্রতি মৌন সমর্থনের কারণে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হতোই। এরকম হয়নি বলেই তো তোমরা লাভ করলে তওবার সুযোগ এবং বহাল রইলো আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদেরকে প্রদত্ত জান্নাত দানের অঙ্গীকার।

এখানে 'ইফদ্বাহ্' অর্থ মগ্ন হওয়া, কোনোকিছুতে জড়িত হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ প্রসারিত করা, সংবাদ প্রচার করা।

'লামাস্‌সাকুম' অর্থ অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করতো শাস্তি, যেমন শাস্তি এসেছিলো আদ, ছামুদ, হজরত লুতের সম্প্রদায় ও হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের প্রতি। সমূলে উৎপাটন করা হয়েছিলো তাদেরকে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসী সম্পর্কে যাঁরা অপবাদ আরোপকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁরা মুমিনই ছিলেন, মুনাফিক কিছুতেই নন। আর ইতোপূর্বে 'এবং এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি', কথাটি বলা হয়েছে মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে, যাদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই, জায়েদ ইবনে রেফা'য়া প্রমুখ।

এখানে 'লাওলা' কথাটির মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের সঙ্গে মেলামেশা করা সত্ত্বেও ওই সকল বিশ্বাসীর উপরে আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়নি। তাঁরা মুনাফিকদের ভিত্তিহীন আলোচনা নীরবে শুনে গেলেও আন্তরিকভাবে তাদের সমর্থক ছিলেন না। কেননা 'লাওলা' এর উদ্দেশ্য কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভ না করা। সুতরাং যেহেতু বরকত স্বরূপ আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তাই আযাবের অস্তিত্বায়ন ঘটেনি। আর ১১ সংখ্যক আয়াতে 'লাওলা' না বলে বলা হয়েছে 'তাওয়াল্‌লা'। তাই বুঝতে হবে সেখানে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা সুনিশ্চিত।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে, এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না'। একথার অর্থ— তোমরা অপবাদ প্রচারক না হলেও একে অপরকে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, এভাবে মুখে মুখে এই অপসংবাদ নিজেদের অজান্তেই ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করে যাচ্ছিলে। কালাবী বলেছেন, তাঁদের কথা ছড়ানোর প্রকৃতি ছিলো এরকম— তারা একজন অন্যজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কৌতূহল প্রকাশ করে বলতেন, আমি তো এরকম শুনলাম। ব্যাপার কী বলোতো? এভাবেই মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো ওই অপসংবাদটি। উল্লেখ্য, এখানকার 'ইজ' (যখন) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'মাস্‌সাকুম' (তোমাদেরকে স্পর্শ করতো) অথবা 'আফাদ্বতুম' (যাতে জড়িত ছিলে তোমরা) এর সঙ্গে। 'ওয়া তাকূলূনা বি আফওয়াহিকুম' অর্থ— তোমরা কেবল বলে যাচ্ছিলে মুখে মুখে, অথচ তার সত্যাসত্য সম্পর্কে বাস্তব কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে'। এখানে 'হায়্যিনা' অর্থ তুচ্ছ, অনুল্লেখ্য, যার গুরুত্ব সহজবোধ্য নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদিও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ছিলো গুরুতর বিষয়'। একথার অর্থ— অথচ তোমরা যাকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিলে, আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং অনুধাবন করো, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ কতো গুরুতর ও ভয়াবহ। আর এ অপবাদ তো আরো অধিক ভয়ংকর। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তোমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া জননী ও তোমাদের মহামান্য রসুল স্বয়ং।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং রক্ষা করবে দোজখ থেকে। রসুল স. বললেন, তুমি উত্থাপন করেছো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তবে আল্লাহ্‌ যদি কারো জন্য সহজ করেন, তবে তা সহজ। আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তাঁর উপাসনায় ও হুকুম প্রতিপালনে অন্য কাউকে বা কোনোকিছুকে শরীক কোরো না। নামাজ কায়েম কোরো। জাকাত দিয়ো। রমজানে রোজা রেখো। আর হজ কোরো কাবাগৃহের। শেষে বললেন, আমি কি তোমাকে মহাকল্যাণের কথাটি জানাবো না? স্মরণে রেখো, রোজা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পাবার ঢাল। আর দান-খয়রাত পাপের আগুনকে নির্বাপিত করে এমনভাবে যেমনভাবে পানি নিভিয়ে দেয় আগুনকে। গভীর রাতের গোপন নামাজও নিভিয়ে দেয় পাপানল। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'তাতাজ্বাফা জুনূবুহুম আনিল মাদ্বাজিয়ি' থেকে 'ইয়া'মালূন' পর্যন্ত। তারপর

বললেন, আমি তোমাদের ধর্মাচরণের মস্তক, স্তম্ভ ও শিখর সম্পর্কে কি বলবো না? শোনো, ইসলাম হচ্ছে মস্তক, নামাজ হচ্ছে স্তম্ভ, আর জেহাদ হচ্ছে তার শিখর। এরপর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না, যা এসকল কাজের ভিত্তি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. তাঁর পবিত্র রসনা স্পর্শ করে বললেন, একে সংযত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কথা বলা থেকেও কি আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে? তিনি স. বললেন, মুয়াজ তোমার মা তোমার জন্য রোদন করুক। রসনার অসংযমের কারণেই তো মানুষকে অধোমুখী করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮

❒ এবং তোমরা যখন ইহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদিগের উচিত নহে; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এইরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না।'

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেনো বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়'। একথার অর্থ— এবং তোমরা এমতো মিথ্যা অপবাদের কথা যখন শুনলে তখন একথা কেনো বললে না যে, এরকম অসুন্দর উক্তির উচ্চারণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। সাধারণ চরিত্রবতী রমণীকে অপবাদ দিলেই তো শাস্তিগ্রস্ত হতে হয়, হতে হয় ফাসেক, আর হারিয়ে যায় সাক্ষ্যপ্রদানের অধিকার। আর তিনি তো সিদ্দীকতনয়া, রসুল স. এর পবিত্র সহধর্মিণী, আর বিশ্বাসীগণের পরম সম্মানার্হা জননী। সুতরাং তাঁর প্রতি অপবাদের কথা আমরা সহ্য করি কীরূপে? এখানে 'মা ইয়াকূনু লানা' অর্থ— এরকম বলা আমাদের জন্য জায়েয নয়। নয় শোভন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এটাতো এক গুরুতর অপবাদ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র রসুলের স্ত্রী ব্যভিচারিণী হতে পারে এধরনের অপধারণা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ব্যভিচারিণীরা স্বামীর সম্মান ধূলিসাৎ করে দেয়। নবী-রসুলগণ তো মানুষের সংশোধনকর্মে সতত নিয়োজিত। সুতরাং তাঁদের ঘরে কি ব্যভিচারিণীর অবস্থান শোভন? সম্ভব? এরকম হলে তাঁরা আর অনুসরণীয় থাকেন কী করে? বর্ণনাসঞ্জাত ও বুদ্ধিগত কোনো প্রকার প্রমাণই যে এর নেই, থাকতে পারে না। উল্লেখ্য, নবীর স্ত্রী কাফের হতে পারে, কিন্তু ব্যভিচারিণী কদাচ নয়। কারণ তাঁর স্ত্রীর অবিশ্বাস বিশ্বাসীদেরকে নবীর সান্নিধ্যে আসতে বাধা প্রদান করে না, এতে করে নবীর সম্মানহানি হয় না। কিন্তু ব্যভিচার সংশোধন কর্মের এক অনড় অন্তরায়। তাই দেখা যায় কোনো নবীরই স্ত্রী ব্যভিচারিণী নন। কিন্তু তাদের কারো কারো স্ত্রী কাফের। যেমন, হজরত নুহের এক পত্নী ছিলো কাফের।

'হাজা বুহতানুন আ'জীম' অর্থ এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। অর্থাৎ এতো বড় অপবাদ যে, যে এরকম শোনে সে হয়ে যায় হতভম্ব। উল্লেখ্য, অপবাদের গুরুত্বের তারতম্য ঘটে অপবাদগ্রস্তার মর্যাদার তারতম্যের উপর।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি কোরো না'। এখানে 'ওয়াজ' অর্থ ভীতিপ্রদর্শক প্রকাশ্য সতর্কবাণী, উপদেশ। খলিল বলেন, 'ওয়াজ' অর্থ কল্যাণজনক কথা এমনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা, যাতে করে শ্রোতার অন্তরে সৃষ্টি হয় বিনয় ও ভয়। এভাবে এখানে 'উপদেশ দিচ্ছেন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, প্রদর্শন করছেন ভীতি।

'আন তাউ'দূ লিমিছলিহী আবাদা' অর্থ জীবনে কখনোই এমতো অপউক্তি শুনবে না ও বলবে না, পুনরাবৃত্তি করবে না এমতো অপবাদাচরণের। অথবা কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছেন, যেনো তোমরা এমতো অপআচরণের পুনরাবৃত্তি আর না করো। কারণ এমতো কর্ম আল্লাহ্র পরিতোষানুকুল নয়। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদেরকে এরকম গর্হিত কর্ম পুনরায় করতে নিষেধ করছেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ বিশ্বাসীই যদি তোমরা হয়ে থাকো, তবে আর কখনো এরকম কোরো না। কারণ এটা ইমানের দাবির পরিপন্থি। আমি বলি, একথায় প্রমাণিত হয় যে, যে সকল শিয়া জননী আয়েশার পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপন করে, তারা মুমিন নয়।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য প্রবর্তন করেন তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলী, যা সদুপদেশ ও শিক্ষণীয় আদেশে সমৃদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। একথার অর্থ— এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ বলেই তোমাদের জন্য প্রদান করেন শুভ কর্মের আদেশ এবং বিরত থাকতে বলেন অশুভ কার্যাবলী থেকে। উভয় কর্মের পরিণতিই তাঁর জানা। কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— এবং অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন সিদ্দীকনন্দিনীর সতীত্বকে এবং তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা রটনাকে। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্‌র এই অতুলনীয় গুণটির উল্লেখের মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— তাঁর সকল কার্যের আদি-অন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে মন্দ কোনোকিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে বৈধ জ্ঞান করেননি।

সূরা নূর ঃ আয়াত ১৯, ২০

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ যাহারা বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, 'তোমরা জান না'।

❒ তোমাদিগের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হইলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইত না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা কামনা করে, বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তারা শাস্তি পাবে যেমন পৃথিবীতে, তেমনি পরবর্তী পৃথিবীতে। এ শাস্তি সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্ জানেন, কাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং কাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল।

'ওয়া আনতুম লা তা'লামূন' অর্থ— তোমরা জানোনা। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু বিষয়টির সত্যাসত্য সম্পর্কে অবগত নও সেহেতু তোমাদের উচিত ছিলো অপবাদদাতাদেরকে চারজন প্রত্যক্ষ্যদর্শীর সাক্ষ্য হাজির করতে বলা। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, সেরকম কোনো সাক্ষীই তাদের নেই। অতএব বুঝতে হবে, পুতপবিত্রা রমণীর চরিত্রহননই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের উপরে এবার প্রয়োগ করো অপবাদের শাস্তি। এভাবে তোমরা হও প্রকাশ্য শরিয়তের অনুগামী। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই সর্বশেষ শরিয়তের বিধানানুসারে ফয়সালা করো সকলের এবং সকলকিছুর। এভাবে তোমাদের জ্ঞানকে করো আল্লাহ্‌র অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুকূল। কারণ তোমরা জানো না। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতো না'। এখানে 'তোমাদের প্রতি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ওই সকল সাহাবীকে যাঁরা অপ্রত্যক্ষ ও বাহ্যিকভাবে হলেও ওই অপবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কর্মগত শৈথিল্য থাকলেও বিশ্বাসগত কোনো ত্রুটি ছিলো না। তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া পেয়েছো, আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ। যদি এরূপ না হতো, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তোমাদের পরিত্রাণ ছিলো অসম্ভব, দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। উল্লেখ্য, এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় এবং রহমতের আশার কথা। তাই বুঝতে হবে, অপবাদের এই ঘটনাটি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরাধও ছিলো অত্যন্ত গুরুতর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, 'যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদেরকে। 'তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি' বলে বুঝানো হয়েছে ওই মুনাফিকদের দুনিয়ার অপবাদের শাস্তি ও আখেরাতের অনন্ত দোজখবাসের কথা। আর 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া থাকলে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত হাস্‌সান, হজরত মিসতাহ্ ও হজরত হামনাকে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিতে না, তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

'আলফাহ্শা' অর্থ সীমাতিরিক্ত মন্দ, চরম পর্যায়ের অশ্লীলতা— ধর্মীয় ও বুদ্ধিগত উভয় দিক থেকে। 'আলমুনকার' অর্থ ওই কাজ, যা শরিয়তের বিধানে অবৈধ। আর 'আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতো না' কথাটির মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে ওই সকল সাহাবীর কথা যারা অনবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ মুনাফিকদের ভিত্তিহীন রটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা নিজের অজান্তে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করেছিলে। এরকম কখনোই কোরো না। কারণ, শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ পথে নিয়ে যায়। তোমাদের প্রতি রয়েছে আমার অপার অনুগ্রহ ও দয়া। তাই আমি পাপমোচনের জন্য ক্ষমার প্রবর্তন করেছি। আর দান করেছি তওবার সৌভাগ্য। যদি এরকম না করতাম তবে তোমরা কিছুতেই পাপমুক্ত হতে পারতে না। এভাবে আমি আমার অভিপ্রায়ানুসারে যাকে পছন্দ করি তাকে পবিত্র করে থাকি। আর আমিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

শায়খাঈন (বোখারী, মুসলিম) ও কতিপয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে, অপবাদের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হজরত মিসতাহ্ ছিলেন হজরত আবু বকরের একজন দরিদ্র আত্মীয়। তিনি তাঁকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁর অপআচরণে দুঃখিত হলেন হজরত আবু বকর। বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন থেকে আমি তাকে আর কিছুই দিবো না। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২২

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❒ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহের রাস্তায় যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না; তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদিগের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'ওয়া লা ইয়া'তালি' অর্থ যেনো শপথ গ্রহণ না করে, কসম না খায়। শব্দটি বাবে ইফতিয়ালের অন্তর্ভুক্ত যা পরিগঠিত হয়েছে 'আলইয়াহ্' থেকে। 'আলইয়াতুন' অর্থ শপথ। অথবা শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'আলউন্' যার অর্থ কম করা বা হ্রাস করা। এভাবে 'ওয়া ইয়া'তালি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— হ্রাস কোরো না, কম কোরো না। হজরত আবু বকর হজরত মিসতাহ্‌কে কিছুই না দেবার শপথ করেছিলেন। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেনো শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না'।

এখানে 'আল ফাদ্বলি' অর্থ ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা এরপরে উল্লেখিত হয়েছে 'আস্‌সায়াত', যার অর্থ সম্পদগত প্রাচুর্য। আলকাদ্বলু' দ্বারা সম্পদের প্রাচুর্য অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্রয় দেয়া হবে পুনরাবৃত্তিকে। সেকারণেই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান এবং সম্পদগত প্রাচুর্যে প্রাচুর্যসম্পন্ন। উল্লেখ্য আত্মীয়-স্বজনের আচরণে দুঃখ পেয়ে তাদেরকে কিছু না দেয়া সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য হারাম নয়। কিন্তু হজরত আবু বকর ছিলেন অসাধারণ এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সেকারণেই এখানে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে) বলে তাঁর বিশেষ মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ও জাগতিক বিত্তে বিত্তবান, তারা কেনো আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুহাজিরগণকে দান না করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করবে? একি তাদের জন্য শোভন, না সমীচীন?

'আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত মিস্‌তাহকে। কারণ তিনি ছিলেন মুহাজির। অভাবগ্রস্তও ছিলেন। ছিলেন বদরযোদ্ধা। আরো ছিলেন হজরত আবু বকরের আত্মীয়— খালাতো ভাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যেনো তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে'। একথার অর্থ— মানুষের ভুল তো হতেই পারে। সে ভুল ক্ষমা করা যায় না এমন তো নয়। সুতরাং মর্যাদাবানগণের উচিত তাদেরকে ক্ষমা করা এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! তোমরা কি চাওনা যে, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? ভেবে দেখো, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও রয়েছে কোনো না কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, যা আল্লাহ্তায়ালার অপার নেয়ামতের যথাযথ ও পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। আর আল্লাহ্ তো তাঁর যথাঅধিকার যথাপরিপূরিত না হওয়ার কারণে সকলকেই অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। অতএব, হে আল্লাহ্প্রেমিকগণ! তোমরাও তোমাদের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত করো আল্লাহ্তায়ালার এ দু'টো মহৎ গুণ— ক্ষমা ও দয়া।

শায়খাঈন প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তো এটাই চাই যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কখনোই মিসতাহ্র খরচ বন্ধ করবো না।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে বিনিময় কামনা করে। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে-ই, যে সম্পর্কচ্ছিন্নকারীদের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর ও কতিপয় সাহাবী শপথ করলেন, অপবাদে অংশ গ্রহণকারীদেরকে তাঁরা কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৩

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

❒ যাহারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি।

'আল মুহসানাত' অর্থ সাধ্বী রমণী। 'গফিলাত' অর্থ ব্যভিচার সম্পর্কে বেখবর, ব্যভিচারের কল্পনাও যাদের অন্তরে নেই। অর্থাৎ নিরীহ নারী। 'মু'মিনাত' অর্থ বিশ্বাসবতী। আর 'আজাবুন আ'জীম' অর্থ দোজখের শাস্তি, মহা শাস্তি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যারা কোনো সতীসাধ্বী, সরলমনা

ও বিশ্বাসিনীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তারা পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে নরকাগ্নির লেলিহান শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি সাধারণ। অর্থাৎ যে কোনো সতী, সরলপ্রাণা ও বিশ্বাসবতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে হতে হবে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত এবং ভোগ করতে হবে দোজখের মহাশাস্তি। আর ৪ সংখ্যক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সতী-অসতী, ব্যভিচারপ্রবণা— অপ্রবণা সকল প্রকার রমণীর উপরে ব্যভিচার আরোপের বিধান। বলা হয়েছে, যে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলতে হবে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যসহযোগে। এরকম না করলে অভিযোগ উত্থাপনকারীর উপরে প্রয়োগ করতে হবে আশিটি কশাঘাতের শাস্তি। তবে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সত্য হয়, তবে সে অভিশাপগ্রস্ত হবে না। অভিশাপগ্রস্ত হবে কেবল মিথ্যাবাদীরা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে এধরনের মিথ্যাবাদীদের কথাই বলা হয়েছে। বিশ্বাসিনী সতী ও নিরীহারা ব্যভিচারের কল্পনাই করে না। তাই তাদেরকে প্রদত্ত অপবাদ অধিকতর নিন্দনীয়। সে কারণেই এখানে বলা হয়েছে, তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য অবধারিত মহা শাস্তি। আরো উল্লেখ্য, এধরনের অপবাদ অনেক বড় পাপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কুফরী নয়। সুতরাং তারা গোনাহগার হলেও কাফের নয়। যেমন হন্তারক অভিশপ্ত বটে, কিন্তু কাফের নয়।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে অভিশপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে কপটচারী আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে। তার ধারনা ছিলো একমাত্র অবিশ্বাসীরাই হয় অভিশপ্ত।

তিবরানী লিখেছেন খসিফ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদারোপ— এ দু'টোর মধ্যে কোন পাপটি বড়? তিনি বললেন, ব্যভিচার। আমি তখন পাঠ করলাম এই সুরার আলোচ্য আয়াত। তিনি বললেন, এই আয়াত তো অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা প্রসঙ্গে। উল্লেখ্য, এই বর্ণনার সূত্রপরম্পরাভূত ইয়াহ্ইয়া হাসানী কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। বাগবীও খসিফের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

কাহিল গোত্রের জনৈক বৃদ্ধের বরাত দিয়ে আ'য়াওয়াম ইবনে হাওশাম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে জননী আয়েশা ও অন্যান্য উম্মতজননীকে লক্ষ্য করে। তাই এখানে তওবার কোনো উল্লেখ নেই। তওবার সুযোগ রয়েছে অন্যান্য নারীর অপবাদের

বেলায়। একথা বলে হজরত ইবনে আব্বাস পাঠ করলেন ৫ সংখ্যক আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে 'তবে যদি এর পর তারা তওবা করে'। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তওবার কথা নেই। অনুরূপ তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, জুহাক ইবনে মুজাহিম বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল জননী আয়েশা সম্পর্কে।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এই আয়াত প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর প্রিয় সহধর্মিণীগণকে লক্ষ্য করে। এর পর অবতীর্ণ হয় ৪ ও ৫ সংখ্যক আয়াত। আমি বলি, এ প্রসঙ্গের মতপৃথকতাটির ভিত্তি দু'টো বিষয়— ১. এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে ওই অপবাদের ঘটনা। ২. কুফর ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গোনাহকারীর উপরে অভিশাপের কথা শরিয়তসম্মত নয়। প্রথমোক্ত উক্তি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো অন্তরায় নেই। আর আলোচ্য আয়াত সেরকমই একটি আয়াত। তাই এখানে বিশেষ কোনো ঘটনার উল্লেখও নেই।

দ্বিতীয় উক্তি সম্পর্কে বলা যায়, অভিশাপ কুফরীর (অবিশ্বাসের) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কোনো বিষয় নয়। যেমন হত্যাও কবীরা গোনাহ্। অথচ হত্যাকারীকেও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে, কোনো কোনো কবীরা গোনাহ্ অভিশাপের উপযোগী করে। আর একটি কথা এই যে, এখানে 'তওবা'র উল্লেখ না থাকার কারণে একথা বলা যাবে না যে, উম্মত জননীর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের জন্য তওবার সুযোগই নেই। অথবা তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ এক আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা জালিকা লি মাইঁয়াশাউ' (এবং মুশরিক ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন)।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৪, ২৫

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ يَوْمَىِٕذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

❑ যে দিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে—

❑ সে দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক;

ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হজরত আবু মুসা আশয়ারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণকে একজন একজন করে হিসাব গ্রহণের জন্য উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে তাদের কৃত পাপরাশিকে। বিশ্বাসীরা স্বীকার করবে তাদের অপরাধ। আল্লাহ্পাক তখন পাপসমূহকে আড়াল করে দিবেন। তখন দৃশ্যমান হবে কেবল তাদের পুণ্যসমূহ। লোকেরা তাই দেখে তাদের সুখ্যাতি করতে থাকবে। এরপর উপস্থিত করা হবে মুনাফিকদেরকে। তাদের পাপগুলো তাদের সামনে উপস্থিত করা হলে তারা তা অস্বীকার করে বসবে। বলবে, হে আমার প্রভুপালক! তোমার সম্মানের শপথ! এগুলো আমি করিনি। মিছামিছি ফেরেশতারা এগুলো আমার আমলনামায় লিখে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট ফেরেশতা বলবে, তুমি কি অমুকদিন অমুক জায়গায় একাজ করোনি? সে বলবে, আমার প্রভুপালকের কসম করে বলছি, আমি একাজ করিনি। এরপর তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে (তখন সাক্ষ্য দিবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ)। এরপর হজরত আবু মুসা পাঠ করলেন প্রথমোক্ত আয়াতটি। পাঠ শেষে বললেন, আমার ধারণা সর্বপ্রথম কথা বলবে তার ডান রান।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়া'লী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসেও অনুরূপ বিবরণ এসেছে। হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীর।

যথাসূত্রে আহমদ ও তিবরানী হজরত উকবা ইবনে আমেরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যেদিন মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, সেদিন সর্ব প্রথম কথা বলবে তার বাম উরু। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে জায়দাহ্ থেকে আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে মুনাফিকদের মুখ থাকবে বন্ধ। তখন কথা বলবে তার উরুদেশের অস্থি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, তখন মানুষের মন্দ আমলের সাক্ষ্য দিবে তার উরুদেশের গোশত ও হাড়। ওই সকল লোক হবে মুনাফিক। তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্র গজব।

একটি সন্দেহ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব। এই দ্বন্দ্বায়নের নিরসন কী?

নিরসন : মুখে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ— সে তখন স্বেচ্ছায় কিছু বলতে পারবে না। এরকম অর্থ নয় যে, তার ইচ্ছার বিপরীত কোনো কথা তার মুখে উচ্চারিত হতে পারবে না এবং রহিত হয়ে যাবে তার বাকশক্তি।

আমি বলি, এমতো তাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করে। কাতাদা এরকমই ধারণা করেছেন।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক'। এখানে 'দীন' অর্থ প্রাপ্য বা বিনিময়। 'হক' অর্থ আবশ্যকীয় প্রতিফল। আর 'আল হাক্কুল মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রকাশক, তাঁর অস্তিত্বের প্রতিবিম্বের স্পষ্ট প্রকাশক, অথবা প্রতিবিম্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির রক্ষক। উল্লেখ্য, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর ছায়া বা প্রতিবিম্ব। আর প্রতিবিম্ব কখনো মূলের অংশ নয়। তেমনি সৃষ্টির কেউ বা কোনোকিছুই আল্লাহ্তায়ালার অংশীদার নয়। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির স্পষ্ট প্রকাশয়িতা। সকলের পুরস্কার ও তিরস্কারের একক নির্ধারয়িতা।

অথবা 'আলহাক্ব' অর্থ জুলহাক্ব (সত্যের অধিকারী), আর 'মুবীন' অর্থ 'বায়নুন' (প্রকাশ্য)। অর্থাৎ তিনি সুবিচারের বা সত্যের প্রকাশ্য প্রকাশক। কিংবা 'আল মুবীন' অর্থ প্রকাশকারী। অর্থাৎ তিনি দুনিয়াতে যে অঙ্গীকার প্রদান করেছেন আখেরাতে তার প্রকাশকারী বা বাস্তবায়ক।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই দ্বীন ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো। কিয়ামতের সময় তার সন্দেহ চিরতরে হয়ে যাবে অন্তর্হিত। কারণ আল্লাহ্তায়ালাই তখন চিরস্থায়ীরূপে সুস্পষ্ট করে দিবেন সত্যের স্বরূপ। সে কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'ওয়াল হাক্কুল মুবীন' (তিনি স্পষ্ট প্রকাশক)।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন, ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। কিয়ামতের সময় সে বুঝতে পারবে— আল্লাহ্ই সত্য, সত্যের স্পষ্ট প্রকাশক।

আমি বলি, সম্ভবতঃ হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের মর্ম এরকম— অবিশ্বাসীরা ও ধর্মবোধহীন জনতা মনে করে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব কল্পনাপ্রসূত। এই মহাবিশ্ব স্বতোৎসারিত ও স্বতঃপরিচালিত, বিভিন্ন প্রভাব, প্রক্রিয়া, ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রকাশ। আর কর্মই মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নির্ধারয়িতা। তাই তারা সম্রাটকে ভয় করে বটে, কিন্তু ভয় করে না সম্রাটের সৃজয়িতাকে। মহাবিচারের দিবসে তাদের এমতো অপবিশ্বাস অন্তর্হিত হয়ে যাবে চিরতরে। কারণ সেদিন আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে উন্মোচিত করবেন সত্যের স্বরূপ। সকলেই সবিস্ময়ে দেখবে, আল্লাহ্ই সত্যের স্পষ্ট উন্মোচক এবং প্রকাশ্য ন্যায়বিচারক।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۟

❑ দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; ইহাদিগের সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতার অভিমত হচ্ছে— এখানকার 'আল খবীছাত' অর্থ অপকৃষ্ট বাক্য, অবমাননা ও অসম্মানতা প্রকাশক শব্দাবলী। যে সকল লোক নীচ ও হীন, এ ধরনের অপবাক্য উচ্চারিত হয় তাদের মুখেই । আলোচ্য আয়াতে সে সকল নারী-পুরুষকেই বলা হয়েছে দুশ্চরিত্রা ও দুশ্চরিত্র। নিঃসন্দেহে এরা নিন্দার্হ। আর সম্মানার্হ হচ্ছেন তাঁরা , যাদের মুখে উচ্চারিত হয় শুভ, সুন্দর ও সৎ বাক্যাবলী। এদেরকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'সচ্চরিত্রা' ও 'সচ্চরিত্র' বলে। এরা পবিত্র, ক্ষমার্হ এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণের অঙ্গীকার প্রাপ্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহাসম্মানিতা উম্মত জননী হজরত আয়েশা সচ্চরিত্রা রমণীগণের নেত্রী। তিনি সতী-সাধ্বী পূতপবিত্রা, মহাপুণ্যবতী ও চির-সত্যাধিষ্ঠিতা। তাই তাঁর পবিত্র চরিত্রের কলংকায়ন অশোভন, অসঙ্গত— নিষিদ্ধ ও অসিদ্ধ, মহাপাপ।

জুজায আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— 'আলখবীছাত' অর্থ অপবিত্রবচন। যেমন অবিশ্বস্ত বাক্য (কুফরীকালাম), অসত্য-ভাষণ, রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ ও তাঁর মহাকল্যাণপ্রাপ্ত বংশধরগণের নিন্দাচার, তাঁর পরিবার পরিজনভূত নারীগণের উপরে অপবাদ আরোপণ ইত্যাদি। যে মাটি দিয়ে তাদেরকে গঠন করা হয়েছে, সেই মাটিতেই ছিলো তাদের এসকল অসৎগুণ। আর 'আত্‌তুইয়্যেবাত' অর্থ পবিত্র বচন। যেমন, আল্লাহ্‌র জিকির, রসুল স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত, বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। এসকল সদ্‌গুণ তাঁরা সৃষ্টির সূচনালগ্নের মৃত্তিকা থেকেই প্রাপ্ত। এঁদের রসনা অপবাদারোপকারীদের অপবাক্যসমূহ থেকে পবিত্র। এঁদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার প্রতিশ্রুতি।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'খবীছাত' ও 'খবীছীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুশ্চরিত্রা নারী ও দুশ্চরিত্রা নরকে। অর্থাৎ এটাই সাধারণ বিধান ও বাস্তব যে, দুশ্চরিত্র পুরুষ ও দুশ্চরিত্রা নারী সমমানসিকতাসম্পন্ন। আর সমসংবেদনশীলতা-সম্পন্ন হচ্ছে সচ্চরিত্রা নারী এবং সচ্চরিত্র পুরুষ। আর জননী আয়েশা যেহেতু সচ্চরিত্রা রমণীগণের মস্তক-মুকুট, তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে নির্বাচন করেছেন শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের ধর্ম ও কর্মসহচরীরূপে। তাই তিনি ও তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণকারীরা অপবাদ আরোপকারীদের জঘন্য মানসিকতা ও অপবচন থেকে অবশ্যই পবিত্র। জননী আয়েশা সৎচ্চরিত্রা না হলে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম রসুলের সহধর্মিণী হতে পারতেন না।

হজরত হিন্দ ইবনে আবী হালা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র পছন্দ নয় যে, আমি জান্নাতী রমণী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করি। ইবনে আসাকের।

বাগবী লিখেছেন, কতিপয় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জননী আয়েশা প্রকাশ করতেন কৃতজ্ঞায়িত গৌরব। যেমন—

১. তাঁর বিবাহের পূর্বে একদিন হজরত জিবরাইল রসুল স. সকাশে এসে তাঁর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলেন রেশমীবস্ত্রে জড়ানো একটি রমণীপ্রতিকৃতি। বললেন, ইনি আপনার স্ত্রী। আমি বলি, জননী আয়েশা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জিবরাইল ওই প্রতিকৃতিটি রসুল স. এর হাতে দিয়েছিলেন।
২. তিনিই ছিলেন রসুল স. এর একমাত্র কুমারী সহধর্মিণী।
৩. তাঁর পবিত্র কোলে মস্তক রেখেই তিনি স. চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন এই মর্ত্যলোক থেকে।
৪. রসুল স.কে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁরই পবিত্র প্রকোষ্ঠে।
৫. তাঁর সঙ্গে একই বস্ত্রাবৃত অবস্থাতেও রসুল স. এর উপর অবতীর্ণ হতো প্রত্যাদেশ, অন্য কোনো সহধর্মিণীর সাহচর্যে থাকা অবস্থায় এরকম ঘটতো না।
৬. তাঁর সচ্চরিত্রতার সাক্ষ্য নেমে এসেছে আকাশ থেকে কোরআনের বাণীরূপে।
৭. তিনি রসুল স. এর প্রথম খলিফার কন্যা।
৮. তিনি সিদ্দীকা (সত্যবাদিনী), তাহেরা (পবিত্রিণী)।
৯. তাঁকেই বিশেষ করে দেয়া হয়েছে মার্জনা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার।

তাঁর নিকট থেকে শ্রুত হাদিস বর্ণনা কালে মাসরুক বলতেন, এই হাদিস আমি শুনেছি সিদ্দীকনন্দিনী সিদ্দীকা থেকে, তিনি ছিলেন রসুল স.এর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী যার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ রয়েছে আকাশজ বাণীবৈভবে ইত্যাদি।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে জননী আয়েশার উপরে অপবাদ আরোপকারীদের যেভাবে ধমক ও হুমকি দেয়া হয়েছে, সে রকম কঠোর হুঁশিয়ারী কোরআন মজীদের অন্যত্র নেই।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তোমার প্রতিকৃতি আমাকে তিন বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। ভ্রাতা জিবরাইল ওই প্রতিকৃতি একটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো এবং বলেছিলো, ইনি আপনার স্ত্রী। আমি রেশমী আবরণ উন্মোচন করে দেখলাম প্রতিকৃতিটি তোমার। তাঁকে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে এর বাস্তবায়ন ঘটবেই।

জননী আরো বলেছেন, লোকেরা আমার পালার দিন রসুল স. এর খেদমতে আমার প্রকোষ্ঠে হাদিয়া প্রেরণ করতো। রসুল স. এর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো তাদের এমতো আমলের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স.এর সহধর্মিণীগণ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন দু'টি দলে। এক দলে ছিলাম আমি, হাফসা, সুফিয়া ও সাওদা। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালমা ও অন্যান্যরা। একদিন উম্মে সালমার দলের সপত্নীরা তাকে বললেন, তুমি রসুল স.কে বলো, তিনি যেনো লোকদেরকে এমতো নির্দেশ দেন, যেনো তিনি স. যখন যার ঘরে অবস্থান করেন সেখানেই যেনো তারা তাঁর নিকট হাদিয়া পাঠায়। উম্মে সালমা একথা রসুল স.কে বললেন। তিনি স. বললেন, আয়েশা প্রসঙ্গে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। আয়েশা ছাড়া অন্য কারো চাদরে আবৃত অবস্থায় আমার নিকট ওহী আসে না। উম্মে সালমা বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মরক্ষা প্রার্থনা করি। এরপর তাঁরা ধরে বসলেন রসুলতনয়া ফাতেমাকে। তিনি তাঁদের প্রস্তাব রসুল স. সকাশে পেশ করলেন। রসুল স. বললেন, প্রিয় পুত্রী! আমার পছন্দ কি তোমার পছন্দ নয়? ফাতেমা বললেন, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, তবে তুমিও আয়েশাকে ভালোবাস। বোখারী, মুসলিম,

হজরত আবু মুসা আশয়া'রী থেকে বোখারী ও মুসলিম, কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. জানিয়েছেন, অন্যান্য আহার্য বস্তুর তুলনায় ছরিদ যেমন অনন্য, আমার সহধর্মিণীগণের তুলনায় আয়েশার অনন্যাতাও তেমনি । হজরত আবু মুসা আশয়ারী আরো বলেন, সাহাবীগণ কোনো হাদিস বুঝতে অসমর্থ হলে মাতা আয়েশার দ্বারস্থ হতেন। তিনি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিরমিজি।

হজরত মুসা ইবনে তালহা বলেছেন, আমি জননী আয়েশা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জল বর্ণনাকারিণী দেখিনি। তিরমিজি। বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালা চারজন অসাধারণ মানুষকে অপবাদ মুক্ত করেন চারজনের দ্বারা। যেমন— ১. হজরত ইউসুফকে জুলায়খার অপবাদ থেকে রক্ষা করেছিলেন ওই গৃহেরই একটি শিশু দ্বারা। ২. ইহুদিদের অপবাদ থেকে হজরত মুসাকে মুক্ত করেছিলেন একটি পাথর দ্বারা (পাথরটি পলায়ন করেছিলো তাঁর পরিধেয় বসন নিয়ে)। ৩. ইহুদীর অপবাদ থেকে হজরত মরিয়মকে মুক্ত করেছিলেন তাঁরই শিশু পুত্র হজরত ঈসার সাক্ষ্যের মাধ্যমে। ৪. মুনাফিকদের অপবাদ থেকে জননী আয়েশাকে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, প্রকৃতপক্ষে রসুল স. এর মহান মর্যাদা ও মহিমাকে সমুজ্জ্বল করার জন্যই কোরআনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর চরিত্রকে এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে শাশ্বত-সাধ্বী ও মহিমময়ীরূপে।

আমি বলি, এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টে জননী আয়েশার মহান মর্যাদার প্রকাশ ঘটানোই ছিলো মূল উদ্দেশ্য।

আদী ফারইয়ানী ও ইবনে জারীর হজরত ইবনে সাবেত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.এর মহান দরবারে হাজির হয়ে একবার এক আনসারী রমণী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি আমার ঘরে একলা এমন অবস্থায় থাকি যখন আমি চাইনা যে কেউ আমাকে দেখে ফেলুক। কিন্তু বাড়ীর লোকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্দ্বিধায় কখনো কখনো আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে দেখে ফেলে অসংবৃত অবস্থায়। এখন আমি কী করবো? তাঁর এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত এভাবে—

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদিগের অনুমতি না লইয়া ও তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যে গৃহে বসবাস করো, সেই গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে এবং ওই গৃহবাসীদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না। এটাই তোমাদের জন্য শোভন ও অবশ্যপালনীয়। অতএব তোমরা এই উপদেশ মেনে নাও।

এখানে 'গইরা বুয়ূতিন' অর্থ যে গৃহে অন্যরা বসবাস করে। উল্লেখ্য, নিজের গৃহ অন্যকে ভাড়া দিলেও গৃহের মালিক ওই গৃহে বিনা অনুমতিতে ও বিনা সালামে প্রবেশ করতে পারবে না।

'তাসতা'নিসূ' অর্থ অনুমতি গ্রহণ করো। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত উবাই ইবনে কা'ব শব্দটি পড়তেন 'তাসতা'জিনূ'। উভয় শব্দের অভিধানগত অর্থ দেখা, জানা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা, অসতর্ক না হওয়া। ইবনে আবী হাতেম বলেন, হজরত আবু আইয়ুবের ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত সুরাহ বর্ণনা করেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসুল! সালাম করা কাকে বলে, তাতো আমরা জানি, কিন্তু 'ইস্তিনাস' অর্থ কী? তিনি স. বললেন, গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে সশব্দে সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার বলা, গলা খাঁকারী দেয়া (যাতে গৃহবাসী তার উপস্থিতি টের পায়)। তারপর গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহকর্তার অনুমতি নেয়া।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'উনস' 'ওয়াহশাত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। আনাসাশ্ শাইআ ' অর্থ কোনকিছু দর্শিত হওয়া। 'আনাস সওতা' অর্থ আওয়াজ শ্রবণ করা। খলিল বলেছেন, 'ইস্তিনাস' অর্থ দেখা। আনাসতু নারা' অর্থ আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। এখানে অনুমতি চাওয়াকে 'ইস্তিনাস' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে একারণে যে, অনুমতিপ্রার্থীর অন্তরে থাকে এক ধরনের আশা-আশঙ্কার দোলা। সেভাবে, অনুমতি মিলবে কি মিলবেনা কে জানে? অনুমতি পেলে আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

'তুসাল্লিমূ আ'লা আহলিহা' অর্থ গৃহকর্তাকে আসসালামু আলাইকুম বলো। হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে এই মর্মে সদুপদেশ প্রদান করলেন যে, বৎস! কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমে বাড়ির মালিককে সালাম প্রদান করবে। এতে করে বরকত লাভ হবে তোমার ও গৃহকর্তার।

'অনুমতি প্রার্থনা' ও 'সালাম' এ দু'টোর কোনটি অগ্রে সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের মতপৃথকতা। আলোচ্য আয়াতে অবশ্য অনুমতি প্রার্থনার কথাই এসেছে আগে। তাই কেউ কেউ বলেন, আগে চাইতে হবে অনুমতি। তারপর দিতে হবে সালাম। কিন্তু এমতো অভিমত প্রামাণ্য নয়। কারণ দু'টো কথাকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে 'ওয়াও' (এবং) সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে। এর অর্থ দু'টোই করতে হবে। মনে রাখতে হবে 'এবং' কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ নির্ণায়ক নয়। উপরন্তু হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতে 'তুসাল্লিম' কথাটি এসেছে 'তাসতা'জিনূ' এর পূর্বে। তাই অধিকাংশ আলেম বলেন, প্রথমে করতে হবে সালাম। হজরত কেলাদা ইবনে হাম্বল বলেছেন, আমি একবার বিনা সালামে ও

বিনা অনুমতিতে রসুল স. এর গৃহে গমন করলাম। তিনি স. বললেন, বাইরে যাও এবং বলো— আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? আবু দাউদ, তিরমিজি।

হজরত জাবের বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম বলবে না, তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়ো না। বায়হাকী।

বাগবী লিখেছেন, এক লোক হজরত ইবনে ওমরের গৃহে গমন করে বললেন, আমি কি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি? হজরত ইবনে ওমর বললেন, না। ওই লোকের সঙ্গী বললো, প্রথমে সালাম বলো, তারপর প্রার্থনা করো প্রবেশের অনুমতি। লোকটি তাই করলো। তখন হজরত ইবনে ওমর প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, যদি আগন্তুকের দৃষ্টি গৃহবাসীদের কারো উপরে পড়ে, তবে প্রথমে তাকে লক্ষ্য করে সালাম বলবে, আর কাউকে দেখতে না পেলে প্রথমে চাইবে অনুমতি।

হজরত আবু মুসা ও হজরত হুজায়ফা গৃহাভ্যন্তরের মুহরিম নারীগণের নিকটে গমনকালেও অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অপরিণত সূত্রে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে হাসান বর্ণনা করেন, এক লোক একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি কি আমার জননীর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো তার সঙ্গেই থাকি। রসুল স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো, আমি তো তার সেবক। তিনি স. বললেন, তবুও। তুমি কি তোমার আম্মাকে বিবস্ত্র দেখতে চাও। লোকটি বললো, না। তিনি স. বললেন, তবে তার কাছেও অনুমতি প্রার্থী হয়ো। মালেক।

মাসআলা ঃ যদি সংবাদবাহকের মাধ্যমে কাউকে ডেকে আনা হয় তবে সংবাদবাহক ও তার প্রবেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে ডাকে এবং সে যদি সংবাদবাহকের সঙ্গে চলে আসে, তাহলে ধরতে হবে সে অনুমতিপ্রাপ্ত। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কাউকে ডাকার জন্য সংবাদবাহক প্রেরণ করার অর্থই তাকে অনুমতি প্রদান করা।

'জালিকুম খইরুল্ লাকুম' অর্থ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ মূর্খতার যুগে প্রচলিত বিনা অনুমতিতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করার নিয়ম অপেক্ষা এখনকার এই অনুমতি প্রার্থনার বিধান অনেক উত্তম।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, মূর্খতার যুগের লোকেরা সালামের বদলে বলতো 'আনয়া'মাল্লহু বিকা আইনান্' (আল্লাহ্ তোমার চক্ষু শীতল করুন)। কখনো বলতো 'ইন্‌য়া'ম সাবাহান' (শুভপ্রভাত)। ইসলামের আগমনের পর এই অপপ্রথা তিরোহিত হয়। শুরু হয় সালাম আদান প্রদানের নিয়ম। আবু দাউদ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ২৮

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

❐ যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে তোমাদিগকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ উহাতে প্রবেশ করিবে না; যদি তোমাদিগকে বলা হয় 'ফিরিয়া যাও' তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তা হলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করবে না।' একথার অর্থ গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে অথবা তার বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না। কারণ এতে করে হয়তো সম্মুখীন হতে হবে অসংবৃত অথবা শিথিলবসনা গৃহবাসীদের কারো। আবার হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। এটা নিশ্চয় মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, যা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে কতকগুলো ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজনই নেই। যেমন অগ্নিকাণ্ড, গৃহধস, অথবা গৃহাভ্যন্তরে চুরি, হত্যা কিংবা মদ্যবিক্রয় ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম'। একথার অর্থ— অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে, অযথা দাঁড়িয়ে থাকা বা জেদ করে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাবে না। এরকম করার অর্থ গৃহবাসীকে বিব্রত করা, যা একেবারেই অনুচিত। উল্লেখ্য, প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিনবার। এরপরেও অনুমতি না মিললে বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা আশয়ারী এসে বললেন, খলিফা ওমর লোক মারফত আমাকে ডেকেছিলেন। আমি তাঁর গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম বললাম। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না।

তাই ফিরে এলাম। পরে ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তোমাকে তো আমি ডেকেছিলাম। এলেনা কেনো? বললাম, আমি তো গিয়েছিলাম। তিনবার সালামও বলেছিলাম। কিন্তু কোনো জব্যব না পাওয়াতে ফিরে এসেছি। কেননা রসুল স. বলেছেন, কারো নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে তিন বার। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে। ওমর বললেন, সাক্ষ্য উপস্থিত করো। এখন তো আমাকে সাক্ষ্য উপস্থিত করতেই হবে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি তখন আবু মুসা আশয়ারীর সঙ্গে ওমরের নিকটে গেলাম এবং এব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করলাম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে সুপরিণত সূত্রসহযোগে বর্ণিত হয়েছে, কারো গৃহে প্রবেশের আগে তিনবার বলতে হবে আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এরপর অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, নতুবা ফিরে আসতে হবে। ইবনে মাজা।

বাগবী লিখেছেন, এই হাদিসটি আবার বাশার ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে।

হাসান বলেছেন, প্রথমে প্রদান করবে আগমনের সংবাদ। পরে করবে সালাম ও অনুমতি প্রার্থনা। সালাম ও অনুমতির পর প্রার্থনা করতে হবে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. হজরত সা'দ ইবনে উবাদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলেন। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে চাইলেন প্রবেশের অনুমতি। বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। ভিতর থেকে হজরত সা'দ সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু রসুল স. তা শুনতে পেলেন না। এভাবে মোট তিন বার সালাম দিলেন রসুল স.। তিনবারই ভিতর থেকে জবাব এলো। কিন্তু রসুল স. কোনোবারই তা শুনতে পেলেন না। তাই ফিরে এলেন। একটু পরেই পিছনে পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে এলেন হজরত সা'দ। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান। আমি তো আপনার প্রতিটি সালামের জবাব দিয়েছি। আমি অপেক্ষায় ছিলাম আপনার পক্ষ হতে আমার প্রতি আরো অধিক সালাম বর্ষিত হোক। তাই আমি জবাব দিয়েছি নিম্নকণ্ঠে। রসুল স. থামলেন। গমন করলেন হজরত সা'দের গৃহে। হজরত সা'দ উপস্থিত করলেন কিসমিস। রসুল স. তা থেকে কিছু খেলেন। তারপর বললেন, তোমার আহার্য ভক্ষণ করেছে পুণ্যবানেরা। আর রহমত বর্ষণের দোয়া করেছে ফেরেশতারা। আর রোজাদারেরা তোমার সামনেই ভঙ্গ করেছে তাদের রোজা। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ'য়।

মাসআলা ঃ যদি কেউ কারো বসতবাটির সামনে যেয়ে প্রবেশের অনুমতি না চেয়ে গৃহকর্তার বাহিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তা সিদ্ধ। হজরত

ইবনে আব্বাস জনৈক আনসারী সাহাবীর নিকট থেকে হাদিস শ্রবণের আশায় তাঁর গৃহের সামনে বসে থাকতেন। অপেক্ষা করতেন তাঁর বহিরাগমনের। প্রবেশের অনুমতি চাইতেন না। ওই সাহাবী বলতেন, হে রসুলের পিতৃব্যপুত্র! আপনি আমাকে ডাকলেই তো পারতেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলতেন, আমাকে এভাবেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশিত আলোচ্য আয়াতই একথার প্রমাণ।

মাসআলা ঃ কারো গৃহদ্বারে গিয়ে কেউ যদি প্রবেশের অনুমতি চায়, আর যদি সে দরজায় পর্দা না থাকে, তবে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ানো যাবে না এবং উঁকি মারা যাবে না কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বাশার বর্ণনা করেন, রসুল স. কারো গৃহের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতেন না। দাঁড়াতেন ডান অথবা বাম চৌকাঠের কাছে। তিনবার বলতেন, আস্সালামু আলাইকুম। ওই সময় অবশ্য বেশীরভাগ গৃহের দরজায় পর্দা থাকতো না। আবু দাউদ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, একবার এক লোক রসুল স. এর গৃহের পর্দা উত্তোলন করে রসুল স.কে দেখলো। ওই সময় রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি ছুঁচালো লৌহদণ্ড। তিনি স. পরে লোকটির কথা জানতে পেরে বললেন, আমি টের পেলে তখনই এটা দিয়ে তার চোখে গুঁতো দিতাম। অনুমতি প্রার্থনা তো করতে হবে পর্দার বাইরে থেকে (পর্দা উত্তোলন করে নয়)। বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বিনা অনুমতিতে কেউ তোমাদেরকে পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলে তোমরা যদি তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারো, আর তাতে করে যদি তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ভালো করেই একথা জানেন যে, তাঁর নির্দেশিত বিধান তোমরা সঠিকভাবে প্রতিপালন করো কি না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে হাব্বান বলেছেন, যখন গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে মক্কা মদীনা ও সিরিয়ায় গমনাগমনকারী কুরায়েশ ব্যবসায়ীদের কী হবে, যারা পথিপার্শ্বের বিভিন্ন খালি গৃহে অবস্থান করে। সেগুলোতে গৃহকর্তা বলে তো কেউ থাকেই না। তারা সালাম দিবে কাকে, অনুমতিই বা চাইবে কার কাছ থেকে? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

❐ যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য উপকার থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোনও পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কোন কোন গৃহে উপকৃত হওয়ার নিমিত্তে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন কাতাদা বলেছেন, ওই গৃহগুলো হচ্ছে পান্থশালা, যেগুলো প্রস্তুত করা হয় পথিকদের বিশ্রামগ্রহণ ও মালামাল রক্ষণের জন্য। পান্থশালা ও এধরনের অন্যান্য বিশ্রামাগারগুলোকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'যে গৃহে কেউ বাস করে না'। আর 'উপকার থাকলে' বলে বুঝানো হয়েছে অবস্থান গ্রহণ ও শ্রান্তি নিবারণের কথা, অত্যধিক শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার কথা।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বাণিজ্যিক কুটির, গুদাম ঘর ও বাজারের দোকানগুলোর কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়াই হচ্ছে এখানে উপকার।

ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, বাজারের দোকানগুলোতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিস্প্রয়োজন। ইবনে সিরীন বাজারের কোনো দোকানে গেলে বলতেন, আস্সালামো আলাইকুম, প্রবেশ করবো? এরপর জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রবেশ করতেন দোকানে। আতা বলেন, জনশূন্য জীর্ণশীর্ণ গৃহ বা পোড়োবাড়ীই আলোচ্য আয়াতে কথিত 'যে গৃহে কেউ বাস করে না' কথাটির উদ্দেশ্য। আর সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোই হচ্ছে উপকার।

কেউ কেউ বলেছেন, যে গৃহে জনমানবের উপস্থিতি নেই, সে গৃহের কথাই বলা হয়েছে এখানে। এ ধরনের গৃহে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে অনুমতি গ্রহণের বিধান। সুতরাং মানুষই যেখানে নেই, সেখানে আর অনুমতির প্রয়োজনই বা কী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো'। এই সতর্কীকরণমূলক বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই সকল নির্লজ্জ ও দুর্বৃত্তদের জন্য, যারা মানুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখার জন্য অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

❒ বিশ্বাসীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিন যে, তারা যেনো তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। হাসান বসরী কর্তৃক একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র অভিশাপ ওই সকল পুরুষের প্রতি যারা দৃষ্টিপাত করে নিষিদ্ধ নারীদের প্রতি এবং ওই সকল নারীদের প্রতিও যারা দেখা দেয়। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

এখানে 'ইয়াগুদ্দু' (সংযত করে) কথাটি নির্দেশসূচক। এখানে 'লাম' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। আর 'মিন আবসর' এর 'মিন' এখানে আখফাশের মতানুযায়ী অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। তিনি বলেন, হ্যাঁ বাচক বাক্যে 'মিন' এর অতিরিক্ত ব্যবহার সিদ্ধ। আর সিবওয়াইহ্ এর মতে এখানকার 'মিন' তাব্‌ঈ'জীয়া (আংশিক অর্থ প্রকাশক)। কেননা এখানে বিশ্বাসীদেরকে এমতো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কাউকেই দেখতে পারবে না। বলা হয়েছে দেখা যাবে না কেবল তাদেরকে যাদেরকে দেখা নিষেধ। অবশ্য অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ নয়। এতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পরের দৃষ্টিপাত অবশ্যই পাপ। হজরত বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার হজরত আলীকে আজ্ঞা করলেন, আলী! প্রথমবার হঠাৎ কোনো নিষিদ্ধ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত কোরো না। প্রথম দৃষ্টি জায়েয। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়েয। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, দারেমী।

হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে নরনারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে কী করবো সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো। মুসলিম।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণেই দৃষ্টিকে সংযত করে, আল্লাহ্ তার ইবাদতকে করেন আস্বাদপূর্ণ। আহমদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবগত'। একথার অর্থ— দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা অত্যুত্তম কর্ম। আর আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কারা এরকম করে এবং কারা করে না। তিনি যে সর্বজ্ঞ। এখানে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ আপন স্ত্রী এবং বৈধ দাসী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত না হওয়া।

আবুল আলীয়া বলেন, অন্যান্য আয়াতে লজ্জাস্থানের হেফাজত করার অর্থ ব্যভিচার থেকে মুক্ত থাকা। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ লজ্জাস্থান আবৃত রাখা, পর্দা করা। বাহাজ ইবনে হাকিমের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা অবশ্যই নিজ পত্নী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য নারীদের নিকট থেকে লজ্জাস্থানকে আবৃত রাখবে। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল। একাকী থাকলে কী হুকুম? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা বড় হকদার, তাকেই লজ্জা করতে হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা নগ্নতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কোরো। তোমাদের সঙ্গে সর্বাবস্থায় এমন সত্তা বিদ্যমান যিনি তোমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্ত্রী সম্ভোগের সময় ছাড়া অন্য সময় বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তোমরা তাঁকে লজ্জা করো ও সম্মান জানাও ।

মুকাতিল সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার হজরত আসমা বিনতে মুরসাদ তাঁর খেজুর বাগানে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো কয়েকজন শিথিলবসনা রমণী। তাদের বক্ষদেশ ও কেশ ছিলো অনাবৃত। পরনে তাদের ইজারও ছিলো না। তাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো তাদের পায়ের আভরণ। হজরত আসমা তাদের এমতো অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, হায়! একি বীভৎস অবস্থা। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩১

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

❑ বিশ্বাসী নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের যৌন অংগের হিফাজত করে; তাহাদের যাহা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যাহারা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা-রহিত পুরষ এবং নারীদিগের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহারা আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসী নারীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! আপনি রমণীদেরকেও একথা জানিয়ে দিন যে, তারা যেনো পরপুরুষ দর্শন থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত রাখে এবং সুসংরক্ষিত রাখে তাদের লজ্জাস্থানকে। একথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রমণীদের জন্য পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণতই নাজায়েয। ইমাম শাফেয়ী একথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে রমণীরা পুরুষের ওই অঙ্গসমূহ দেখতে পারে, যা দেখতে পারে অন্য পুরুষ। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের পরিপোষকরূপে উপস্থাপন করেন একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একবার রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর দু'জন সহধর্মিণী হজরত উম্মে সালমা ও হজরত মায়মুনা। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। রসুল স. বললেন, তোমরা দু'জন আড়ালে চলে যাও। হজরত উম্মে সালমা বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! উনিতো দৃষ্টিহীন। তিনি স. বললেন, তোমরাও দৃষ্টিহীন? আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি।

ইমাম আবু হানিফা দলিল গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি এই— বিদায় হজের বৎসর খাছয়া'ম গোত্রের এক রমণী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতার উপরে হজ ফরজ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। কোনো বাহনে আরোহী হওয়ার সামর্থ্যও তার নেই। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ করি তবে কি তার হজ আদায় হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, ওই সময় রসুল স. এর সঙ্গে এক বাহনে আরোহণ করেছিলো ফজল। সে ওই রমণীর প্রতি তাকিয়েছিলো। রমণীটিও তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। রসুল স. ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বোখারী। হজরত আলী থেকে এই হাদিসটি আবার বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাগুলো— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রসুল স. তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন অন্য দিকে। বললেন, আমি এক যুবক ও এক যুবতীকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখছি। আমার আশংকা হয় তাদের উপরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করবে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে কাত্তান অভিমত প্রকাশ করেন, ফেৎনার আশংকা না থাকলে নারীরা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। কেননা রসুল স. তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই রমণীকে কিছু বলেননি। আর হজরত ইবনে আব্বাস যা বুঝেছিলেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। আর তার ধারণা সঠিক না হলে রসুল স. নিশ্চয়ই তাঁকে সাবধান করে দিতেন। অপর এক হাদিসে এসেছে, হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, যখন তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন, তখন রসুল স. তাঁকে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করতে বলেছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমের গৃহে। এ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুরক্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে নারীরা পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারে।

মাসআলা ঃ মহিলারা মহিলাদের এবং পুরুষেরা পুরুষদের নাভি থেকে উরুদেশ দেখতে পারবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের সতর (লজ্জা স্থান) দেখতে পারবে না এবং পুরুষ পুরুষের সঙ্গে ও নারী নারীর সঙ্গে বিবস্ত্র অবস্থায় এক বস্ত্রের নিচে শয়ন করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে, তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রকাশ না করে'। এখানে 'যীনাত' অর্থ সৌন্দর্য, আভরণ। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে যীনাত' অর্থ সৃষ্টিগত সৌন্দর্য।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের পাঞ্জা 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কবজি পর্যন্ত দুই হাত আবরণীয় (সতর) নয়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' (মা জাহারা) অর্থ মুখাবয়ব ও উভয় হাতের তালু ও পিঠ। জননী আয়েশা থেকে আতাও এরকম বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় মুখ ও হাতের পাঞ্জার সঙ্গে দুই পা-কেও অনাবরণীয় অঙ্গ বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, কেবল মুখমণ্ডল অনাবরণীয়। অবশ্য মুখমণ্ডল যে আবরণীয় নয়, সে ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয় একমত। তবে এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের নিকট কবজি পর্যন্ত দুই হাতও অনাবরণীয়। 'কাজীখান' গ্রন্থে রয়েছে মেয়েদের উভয় হাতের তালু ও পিঠ আবরণীয় অঙ্গ নয়। অপর এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে, হাতের তালু আবরণীয় নয়, কিন্তু তার পৃষ্ঠদেশ আবরণীয়। ইবনে হুম্মামও এরকম বলেছেন। উভয় পায়ের পাতাও আবরণীয় অঙ্গ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মত এর বিপরীত।

জননী উম্মে সালমা বলেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোনো স্ত্রী লোক যদি ইজার না পরে কেবল কামিজ ও ওড়না পরে নামাজ পড়ে, তবে কি তার নামাজ হবে? তিনি স. বললেন, এতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু কামিজ হতে হবে এমন লম্বা যাতে করে দুই পা আবৃত থাকে। আবু দাউদ, হাকেম। শায়েখ আবদুল হক হাদিসটির সূত্রপরম্পরাকে ত্রুটি মুক্ত মনে করেন না। কেননা ইমাম মালেক প্রমুখ এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন পরিণত সূত্রে। সুতরাং বর্ণনাটি পরিণত শ্রেণীর, সুপরিণত শ্রেণীর নয়। ইবনে জাওজী বলেছেন, একে সুপরিণত শ্রেণীভূত করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা ইয়াহ্ইয়া এর সূত্রপরম্পরাভূত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহকে দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। আবু হাতেম রাজী বলেছেন, তার বর্ণনা প্রামাণ্য নয়।

পায়ের উপরি অংশ যে আবরণীয় তার প্রমাণ রয়েছে অন্য এক আয়াতে। যেমন— 'পদযুগল এমনভাবে সঞ্চালন করবে যেনো গোপন থাকে পায়ের অলংকার'। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, পায়ের অলংকার আবরণীয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার উপরের অংশও আবরণীয়।

বায়যাবী লিখেছেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে অঙ্গ আবরণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্ক কেবল নামাজের সঙ্গে, সার্বক্ষণিক পর্দার সঙ্গে নয়। স্বাধীনা

নারীর জন্য সমস্ত শরীরই আবরণীয়। তাই স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে তারা শরীরের কোনো অংশ দেখাতে পারবে না। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কথা স্বতন্ত্র। যেমন— চিকিৎসা, সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি। হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে মুখমণ্ডলকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। আর এই বিধান কেবল নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, পুরুষ বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন 'তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে'। অর্থাৎ এই নির্দেশনার মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের তালু ও তার পৃষ্ঠদেশকে আবরণীয় অঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়েছে। তাছাড়া মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা সুকঠিন। তাই প্রয়োজন বশতঃ এ দু'টো অঙ্গ অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। তবে প্রবৃত্তির তাড়না ও পদস্খলনের ভয় যদি থাকে, তবে নিরুপায় হয়ে মুখমণ্ডলকেও আবৃত করে নিতে হবে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম করা সম্ভবই নয়। যেমন সাক্ষ্য প্রদান করা, বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এরকম। আর এই আয়াতই তাঁর অভিমতের প্রমাণ। পরিণত সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার মুখমণ্ডল এবং কবজি পর্যন্ত হাতের তালু ছাড়া অন্য কিছু দেখা জায়েয নয়। আমি আরো বলি, অতি বৃদ্ধের সম্মুখে মেয়েদের আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করা জায়েয। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কোরআন মজীদের প্রত্যয়নও এমতের পূর্ণ অনুকূল। কেননা এমতোক্ষেত্রে ফেৎনার কোনো আশংকা নেই। এভাবে অতি দুর্বল পুরুষের সামনেও আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন সিদ্ধ। তবে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি নিক্ষেপ নাজায়েয, যদি সামান্যতম ফেৎনার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। হেদায়া রচয়িতা এরকমই বলেছেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, বেগানা রমণী ও শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে তাকানো নাজায়েয, যদি কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার আশংকা থাকে। এমতো আশংকা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নারীও তার চেহারা বেগানা পুরুষকে দেখাতে পারবে না। কারণ এতে রয়েছে ফেৎনার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং অতি বৃদ্ধ ও অতি বৃদ্ধা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান অবশ্যপালনীয়। তাই আমরা বলি, স্বাধীনা রমণী তার স্বামী ও মুহরিম পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ প্রদর্শন করতে পারবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে, মুখমণ্ডলই সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। তাই অনাবশ্যকভাবে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার মধ্যেও রয়েছে ফেৎনার বিষাক্ত বীজ।

রসুল স. বলেছেন, নারীর আপাদমস্তক আবরণযোগ্য। তারা যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তাদের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। হজরত ইবনে মাসউদ

থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর আপাদমস্তকের আবৃতায়ন ওয়াজিব। কেবল নিতান্ত প্রয়োজন পূরণ এ হুকুম থেকে পৃথক। উম্মতের ঐকমত্য এটাই। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার মতো কেউ না থাকলে মেয়েরা পর্দাবৃত হয়ে বাজারে যেতে পারবে। এক চোখ খোলা রাখবে। আপাদমস্তক আবৃত করার মতো কাপড় না থাকলে যে কাপড়েই হোক আবৃত করতে হবে সারা শরীর। এভাবে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বিচারকের নিকট গমনও সিদ্ধ।

আমরা 'যীনাত' বা আভরণ কথাটির অর্থ করেছি দু'রকমের। ১. কাপড় চোপড়, অলংকার ও সাজসজ্জা এবং অন্যান্য উপকরণ। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন যীনাত অর্থ বস্ত্রবৈভব। এক আয়াতে শব্দটির এরকম অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন— 'খুজু যীনাতাকুম ইন্‌দা কুল্‌লি মাসজিদ' (প্রত্যেক নামাজের সময় আভরণ গ্রহণ কোরো)। এখানে যীনাত অর্থ বস্ত্র এবং মাস্‌জিদ অর্থ নামাজ। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কাপড় চোপড়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করতেই নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য যে কাপড় দ্বারা পর্দা করা হয়, সেই কাপড় কথিত 'যীনাত' বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, বস্ত্রবৈভব প্রদর্শন করাই যখন নিষিদ্ধ তখন অঙ্গ প্রদর্শন তো আরো বেশী নিষিদ্ধ।

আর যদি 'যীনাত' অর্থ এখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে মুখমণ্ডল ও হাত অনাবৃত রাখা জায়েয করা হয়েছে তখন, যখন সমাধা করতে হয় জরুরী কোনো সাংসারিক কাজ, চিকিৎসা, সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি। আর এই অনাবৃততা কেবল নামাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এ বিধান সকল সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে'। উল্লেখ্য, এ ধরনের নির্দেশ রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন, তারা যেনো চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়'। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আবু উবায়দা বলেন, মুসলিম রমণীকুল যেনো মাথা ও চেহারা চাদর দ্বারা আবৃত করে নেয়, যাতে করে বুঝা যায় যে, তারা স্বাধীনা। খোলা রাখবে কেবল এক চোখের দৃষ্টিপাতের জায়গা। এখন আলোচনা করা যেতে পারে খাছয়াম গোত্রীয় ওই রমণীর প্রসঙ্গ, যিনি রসুল স.কে তাঁর বৃদ্ধ পিতার বদলী হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন হজরত ফজল ইবনে আব্বাস। এই ঘটনার দ্বারা অবশ্য মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখার বৈধতাকে প্রমাণ করা যায় না। কারণ ওই রমণী তখন রসুল স.কে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এমন অবস্থায়

সাধারণতঃ মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকাই স্বাভাবিক। আর ওই ঘটনায় রসুল স. কর্তৃক হজরত ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া একথাই প্রমাণ করে যে, গায়ের মুহ্‌রিম রমণীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নাজায়েয।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য কেবল স্বাধীনা রমণীদের জন্য। আর মুকাতিব, মুদাব্‌বির, উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদি প্রকারের সকল ক্রীতদাসীর জন্য বিধান হচ্ছে, তারা তাদের মাথা, মুখমণ্ডল, হাতের পাঞ্জা ও পা অনাবৃত রাখতে পারবে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, ক্রীতদাসীদেরকেও পুরুষের মতো নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত আবৃত রাখা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ক্রীতদাসীদের জন্যও পিঠ ও পেট আবৃত রাখা ওয়াজিব। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, ক্রীতদাসীদের বিধানও স্বাধীনা রমণীদের মতো। ক্রীতদাসীদের মাথা, পা ও হাতের পাঞ্জা কেবল অবশ্য আবরণীয় অঙ্গ নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. যখন হজরত সাফিয়্যাকে গ্রহণ করলেন তখন সাহাবীগণ বলাবলি শুরু করলেন, যদি রসুল স. তাঁকে পর্দা করান তবে বুঝতে হবে তিনি তাঁর সহধর্মিণী। আর যদি তা না করান তবে বুঝতে হবে, তিনি উম্মে ওয়ালাদ (ক্রীতদাসী বিশেষ)। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীর বিধান পৃথক। হজরত আনাস বলেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে বাইরে বের হলো। রসুল স. ছড়ি নিয়ে তার সামনে গিয়ে বললেন, হতভাগিনী! স্বাধীনাদের মতো কষ্টদায়ক আমলকে গ্রহণ করেছো কেনো?

এছাড়া 'হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও অন্যান্য মুসলমানের স্ত্রীগণকে জানিয়ে দিন..........' এই আয়াতের শেষাংশও একথা প্রমাণ করে যে, স্বাধীনা ও ক্রীতদাসীদের পর্দার বিধান পৃথক। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ক্রীতদাসীদের মাথা, হাত ও পা অনাবৃত রাখার বিধানও অন্তর্নিহিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' কথাটির মধ্যে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের বিধান স্বাধীনা-ক্রীতদাসী সকলের জন্য। উল্লেখ্য, ক্রীতদাসীকে ঘরে-বাইরে তার প্রভুর খেদমত করতে হয় বিভিন্নভাবে। তাই তার বস্ত্র হ্রস্ব হওয়াই স্বাভাবিক। সেকারণে ক্রীতদাসীর মাথা, মুখমণ্ডল, হাত ও পা-কে অবশ্যআবরণীয় সাব্যস্ত করা হয়নি।

'ওয়াল ইয়াদ্বরিবনা' অর্থ যেনো কাপড় দ্বারা বা ওড়না দ্বারা আবৃত করে। যেমন 'দ্বারাবাল ইয়াদাহু আ'লাল হায়িতি' অর্থ দেয়ালে হাত রেখেছে। বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেন, মুহাজির রমণীগণের উপরে যখন আল্লাহ্‌তায়ালা 'তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে' অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা তাদের চাদর চিরে বানিয়ে নিলো ওড়না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে'।

স্বামীই স্ত্রীর সর্বাঙ্গ দেখার একমাত্র অধিকারী। স্ত্রী তার সকল সৌন্দর্য দেখাতে পারে কেবল স্বামীকেই। এমনকি লজ্জাস্থানকেও। কিন্তু লজ্জাস্থান দেখা মাকরূহ্। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সহবাসের সময়েও পর্দা করে নিয়ো। গর্দভের মতো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ো না। শাফেয়ী, তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, তিনি হজরত উত্বা ইবনে আম্বর থেকে, নাসাঈ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজাস থেকে এবং তিবরানী হজরত আবু উমামা থেকে। জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি কখনো রসুল স. এর লজ্জাস্থান দর্শন করিনি।

নারীরা তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে আরো কতিপয় পুরুষের সামনে। যেমন— পিতা, পিতামহ, মাতামহ, অর্থাৎ পিতা ও মাতার সকল উর্ধ্বতন পুরুষ।

শশুরের সামনেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করাতে কোনো বাধা নেই। তেমনি বাধা নেই শশুরের পিতা, শশুরের ভ্রাতা, তাদের ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে, স্বামীর পুত্রগণ। অর্থাৎ স্বামীর জন্মজাত সূত্রের একই বিধান। এভাবে ভ্রাতাগণ, অর্থাৎ আপন ভাই, সৎ ভাই, আখইয়াবি ভাই (যাদের পিতা ভিন্ন কিন্তু মাতা এক), ভাতিজার পুত্র, ভাতিজির পুত্র— এদের সামনেও পর্দার প্রয়োজন নেই। এভাবে ভ্রাতার সকল শাখার বিধান একই রকম। এরকম আরো যাদের সঙ্গে পর্দা নেই, তারা হচ্ছে ভগ্নির পুত্র, ভগ্নির পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র। এ সকল নিকটজন নারীদের কাছে যাতায়াত করা স্বাভাবিক। আর এদের মাধ্যমে কোনো ফেৎনা সংঘটনের অবকাশ নেই। তাই আল্লাহ্পাক এদের সামনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশকে বৈধ করে দিয়েছেন। আর এসকল পুরুষের জন্যও বৈধ করে দিয়েছেন যে, তারা এসকল নারীর ওই সকল অঙ্গ দেখতে পারবে যেগুলো খেদমতের সময় সাধারণতঃ খোলা থাকে। অর্থাৎ তারা দেখতে পারবে এ সকল নারীর মাথা, হাঁটুর নিম্নাংশ, বাহু ও বুক। পেট ও পিঠ দেখা এদের জন্যও জায়েয নয়। আরো জায়েয নয় নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। এসকল অঙ্গ কাজের সময়েও সাধারণতঃ আবৃত থাকে। আর এ সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা কষ্টদায়ক কিছুও নয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের ক্ষেত্রেই রয়েছে পর্দার এই শিথিলতা। এ নিষিদ্ধতা যেমন বংশীয় সূত্রে, তেমন দুধ পান সম্পর্কীয় সূত্রেও। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে পিতার ভাইয়ের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে অকাট্য দলিলের মাধ্যমে তারা এবং ভাতিজা-ভাগিনারাও এই বিধানের

অন্তর্ভুক্ত। এব্যাপারে আলেমগণ একমত। কেননা ফুফু যদি তার আভরণ ভাইয়ের ছেলের সামনে প্রকাশ করতে পারে, তবে ভাতিজির জন্যও চাচার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয। উভয় সম্পর্ক সমতুল। অনুরূপ খালা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তার বোনের ছেলের সামনে এবং ভাগ্নিও তার মামার সামনে।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, চাচা ও মামার কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ না করে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এমতোক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। সম্ভবতঃ এরা ভাতিজি বা ভাগ্নির রূপ সৌন্দর্যের কথা বলতে পারে তাদের আপনাপন পুত্রকে, যার ফলে উন্মেষ ঘটতে পারে পরোক্ষ কোনো ফেৎনার।

মাসআলা ঃ মুহরিম নারীদের যে সকল অঙ্গ দর্শন জায়েয, ওই সকল অঙ্গ হাত দ্বারা স্পর্শ করাও জায়েয। চলা ফিরা বা ভ্রমণে অনেক সময় এরকম হয়েও থাকে। কারণ চিরতরে বিবাহ হারাম হওয়ায় ফেৎনার আশংকা এসকল ক্ষেত্রে নেই। তবে এমতোক্ষেত্রেও যদি প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকে তবে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। রসুল স. বলেছেন, চোখও ব্যভিচার করে। আর চোখের ব্যভিচার হচ্ছে কামনার দৃষ্টিতে দেখা। এভাবে ব্যভিচার করতে পারে হাত। আর হাতের ব্যভিচার হচ্ছে কামভাবের সঙ্গে স্পর্শ করা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ব্যভিচার করে চোখ, হাত, পা ও লজ্জাস্থান। আহমদ ও তিবরানী সুপরিণত সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। মুহরিম নারীর সঙ্গে ব্যভিচার অত্যন্ত গুরুতর পাপ। সুতরাং এমতোক্ষেত্রে যদি কখনো প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তবে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে দর্শন ও স্পর্শন থেকে।

নারীরা নারীদের সম্মুখে নিজেদেরকে অনাবৃত রাখতে পারবে। সে নারী বিশ্বাসিনী হোক অথবা হোক অবিশ্বাসিনী। স্বাধীনা অথবা ক্রীতদাসী। এভাবে নারীদের সামনে নারীদের নিরাবরণ কামোত্তেজক কোনো অবস্থার সৃষ্টি সাধারণতঃ করে না। তাই এমতোক্ষেত্রে আবরণ অত্যাবশ্যক নয়। তবে নাভি ও উরুদেশ নারীরাও একে অপরের সামনে অনাবৃত করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত মুহরিম নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাতের মতো।

কতিপয় কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'নিসায়িহিন্না' অর্থ মুসলিম রমণীকুল। অর্থাৎ স্বধর্মীয় ভগ্নিবৃন্দ। এই তাফসীর অনুসারে মুসলিম রমণীরা অমুসলিম রমণীর সামনে তাদের আবরণ উন্মোচন করতে পারবে না। তারা মুসলমানদের আপনজন নয়। আর তারা তাদের পুরুষদের সামনে মুসলিম নারীদের গোপন সৌন্দর্যের কথা প্রকাশও করে দিতে পারে।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নারী নারীদের সামনে নগ্ন হবে না। কারণ তারা তাদের আপনাপন পুরুষের সামনে অন্য নারীর গোপন সৌন্দর্যের কথা বলবে। ফলে পুরুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ওই নারীর নগ্নরূপ।

বাগবী লিখেছেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয হজরত উবাইদাহ ইবনেল জাররাহ এর নিকট এইমর্মে ফরমান জারী করেছিলেন যে, মুসলিম নারীদেরকে কিতাবী রমণীদের সঙ্গে এক গোসলখানায় যেতে নিষেধ করে দেয়া হোক।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, 'নিসায়িহিন্না' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে স্বাধীনা রমণীকূলকে। আর 'মালাকাত আইমানুহুন্না' বলে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে, ক্রীতদাসদেরকে নয়। অংশীবাদিনী ক্রীতদাসীদের সামনেও নিরাবরণ হওয়া দূষণীয় নয়। তবে যদি 'মা-মালাকাত' অর্থ আপন ক্রীতদাসী হয়, তা হলে ওই ক্রীতদাসীও মালিকের ক্রীতদাসের সামনে তার আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না। ক্রীতদাসও দেখতে পারবে না তার প্রভুপত্নীর এমন গোপন সৌন্দর্য যা দেখা অন্য পুরুষের জন্য হারাম। ইমাম আবু হানিফা এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম এরকমই বলেছেন। শায়েখ আবু হামেদ শাফেয়ী বলেছেন, আমাদের বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের অভিমত এটাই যে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহরিম নয়। ইমাম নববী লিখেছেন, এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এতে মতোবিরোধের কোনো স্থান নেই। কারণ গোলাম যে তার মালিকপত্নীর মুহরিম হবে তার কোনো দলিলই নেই। তাই 'মা-মালাকাত' অর্থ এখানে বাঁদী। হেদায়া রচয়িতা বলেন, আমাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ এই যে, গোলাম পুরোপুরি পুরুষ নয়, স্বামী নয়, আবার মুহরিমও নয়। এমতোক্ষেত্রে কামনা-বাসনার সম্ভাবনা বিদ্যমান। মুক্ত হলে তারা স্বাধীনা রমণীদেরকে বিয়ে করতেও সক্ষম। সুতরাং গোলামের সামনে মেয়েদেরকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। গোলামেরা করে সাধারণতঃ বহির্বাটির কাজ। আর অন্দরমহলের কাজ করে বাঁদীরা। তাই বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে কেবল বাঁদীর কথা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাসান ও অন্যান্যরা বলেছেন, তোমরা সুরা নূরের 'মা-মালাকাত' কথাটির ভুল অর্থ কোরো না। কথাটি বলা হয়েছে কেবল নারীদের সম্পর্কে, পুরুষদের সম্পর্কে নয়।

অবশ্য এরকম তাফসীর ওই সময় যথার্থরূপে গণ্য হবে যখন 'নিসায়িহিন্না' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে স্বাধীনা রমণী, মুসলিম রমণী নয়। নতুবা 'মা-মালাক্যত আইমানুহুন্না' কথাটি হয়ে পড়বে একটি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফার অভিমতানুসারে মুসলিম রমণীরা স্বাধীনা কাফের রমণীদের সামনে তাদের আভরণ প্রকাশ করতে পারবে না।

ইমাম মালেক বলেন, 'মা-মালাকাত আইমানুহুন্না' কথাটির মধ্যে আপন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রভুপত্নীর নিকটে তার ক্রীতদাস মুহরিম পুরুষদের মতোই। সুতরাং মুহরিম পুরুষের সামনে যে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যায় সে সকল অঙ্গ অনাবৃত রাখা যাবে আপন ক্রীতদাসের সামনেও। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। প্রসিদ্ধ শাফেয়ী মতাবলম্বীরাও এই মতের প্রবক্তা। এরকম বলার কারণ এই যে, গোলাম গৃহকর্মের প্রয়োজনে সাধারণতঃ বিনা অনুমতিতে অন্দরমহলে যাতায়াত করতে পারে।

বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা এবং জননী উম্মে সালমা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার তাঁর প্রিয় আত্মজাকে একটি গোলাম দান করলেন। গোলামটিকে নিয়ে তিনি যখন হজরত ফাতেমার নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন হজরত ফাতেমার পরনে ছিলো একটি খাটো কাপড়, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে নগ্ন হয়ে পড়তো পা, আবার পা ঢেকে নিলে নগ্ন হয়ে পড়তো মস্তক। রসুল স. বিষয়টি অবলোকন করে বললেন, কোনো অসুবিধে নেই। এখানে তো কেবল তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম। আবু দাউদ। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ ওই গোলাম ছিলো অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'গোলাম' এর আর এক অর্থ বালক।

জননী উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মুকাতাব ক্রীতদাসের টাকা উশুল হলে তার সঙ্গে পর্দা রক্ষা করা তোমাদের পত্নীদের জন্য নিতান্তই সমীচীন। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

'যৌন কামনা রহিত পুরুষ' অর্থ অতিবৃদ্ধ। তাদেরকে এখানে 'তাবেয়ীন' বলা হয়েছে একারণে যে, তারা উপার্জনক্ষম নয়। তারা অন্যের উপার্জননির্ভর ও অধীন।

হাসান বলেছেন, এখানকার 'গইরি উলিল ইরবাতি' কথাটির অর্থ যারা নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবগতই নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ খোজা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কথাটির অর্থ অজ্ঞ, উন্মাদ। ইকরামা বলেছেন, নপুংসক। কেউ কেউ বলেছেন, হিজড়া। মুকাতিল বলেছেন অতিবৃদ্ধ, যৌনশক্তিরহিত, শিথিল গোপনাঙ্গবিশিষ্ট।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, খোজা ও শিথিল গোপনাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নারীদের নিকটে সক্ষম পুরুষের মতো। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, কোনো কোনো সময় পুরুষ খোজারাও সহবাস করতে সক্ষম হয়। আর শিথিল যৌনাঙ্গবিশিষ্ট পুরুষদের ঘর্ষণে ও স্পর্শে বীর্যস্খলন হয়ে যেতে পারে। তাই এধরনের লোকও 'কুল্‌লিল মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসরিহিম' এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে,

এধরনের সকল লোককে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'আত্তাবিয়ীনা গয়রি উলিল ইরবাতি'। 'কিফাইয়া' রচয়িতা লিখেছেন, হিজড়া বলে তাকে, যে কুকর্মে লিপ্ত হয়, সে নয় যে অঙ্গশৈথিল্যের কারণে জন্মাবধি যৌন-আগ্রহশূন্য। এধরনের যৌন-আগ্রহশূন্যদেরকে আমাদের মাশায়েখবৃন্দ নারীদের নিকটে গমনাগমনের অনুমতি দিয়েছেন। এরাই 'গইরি উলিল ইরবাতি'।

আমি বলি, প্রকৃতিগতভাবে যে হিজড়া, যার নারীদের মতো যৌনাঙ্গ, স্তন,নারীসুলভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, মেয়েরা তার সামনে তাদের আভরণ উন্মোচন করতে পারবে। কারণ তারা নারীদের বিধানের অন্তর্ভূত। এছাড়া অন্য সকল হিজড়ার প্রতি প্রযোজ্য হবে পুরুষের বিধান। নারীরা তাদের সামনেও পর্দা করবে।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয় পত্নী হজরত উম্মে সালমার ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো এক হিজড়া। সে হজরত উম্মে সালমার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াকে বললো, আবদুল্লাহ্! আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি তোমাদেরকে শোনাবো গাইলানের কন্যার সংবাদ। সে সম্মুখবর্তিনী হলে সাথে আসে চার, আর পশ্চাদ্বর্তিনী হলে সাথে যায় আট। অর্থাৎ সে এমনই দৃষ্টি নন্দিতা যে সম্মুখে অগ্রসরমান হলে উদ্ভিন্ন যৌবনের চারটি ঢেউ জাগে তার দেহে। আর প্রত্যাবর্তনকালে দৃশ্যমান হয় আটটি ঢেউ। দক্ষিণ পঞ্জরে চারটি আর বাম পঞ্জরে চারটি। তার কথা শুনে রসুল স. বললেন, একে আর অন্দর মহলে আসতে দিয়ো না।

কতিপয় আলেম বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হিজড়ারা নারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি দুর্বল। কারণ এখানে দেখা যায়, রসুল স. ওই হিজড়াকে ঘরে আসতে নিষেধ করেছিলেন তার গাইলান কন্যার রূপ-বর্ণনা করার পর। তার আগে তিনি স. তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এভাবে নারীর রূপ বর্ণনার দ্বারা অন্য পুরুষকে প্রলুব্ধ করাই ছিলো তার গৃহাগমন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে ইতোপূর্বের হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে।

'আত্তিফলু' শব্দটি এখানে জাতিবাচক নামপদ। কেননা এর বিশেষণকে এখানে দেয়া হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ। 'লাম ইয়াজহারু' অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক, অথবা যৌনযোগ্যতাহীন বালক। যেমন 'জাহারা আ'লা যাইদিন' অর্থ সে জায়েদের উপরে বিজয়ী হয়েছে, হয়েছে ক্ষমতাধিকারী। অথবা 'লাম ইয়াজহারু' অর্থ তারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে জানেই না, নারীদের আবরণ-নিরাবরণ সম্পর্কীয় জ্ঞানই যাদের নেই।

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ এতো ছোট বালক, যার নিকট নারীজাতির গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ের কোনো পার্থক্য নাই। অর্থাৎ পর্দা কী জিনিস তা সে জানেই না। অবশ্য এখানে প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন অর্থাৎ নারীদের গোপনাঙ্গের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পার্থক্যজ্ঞান যার নাই, তার সামনে নারীরা অনাবৃত হতে পারবে, তবে এমতাবস্থাতেও আবৃত রাখতে হবে নাভি থেকে উরুদেশ পর্যন্ত। 'ইয়াসতা'জিনুকুমুল্ লাজীনা মালাকাত আইমানুকুম ওয়াল্লাজীনা লাম ইয়াবলুগুল হুলুমা মিনকুম ছালাছা মাররাতিন'— এই আয়াতও একথার প্রমাণ। অর্থাৎ ছোটো বালক, অজ্ঞতার দিক থেকে চতুষ্পদ জন্তু, বৃক্ষ ও প্রস্তরের মতো। তাই তার সামনে নারীরা যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গও হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বালক যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তবে তাকেও গণ্য করতে হবে যুবকরূপে। আর তার সঙ্গে পর্দাও পালন করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তারা যেনো তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে'। হাজরামী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এক রমণী পায়ে পরতো দু'টি চাঁদির নূপুর এবং পথ অতিক্রমের সময় করতো সজোরে পদবিক্ষেপ; ফলে শোনা যেতো তার ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ। তার এমতো অপআচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো মহিলা পথ চলার সময় নূপুরের আওয়াজ শোনানোর উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা ফেলে। তাদের বিরত রাখাই আলোচ্য বাক্যের উদ্দেশ্য। তাই বায়যাবী তাঁর আন্নাওয়াযীলে উল্লেখ করেছেন, নারীদের কণ্ঠস্বরও পর্দা। সুতরাং নারীদের নিকট থেকেই তাদের কোরআন শিক্ষা করা উত্তম। একারণেই রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহ্ এবং নারীরা তালি লাগাবে হাতে। বোখারী, মুসলিম।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এজন্যই বলা হয় নারীরা নামাজে সশব্দে কোরআন পড়লে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মনে রাখতে হবে নামাজ পাঠকালে ইমামের ভুল হলে পুরুষেরা বলবে সুবহানাল্লাহ্ এবং নারীরা তালি দিবে হাতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'। একথার মর্মার্থ— তোমরা সকলে তওবা করো। কারণ তোমাদের কারোরই জীবনযাপন ও আমল সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। তাই তওবা করাই সমীচীন। এটাই সফলতার পথ। এক হাদিসে এসেছে, সকল আদম সন্তান পাপী। উত্তম তারাই, যারা তওবা করে। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা সুরা নূরে তোমাদের জন্য যে সকল নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান

করেছেন, সে সকলের দিকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যাবর্তন করো। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— তোমরা ফিরে এসো তোমাদের মূর্খতার জীবনের সকল গ্লানি থেকে। ইসলামের কারণে সে সকল গ্লানি অপনোদনিত হয়ে গেলেও সে সকল অপস্মৃতির কথা মনে করে মনে মনে লজ্জিত হও এবং এটাই নিজেদের উপরে অত্যাবশ্যক করে নাও যে, তোমরা আর কস্মিনকালেও ওগুলোর দিকে গমন করবে না।

'লায়া'ল্লাকুম তুফ্লিহুন' অর্থ 'যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো'। একথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সফলতার সম্পৃক্তি রয়েছে তওবার সঙ্গে। রসুল স. বলেছেন, আনন্দিত হবে ওই ব্যক্তি, যে তার আমলনামায় পাবে অধিক পরিমাণ ইস্তেগফার।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আপন প্রভুপালয়িতার দিকে ফিরে এসো (তওবা করো)। আমি নিজেও প্রত্যহ একশত বার ইস্তেগফার করি।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহ্র সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও তওবা করি। বোখারী।

আরাবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় আমারও হৃদয় কখনো কখনো অনভ্র হয়। আর আমি প্রত্যহ একশত বার আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করি ও প্রত্যাবর্তনকামী হই। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, আমি গণনা করে দেখলাম, রসুল স. এক বৈঠকে বিরতিহীনভাবে একশত বার বলতেন 'রব্বিগফিরলি ওয়াতুব্ আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রহীম'। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩২

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

❒ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 'আইয়িম', তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরো দেয়া হয়েছে ব্যভিচারপ্রবণতাকে দমন করার জন্য পর্দার নির্দেশ। আর আলোচ্য

আয়াতে দেয়া হয়েছে বিবাহের নির্দেশ, যাতে করে মানব-মানবী বৈধ উপায়ে মেটাতে পারে তাদের স্বাভাবিক যৌন-বৃত্তি। বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং রক্ষা করে ব্যভিচার থেকে।

এখানে 'আনকিহু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে অভিভাবকদেরকে যারা সাধারণতঃ বিবাহকর্ম সম্পাদন করতে সহায়তা করে। বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম, তাদের বিবাহ সম্পাদন করো'। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'আয়ামা'। এর প্রকৃত রূপ 'আইয়িম', যেমন উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্গানুবাদে। এরকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যত্রও। যেমন 'ইয়াতামা' শব্দটির আসল রূপ 'ইয়াতাইম'। উল্লেখ্য, 'আইয়িম' একবচন এবং এর বহুবচন হচ্ছে 'আয়ামা'। এর অর্থ ওই পুরুষ যার স্ত্রী নেই এবং ওই রমণী যার স্বামী নেই। উল্লেখ্য, এখানকার 'সম্পাদন করো' নির্দেশটি অত্যাবশ্যক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরকেও'। উল্লেখ্য, বিবাহের জন্য সৎ হওয়ার শর্তটি আবশ্যিক নয়। অসৎ লোককে বিবাহ দেয়াও মোস্তাহাব। কিন্তু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী যদি সৎ হয়, তবে তাদের ধর্মপরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। তাই বিশেষভাবে এখানে সৎ দাস-দাসীদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশ এসেছে। অবশ্য কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'সলিহীন' (সৎ) বলে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা বিবাহ করার এবং বিবাহের হক আদায় করার যোগ্য।

মাসআলা ঃ যৌনউত্তেজনা যদি অসহ্য হয় এবং অবৈধতার দিকে ধাবিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে বিবাহ অত্যাবশ্যক। 'নেহায়া' রচয়িতা লিখেছেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে বিবাহবদ্ধ হওয়া ফরজ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হারাম কাজে প্রলিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে বিবাহ করা ফরজ। আর হারামের আশংকা বিদ্যমান থাকলে ওয়াজিব। কিন্তু এই ওয়াজিব পালন করা যেতে পারবে তখন, যখন বিবাহের হক আদায় করার যোগ্যতা থাকবে। অর্থাৎ যখন থাকবে স্ত্রীর পরিতৃপ্তি বিধান ও ভরণপোষণের উপযুক্ততা। এ যোগ্যতা না থাকলে বিবাহ করা মাকরূহ্। ইবনে হুম্মাম একথাও লিখেছেন, হক রক্ষার বিষয়টিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মূল হক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে বিবাহ করা হারাম। আর যদি আশংকা নিশ্চিত না হয়, তবে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমা।

'বেদায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌন-উত্তেজনা প্রবল হলে বিবাহ ফরজ। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে তার জন্য 'মোহরে মুয়াজ্জাল' (তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ্য

মোহর) প্রদানের যোগ্যতা ও ভরনপোষণের সামর্থ্যও অত্যাবশ্যক। এ শর্ত দু'টো পরিপূরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি যৌনতাড়িত ব্যক্তি বিবাহ না করে, তবে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহ করা না করার উপরে গোনাহগার হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল নয়, সেক্ষেত্রে দাউদ জাহেরী এবং তাঁর সতীর্থদের মত হচ্ছে এরকম নারী-পুরুষের জন্য বিবাহবন্ধ হওয়া ফরজে আইন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে পুরুষকে জীবনে অন্ততঃ একবার সহবাসক্ষম হতে হবে এবং হতে হবে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন 'ফানকিহূ মা ত্বৃবা লাকুম' (নারীদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় তাকে বিবাহ করো)। হজরত সামুরা বর্ণনা করেন, রসুল স. অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার উকাফ্কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না, বাঁদীও নেই। রসুল স. বললেন, তুমি তো বিত্তবানও। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রসুল স. বললেন, তাহলে তুমি তো দেখছি শয়তানের সহোদর। রসুল স. একথাও বলেছেন, বিবাহ আমার আদর্শ (সুন্নত)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে না, সে মন্দ। আর যে এমতাবস্থায় মারা যাবে, সে অত্যন্ত নিম্নস্তরের মৃত। আহমদ।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সকলকে বিবাহের নির্দেশ দিতেন এবং অবিবাহিত জীবন যাপন থেকে বিরত থাকতে বলতেন। আরো বলতেন, ওই রমণীকে বিবাহ করো, যে তার স্বামীকে ভালোবাসে এবং জননী হয় অধিক সন্তান-সন্ততির। মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্-ভীরুদের তুলনায় আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করবো। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী।

সুরা নিসার তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইন খিফতুম আল্লা তা'দিলূ ফা ওয়াহিদাতান আও মা মালাকাত আইমানুকুম'। এই আয়াতের তাফসীরের সঙ্গে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে এরকম অনেক হাদিস। কোনো কোনো হানাফী আলেম বলেন, বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া, অর্থাৎ সকলের উপরে ওয়াজিব। কিন্তু সকলের জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ কেউ বিবাহ করলেই এই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিবাহের বিধান প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্য হলো কিছু লোকের মাধ্যমে হলেও যেনো মুসলমানদের প্রজন্মপ্রবাহ প্রবহমান থাকে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহ ফরজে আইন (মৌলিক ফরজ) নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। দাউদ জাহেরী ও তাঁর সতীর্থদের অভিমত তাই ঐকমত্যবিরোধী। কোনো কোনো আলেম বিবাহ ওয়াজিব বিল কিফায়া হওয়াকে

প্রমাণ করেন 'ফানকিহু মা ত্বা লাকুম মিনান্ নিসায়ি' আয়াতের মাধ্যমে। অথচ এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে কাকে কাকে এবং একসঙ্গে কতোজনকে বিবাহ করা যাবে তাদের কথা। আরো বলা হয়েছে ক্রীতদাস বিবাহ করতে চাইলে তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়। এখন অবশিষ্ট রইলো বর্ণিত হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, বিবাহ আমার আদর্শ। উল্লেখ্য, হাদিসটি একক বর্ণনায়ন (খবরে ওয়াহিদ)। এ ধরনের হাদিস দ্বারা ফরজ প্রত্যয়িত হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, বিবাহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মোস্তাহাব। তবে সুন্নত-মোস্তাহাব যাই হোক না কেনো, সহবাসক্ষম হওয়া, ভরনপোষণের সামর্থ্য, হক বিনষ্ট হওয়ার অনাশংকা— এগুলো শর্তও প্রতিপালিত হতে হবে। এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি শর্ত পরিপূরিত না হলে বিবাহ হয়ে যাবে মাকরূহ্ অথবা হারাম।

বিবাহ ছিলো রসুল স. এর সার্বক্ষণিক আমল। আর বাচনিক সুন্নত প্রমাণার্থে এই হাদিসটি যথেষ্ট যে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা বিবাহবদ্ধ হও। আর যার আর্থিক সঙ্গতি নেই সে যেনো রোজা রাখে। রোজাই তার কামনা বিনাশক প্রতিষেধক। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

জননী আয়েশা থেকে ইবনে মাজা লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার এ সুন্নত পালন করবে না, সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করবো । সুতরাং যে সক্ষম সে বিবাহ করবে, আর যে সক্ষম নয় সে রাখবে রোজা। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত ঈসা ইবনে মায়মুন অবশ্য বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি রোজা রাখি, রোজা ভঙ্গও করি, আর বিবাহ করি রমণীকে। এগুলোই আমার রীতি। সুতরাং যে আমার রীতির অনুগত নয়, সে আমার নয়।

আইয়ুব সূত্রে তিরমিজি লিখেছেন, আল্লাহ্র বাণীবহনকারীগণের প্রতিপালিত বিশেষ রীতি চারটি— ১. ব্রীড়া ২. সুবাস ৩. মেসওয়াক ৪. বিবাহ্। ইবনে মাজা লিখেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় আল্লাহ্র মিলন লাভ করতে চায় তার উচিত বিবাহবদ্ধ হওয়া।

বিবাহ সম্পর্কীয় বর্ণিত আলোচনার মধ্যেই রয়েছে হানাফীগণের অভিমত। ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট বিবাহ সর্বাবস্থায় মোস্তাহাবের অধিক কিছু নয়। আর মোস্তাহাবও হবে ওই সময় যখন বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি হবে সহবাসক্ষম, ভরণপোষণে সমর্থ এবং হক নষ্ট করার আশংকামুক্ত। এই শর্তসমূহের বিদ্যমানতায় যদিও বিবাহ মোস্তাহাব, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতলিপ্ত

থাকার সংকল্প করলে বিবাহ না করাই বরং উত্তম হবে। আর বর্ণিত তিন শর্তের যে কোনো একটির অনুপস্থিতিতে বিবাহ করা হয়ে যাবে হারাম অথবা মাকরূহে তাহরিমা। হারাম কর্মে সংলিপ্ত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা দেখা দিলে অবশ্য বিবাহের এই মোস্তাহাব বিধানটি হয়ে যায় আরো অধিক শক্তিশালী। এমতাবস্থায় নফল নামাজ, নফল রোজা, নফল হজ এবং নফল জেহাদ অপেক্ষা বিবাহবন্ধ হওয়া উত্তম। ইমাম মালেকের অভিমত এরকমই।

উভয় দলের মতানৈক্যের সারমর্মঃ যে ব্যক্তির হক আদায়ে অক্ষমতার আশংকা রয়েছে, অথবা বিবাহ করার কারণে সম্ভাবনা রয়েছে হারাম কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার, তার জন্য বিবাহবন্ধ হওয়া হারাম অথবা মাকরূহে তাহরিমা। আর যে ব্যক্তির কামোত্তেজনা প্রবল এবং আশংকা হয় যে বিবাহ না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং যার বৈবাহিক হক আদায় করার ক্ষমতাও বিদ্যমান, ইমাম আবু হানিফার মতে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব।

আমি বলি, ব্যভিচার হারাম, আর হারামের বিপরীত হচ্ছে ওয়াজিব। অধিকন্তু মধ্যবর্তী অবস্থায় যদি কামোত্তেজনা না হয়, ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং বিবাহিত জীবনের অধিকার খর্ব হওয়ার আশংকাও না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য বিবাহ যদিও মোস্তাহাব, তবুও ইবাদত বন্দেগী নির্বিঘ্ন রাখার জন্য তার বিবাহ না করাই উত্তম, অথবা উত্তম বিবাহ করা। ইমাম আবু হানিফা বলেন, ইবাদত নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে উত্তম, বিবাহ না করা। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন নবী ইয়াহ্ইয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন নারীসংস্পর্শ থেকে, যদিও তাঁর ছিলো নারীসম্ভোগের ক্ষমতা। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রশংসা করেছেন এভাবে— 'সায়্যিদাঁও ওয়া হাসুরা' (ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ও নারী সঙ্গবিবর্জিত)। ইবনে হুম্মাম বলেন, তাঁর শরিয়তে বিবাহ না করাই ছিলো প্রশংসিত। আর আমাদের শরিয়তে বিবাহবন্ধ হওয়াই প্রশংসনীয়। তাই দেখা যায়, তিনি কোনো রমণীকে বিবাহ করেননি, কিন্তু আমাদের রসুল স. বিবাহ করেছিলেন কয়েকজনকে। সুতরাং বুঝতে হবে, আমাদের জন্য আমাদের রসুলের আদর্শই গ্রহণীয়। বিবাহ বর্জন যদি উত্তম হতো, তবে নিশ্চয় আমাদের রসুল সমগ্রজীবন বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, কতিপয় সাহাবী উম্মত-জননীকে রসুল স. এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, তিনি স. শয়ন করতেন এবং ইবাদতও করতেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, তোমাদের

মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁর মতো হতে পারে? আর এক ঘটনায় এসেছে— একবার জনৈক সাহাবী বললেন, আমি স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবো। আর এক জন বললেন, আমি গোশত ভক্ষণ করবো না। এ রকম আরো একজন বললেন, আমি কখনো শয্যাগ্রহণ করবো না। তাঁদের এমতো আলোচনার সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. তখন লোকজনকে একত্র করে একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর বললেন, আমি শুনতে পেলাম, কিছুসংখ্যক লোক এরকম এরকম বলাবলি করছে। কিন্তু আমিতো নামাজ পড়ি, আবার শয্যাগ্রহণও করি। রোজা রাখি, আবার রোজা পরিত্যাগও করি। আবার আমি বিবাহও তো করি। এগুলো আমার আদর্শ। সুতরাং যে এগুলোকে পরিত্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহ করো। কারণ সর্বোত্তম ও মহাসম্মানিত রসুল বিবাহ করেছেন। তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন অনেক। আর অধিক স্ত্রী রাখা সত্ত্বেও তাঁর কোনো সম্মানহানি হয়নি। এছাড়া ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. অবিবাহিত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আমার মতে প্রকৃত কথা এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করা ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও নিজের ইবাদত ও জিকির আজকারকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারে, তার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। রসুল স., অধিকাংশ নবী, সাহাবী ও পুণ্যবান আলেম এই আদর্শের উপরেই জীবনযাপন করেছেন। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁদের সাধনা ছিলো নিরবচ্ছিন্ন ও সফল। সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। জ্ঞান-গবেষণার দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু যারা সাংসারিক জীবনে এমতো দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারবে না বলে আশংকা করে, সাংসারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা যাদের রয়েছে, তাদের জন্য বিবাহবন্ধ না হওয়াই উত্তম। তবে এই উত্তমতা গ্রাহ্য হবে তখন, যখন তাদের ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা, জিকির-জেহাদে জীবনাতিপাত করা— এ সকল কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্পাক প্রদত্ত শিক্ষা। যেমন তিনি এরশাদ করেন— ১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়। যারা এরকম করবে তারা নিপতিত হবে ক্ষতির মধ্যে। ২. হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রসন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের স্বজনগণ এবং তোমাদের সম্পদ, যা

তোমরা অর্জন করেছো এবং তোমাদের ব্যবসায়, যা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমাদের হয় এবং তোমাদের পছন্দনীয় স্থান, যা তোমাদের আবাসস্থল— এ সকল কিছু যদি আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষায় থাকো, আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশসহ আগমন করবেন। ৩. হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমাদের কিছু স্ত্রী ও সন্তানেরা তোমাদের শত্রু; তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকবে।

একথা সুপ্রমাণিত যে, নফল ইবাদত একটি প্রকাশ্য ইবাদত। আর বিবাহ মৌলিকভাবে একটি জায়েয কাজ, ইবাদত নয়। তাই বিবাহকে ইবাদত বলা যায় না। যদি ইবাদতই হতো, তবে বিবাহ করার জন্য মুসলমান হওয়া হতো একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কারণ মুসলমান হওয়া ছাড়া ইবাদতের যোগ্যতাই অর্জিত হয় না। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যার হিজরত পার্থিব অর্জন অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্য হয়, তার হিজরত ওইগুলোর জন্যই (আল্লাহ্র জন্য নয়)। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ ইবাদতরূপে গণ্য নয়। যদি সেরকম কিছু হতো, তবে রসুল স. বিবাহের জন্য দেশত্যাগকে আল্লাহ্র জন্য হিজরত বলে সাব্যস্ত করতেন।

রসুল স. একথাও বলেছেন যে, পৃথিবীর সামগ্রীর মধ্যে নারী ও সুগন্ধকে আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর নামাজ আমার চোখের প্রশান্তি। নাসাঈ, তিবরানী। হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নারীকে বিবাহ করা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের মতো একটি জাগতিক অনুমোদিত কর্ম। প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিবাহের দ্বারা যে উপকার লাভ হয় এবং দৈহিক ও আত্মিক শুদ্ধি যেহেতু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই বিবাহকে বড় জোর মোস্তাহাব বলা যাবে। নতুবা মৌলিকভাবে বিবাহ অনুমোদিত (মোবাহ) কাজ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী কিছু নয়।

রসুল স. বিবাহবন্ধ হওয়া ও সুরভি ব্যবহারকে নবীগণের সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, এমতো কর্ম হেদায়েতের অন্তর্ভুক্ত। বরং এ হচ্ছে সুন্নতে যায়েদা বা অতিরিক্ত সুন্নত। সুনানে হুদা বা হেদায়েত তো বলে ওই সকল কর্মকে, যা রসুল স. সর্বদা ইবাদত হিসেবে প্রতিপালন করতেন।

একটি সন্দেহঃ বিবাহ আমার সুন্নত। যে এই সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়— এই হাদিস প্রমাণ করে যে, বিবাহ সুন্নতে হুদা।

সন্দেহের নিরসনঃ না, এ হাদিস দ্বারা একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। বিষয়টি আসলে এরকম— যে কাজ রসুল স. স্বয়ং করেছেন এবং পছন্দ করেছেন, সে কাজ থেকে দূরে থাকা এবং তাকে মন্দ মনে করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু মন্দ মনে না করে তা পরিহার কখনোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। হাদিসে 'ইরাজ' দ্বারা উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি। অর্থাৎ বীতশ্রদ্ধ হওয়া, মন্দ মনে করে পরিহার করা। কিন্তু সুন্নতে হুদা পরিত্যাগ করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই বুঝতে হবে বিবাহ সুন্নতে হুদা নয়।

একটি দ্বন্দ্ব ঃ হাদিস শরীফে এসেছে, দুনিয়ার তিনটি বিষয় আমার প্রিয়— খুশবু, আওরত ও নামাজ। আর নামাজ আমার নয়ন-শান্তি। এই হাদিস দ্বারা নামাজও তো পার্থিব বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বন্দ্বায়নের উত্তর ঃ হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসকে যথাসূত্রপরম্পরাগত বলে মেনে নেননি। বলেছেন, যথাসূত্রে আমাদের নিকট তিনটির কথা পৌঁছেনি। বরং সুপরিণত সূত্রে হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের মধ্যে পুণ্যবতী নারী হচ্ছে সর্বোত্তম। এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ জাগতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসে বিবাহের যে সকল নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলো আনুমোদনমূলক অথবা মোস্তাহাব সম্বন্ধীয়, আদেশসূচক নয়।

রইলো উকাফ সম্পর্কিত হাদিস। স্ত্রী ও ক্রীতদাসী কোনোটাই ছিলো না বলে তিনি স. তাকে শয়তানের সহোদর বলেছিলেন। রসুল স. এর এমতো মন্তব্য সম্পৃক্ত ছিলো একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে। হয়তো তাঁর মধ্যে কামোত্তেজনাবশতঃ ব্যভিচারলিপ্ত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিলো। তাই তিনি স. তাঁকে ওরকম করে বলেছিলেন। তাই বুঝতে হবে তাঁর মতো অবস্থা যদি কারো হয়, তবে বিবাহ করা অবশ্যই অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হবে।

বিবাহ যদিও মোবাহ্, ইবাদত নয়, তবুও তা উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হলে পরিণত হয় ইবাদতে। যেমন বিবাহের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি দৃষ্টি সংযত রাখা এবং মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য সম্মিলিত হয় তবে তা হবে ইবাদত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম হওয়া সম্ভব। যেমন পানাহার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য মোবাহ্ কাজও যদি উত্তম উদ্দেশ্যসম্বলিত হয়, অর্থাৎ ইবাদতের শক্তি অর্জন, হালাল রিজিক অনুসন্ধান ইত্যাদি উদ্দেশ্য হলে পানাহার, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য মোবাহ্ কাজও হয়ে যায় সওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ দায়িত্ব পালনের পর হালাল উপার্জন অন্বেষণও ফরজ। তিবরানী ও বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— হালাল জীবিকা অনুসন্ধান সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। প্রজন্মপরম্পরা প্রবহমান রাখা যেমন ফরজে কেফায়া, তেমনি জীবনধারণ পরিমাণ পানাহার ফরজে আইন। কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য হালাল পেশা অবলম্বনও ফরজে কেফায়া। সকল মুসলমান যদি উপার্জনবিমুখ হয়ে পড়ে তবে ধর্মকর্ম সবকিছু হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। তখন সকলেই হয়ে যাবে গোনাহগার। রসুল স. বলেছেন, সৎ ব্যবসায়ীরা মহাবিচারদিবসে থাকবে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। আর ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'র হজরত আনাস থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, পার্থিব প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমগুলো উত্তম নিয়তের কারণে ইবাদতরূপে পরিগণিত হলেও কিন্তু সত্তাগতভাবে এগুলো ইবাদত নয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কেবল আল্লাহ্র স্মরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকা সত্তাগতভাবেই ইবাদত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এমন নৈকট্যে পৌঁছায় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। বোখারী। এই হাদিসে এমন কথা বলা হয়নি যে, আমার বান্দা পানাহার বা বিবাহশাদীর মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে। রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, আমার উপরে এইমর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করি, ব্যবসায়ী হই, বরং প্রত্যাদেশিত হয়েছি আমি আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি বর্ণনা ও সেজদাবনত হওয়ার জন্য। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুরা হুজুরার তাফসীর ব্যপদেশে।

নবী ইয়াহ্ইয়ার অবিবাহিত জীবনযাপন সম্পর্কে একথাও বলা যায় যে, তাঁর শরিয়তে এরকম করাই ছিলো উত্তম। আর আমাদের শরিয়তে যেহেতু বৈরাগ্য অনভিপ্রেত, তাই আমাদের জন্য বিবাহ উত্তমতর। আর রসুল স. যে চারটি বিষয়কে নবীগণের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে বিবাহ একটি। সর্ব হজরত আদম, নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, আইয়ুব, দাউদ, সুলায়মান, জাকারিয়া সকলেই বিবাহ করেছিলেন। আর তাঁরা

সকলেই ছিলেন নবী ইয়াহ্ইয়া অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নবী ইয়াহ্ইয়া সম্ভবতঃ বিবাহ করাকে নিজের জন্য সমীচীন মনে করেননি। হয়তো তাঁর এমতো আশংকা ছিলো যে, এতে করে বিঘ্নিত হবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ। আবার একথা বলাও ঠিক হবে না যে, হজরত ঈসা এবং হজরত ইয়াহ্ইয়ার শরিয়তে বৈরাগ্য ছিলো উত্তম এবং ইসলামী শরিয়তে তা তিরোহিত করা হয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, খৃষ্টানেরা যে বৈরাগ্যকে উত্তম বলে জেনেছে, তা বেদাত। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'ওয়া রহবানিয়া তাব্দাউ'...... (আর বৈরাগ্য তাদের নব আবিষ্কার)। আর হাদিস শরীফে যে বৈরাগ্য পরিত্যাগের নির্দেশনা এসেছে, সে বৈরাগ্য হচ্ছে খৃষ্টীয় বৈরাগ্য। কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণে-ধ্যানে নির্জনতা অবলম্বন, সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করে আল্লাহ্র উপাসনামগ্ন হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের জন্য উত্তম সম্পদ ওই ছাগল যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় এবং তার ধর্মাচরণকে রক্ষা করে ফেৎনা থেকে। সুতরাং বৈরাগ্য অর্থ ওই সকল জায়েয কাজ, যেগুলো পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো সওয়াব নেই। যেমন অবিবাহিত থাকা, শয্যাগ্রহণ না করা, গোশত ভক্ষণ পরিত্যাগ করা ইত্যাদি, যেমন করে থাকে খৃষ্টান পুরোহিতেরা। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন 'কুল মান হাররামা যীনাতাল্লাহিল লাতি আখ্রজা লিইবাদিহী ওয়াত্ত্বয়্যিবাতি মিররিয্ক্বি' (আপনি বলুন, কে নিষিদ্ধ করেছে ওই শোভন বস্ত্র যা আল্লাহ্ উদ্ভাবন করে দিয়েছেন তার বান্দাদের জন্য, আর পবিত্র উপজীবিকা। সুতরাং বুঝতে হবে শরিয়তে এরকম স্বকপোলকল্পিত বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাহাবীগণের প্রশংসায় হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে— তারা রাতে রাহেব (সংসারবিরাগী) দিনে বাহাদুর (বীর)।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূলে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিও তাদের অধীনস্থ বিধবাদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মালিককেও দেয়া হয়েছে তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে বিবাহ দেয়ার অধিকার। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুঝতে হবে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনা, জ্ঞানসম্পন্না ও প্রাপ্তবয়স্কা মুসলিম রমণীর বিবাহ সিদ্ধ নয়। সুরা বাকারার তাফসীরের যথাস্থানে আমি আলেমগণের মতপ্রভেদসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং বাগবীর বক্ষমান ব্যাখ্যা ভুল। কেননা এখানে 'আয়ামা' অর্থ কেবল বিধবা নয়। 'আইয়িম' বলে পত্নী বিবর্জিত

ও পতিবিবর্জিতাদেরকে, অবিবাহিত-অবিবাহিতা,তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্না, মৃত্যুর কারণে বিপত্নীক ও বিধবা— যে কোনো অবস্থায় হোকনা কেনো। শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে প্রাপ্তবয়স্ক-প্রাপ্তবয়স্কা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের ক্ষেত্রে। অতএব 'আয়াম' দ্বারা এখানে শুধু নারী অথবা শুধু বিধবা অর্থ গ্রহণ করার বিষয়টি নির্ভুল নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'বিবাহ সম্পাদন করো' কথাটির অর্থ হবে 'বিবাহে বাধা দিয়ো না'। এভাবে এখানে যেনো এইমর্মে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী যদি তার মালিককে এবং স্বাধীনা রমণী তাদের অভিভাবককে যদি বিবাহ সম্পন্ন করার আবেদন জানায়, তবে মালিক ও অভিভাবকের উপরে তাদের বিবাহ নিষ্পন্ন করা হবে ওয়াজিব। আর এমতো অর্থ ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূলও।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য কেবল এই নির্দেশনাটি দেয়া যে, অভিভাবক বা সহায়তাকারী তাদের অধীনাদের বিবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। এমতো উদ্দেশ্য অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ালা তা'দুলু হুন্না আঁইয়্যানকিহ্না আযওয়াজাহুন্না ইজা তারাদ্বাউ বাইনাহুম বিল মা'রূফ'(আর তোমরা বাধা দিয়োনা তাদেরকে বিয়ে করতে তাদের স্বামী। যখন তারা উভয়ে সম্মত হবে সঙ্গতভাবে)।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের নিকটে যদি এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে, যার ধর্মপরায়নতা ও চরিত্রমাহাত্ম্য তোমাদের প্রিয়, তবে তার সঙ্গে তোমরা তোমাদের বোন, কন্যা অথবা প্রিয়জনদের বিবাহ দিয়ে দিয়ো। এরকম না করলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি।

হজরত ইবনে খাত্তাব ও হজরত আনাস ইবনে মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তওরাত কিতাবে লিখিত রয়েছে, বারো বৎসর বয়সে পদার্পন করার পর কোনো কন্যাকে যদি তার অভিভাবক বিবাহ না দেয়, আর সে কন্যা যদি কোনো পাপকর্ম করে ফেলে, তবে সে অভিভাবক হয়ে যাবে গোনাহ্গার।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ভালো নাম রেখো, গড়ে তুলো চরিত্রবানরূপে, আর বিবাহ দিয়ো যুবক হলে। যুবক হওয়ার পর অবিবাহিত অবস্থায় যদি সে গর্হিতকর্ম করে বসে, তবে তার পাপ পতিত হবে পিতার উপর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— তোমরা অভাব-অনটনকে কখনো বিবাহের অন্তরায়রূপে গণ্য কোরো না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি ভালো করেই জানেন, কে অভাবগ্রস্ত, কে নয়। সুতরাং অভাবগ্রস্তদেরকে আল্লাহ্ই তাঁর আপন অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। অভাব মোচনের ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে তো কেবল তাঁর। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই একমাত্র প্রাচুর্যাধিকারী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্তায়ালাই সকলের এবং সকলকিছুর রিজিকের একমাত্র জিম্মাদার। আর রিজিক তো একটি অনিশ্চিত ও প্রবহমান প্রক্রিয়া। সুতরাং সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হবে কেবল রিজিকদাতার উপর, রিজিকের উপরে নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, 'এখানে অভাবমুক্ত করবেন' কথাটির অর্থ হবে— দান করবেন অল্পে তুষ্ট হওয়ার মন-মানসিকতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— দান করবেন স্বচ্ছলতা, রিজিক তখন হয়ে যাবে দ্বিগুণ, স্বামী ও স্ত্রীর। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আলোচ্য আয়াতে বিবাহকারীর জন্য আল্লাহ্পাক এই প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিয়ে করার পর তিনি তিরোহিত করবেন তাদের অভাব-অনটন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, ওই ব্যক্তির আচরণ বিস্ময়কর, যে বিবাহ না করেই প্রাচুর্যের প্রত্যাশী হয়। অথচ আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন 'তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন'। 'ইঁইয়াকুনূ ফুক্বারাআ ইউগ্নি-হুমুল্লাহু মিন ফাদ্বলিহি'।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, বিবাহ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করবেন। আর তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণকর্তা। তিনি এরশাদ করেছেন তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি ওই লোকের কথা ভেবে আশ্চর্য হই, যে বিবাহ না করেই স্বচ্ছলতাপ্রত্যাশী হয়। অথচ বিবাহের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করো দাম্পত্য জীবনে পদার্পনের পর। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

বায্যার, খতিব ও দারাকুতনী জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। তারাই সম্পদ নিয়ে আসবে (তাদের মাধ্যমেই বিবাহের পর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উন্মুক্ত করে দিবেন ঐশ্বর্যের দুয়ার)। পরিণত সূত্রে আবু দাউদ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'মারাসিল' পুস্তকে।

সা'লাবী, এবং 'মসনাদুল ফিরদাউস' রচয়িতা দায়লামীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে রিজিক অন্বেষণ করো।

আমি বলি, — সম্ভবতঃ এ প্রতিশ্রুতি ওই সকল লোকের জন্য যারা শালীনতা রক্ষার্থে বিয়ে করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরিশুদ্ধতা অর্জন। রিজিকের জন্য তারা নির্ভরশীল হয় একমাত্র আল্লাহ্র উপর।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৩

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا
فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ ۢبَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

❑ যাহাদিগের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান উহাদিগের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে-সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না; তবে কেহ্ যদি তাহাদিগকে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাহাদিগের উপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাহাদিগের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে'। একথার অর্থ— যাদের মোহরানা পরিশোধ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, বিবাহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ইত্যাদির ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষমতা নেই, তারা যেনো রোজা প্রতিপালনের মাধ্যমে কামভাব অবদমনের চেষ্টা করে, জীবনযাপন করে

সংযমের সঙ্গে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর আপন অনুগ্রহে আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন। উল্লেখ্য, স্বল্পাহার ও রোজা কামোত্তেজনানাশক। রসুল স. বলেছেন, যারা বিত্তহীন, তারা যেনো কামতাড়না দমনার্থে রোজা রাখে। রোজা কামতাড়নানাশক।

'ইউগ্নি হুমুল্লহু মিন ফাদ্বলিহী' অর্থ যতক্ষণ আল্লাহ্ তাঁর স্ব-অনুগ্রহে দান করেন বিত্তপ্রাচুর্য। এখানে 'ফদ্বল' অর্থ প্রাচুর্য। আর 'ইউগ্নিহুম' অর্থ— উপজীবিকার প্রাচুর্য।

ইবনে সাকান তাঁর 'মারেফাতুস্ সাহাবা' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবীহ্ এর পিতার উক্তিরূপে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি ছিলাম হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উজ্জার ক্রীতদাস। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে মুকাতাব (অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ) বানিয়ে দিন। তিনি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত হুয়াইতিব একশত দিনার পরিশোধের শর্তে তাঁর ক্রীতদাসকে মুকাতিব বানিয়ে দেন। আর ব্যবসা করার জন্য তাকে দান করেন বিশ দিনার। ওই ক্রীতদাস ওই অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে একশত দিনার পরিশোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যান। মুক্তিলাভের পর তিনি শহীদ হন হুনায়েনের যুদ্ধে।

শুরুতে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে'। এখানে 'চুক্তিতে আবদ্ধ হও' নির্দেশটি অবশ্যপালনীয় অর্থাৎ ওয়াজিব নয়। বরং এই নির্দেশটি অনুমোদনমূলক। অর্থাৎ এরকম করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম করতেই হবে— এমন নয়। হেদায়া প্রণেতাও এরকম লিখেছেন এবং এটাকেই সঠিক বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, আমাদের কোনো কোনো সম্মানিত পূর্বসূরী 'চুক্তিতে আবদ্ধ হও' কথাটির অর্থ করেছেন— এরকম করা জায়েয। কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়। সঠিক অর্থ হচ্ছে— এরকম করা মোস্তাহাব। কেননা জায়েয বললে ক্রীতদাসের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গটি হয়ে যায় নিরর্থক।

এখানে মোবাহ্ বা বৈধতার শর্তের বর্ণনা এসেছে অভ্যাসগতভাবে। নিয়ম হলো মালিক তার ক্রীতদাসকে ওই সময় মুকাতাব বানাবে যখন তার মধ্যে পাওয়া যাবে মুকাতাব হওয়ার যোগ্যতা। এটাকেই আয়াতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'লিখিত চুক্তি করতে চাইলে'।

কোনো কোনো প্রাচীনপন্থি আলেম বলেছেন, এখানে 'কাতিবু' (চুক্তিতে আবদ্ধ হও) নির্দেশটি ওয়াজিব। আতা এবং ওমর ইবনে দীনারের অভিমতও এরকম। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এরকম। কিন্তু এ ওয়াজিবের একটি শর্তও রয়েছে। শর্তটি হচ্ছে, ক্রীতদাস বাজারদর অনুসারে চুক্তিবদ্ধ হবে। অথবা পরিশোধ করতে চাইবে বাজারদর অপেক্ষা অধিক। বাগবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ইবনে সিরীন তাঁর প্রভু হজরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট নিবেদন করলেন, আমাকে মুকাতাব বানিয়ে দিন। হজরত আনাস তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না। তখন ইবনে সিরীন অভিযোগ পেশ করলেন হজরত ওমরের কাছে। হজরত ওমর ছড়ি হাতে হজরত আনাসের কাছে এসে বললেন, একে মুকাতাব বানিয়ে দাও। হজরত আনাস তাই করলেন।

মালিক ও ক্রীতদাস উভয় পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হলে, তাকে বলা হয় মুকাতাব। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও সম্মতি) উভয়টিই প্রয়োজন। ইজাব হবে মনিবের পক্ষ থেকে এবং ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে হবে কবুল।

'মুকাতাবাত' ধরনের দাসমুক্তি সম্পদ প্রদানের শর্ত সাপেক্ষ নয়। তাই এমতোক্ষেত্রে ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে কবুল আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে, সে-ও চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু সে যদি খুবই অল্পবয়স্ক হয়, যে ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞান রাখে না অথবা হয় পাগল, তবে তার কবুলের দ্বারা চুক্তি স্থিরীকৃত হবে না।

মালিক যদি তার ক্রীতদাসকে বলে 'আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ প্রদানের শর্তে মুকাতাব বানিয়ে দিলাম' এবং ক্রীতদাস যদি বলে 'আমি স্বীকার করলাম', তবে ইমাম আবু হানিফার মতে চুক্তি পূর্ণ হয়ে যাবে। মালিকের তখন আর একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, 'যদি তুমি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করো, তবে তুমি মুক্ত'। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদও এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, কেবল বর্ণিত কথাগুলোর দ্বারা মুকাতাবের চুক্তি পূর্ণ হবে না। বরং তাকে বলতে হবে 'আমি তোমাকে কিসতি অনুসারে এতো টাকা প্রদানের শর্তে মুকাতাব করলাম, তুমি যদি এই অর্থ এই নিয়মে পরিশোধ করো, তবে তুমি মুক্ত'। একথাগুলো মুখে না বলে মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে। এরকম বলা হয়েছে 'মিনহাজ' পুস্তকে।

মাসআলা ঃ নির্ধারিত বিনিময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের শর্ত করা হয়, তবুও তা হবে সঠিক। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, কিসতি হওয়া দরকার কমপক্ষে দু'টি। আর কিসতি নির্ধারণও হতে হবে আদায়ের একটি শর্ত। তাৎক্ষণিক আদায়ের কোনো অর্থ নেই। কারণ ক্রীতদাস তাৎক্ষণিকভাবে অর্থই বা পাবে কোথায়?

ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুকাতিবের চুক্তিই বিনিময় চুক্তি, যেমন চুক্তি করা হয় বিক্রয়ের। আর মুকাতিবের বিনিময় হবে মূল্যসদৃশ। মূল্যের মৌখিক স্বীকৃতি ক্রয়ের শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট। ক্রেতার মূল্য আদায়ে সক্ষম হওয়া চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক নয়। একজন অভাবগ্রস্ত লোকও হাজার টাকা সম্পদ ক্রয়ের চুক্তি করতে পারে। এরকম হওয়াও সম্ভব যে, লিখিত চুক্তির সময় ওই ক্রীতদাসকে কেউ জাকাতের সম্পদ প্রদান করতে পারে, অথবা দিতে পারে অন্য কোনোরকম আর্থিক সহায়তা। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারে তার পরিশোধ্য অর্থ। আর একটি কথা এই যে, লিখিত চুক্তি মোতাবেক ক্রীতদাস যদি নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, তবে মালিক তাকে রেখে দিতে পারবে পূর্বাবস্থায়।

মাসআলা ঃ মুকাতাবের চুক্তি হওয়ার পর ক্রীতদাসের উপর মালিকের কোনো আধিপত্য থাকে না। এমতাবস্থায় ক্রীতদাস ফিরে পাবে সর্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়, মেহেনত-মজদুরী ও সফরের অধিকার। অবশ্য তাকে স্বীকার করতে হবে মালিকের অধীনস্থতা। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে মালিকের অধিকারমুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করবে নির্ধারিত অর্থ।

মাসআলা ঃ লিখিত চুক্তি মালিকের জন্য একান্ত আবশ্যক। মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে দাসের ইচ্ছাকে বাতিল করতে পারবে না। চুক্তি লিপিবদ্ধ করার পর অবশ্য দাসের মুক্ত হওয়ার অধিকার অর্জিত হয়। মুক্ত হওয়ার পর যেমন মালিক দাসের মুক্তি বাতিল করতে পারে না, তেমনি বাতিল করতে পারে না তার মুক্ত হওয়ার অধিকারকে। তবে দাস যদি উপার্জন না করে, চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে না পারে, তবে তার উপরে বলপ্রয়োগও করা যাবে না, বরং তার মতামত নিয়েই চুক্তি বাতিল করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এরকমই বলেন। তবে যদি তার নিকট এরকম অর্থ থাকে যাতে করে সে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে পারে, অথচ করে না, তবে তাকে ওই অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে, তবুও চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম মালেক বলেছেন, দাসকে রোজগার করতে বাধ্য করা যাবে, তবু চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এমতাবস্থায় দাসেরও এমতো অধিকার নেই যে, সে নিঃস্ব হওয়ার কারণে চুক্তিকে বাতিল করবে।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যেহেতু পুরোপুরি মুক্ত নয়, তাই লিখিত চুক্তির পরে মালিক ইচ্ছা করলে চুক্তির অর্থ না নিয়েই তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর দাসও নিশ্চয় এতে করে সন্তুষ্ট থাকবে।

মাসআলা ঃ মালিক মুকাতাবকে বিক্রয়ও করতে পারবে। এরকম করলে নতুন মালিক হবে পূর্বতন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবস্থায় দাসকে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে নতুন মালিককে। ইমাম আহমদ এরকম বলেন। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম অভিমতও ছিলো এরকম। আর ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক বলেন, মুকাতাবের স্বীকৃতি না নিয়ে মালিক তাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারবে না। মুকাতাব রাজী হলেই কেবল তার এরকম বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে লিখিত চুক্তি। ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী অভিমতও এরকম।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর মুকাতাব মুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে। মালিক তার এ অধিকার খর্ব করতে পারে না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ তাকে ক্রয় করলে নিঃসন্দেহে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, ক্রয়ের পরের কর্তৃত্ব অবশ্যই ক্রেতার, যেমন কর্তৃত্ব ছিলো ক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হলেও কোনো অবস্থাতেই মুকাতাবের অধিকার খর্ব হতে পারে না।

ইমাম আহমদ তাঁর মতের পরিপোষকতার উপস্থাপন করেন জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে বলা হয়েছে, একদিন রসুল স. সকাশে বারিরাহ্ উপস্থিত হয়ে বললো, আমি মুকাতাব। চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। ওই সময় পর্যন্ত সে চুক্তির কোনো কিসতিই পরিশোধ করেনি। রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করলেন, আয়েশা! একে ক্রয় করে আজাদ করে দাও। দানের বিনিময় পাবে সে, যে তাকে মুক্ত করেছে। আহমদ।

মূল হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— একদিন বারিরাহ্ জননী আয়েশা সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি নয় উকিয়া স্বর্ণ প্রদানের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। প্রতি বছর পরিশোধ করতে হবে এক উকিয়া। আমাকে সাহায্য করুন। জননী বললেন, তোমার মালিক যদি রাজী হয়, তবে আমি এক সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু দানের বিনিময় পাবো আমি। বারিরাহ্ তার মালিককে গিয়ে একথা জানালো। কিন্তু তার মালিক এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বারিরাহ্ পুনরায় এসে জননী আয়েশাকে বললো, আমার মালিক আপনার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, দানের বিনিময় দিতে হবে তাকেই। ঘটনাটি পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কানে। তিনি স. বললেন, কী ব্যাপার বলতো? জননী আয়েশা খুলে বললেন সব কথা। তিনি স. বললেন, তুমি বারিরাহ্কে কিনে মুক্ত করে দাও। দানের বিনিময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরো না। দানের বিনিময় তারই, যে তাকে মুক্ত করবে। হজরত বারিরাহ্ থেকে নাসাঈও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, এই হাদিসে কিন্তু ইমাম আহমদের অভিমতের কোনো প্রমাণ নেই। কেননা ইমামগণের মতানৈক্য ঘটেছে তো মুকাতাবকে তার স্বীকৃতি ছাড়াই বিক্রয় করা না করার বৈধতা প্রসঙ্গে। আর ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, মুকাতাবের সম্মতি ছাড়া তাকে তার মালিক বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু এখানে দেখা যায়, বারিরাহ্ নিজেই বিক্রিত হতে সম্মত। একারণেই বোখারী হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন ভিন্ন একটি অধ্যায়ে, যার শিরোনাম 'বাবে বায়উল মুকাতাবি ইজা রদ্বা'।

মাসআলা ঃ চুক্তির অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরেই কেবল মুকাতাব সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে পারে। আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেন, লিখিত চুক্তির অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকলেও মুকাতাব ক্রীতদাসই থাকবে। আবু দাউদ, হাকেম ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ভিন্নসূত্রে ইবনে মাজা ও নাসাঈ আবার আতার মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— রসুল স. বলেছেন, যে গোলাম একশত উকিয়া পরিশোধের লিখিত চুক্তি করেছে, সে এক উকিয়া বাকি থাকলেও গোলামই থাকবে। নাসাঈ বলেছেন, বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। ইবনে হাজাম বলেছেন, আতা খোরাসানী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের নিকট থেকে কোনো হাদিস শ্রবণ করেননি।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, যে মালিক তার ক্রীতদাসকে একশত উকিয়া পরিশোধের বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছে, তার ওই ক্রীতদাস নব্বই উকিয়া পরিশোধের পর মাত্র দশ উকিয়া বাকি রাখলেও তার ক্রীতদাসই থাকবে।

ইমাম মলেক তাঁর মুয়াত্তায় নাফেয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, পরিশোধ্য অর্থের এক দিরহাম বাকী থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাস ক্রীতদাসই থাকবে। অপর পদ্ধতিতে ইবনে কানেয়' হজরত ইবনে ওমর সূত্রে বর্ণনাটিকে সুপরিণতরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কানেয়' বর্ণনাটির সুপরিণত হওয়াকে করেছেন ত্রুটিযুক্ত।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, বর্ণিত মাসআলা প্রসঙ্গে সাহাবীগণের মধ্যে মতপৃথকতা বিদ্যমান ছিলো। 'কেফায়া' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের উক্তি এ ব্যাপারে আমাদের অভিমতের অনুকূলে। হজরত আলী বলেছেন, মুকাতাব যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে, ওই পরিমাণ স্বাধীনতা লাভ করবে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মুকাতাব যদি বাজারদর অনুসারে

পরিশোধ করে, তবে সে মুক্ত। যদি মালিকের পক্ষ থেকে এর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা থাকে, তবে অন্য ঋণদাতার মতো মালিকও হয়ে যাবে এক প্রকার ঋণদাতা। আর ওই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুকাতাব তখন মুক্ত হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হলেই মুকাতাব মুক্ত হয়ে যায়। তার স্বাধীনতা বিনিময়ের উপরে নির্ভরশীল নয়। তবে মালিক হয়ে যায় তাকে ঋণদাতা, যেমন অন্যান্য ঋণদাতারা হয়। অবশ্য আমরা এব্যাপারে জায়েদ ইবনে সাবেতের উক্তিকেই গ্রহণ করেছি। কারণ এর ভিত্তি সুপরিণতসূত্রসম্বলিত হাদিসের উপরে।

তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা জননী উম্মে সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, মুকাতাবের নিকট যদি তোমাদের কোনো বিনিময় বিদ্যমান থাকে, তবেও ওই মুকাতাবের নিকট তোমাদের পর্দা করা বাঞ্ছনীয়।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কোনো কিসতি পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিচারক চিন্তা করে দেখবে সে কারো কাছে পাওনাদার কিনা, অথবা তার অর্থাগমের অন্য কোনো উপায় আছে কিনা। যদি এরকম কিছু থাকে তবে বিচারক তাকে কিসতি পরিশোধের জন্য তিনদিন সময় দিবে, এর বেশী নয়। আর এরকম কোনো উপায় যদি তার না থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মদের মতে বিচারক লিখিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, মুকাতাবের দুই কিসতি বাকি না পড়া পর্যন্ত বিচারক তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবে না। মালিককে চুক্তি বাতিলের ফয়সালাও দিবে না। মালিকেরও এরকম অধিকার নেই যে, সে নিজে নিজে মুকাতাবকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করবেন। এমতোক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্ত ও মুকাতাবের স্বীকৃতি আবশ্যক।

মাসআলা ঃ মুকাতাব যদি কারো কাছ থেকে জাকাতের সম্পদ লাভ করে এবং ওই সম্পদ তার মালিককে দেয়, কিন্তু এতে করে যদি তার চুক্তির অর্থ পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হয়, এমতাবস্থায় বিচারক যদি তাকে পরিশোধে অক্ষম সাব্যস্ত করে, তবে পরিশোধিত অর্থ মালিকের জন্য হালাল হবে, মালিক সম্পদশালী অথবা হাশেমী হলেও, যদিও হাশেমীদের জন্য কোনো অবস্থায় জাকাতগ্রহণ হালাল নয়। এমতোক্ষেত্রে মুকাতাব অবশ্যই জাকাতগ্রহীতা, কিন্তু মালিক চুক্তির অর্থ গ্রহণকারী— জাকাতগ্রহীতা নয়। কেননা এক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে মালিকানার।

বর্ণিত মাসআলার প্রমাণ রয়েছে জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে। জননী বলেন, একদিন আমাদের গৃহে গোশত পাক হচ্ছিলো। এমন সময় রসুল স. এলেন। আমি তাঁকে খেতে দিলাম রুটি ও সাধারণ তরকারী। তিনি স. বললেন, হাঁড়িতে কি গোশত নেই? গৃহবাসীরা বললেন, অবশ্যই। কিন্তু এ গোশত তো সদকার। আর এগুলো দেয়া হয়েছে বারিরাহ্কে। আপনি তো সদকা ভক্ষণ করেন না। তিনি স. বললেন, সদকা তো বারিরাহ্র জন্য, আর আমার কাছে এগুলো হাদিয়া। বোখারী, মুসলিম। এখন কথা হচ্ছে মুকাতাব যদি তার প্রাপ্ত জাকাতের সম্পদ কোনো সম্পদশালী অথবা হাশেমীকে কেবল ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে তাদের জন্য সে সম্পদ ভোগ করা জায়েয হবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি বাতিল চুক্তির ভিত্তিতে কোনো সামগ্রী ক্রয় করার পর যদি অন্য ব্যক্তিকে তা ভক্ষণের অনুমতি দেয়, তবে ওই ব্যক্তির জন্য তা হালাল হবে না। কিন্তু যদি দান করে অথবা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে দেয়, অর্থাৎ মালিকানা হস্তান্তর করে, তবে গ্রহীতা অথবা ক্রেতা তা ভক্ষণ করতে পারবে। কারণ এক্ষেত্রে মালিক পরিবর্তিত হয়েছে।

মাসআলা : চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার পূর্বেই যদি মুকাতাব মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থাক আর না থাক লিখিত চুক্তি আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে, কারণ সে মারা গিয়েছে ক্রীতদাস অবস্থায়। এরকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ। বিষয়টি এরকম— বিক্রিত বস্তু ক্রেতার অধিকারে না পৌছানো পর্যন্ত বিক্রেতারই থাকে। এমতাবস্থায় বিক্রিত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তিও বাতিল হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, এরকম অভিমত হজরত ওমর, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত, ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও কাতাদার। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, আতা,তাউস, হাসান বসরী ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেন, যদি দেখা যায়, মুকাতাবের পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা চুক্তির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা যায়, তবে ওই অর্থ মালিককে দিয়ে তাকে স্বাধীন অবস্থায় মৃত বলে ঘোষণা করতে হবে। আর সম্পূর্ণ বিনিময় পরিশোধ করার পরেও যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তবে তা বণ্টন করে দিতে হবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্ আ'লিমতুম ফীহিম খইর' (যদি তোমরা জানো এদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে)। হজরত ইবনে ওমর, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরীর মতে এখানে 'খইর' (কল্যাণ) অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। হাসান, জুহাক ও মুজাহিদ বলেন, এখানে শব্দটির অর্থ সম্পদ। যেমন অসিয়তের ব্যাপারে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'যদি সে সম্পদ পরিত্যাগ করে'। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত

সালমানের এক ক্রীতদাস তাঁর নিকট মুকাতাব করে দেয়ার নিবেদন করলো। তিনি বললেন, তোমার নিকট কি সম্পদ আছে? সে বললো, না। হজরত সালমান তাকে মুকাতাব করলেন না। বললেন, তুমি কি আমাকে ময়লা (সদকা) খাওয়াতে চাও?

মুজাহিদ প্রমুখের ব্যাখ্যা ভুল। কারণ ক্রীতদাসের নিকট সম্পদ থাকার কথা ভাবাই যায় না। ক্রীতদাসের যা কিছু অর্জন তাতো তার মালিকের । জুজায বলেছেন, এখানে 'খইর' অর্থ যদি সম্পদ হতো, তবে 'ফীহিম' শব্দটির স্থলে বসতো 'লাহুম'।

ইব্রাহিম ইবনে জায়েদ ও ওবায়েদ 'খইর' এর অর্থ করেছেন সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা। আর বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন সততা ও প্রতিশ্রুতিপূরণ। ইমাম শাফেয়ী বলেন, শব্দটির সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ হচ্ছে উপার্জন ও আমানতদারী।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, কথাটির অর্থ মুসলমানগণকে আঘাত দিয়ো না। যদি ক্রীতদাস কাফের হয়, আর তার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা থাকে, অথবা সে হয় কাফেরদের সহায়ক, তবে এরকম ক্রীতদাসকে মুকাতাব করা মাকরূহ্। কিন্তু তবুও তাকে মুকাতাব করা নাজায়েয নয়। এক বর্ণনায় উবায়দার উক্তিরূপে এসেছে, এই আয়াতে 'খইর' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে শব্দটির উদ্দেশ্য জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক। শিশু ও পাগল কখনো মুকাতাব হয় না।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে বলেছেন 'ওয়াললাজীনা ইয়াবতাগুণাল কিতাবা'। এরপর দিয়েছেন মুকাতাব করার নির্দেশ। জ্ঞানসম্পন্ন না হলে মুকাতাবের নিবেদন গ্রহণীয় নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে ওই ক্রীতদাসকে মুকাতাব বানানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যে মুকাতাবের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সে যেনো বিকৃতমস্তিষ্ক না হয়। এখন 'খইর' অর্থ যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তবে এই শর্তটি হয়ে যাবে নিরর্থক। রইলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্ত। এই শর্তটিও অগ্রহণীয়। যদি সে সচেতন ও বুদ্ধিমান বালক হয়, তবুও তো সে ক্রয়-বিক্রয়ের মতো চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য মুকাতাব বানানোর নিবেদন জানাতে পারে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, যে ক্রীতদাস অকর্মণ্য, উপার্জনের অযোগ্য, তাকেও মুকাতাব বানানো জায়েয। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের আর একটি উক্তি এই যে, যেহেতু এখানে 'খইর' উদ্দেশ্য উপার্জন, তাই বলতে হয়, যে ক্রীতদাস উপার্জনক্ষম নয়, তাকে মুকাতাব বানানো মাকরূহ্। আমি বলি, যুক্তিটি অযথার্থ। কারণ 'খইর' অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা— একথা মেনে নিলেও শর্ত অনুপস্থিত থাকা

অবস্থায় মুকাতাব কী রূপে মাকরূহ্ হতে পারে। খুব বেশী বললে বলা যেতে পারে, এমতাবস্থায় বিষয়টি ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব অবস্থায় থাকে না। কেননা উপার্জন ছাড়াও সে জাকাত, সদকা ইত্যাদি লাভ করতে পারে।

মাসআলা ঃ যে ক্রীতদাসী বুদ্ধিমতি কিন্তু উপার্জনক্ষম নয়, আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে তাকে মুকাতাব বানানো মাকরূহ্। কারণ অকর্মণ্যতার কারণে একমাত্র ব্যভিচার ছাড়া তার পক্ষে চুক্তির অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। আর স্বাধীনতা লাভের আশায় তার এই ঘৃণ্য পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করবে'। সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে আলোচ্য নির্দেশনাটি। এভাবে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে দাসমুক্তির মতো কল্যাণজনক কাজে। দান করতে বলা হয়েছে জাকাত, খয়রাত অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব সদকা থেকে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে দান করতে বলা হয়েছে ফরজ জাকাতের ওই অংশ, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন 'ফিররিক্বব'— (ক্রীতদাস) এই আয়াতে। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন হাসান বসরী ও জায়েদ ইবনে আসলাম। কিন্তু এই আয়াতে শব্দটির সম্পর্ক সাধারণভাবে জাকাতের সঙ্গে বিশেষায়িত করা ঠিক নয়। কেননা দাসমুক্তির জন্য জাকাতের একটি অংশ প্রদান করা তো ফরজই। আর এখানে দান করার কথা বলা হয়েছে মোস্তাহাব হিসেবে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। বরং মুকাতাব বানানোর নির্দেশনাটিও তো ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। কোনো কোনো আলেম বলেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মালিকদেরকে। অর্থাৎ মালিকদের জন্য তার ক্রীতদাসকে মুকাতাব বানানো মোস্তাহাব। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, মালিকদের প্রতি হুকুমটি ওয়াজিব। অর্থাৎ মালিকদেরকে চুক্তিবদ্ধ অর্থের কিছু অংশ ছেড়ে দিতেই হবে। হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত যোবায়ের প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি দল এরকমই বলেন। ইমাম শাফেয়ীও এই অভিমতের প্রবক্তা।

কতোটুকু অংশ ছেড়ে দিতে হবে, সে সম্পর্কে রয়েছে আলেমগণের বিস্তর মতপ্রভেদ। হজরত আলী বলেন, যে বিনিময় নির্ধারণ করা হবে, ছেড়ে দিতে হবে তার এক চতুর্থাংশ। আব্দুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মনসুর, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী ইবনে আব্দুর রহমান সুলাইমি সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আবার হজরত আলী সূত্রে বক্তব্যটিকে সুপরিণত সূত্রে সাব্যস্ত করেছেন রসুল স. এর নির্দেশরূপে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ছেড়ে দিয়ো এক তৃতীয়াংশ। কেউ কেউ বলেছেন, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। যতো খুশী ছেড়ে দিতে পারে। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেন। নাফেয়ের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাঁর এক দাসকে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের চুক্তিতে মুকাতাব করেছেন। সে ত্রিশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করার পর তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন বাকি পাঁচ হাজার দিরহাম।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর যখন কোনো গোলামকে মুকাতাব বানাতেন, তখন পরিশেষে যা মাফ করার প্রয়োজন হতো, তা মাফ করে দিতেন। তবে তিনি প্রারম্ভে মাফ করতেন না, মাফ করতেন শেষের দিকে। কেননা তিনি আশংকা করতেন, মুকাতাব যদি শেষে তার কিসতি পরিশোধ করতে না পারে, তবে সে পুনরায় ক্রীতদাস হয়ে যাবে এবং মালিক হয়ে যাবে তার পরিশোধিত অর্থের, যে পরিমাণ অর্থ মাফ করে দেয়া হয়েছিলো। একারণেই তিনি মাফ করতেন শেষের দিকে।

আমি বলি, এখানে মাফ করে দেয়ার অর্থ এরকম নয় যে, গোলামকে কিছু দিয়ে দিতে হবে। বরং এর অর্থ মূল পরিশোধ্য অর্থের কিছু অংশ রহিত করে দেয়া। আর রহিতকরণের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় পরিশোধিত অর্থের মধ্যে। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেন, নির্ধারিত বিনিময়ের কোনো অংশ মাফ করে দেয়া মালিকের উপরে ওয়াজিব নয়। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মতো মুকাতাবের লিখিত চুক্তিও বিনিময় চুক্তি। আর কোনো বিনিময়ের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব নয়। বিনিময় চুক্তিতে তো বিনিময় ওয়াজিব হয়, সুতরাং বিনিময় রহিতকরণ ওয়াজিব হতে পারে কীরূপে? মুকাতাব চুক্তিতে নির্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করা গোলামের উপরে ওয়াজিব, এখন যদি মালিকের উপরেও ওই বিনিময়ের কিছু অংশ মাফ করে দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়, তবে লিখিত চুক্তি হবে ওয়াজিব বিনিময়ের কারণ এবং রহিত বিনিময়ের ওয়াজিবেরও। তাহলে এরকম মাফ করার অর্থ কী? বরং সহজ পদ্ধতি তো এটাই হতো যে, মালিক বিনিময় হিসেবে এক হাজার দিরহাম নিতে চাইলে প্রথমেই হয়তো তিন শত মাফ করে দিয়ে গ্রহণ করতো সাত শত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারী হতে বাধ্য কোরো না'।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তার দাসীদের দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। তার দু'জন দাসীর নাম ছিলো মুসায়কা ও উমায়মা। তারা ব্যভিচারপ্রবণা ছিলো না বলে রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য বাক্যটি।

হজরত জাবের থেকে আবু যোবায়েরের পদ্ধতিতে হাকেম বর্ণনা করেন, মুসায়কা ছিলো জনৈক আনসারের দাসী। সে অভিযোগ করেছিলো, আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতাংশ।

বায্যার ও তিবরানী বিশুদ্ধসূত্রসহযোগে বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক ক্রীতদাসী মূর্খতার যুগে ব্যভিচার করতো। ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সে পণ করলো, সে আর কখনো ব্যভিচার করবে না। তাকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃত বাক্যটি। একটি শিথিলসূত্রসহযোগে বায্যারও হাদিসটিকে হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ওই বর্ণনায় এসেছে, ওই ক্রীতদাসীর নাম ছিলো মুয়াজা। সাঈদ ইবনে মনসুরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ছিলো মুসায়কা ও মুয়াজা নাম্নী দু'জন দাসী। সে ওই দু'জনকে দিয়ে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতো । ইসলামের আবির্ভাবের পর তাদের একজন বললো, এ কাজ যদি উত্তম হয়, তবে এ কাজ তো আমি অনেক করেছি। আর উত্তম না হলে এ কাজ বাদ দেয়াই সমীচীন। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় উদ্ধৃত আয়াতাংশ।

বাগবী লিখেছেন, এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের এক দাসী আনলো একটি চাদর এবং অপর জন আনলো দিনার। সে বললো, যাও, আরো কিছু উপার্জন করে আনো। দাসীদ্বয় বললো, আল্লাহ্র কসম! এখন থেকে এরকম কাজ আমরা করবো না। সত্য ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আর ওই ধর্মে ব্যভিচারকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে দাসীদ্বয়ের অবাধ্যতার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, মুকাতিল বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার ছয়জন দাসীকে ব্যভিচারে নিয়োজিত করেছিলো। তার ওই অসদাচরণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কোরো না'।

'ইন আরদনা তাহাস্সুনা' অর্থ যদি তারা সততা রক্ষা করতে চায়। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'ইন্' শর্তসূচক। আর এ শর্ত দাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নির্দিষ্ট করে না। যেমন শাফেয়ীগণের মতানুসারে কথাটির বিপরীত অর্থ এরকম— যদি তারা সততা বা সতীত্ব রক্ষা না করতে চায় তবে তাদের জন্য ব্যভিচার বৈধ। কিন্তু এ ধরনের অর্থ ভুল। কারণ এতে করে আপনাআপনি ব্যভিচার স্বীকৃতি লাভ

করে। আমি বলি, এ স্থলে 'ইন' (যদি) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাদের সততা রক্ষা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের এমতো অভিলাষ শক্তিশালী নয়, বরং সন্দেহপূর্ণ। কারণ তারা মালিকের ইচ্ছার কাছে অসহায়। মালিকের বলপ্রয়োগের ঊর্ধে ওঠার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া তাদের কামোত্তেজনাও তাদের ইচ্ছার পথের প্রতিবন্ধক। তাই এখানে মালিকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাওয়া হয়েছে, যদি তোমাদের দাসীরা নিজেরাই সততা রক্ষা করতে চায়, তবে তোমরা কেমন পুরুষ যে, তাদের এমতো শুভ অভিলাষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাও? বাধ্য করো তাদেরকে ব্যভিচারলিপ্ত হতে? তারা তোমাদের বাধ্য, কিন্তু তোমরা তো স্বাধীন। সুতরাং এরকম গোনাহের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করা তোমাদের জন্য নিতান্তই অনুচিত।

হোসাইন ও ফুজাইল বলেন, বক্তব্যে ঘটেছে কিছু অগ্রপশ্চাৎ। কথাটি হবে এরকম— যদি বিধবা তার সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে তার বিয়ে দিয়ে দাও এবং আপন দাসীকেও বাধ্য করো না ব্যভিচারিণী হতে। প্রশ্রয় দিয়ো না পার্থিব জীবনের ধন-লোলুপতাকে। এমতো আকাংখা কোরো না যে, তাদেরকে দিয়ে ব্যভিচার করিয়ে উপার্জন করবে এবং তাদের সন্তানাদি বিক্রয় করে লাভ করবে অর্থ-সম্পদ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— মালিকেরা যদি তাদের দাসীদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে, তবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য করবেন না, ক্ষমা করে দিবেন। হাসান যখন এই আয়াত পাঠ করতেন, তখন বলতেন 'লাহুন্না ওয়াল্লহু লাহুন্না' (আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ই ওই দাসীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন)। এই উদ্দেশ্যের উপরে ভিত্তি করে 'মাঁই ইউকরিহ্ হুন্না' (তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে) কথাটি হবে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় থাকবে লুপ্ত। যেহেতু পরবর্তী বাক্যে কোনো যোজক সর্বনাম নেই, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বাক্য বিধেয় হবে না। অর্থ দাঁড়াবে— ব্যভিচারের পাপ ও শাস্তি পতিত হবে তার উপর যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে। আর এমতাবস্থায় ব্যভিচারে বাধ্য দাসীকে আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন। কথাটির উদ্দেশ্য এরকমও হতে পারে যে, যে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, তাকেই আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন, যদি সে আর এরকম করবে না বলে আন্তরিক তওবা করে নেয়। কিন্তু এমতো অর্থ বাক্যের ধরন ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেননা এখানে জবরদস্তি যে করবে, তাকে শাস্তির ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এরকম উদ্দেশ্য এখানে নেই। তদুপরি

দাসীর মালিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশ। সে ছিলো মুনাফিকশ্রেষ্ঠ। আর মুনাফিকদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকরুন আর না করুন, আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

একটি সন্দেহ ঃ যে দাসীকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করা হয় সে যখন গোনাহ্গারই নয়, তখন তাকে ক্ষমা করার প্রয়োজনই বা কী?

সন্দেহের অপনোদন ঃ জবরদস্তি করার পর দায়িত্ববোধ ও জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে না। কর্মক্ষমতাও রহিত হয় না। তাই যে বাধ্য, তাকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্তও বলা যায় না। সে কারণেই কাউকে হত্যা করতে যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়েছে এবং যাকে বাধ্য করা হয়েছে ব্যভিচার করতে, তার জন্যও হত্যা করা অথবা ব্যভিচার করা হারাম। ইমাম জোফারের নিকট তো এরকম হত্যা কিসাসের যোগ্যও নয়। তাঁদের অভিমত স্ব স্ব স্থানে সঠিক। তবে আল্লাহ্পাক কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধ্যগত ব্যক্তির উপর থেকে পাপের দায় অপসারণ করে দেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারাম কাজেরও অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যেমন কুফরী কালাম উচ্চারণ, নামাজ-রোজা পরিত্যাগ, হজের ইহ্রাম ভঙ্গ বাধ্যগত অবস্থায় সিদ্ধ। তবে শর্ত হচ্ছে এরকম কাজ করতে বাধ্য হলেও কাজগুলোর প্রতি থাকতে হবে আন্তরিক ঘৃণা। অতএব বুঝতে হবে, এমতাবস্থায় পাপী বলে সাব্যস্ত না করা অবশ্যই আল্লাহ্তায়ালার অপার দয়া ও ক্ষমার নিদর্শন। লক্ষণীয়, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ফামানিদ্বতুররা গয়রা বাগিঁউ ওয়ালা আ'দিন ফালা ইছমা আলায়হি ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম'। এরকমও বলা যেতে পারে যে, গোনাহ্গার সাব্যস্ত করা হবে না তখন, যখন বলপ্রয়োগ ছাড়িয়ে যায় তার সীমানা, অর্থাৎ যখন দেখা যায় বলপ্রয়োগকারীর কথা না মানলে জীবন দিতে হবে, অথবা কাটা পড়বে কোনো অঙ্গ। এরকম আশংকা না দেখা দেয়া পর্যন্ত পাপ অবশ্যই বর্তাবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই কিন্তু তার দাসীদেরকে এরকম চরম পর্যায়ের বলপ্রয়োগ করেনি। একথা বলেনি যে, ব্যভিচার না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ছেদন করা হবে শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং তার দাসীরা এমতাবস্থায় ব্যভিচার করলে অবশ্যই হবে পাপীয়সী।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৪

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

❒ আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের ও সাবধানীদিগের জন্য দিয়াছি উপদেশ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল। আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আলকোরআনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুরা। এর নাম সুরা নূর। এর মধ্যে রয়েছে শরিয়তের কতিপয় সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আয়াত। অথবা— এই সুরায় আমি অবতীর্ণ করেছি এমতো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যার আনুকূল্য ও সমর্থন রয়েছে ইতোপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সমূহেও। আর সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন বিবেকও যেগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের'। একথার অর্থ— এই মহাগ্রন্থে আমি আরো উপস্থাপন করেছি তোমাদের পূর্বসূরীদের বিভিন্ন ঘটনা। যেমন নবী ইউসুফের অত্যাশ্চর্য কাহিনী, হজরত মরিয়মের বিস্ময়কর জীবনেতিহাস ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে তোমাদের রসুল জায়ার নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্যবহ আয়াতসমূহও তো কম আশ্চর্যের নয়। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই মহাগ্রন্থে আমি দিয়েছি পূর্ববর্তী যুগের অপরাধীদের বিভিন্ন অপকর্ম ও সীমালংঘন ও তার অপপরিণতির স্পষ্ট বিবরণ। অতএব হে কপটচারীরা! তোমরাও জেনে রেখো, সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে তোমাদের পরিণতিও হবে সেইরূপ মর্মান্তিক ও ভয়াবহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'ও সাবধানীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ'। একথার অর্থ— সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে প্রদত্ত এই যে সাবধানবাণী, তার দ্বারা উপকার লাভ করবে কেবল সাবধানী বা মুত্তাকীরাই, অন্যেরা নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, প্রত্যাদেশিত এই উপদেশ কেবল মুত্তাকীদের জন্যই, অন্যের জন্য নয়।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি প্রযোজ্য হবে সমগ্র কোরআনের উপর। কারণ 'সুস্পষ্ট আয়াত' 'দৃষ্টান্ত' ও 'উপদেশ' তিনটি কথাই বিধৃত রয়েছে সমগ্র কোরআনে। অর্থাৎ সমগ্র কোরআনই একাধারে সুস্পষ্ট আয়াতের সমাহার, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ভীতিপ্রদ ঘটনার সমাবেশ এবং উপকারপ্রদায়ক উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۚ اَلْمِصْبَاحُ
فِيْ زُجَاجَةٍ ۚ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ
زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ
نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ۚ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ
لِلنَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ

❐ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা কুলুঙগি যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্বলিত হয় তৈল হইতে পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষের , যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি সংযোগ না করিলেও মনে হয় উহার তৈল উজ্জ্বল যেন আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি)। যে আলোকে চোখ প্রথম উপলব্ধি করে এবং যার মাধ্যমে নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দর্শনীয় দৃশ্যসমূহ, সেই আলোকেই বলে নূর বা জ্যোতি। যেমন চন্দ্র-সূর্যের আলো। 'নূর' শব্দের এই ব্যাখ্যাটিকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে এটা নিশ্চিত যে আল্লাহ্তায়ালাকে 'নূর' বলা যায় না। কারণ নূর দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা দৃষ্টির অতীত। বরং উপলব্ধিরও অতীত। তাই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে ভিন্নভাবে। যেমন— ১. ধরে নিতে হবে এখানে একটি সম্বন্ধপদ উহ্য। অর্থাৎ বলতে হবে 'আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবীর নূর' অর্থ 'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে নূর প্রদানকারী'। ২. ধাতুমূল থেকে গ্রহণ করতে হবে আধিক্যপ্রকাশক অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এতো সুপ্রচুর নূরপ্রদাতা যে, মনে হয় তিনিই নূর। যেমন জায়েদ নামক ব্যক্তির অত্যধিক ন্যায়পরায়ণতাকে প্রকাশ করা হয় এভাবে— 'যায়দুন আদলুন' (জায়েদই ন্যায়নিষ্ঠ)। আবার যেমন অত্যধিক দয়ার্দ্র ব্যক্তির প্রশংসা প্রকাশার্থে কেউ কেউ বলে 'আপনিই তো দয়া' (দয়ার প্রতিভূ)। ৩. অথবা ধাতুমূলটি (নূর) এখানে হবে কর্তৃকারকের অর্থ

প্রদায়ক। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্তায়ালা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা, ফেরেশতামণ্ডলী দ্বারা, নবী-রসুলগণের দ্বারা এবং বিশ্বাসীগণের দ্বারা আকাশপৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। এরকমও বলা যেতে পারে যে— আল্লাহ্ পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করেছেন সবুজ বৃক্ষ ও তৃণরাজির মাধ্যমে।

কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— আকাশ-পৃথিবীসহ অন্য সকল কিছুর নূর তাঁর নিকট থেকেই। যেমন বলা হয় 'অমুক ব্যক্তি আমাদের জন্য রহমত'। অর্থাৎ আমরা রহমত লাভ করেছি তাঁরই মাধ্যমে।

কখনো কখনো আবার 'নূর' শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রশংসা প্রকাশার্থে। যেমন জনৈক কবির কবিতায় রয়েছে— যখন আবদুল্লাহ্ কোন রাতে মরো ত্যাগ করে, তখন হারিয়ে যায় মরোর জ্যোতি ও সৌন্দর্য।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'নূর' অর্থ গবেষক, পরিচালক। যেমন বলা হয় অমুক ব্যক্তি 'কওমের নূর' (সম্প্রদায়ের জ্যোতি)।

আবার কারো কারো মত এরকম— নূর হচ্ছে ওই অস্তিত্ব, যা নিজে নিজে বিকশিত হয় এবং বিকশিত করে অন্যকেও। আরো দেখা যায়, দৃশ্যমানতার মূলে আছে অস্তিত্ব আর অদৃশ্যমানতার মূলে অনস্তিত্ব। 'নুরুস্সামাওয়াত' অর্থ আকাশ-পৃথিবীর অস্তিত্ব। আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব সত্তাগত। তিনি স্বয়ং অস্তিত্ব এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছুরই তিনি অস্তিত্বপ্রদাতা।

দর্শনশক্তিকেও নূর বলে এজন্যই যে, দর্শনশক্তি বস্তুসমূহের অনুভূতির গ্রাহক। আর দর্শন,সেতো উচ্চ পর্যায়ের একটি গ্রাহক। চক্ষু তার নিজের গ্রাহক নয় তাই সে নিজেকে দেখতে পায় না। কিন্তু দর্শন স্বীয় সত্তা ছাড়াও যাবতীয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির প্রতিগ্রহীতা। বস্তুসমূহের তাত্ত্বিক গবেষকই হচ্ছে এই দর্শন শক্তি। প্রতিটি বস্তুর সমন্বয়ন ও স্তরায়ন এরই দ্বারা সূচিত হয় বলে একে নূর বলাই উত্তম।। তিনিই দৃষ্টিশক্তির উপরে বর্ষণ করেন অনুভূতির ফয়েজ বা বর্ষণ, কখনো নবীগণের মাধ্যমে, আবার কখনো ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। তাঁর ওই অলৌকিক বর্ষণের নামই নূর। এভাবে বলা যেতে পারে— নবীগণ জ্যোতি, ফেরেশতাগণও জ্যোতি এবং জ্যোতি আল্লাহ্ও, নূরের স্রষ্টা ও দাতা হিসেবে। এভাবেই আল্লাহ্ পথনির্দেশ করে চলেছেন আকাশ-পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টিকে। তাই বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' অর্থ আল্লাহ্ই আকাশ ও পৃথিবীবাসীর পথপ্রদর্শনকারী। সেকারণেই তো নিশ্চিত হয়েছে বিশ্বসমূহের যথাযথ পরিচালন, বিবর্তন ও পথ-পরিক্রমণ। 'নূর' সম্পর্কে আরো বলা যেতে পারে যে, এর ঔজ্জ্বল্য সকলকিছুকে বেষ্টন করে নেয়। অথবা দৃষ্টির মধ্যেই বিদ্যমান থাকে জ্ঞানগত ও অনুভবগ্রাহ্য নূর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ'। এখানে 'তাঁর জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি' অর্থ তাঁর জ্যোতি হচ্ছে তাঁর ওই জ্যোতির বৈশিষ্ট্য যা প্রোজ্জ্বল থাকে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে। তাই তো বিশ্বাসবানগণের অন্তর সতত ধাবমান থাকে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর দিকে, এভাবে পৌঁছে যায় এমন অক্ষয় জ্ঞানগৃহে, যেখানে উপনীত হতে মানবশক্তি অক্ষম। এভাবে প্রকৃত বিশ্বাসীরা পেয়ে যায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ নির্ণায়ক জ্ঞান। এদিকে লক্ষ্য করেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে— 'ফাহুয়া আ'লা নুরিম্ মির রব্বিহী' (অতঃপর সে বিদ্যমান হয় তার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করতেন এভাবে— 'মাছালু নূরিহী ফী ক্বালল্বিল মু'মিন' (বিশ্বাসীর অন্তরপটে তাঁর জ্যোতির উপমা)। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ নূর হচ্ছে এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ দান করেন মুমিনগণকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে 'নূরিহী' কথাটির 'হী' সর্বনাম বিশ্বাসীগণের স্থলাভিষিক্ত। হজরত উবাই ইবনে খলফ বলেছেন, নূর হচ্ছে বিশ্বাসীগণের হৃদয়ের জ্যোতির গুণ। এ ধরনের বিশ্বাসীর অন্তরেই আল্লাহ্ দান করে থাকেন ইমান, বক্ষে দান করেন কোরআনের নূর। হাসান এবং জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, এখানে 'নূর' উদ্দেশ্য কোরআন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং জুহাক বলেছেন, এখানে 'নূর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল পাক স. এর পবিত্র সত্তাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নূর' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের আনুগত্যকে, যা আল্লাহ্পাক দয়া করে সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর নিজের সত্তার সঙ্গে।

'কা মিশকাতিন্ ফীহা মিসবাহুন' অর্থ 'যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ'। অর্থাৎ কুলুঙ্গি বা দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে একটি প্রদীপ। 'মিশকাতুন' অর্থ কুলুঙ্গি বা দীপাধার, যার উভয় পার্শ্ব নিশ্ছিদ্র, আলো প্রদানের জন্য যাতে থাকে সুনির্ধারিত দিক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মিশকাত' শব্দটি আবিসিনীয়। মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন 'কুলুঙ্গি' বা কাঁচের তৈরী এমন ঝুলন্ত প্রদীপাধার যাতে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপবিশিষ্ট ঝুলন্ত প্রদীপাধার। 'মেসবাহ্' অর্থ প্রদীপ। এটা করণকারকরূপের শব্দ, এখানে শব্দটি এসেছে 'মিফআলুন' সূত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত'। 'যুজ্বাজ্বাত্' অর্থ কাঁচের আবরণ। জুজায বলেছেন, কাঁচের আবরণের মধ্যে আলো অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ'। এখানে 'দুররিউন' অর্থ মোতি অথবা মোতির মতো পরিচ্ছন্ন ও দ্যুতিময় নক্ষত্র।

একটি সন্দেহ ঃ তারকার দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা তো মোতির দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অধিক। তাহলে এখানে 'নক্ষত্র' অথবা 'মোতির মতো' এরকম বলা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানে উপমাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— উজ্জ্বলতম নক্ষত্র যেরূপ অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক দ্যুতিময়, তেমনি মোতির দানাও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর অপেক্ষা অধিক দ্যুতিবিশিষ্ট। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নক্ষত্র' অর্থ ওই পাঁচটি নক্ষত্র, যেগুলো অন্যান্য নক্ষত্রের চেয়ে অধিক আলোকজ্জ্বল। ওই নক্ষত্রগুলোর নাম— যুহাল, মিররিখ, মুশ্তারী, জোহরা ও উত্বারিদ। এগুলোর যে কোনো একটিকে বলা হয় 'কাওকাবু দুররি'। আমি বলি, সম্ভবতঃ জোহরা নক্ষত্রকেই এখানে বলা হয়েছে 'দুররিউন'। কারণ, জোহরা সেতারাই সকল নক্ষত্র অপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল।

একটি প্রশ্নঃ এখানে ঔজ্জ্বল্যের উপমা দেয়া হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য তো নক্ষত্র অপেক্ষা আরো অধিক উজ্জ্বল। তৎসত্ত্বেও চন্দ্র-সূর্যের উপমা এখানে দেয়া হলো কেনো?

উত্তরঃ কখনো চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগে। কিন্তু নক্ষত্রে কখনো গ্রহণ লাগে না। আমি বলি, অন্য আয়াতে প্রদীপকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়া জায়ালনাশ্ শামসা সিরাজা'। আর এখানে কাঁচের আবরণকে তুলনা করা হয়েছে নক্ষত্রের সঙ্গে, যাতে করে এই তথ্যটি প্রকাশিত হয় যে, কাঁচের আবরণের দ্যুতি প্রদীপ অপেক্ষা কম। সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই উদ্দেশ্যটি পরিবর্তিত হয়ে যেতো। তখন দীপাধারের দ্যুতি বিবেচিত হতো দীপ অপেক্ষা অধিকরূপে। ফলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য হয়ে যেতো বিপরীত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা প্রজ্জ্বলিত হয়, তেল থেকে পূত-পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের'।

জয়তুন বৃক্ষ একটি অতি বরকতময় বৃক্ষ। তাই এখানে তুলনা দেয়া হয়েছে জয়তুন বৃক্ষের। জয়তুন বৃক্ষ থেকে লাভ হয় বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন জয়তুন হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন। আর জয়তুন থেকে তেল বের করার জন্য কোনো মাড়াইকলের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই অল্প আয়াসে জয়তুন থেকে

তেল বের করে নিতে পারে। জয়তুন তেল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দৃষ্টিস্বস্তিকর। বাগবী লিখেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে জয়তুন তেলের দ্বারা অনারোগ্যক্ষত নিরাময় হয়। আর জয়তুন বৃক্ষের আগা-গোড়া শুধু তেল আর তেল।

বাগবী লিখেছেন, হজরত উসাইদ ইবনে সাবেত অথবা হজরত উসাইদ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মালিশ কোরো। কেননা এটি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ। হজরত ওমর থেকে তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবী উসাইদ থেকে। আর ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খাও ও শরীরে মাখো। কারণ জয়তুন উৎকৃষ্ট ও কল্যাণময়।

আবু নাঈম তাঁর 'আত্তিব্ব' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা জয়তুন তেল খেয়ো ও শরীরে মেখো। কারণ এতে রয়েছে সত্তর প্রকার রোগের নিরাময়। কুষ্ঠ রোগও তার মধ্যে একটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়'। সুদ্দী প্রমুখ বলেন, কথাটির উদ্দেশ্য— জয়তুন বৃক্ষ এমন স্থানে অবস্থিত নয়, যেখানে সারাক্ষণ রৌদ্র পতিত হয়, যাতে করে তা সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যায়, আবার এমন গোপন স্থানেও অধিষ্ঠিত নয়, যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই পৌঁছে না, যাতে করে সে বৃক্ষের বিকাশ হয়ে পড়ে রুদ্ধ অথবা অপরিণত। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, কথাটির অর্থ— জয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যের এমন কোনো স্থানে অবস্থিত নয়, যাতে তার উপরে সূর্যালোক পতিত হয় কেবল সূর্যোদয়ের সময়, আবার প্রতীচ্যের কোনো স্থানও তার জন্য সুনির্ধারিত নয়, যাতে সে সূর্যকিরণ পায় কেবল সূর্যাস্তের কালে। বরং জয়তুন বৃক্ষের অবস্থান পাহাড়ের চূড়ায়, অথবা এমন উচ্চপ্রশস্তভূমিতে, যেখানে সূর্যালোক পতিত হয় সমস্ত দিবসব্যাপী। ফলে জয়তুন ফল হয় পোক্ত এবং তার তৈল হয় স্বচ্ছ।

বাগবী কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— জয়তুন কালো নয়, শাদাও নয়। আবার মিষ্টি যেমন নয়, তেমনি নয় টকও। অর্থাৎ জয়তুন মধ্যম ধরণের রঙ ও স্বাদবিশিষ্ট। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। কালাবী এবং অধিকাংশ তাফসীরকারের মত এরকম।

কেউ কেউ বলেছেন, জয়তুন পৃথিবীর পূর্ব অথবা পশ্চিমের কোনো অংশের বৃক্ষ নয়। বরং জয়তুন জন্ম নেয় পৃথিবীর মধ্যাঞ্চলে। অর্থাৎ সিরিয়ায়। সিরিয়ার জয়তুনই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হাসান বলেছেন, প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলে জন্মে না, এমন কোনো বৃক্ষ দুনিয়ায় নেই। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'যা প্রাচ্যের নয়' প্রতীচ্যেরও নয়' বলে আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা। অর্থাৎ আল্লাহ্র নূর পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোনো দিকের সঙ্গেই সুনির্দিষ্টরূপে সম্পৃক্ত নয়। বরং তাঁর নূর দিকের অতীত। আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে বলা হয়েছে বেহেশতের কোনো অনন্যসাধারণ জয়তুন বৃক্ষের কথা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর নূরের উপমা।

এরপর বলা হয়েছে— ' অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে'। উল্লেখ্য, এই বাক্যটির মাধ্যমে জয়তুন তেলের স্বচ্ছতা ও জয়তুন তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের উজ্জ্বলতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে'। একথার অর্থ— একেতো নূর তৈলবিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতির্ময়। তার উপরে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কারণে তা হয় আরো অধিক আলো বিকিরণকারী। এভাবে এখানে উল্লেখিত আলো হয়ে উঠেছে তীব্র, প্রখর, প্রখরতর। এভাবে দীপ, দীপাধার, কাঁচের আবরণ সবকিছু মিলে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হয়েছে আলো, কেবলই আলো,

বাগবী লিখেছেন, 'নূরের উপরে নূর' কথাটিকে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'নূর' হচ্ছে নূরে মোহাম্মদী। হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'ব আহবারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মাছালু নূরিহী কামিশকাতিণী' এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ এই আয়াতে উপমার মাধ্যমে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর শেষ নবীর অবস্থার। এখানে 'মিশকাত' অর্থ রসুল স. এর পবিত্র বক্ষাভ্যন্তর। 'কাঁচের আবরণ' উদ্দেশ্য তার জ্যোতির্ময় হৃদয়। 'মিসবাহ' অর্থ তাঁর নূরানী নবুয়ত। আর ইউকাদু যায়তুহা 'ইয়ুদ্বিউ' অর্থ— রসুল স. যদি তাঁর নবুয়তের কথা কাউকে না-ও বলতেন, তবুও তাঁর নবুয়ত গোপন থাকতো না। মানুষের সামনে তাঁর নবুয়ত হয়ে উঠতো আপনাআপনি উজ্জ্বল, অধিকতর উজ্জ্বল।

হজরত কা'ব আহবারের ব্যাখ্যাটি আমার নিকট অধিক মনোপুত। প্রকৃতপক্ষে নূরে মোহাম্মদীর প্রকৃতি এরকমই। সেকারণেই রসুল স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বের কিছু কথা আমি এখানে সন্নিবেশ করছি। যেমন রসুল স. এর মহাসম্মানিতা জননী বলেছেন, মোহাম্মদ তখন আমার উদরাভ্যন্তরে। আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার ভিতর থেকে বের হলো একটি অত্যুজ্জ্বল নূর। সেই নূরের আলোকে আমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হলো বসরা শহর ও সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। আর জন্মগ্রহণের পর পরই দেখলাম নবজাতক তার শির উত্তোলন করলো

আকাশের দিকে। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, রসুল স. যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তাঁর মহামর্যাদাশালিনী জনয়িত্রির নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহ। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন ইবনে হাব্বান ও হাকেম।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. এর পূত-পবিত্রা মাতা বর্ণনা করেছেন, যখন মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করলো, তখন ফেরেশতারা তাকে তিনবার চুবালো পানিতে। অতঃপর একটি রেশমি থলির মধ্য থেকে একটি মোহর বের করে স্থাপন করলো তার স্কন্ধদেশে। স্থাপিত মোহরটি ছিলো ডিম্বাকৃতির এবং তা দ্যুতি বিকিরণ করতে লাগলো জোহরা তারার মতো।

বায়হাকী ইবনে আবিদ্‌দুনইয়া এবং ইবনে সাকান বর্ণনা করেন, রসুল স. এর জন্মেররাত্রিতে প্রকম্পিত হয়েছিলো পারস্যরাজের প্রাসাদসমূহ। চৌদ্দটি প্রাসাদ ধসে পড়েছিলো ওই কম্পনে। পারস্যরাজ হয়ে পড়েছিলো ভীত সন্ত্রস্ত। নিভে গিয়েছিলো তার হাজার বছরের অনির্বান অগ্নিশিখা। আর শুকিয়ে গিয়েছিলো তাদের সাদত নামক বিশাল হ্রদ।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. যে রাতে ভূমিষ্ঠ হলেন, সে রাতে মক্কাবাসী এক ইহুদী ব্যবসায়ী কুরায়েশদেরকে বললো, আজ রাতে জন্মগ্রহণ করলেন শেষ জামানার নবী। তাঁর স্কন্ধদেশে রয়েছে একটি বিশেষ চিহ্ন। ওই চিহ্নের উপরে রয়েছে অশ্বের কেশগুচ্ছের মতো ক্ষুদ্র এক গুচ্ছ কেশ। লোকেরা বললো, তার কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। ইহুদী তখন সকলকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলো মা আমেনার গৃহে। দেখতে চাইলো নবজাতককে। যখন তার কাছে নবজাতককে আনা হলো তখন সে তাঁর স্কন্ধদেশের বিশেষ চিহ্নটি দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! শেষ হয়ে গেলো বনী ইসরাইলের প্রবহমান নবুয়ত।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে রয়েছে, আসীসা নামক এক খৃষ্টান সন্যাসী কুরায়েশদেরকে বলতো, হে মক্কাবাসী! অনতিবিলম্বে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এক মহান পয়গম্বর। সকল আরববাসী হয়ে যাবে তাঁর অধীন। অনারবরাও হবে তাঁর অনুসারী। এখনই তাঁর জন্মগ্রহণের সময়।

হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার শিশু অবস্থার অলৌকিক দৃশ্যাবলীর কথা স্মরণ ছিলো বলেই আমি আপনার ধর্মমত গ্রহণ করেছি। আপনি তখন দোলনায় শুয়ে চাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন তার দিকে। চন্দ্র তখন সরে যেতো এক

পাশে। রসুল স. বলতেন, আমি তখন তার সাথে কথা বলতাম। সে-ও কথা বলতো আমার সঙ্গে। আমি কাঁদলে সে আমাকে সান্ত্বনা দিতো। আর সে যখন আরশের নিচে সেজদাবনত হতো, তখন আমি শুনতে পেতাম তার আওয়াজ।

রসুল স. এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর দোলনাকে ফেরেশতারা দোলাতো। আর এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি কথা বলেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর থেকে আবু ইয়ালী ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর দুধমাতা হজরত হালিমা বলেন, তাঁকে কোলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো আমার স্তন। দুধের স্বল্পতার কারণে আমার সন্তান জামুরা ভালোমতো দুধ পেতোনা, তাই সে ঘুমাতে চাইতো না। রসুল স. কে পাওয়ার পর তিনি ও আমার সন্তান দুজনেই পেটপুরে দুধ পান করতো ও যথাসময়ে ঘুমিয়ে পড়তো। আমার উটনীটির স্তনও ছিলো দুধহীন। রসুল স. কে পাওয়ার পর তার ওলানও ভরে গেলো দুধে। আমার স্বামী তা দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, একি! উটনীর স্তনে এতো দুধ এলো কি করে! তিনি উটনীটি দোহণ করলেন। ওই দুধ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম আমরা দুজনেই। ওই রাত অতিবাহিত হলো নির্বিঘ্নে। মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম বাড়ীর দিকে। গাধার উপরে আরোহণ করলাম, শীর্ণ গাধাটি চলতে লাগলো দ্রুতগতিতে। সঙ্গী-সাথীদের গাধাগুলো পড়ে রইলো পেছনে। সঙ্গী সাথীরা বলতে লাগলো, ওগো আবী জুওয়াইব পুত্রী! এটা কি তোমার সেই গাধা, যার উপরে সওয়ার হয়ে তুমি এখানে এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর ভাবলাম, সঙ্গী-সাথীরা তো এরকম বলবেই। আসার সময় আমি বার বার পেছনে পড়ে যাচ্ছিলাম, সঙ্গী-সাথীদেরকেও থেমে যেতে হচ্ছিলো বারবার। আর আজ সকলেই আমার পেছনে পড়ে রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, হজরত হালিমা বলেছেন, আমি যখন রসুল স.এর দুধপান বন্ধ করালাম, তখন তিনি বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লহি বুকরাতাঁও ওয়া আসিলা'। এটাই ছিলো তাঁর প্রথম কথা।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বর্ণনা করেন, হজরত হালিমা তাঁকে কাছ ছাড়া করতেন না। তবু একদিন তিনি তাঁর দুধ বোন সীমার সঙ্গে চলে গেলেন চারণ ভূমিতে। তাঁরা দুজনে ফিরে এলে জননী বললেন, এই তপ্ত রোদে তোমরা বাইরে যাও কেনো? সীমা বললেন, আমার এই ভাইটি সঙ্গে ছিলো বলে আমাদের গায়ে রোদই লাগেনি। আশ্চর্য! সারাক্ষণ তার মাথার উপরে ছায়া দেয় একখণ্ড মেঘ। সে থেমে গেলে মেঘখণ্ডটিও থেমে যায়। আর চলতে শুরু করলে চলতে শুরু করে মেঘখণ্ডটিও।

শামায়েলে মাজদিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত হালিমা বর্ণনা করেন, যখন থেকে আমি তাঁকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসি, তখন থেকেই ফুরিয়ে যায় আমাদের প্রদীপের প্রয়োজন। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বের জ্যোতি ছিলো প্রদীপের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। কোথাও প্রদীপের প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা তাঁকে নিয়ে যেতাম সেখানে। তাঁর উপস্থিতিতে ওই স্থান হয়ে যেতো আলোকিত।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত হালিমা তাঁকে নিয়ে প্রতিমার সামনে গেলে হুবল ও অন্যান্য প্রতিমা তাঁর সম্মানার্থে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেও মস্তক অবনত করে প্রণিপাত করতো। আর হাজরে আসওয়াদের কাছে গেলে ওই কৃষ্ণপাথরটিই এসে মিলিত হতো তাঁর মুখের সঙ্গে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত হালিমা যখন তাঁকে দুধ পান করাতেন তখন তাঁর বুকে এতো দুধ আসতো যে, দশজন শিশু পরিতৃপ্ত হতে পারতো ওই দুধ পান করে। যখন তিনি রসুল স.কে নিয়ে গমন করতেন কোনো শুষ্কভূমিতে তখন ওই স্থানটি হয়ে যেতো সবুজ-শ্যমল। হজরত হালিমা তখন স্বকর্ণে শুনতে পেতেন সেখানকার পাথর ও বৃক্ষরাজি তাঁকে সালাম বলছে। আর দেখতে পেতেন বৃক্ষের ডালপালাগুলো ঝুঁকে আসছে তাঁর দিকে। আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর দুধভাইয়ের সঙ্গে মাঠে ছাগল চরাতেন। তাঁর ওই দুধভাই বর্ণনা করেছেন, আমার দুধভাই কোনো উপত্যকায় উপস্থিত হলে তৎক্ষণাৎ ওই উপত্যকা হয়ে উঠতো সবুজ-শ্যামল। আর ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য যখন কোনো কূপের পাড়ে উপস্থিত হতাম তখন পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আসতো কূপের কিনারায়। যখন রোদে দাঁড়াতেন তখন এক খণ্ড মেঘ এসে ছায়া দিতো তাঁর মাথার উপর। বণ্য পশুকুলও এসে চুম্বন করতো তাঁর পায়ে।

'খোলাসাতুস্ সিয়ার' গ্রন্থে রয়েছে, রসুল স. এর দুধমাতা বর্ণনা করেন, একদিন তিনি আমাদের উট রাখার জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলো আমার সন্তান, তাঁর দুধভাই। সে হঠাৎ দৌড়ে এসে আমাকে বললো, সর্বনাশ হয়েছে। দুজন শাদা পোশাক পরা অচেনা লোক আমার কুরায়েশ ভাইকে মাটিতে শুইয়ে তার পেট চিরে ফেলেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, দুজন শাদা পোশাক পরা লোক এসে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর আমার পেট চিরে কী যেনো বের করলো। হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে আবু ইয়ালী, আবু নাঈম ও ইবনে আবী আসাকের বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন বললেন, তারা সংখ্যায় ছিলো তিন জন। একজনের হাতে ছিলো বরফে পরিপূর্ণ সোনার তশতরী। একজন আমাকে ধরে মাটিতে চিৎ করে শোয়ালো। আর একজন পেট ফেঁড়ে কী যেনো বের করে ফেললো। তারপর

পেটের অভ্যন্তরভাগ ধৌত করলো বরফ দিয়ে। উত্তমরূপে ধৌত করার পর দ্বিতীয় জন এগিয়ে এলো। সে বের করে ফেললো আমার হৃৎপিণ্ড। তারপর হৃৎপিণ্ড থেকে বের করলো কালো এক টুকরা গোশত। তারপর হাত ঘুরাতে লাগলো হৃৎপিণ্ডের ডানে ও বামে। মনে হচ্ছিলো, সে কী যেনো খুঁজছে। তখন আমার চোখে পড়লো তার হাতে রয়েছে একটি দ্যুতিময় আংটি। সেদিকে তাকালে দৃষ্টি হয়ে যায় স্থির। দেখলাম, ওই আংটি দ্বারা আমার হৃদয় মোহর করে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় হয়ে গেলো নূরে ভরপুর। ওই নূর ছিলো জ্ঞানের এবং নবুয়তের । তারপর আমার হৃৎপিণ্ডকে যথাস্থানে রেখে দিলো তারা। ওই মোহরের প্রভাব আমি অনুভব করেছিলাম বেশ কিছুকাল ধরে। আগন্তুকত্রয় এভাবে তাদের কার্য সমাপনের পর তৃতীয় জন বললো, তোমরা এবার সরে যাও। তার সঙ্গী দুজন সরে গেলো। সে হাত ঘোরালো আমার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লেগে গেলো চিরে ফেলা বুক ও পেট। হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর বক্ষদেশে সেলাইয়ের দাগ লক্ষ্য করেছি।

ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, একবার দেখা দিলো অনাবৃষ্টি। আবু তালিব রসুল স. কে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিপ্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন কাবা শরীফের চত্বরে। কাবাগৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনি ধরলেন রসুল স. এর একটি আঙুল। আকাশ ছিলো তখন নির্মেঘ। হঠাৎ শুরু হলো মেঘের আনাগোনা। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। প্লাবিত হয়ে গেলো সমগ্র উপত্যকা। এই ঘটনার কথাই আবু তালিব বলেছেন তাঁর স্বরচিত কবিতায় এভাবে— 'গৌরবর্ণের ওই ব্যক্তির অসিলায় বৃষ্টিপ্রার্থনা করা হয়। তিনি যে পিতৃহীনদের আশ্রয়স্থল এবং দাসীদের সতীত্ব রক্ষাকারী'।

'খোলাসাতুস্ সিয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বারো বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করেন। বসরায় পৌঁছলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খৃষ্টান সন্ন্যাসী বুহায়রার সঙ্গে। বুহায়রা রসুল স.কে দেখেই চিনতে পারেন যে, ইনিই সর্বশেষ রসুল। তিনি রসুল স. এর হাত ধরে বলেন, এই বালক আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির রহমতরূপে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা আপনি জানলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আপনারা যখন আপনাদের অবস্থান স্থল থেকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন আমি দেখলাম, বৃক্ষরাজি তাঁর দিকেই অবনত। বৃক্ষদের এ অবস্থা হয় কেবল নবী-রসুল দেখলে। আমরা আমাদের কিতাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি। বুহায়রা এরপর আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি এঁকে নিয়ে সিরিয়ায় যান, তবে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। আবু তালিব

আতংকিত হলেন। রসুল স. কে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকেই তিনি ফিরে এলেন মক্কায়। পরবর্তী সময়ে রসুল স. পুনরায় হজরত খাদিজার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় যান। সঙ্গে নেন হজরত খাদিজার এক ক্রীতদাসকে। তখন তিনি ছিলেন পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক। হজরত খাদিজার সঙ্গে তখনো তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়নি। সিরিয়ার এক গীর্জার পাশে তিনি যাত্রাবিরতি করলেন। উপবেশন করলেন এক বৃক্ষের নিচে। গীর্জার সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ক্রীতদাস মাইসারাকে লক্ষ্য করে বললেন, উনি কে? সে বললো, কুরায়েশ গোত্রের এক যুবক। সন্ন্যাসী বললেন, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই সন্ন্যাসী তখন রসুল স. এর কাছে এসে বললেন, আমি ইমান আনলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর যার আলোচনা রয়েছে তওরাত কিতাবে। এর পর তিনি তাঁর নবুয়তের মোহর দর্শন করলেন এবং তাতে চুম্বন প্রদানের পর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আপনি উম্মি, হাশেমী, আরাবী, মক্কী। আপনিই হাউজে কাওসারের অধিকর্তা। আপনিই শাফায়াতকারী। মহাবিচারের দিবসে আপনার হাতেই শোভা পাবে প্রশংসার পতাকা।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, মাইসারা যখন বলেছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। তার মধ্যে দুজন ফেরেশতা তাদের পক্ষবিস্তার করে ছায়া দিচ্ছে শেষ জামানার নবীকে। আর তিনি পথ অতিক্রম করছেন উষ্ট্রারোহী হয়ে। পরে মাইসারার এই মন্তব্য কানে গেলো হজরত খাদিজার। সে কারণেই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিলো রসুল স. এর সঙ্গে বিবাহবন্ধ হবার আকাঙ্খা।

সুহাইলি বলেছেন, 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউ উপবেশন করেনি'— খৃষ্টান সন্ন্যাসীর এ কথার অর্থ হবে, ওই সময় যিনি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, তিনি অবশ্যই নবী। তাঁর এমতো ব্যাখ্যাকে বাস্তবসম্মতই বলা যেতে পারে। কারণ পূর্ববর্তী নবী হজরত ঈসার সঙ্গে তাঁর মহাআবির্ভাবের সময়ের ব্যবধান ছিলো প্রায় পাঁচশত বছর। একটি গাছের বয়স সাধারণত এতো বছর হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া বৃক্ষটি ছিলো পথের পাশে। সে পথ দিয়ে পথিকদের ছিলো নিত্য আনাগোনা। সুতরাং কোনো পথিক ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসবেনা, এরকম কল্পনাও অসম্ভব। এসকল কারণে সুহাইলির ব্যাখ্যাটিকে যথার্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে 'কৃত্তু' শব্দটি, যার অর্থকে বিকৃত করাও যে যায় না। আর হাদিসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে 'নবী ছাড়া ওই বৃক্ষের নিচে কেউই উপবেশন করেনি'। সুতরাং বুঝতে হবে, নবী ছাড়া ওই বৃক্ষচ্ছায়ায় অন্য কারো উপবিষ্ট না

হওয়া একটি অলৌকিকত্ব। আর আল্লাহ্ কর্তৃক এমতো অলৌকিকতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব কিছু নয়। সুহাইলির ব্যাখ্যাটি থেকে কেবল এতটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ওই বৃক্ষটির বয়স হয়তো তখন হয়েছিলো দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর। আর ওই সময় পর্যন্ত ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন কেবল রসুল স.। তওরাতে বর্ণিত হয়েছে ওই বৃক্ষতলে উপবেশন করবেন কেবল আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্তায়ালাই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সালেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এখানে 'মিশকাত' অর্থ রসুল স. এর পবিত্র বক্ষ। আর 'যুজ্বাজ্ব' অর্থ তাঁর কলব। আর 'মিসবাহ' ওই নূর, যার দ্বারা সমুজ্জ্বল ছিলো তাঁর হৃদয়। 'পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষ' অর্থ হজরত ইব্রাহিম, রসুল স. ও বনী ইসরাইলের নবীগণ যার শাখা বা ফল। 'প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়' কথাটির অর্থ হজরত ইব্রাহিম ইহুদী অথবা খৃষ্টান কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত নন। আর 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি' কথাটির অর্থ এক নূর হজরত ইব্রাহিম, তার উপরে আর এক নূর রসুল স. স্বয়ং।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, এখানে 'মিশকাত' অর্থ হজরত ইব্রাহিম; 'যুজ্বাজ্ব' অর্থ হজরত ইসমাইল এবং 'মিসবাহ' অর্থ রসুল স.। অন্য আয়াতে রসুল স. কে বলা হয়েছে 'সিরাজ্বাম মুনীরা' (সমুজ্জ্বল প্রদীপ)। এখানেও 'প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হয় তেল থেকে' অর্থ 'সমুজ্জ্বল প্রদীপ' হজরত ইব্রাহিমের সত্তা, যা ছিলো জ্যোতির্ময়। আর হজরত ইব্রাহিম তো অবশ্যই ছিলেন কল্যাণময় ও জ্যোতির্ময়। অধিকাংশ নবী ছিলেন তাঁর বংশোদ্ভূত। একারণে তিনি ছিলেন এমন বৃক্ষ সদৃশ, যা প্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনি নয় প্রতীচ্যেরও। অর্থাৎ তিনি যেমন ইহুদী নন, তেমনি নন খৃষ্টানও। ইহুদীরা ইবাদত করে পশ্চিমমুখী হয়ে। তাই তাদেরকে বলা হয়েছে 'প্রতীচ্য'। আর খৃষ্টানেরা অভিহিত হয়েছে 'প্রাচ্য' বলে। আর এখানকার 'অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল, যেনো আলো দিচ্ছে' কথাটির অর্থ— প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বেই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো রসুল স. এর কামালিয়ত ও শুভ বৈশিষ্ট্যাবলী। অগ্নিসংযোগের পর, অর্থাৎ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর তা হয়ে উঠেছে আরো অধিক প্রোজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। 'নূরের উপরে নূর' অর্থ বংশগতভাবে তিনি হজরত ইব্রাহিমের নূরের উত্তরাধিকারী। তদুপরি তাঁর রয়েছে নিজস্ব নূর— নূরে মোহাম্মদী। সুতরাং অবশ্যই তিনি নূরের উপরে নূর বা জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আবুল আলীয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবাই ইবনে কা'ব আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এখানে উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে

বিশ্বাসীগণের। তাদের সত্তা যেনো একটি দীপাধার। কাঁচের আবরণ হচ্ছে তাদের বক্ষ, দীপ হচ্ছে তাদের অন্তঃকরণ। দীপালোক হচ্ছে ইমান ও কোরআনের আলো, যা বিদ্যমান থাকে তাদের হৃদয়ে। আর কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে তাদের বিশুদ্ধচিত্ততার আলো। অর্থাৎ তাদের এখলাসের আলো অর্জিত হয় কল্যাণময় বৃক্ষ থেকে। যেনো বৃক্ষটি ঘন অরণ্যের কোনো সবুজ সতেজ বৃক্ষ, যা পরিবেষ্টিত থাকে অনেক বৃক্ষের দ্বারা। আর যা সুরক্ষিত থাকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সূর্যালোক থেকে। বিশ্বাসীগণও এভাবে সুরক্ষিত থাকে ফেৎনা-ফাসাদ থেকে। চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে তাদের। যেমন— ১. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো কিছু পেলে তারা প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা ২. কিছু না পেলে ধারণ করে ধৈর্য ৩. বিচার-মীমাংসা করে ন্যায়ানুগতার সঙ্গে এবং ৪. উচ্চারণ করে সত্য বচন। তাদের অন্তর এরূপ প্রদীপে পরিণত হয় যে, প্রজ্জ্বলনের পূর্বেই মনে হয় তা থেকে আরো বিকিরিত হচ্ছে। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের পূর্বেই তারা লাভ করে সত্যের পরিচিতি। কেননা তাদের অন্তর স্বভাবতই সত্যমুখী। যেনো নূরের উপরে নূর। এক নূর হচ্ছে তাদের জ্ঞানের নূর। আর এক নূর হচ্ছে প্রবহমান নূর, কিয়ামতের সময় ওই নূরের প্রতিই তারা হবে ধাবমান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র নূরের দৃষ্টান্ত ওই নূর, যা বিদ্যমান থাকে মুমিনগণের অন্তরে। তাই তারা স্বভাবগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সত্যের উপর। শরিয়ত প্রতিপালণের মাধ্যমে যখন তাদের জ্ঞানার্জনে পরিপূর্ণতা আসে, তখন তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পৃক্তি ঘটে হেদায়েতের সঙ্গে। তখন জাগে জ্যোতির জোয়ার। যেনো জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও যথার্থ আমলের কারণে উন্মিলীত হয় সুফিয়ানে কেরামের অন্তর্নয়ণ। তখন তারা নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে সত্যকে আবাহন করে, পরিত্যাগ করে অসত্যকে। রসুল স. তাই আজ্ঞা করেছেন, মতদ্বৈধতার ক্ষেত্রে হৃদয়ের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কোরো, যদিও মুফতীগণ তোমাকে ফতোয়া দিয়ে দেয়। হাদিসটি উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন বোখারী তার 'ইতিহাস' গ্রন্থে। যখন মুমিনের অন্তরে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতে রসুলুল্লাহ্‌র জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে ইমান ও হেদায়েতের নূর। তার এই অবস্থার নামই 'নূরের উপরে নূর'। কালাবী বলেছেন, নূরের উপরে নূর অর্থ ইমান ও আমলের নূর। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ ইমান ও কোরআনের নূর।

হাসান ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে কোরআনের উপমা। প্রদীপ থেকে যেমন আলো লাভ হয়, তেমনি কোরআন নামক প্রদীপ থেকে লাভ হয় হেদায়েতের আলো। 'যুজাজ' বা কাঁচের আবরণ হচ্ছে মুমিনের

কলব। আর তার মুখ ও রসনা হচ্ছে প্রদীপাধার। কল্যাণময় বৃক্ষ হচ্ছে প্রত্যাদেশের বৃক্ষ। জয়তুন হচ্ছে কোরআনের প্রমাণপঞ্জী। তেল দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার অর্থ কোরআনের প্রমাণপঞ্জী দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, যদিও তা পাঠ না করা হয়। অর্থাৎ কোরআন অবতরণের পূর্বেই আল্লাহ্তায়ালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর হেদায়েতের নিদর্শন ও প্রমাণপঞ্জী। তারপর যখন কোরআন অবতীর্ণ হলো, তখন তা হয়ে গেলো জ্যোতির উপরে জ্যোতি। স্বভাবজ নূরের সঙ্গে মিলিত হলো অবতারিত কোরআনের নূর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে দেয়া হয়েছে ওই হেদায়েতের উপমা, যা বিদ্যমান রয়েছে সুস্পষ্ট আয়াতমালাতে যা দীপাধার সদৃশ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানুষের সন্দেহ ও অনুমানের অন্ধকার তার হেদায়েত প্রবণতাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। সুতরাং এই হেদায়েত হচ্ছে প্রদীপতুল্য, যা দূরে সরিয়ে রাখে তার চতুর্দিকের অন্ধকার। অথবা এরকম বলাও সঙ্গত যে, আল্লাহ্ মানুষকে দান করেছেন পাঁচটি বিশেষ শক্তি, যেগুলো সম্পৃক্ত হয় তার চাহিদা ও পরিণতির সঙ্গে। যেমন—

১. অনুভূতি শক্তি। এই শক্তি ধারণ করে মস্তিস্ক। মস্তিস্ক যা অনুভব করে, তা-ই সে প্রকাশ করে উপলব্ধির পাঁচটি পদ্ধতিতে।

২. ধারণা শক্তি। এই শক্তি অনুভূতি শক্তির সঞ্চিত জ্ঞাতব্যসমূহের ভাণ্ডার। অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই এই শক্তি লাভ করে পরিপুষ্টি এবং তা প্রয়োজনবশতঃ উপস্থাপন করে বোধশক্তির কাছে।

৩. বোধ শক্তি। এই শক্তির মধ্যে সমন্বয়িত থাকে অনেক একক উপলব্ধি। এভাবে এই শক্তি হয় অনেক একক অর্জনের সমন্বয়ন।

৪. চিন্তা শক্তি। এই শক্তি জ্ঞাত বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়ায় এবং এভাবে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে অজানা ও অনাবিষ্কৃত বিষয়াবলীকে। প্রমাণসমূহের সংযুক্তি ও বিন্যাস সাধনই এই শক্তির কাজ।

৫. পরিশুদ্ধি শক্তি। এই শক্তি লাভ করেন কেবল আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ। মহাশক্তির রহস্য ও অদৃশ্যের জ্যোতির উন্মেষ ঘটে এরই দ্বারা। এই শক্তিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'ওয়ালাকিন জায়ালনাহু নূরান নাহ্দীবিহী মান নাশাউ মিন ইবাদিনা' (কিন্তু আমি সেটাকে করেছি একটি জ্যোতি, যদ্দ্বারা আমি হেদায়েত করি আমার বান্দাদেরকে, যাকে ইচ্ছা)। আলোচ্য আয়াতে এই পাঁচটি শক্তিরই উপমা দেয়া হচ্ছে দীপাধার, কাঁচের আবরণ, দীপ, বৃক্ষ ও জয়তুনের মাধ্যমে।

অনুভূতি শক্তি প্রদীপ তুল্য। যেমন এটা একটি বাতায়ন অথবা আলোকাধার যা বহির্মূখী এবং যা কেবল উপলব্ধি করে বাইরের অনুভবযোগ্য বিষয়াবলীকে।

ভিতরের দিকে এ শক্তির কোনো গমনাগমন নেই। আর সে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে বুদ্ধিগত ভাবে, সত্তাগতভাবে নয়।

ধারণা শক্তি হচ্ছে কাঁচের আবরণের মতো, যা বুদ্ধির আলোককে রাখে সুরক্ষিত এবং আলোকময় হয় বোধশক্তির আলোয়।

বোধশক্তি হচ্ছে এক প্রকার প্রদীপ, যা সমষ্টির জ্ঞান ও আল্লাহ্-পরিচিতির আলোক দ্বারা সমুজ্জ্বল। আর চিন্তাশক্তি একটি কল্যাণময় বৃক্ষ, যার ফল ও ফসল অপরিসীম। তা একটি জয়তুন বৃক্ষ, যা থেকে নির্গত হয় তেল, আর ওই তেল দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় প্রদীপ। বৃক্ষটি আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনো অঞ্চলেরই নয়। কেননা বৃক্ষটি সকল প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতিগত ব্যাধি থেকে মুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে, এই চিন্তা-বৃক্ষটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ের মাঝে অবস্থিত। কল্যাণ লাভ করে উভয় দিক থেকে। আবার ব্যয়িত হয় উভয় দিকে। তাই তা প্রাচ্যের যেমন নয়, তেমনি নয় প্রতীচ্যেরও।

পরিশুদ্ধি শক্তি হচ্ছে জয়তুন তেলের মতো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন, যা চিন্তা-ভাবনা ও অন্যের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে আপনাআপনি পরিচিতিমূলক জ্ঞানের আলোকের প্রান্তে উপনীত হয়। এভাবে লাভ করে জ্ঞানালোকের সতত সংযোগ।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বোধশক্তির উপমা। প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকের বোধশক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে সকল প্রকার আকৃতি শূন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে জ্ঞানধারণের প্রভূত যোগ্যতা। এই অবস্থাকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'মিশকাত' (প্রদীপ)। প্রাচীন দার্শনিকগণ ও শায়েখ ইবনে সিনা উপলব্ধির এই অবস্থাকে চিহ্নিত করেছে মৌল জ্ঞানরূপে। এই অবস্থা থেকে বোধের স্তরান্তর ঘটে। তখন লাভ হয় প্রমাণাতীত বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তখন জ্ঞান লাভ হয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ব্যতিরেকেই। কিন্তু অনুমিত বিষয়ের জ্ঞান এমতাবস্থায় কার্যকর হয় না। তবে এমতোক্ষেত্রেও সচল থাকে নিকটের ও দূরের জ্ঞানগ্রহণের যোগ্যতা। প্রতিভাস বিদ্যমান থাকে সামগ্রিক অথবা আংশিক অর্জিত জ্ঞানের। শ্রমসাধ্য বিষয়াবলীর জ্ঞানও সে তখন অর্জন করতে পারে। জ্ঞানের পথের অভিযাত্রিক এমতো স্থানে পৌঁছে নিজেই হয়ে যায় আয়না সদৃশ। এখানে বোধ-চিন্তা-গবেষণা ও অর্জিত জ্ঞান মিলেমিশে হয় কল্যাণময় বৃক্ষের মতো, যেনো তা একটি জয়তুন বৃক্ষ। এখান থেকে যদি সে পুনরাগমন করে তবে তা হবে আহরিত জয়তুন তেল তুল্য। আর তার অর্জিত প্রজ্ঞা যদি হয় পরিশোধিত, তাহলে তার অবস্থা হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তেল ব্যতীতই এমন প্রজ্জ্বোল-সম্ভাবনা, যা অপেক্ষায় থাকে কেবল অগ্নি-স্পর্শের (ওহী অথবা ইলহামের)। তার পরিশুদ্ধি শক্তি তখন এমন হয় যে, প্রত্যাদেশ, প্রক্ষেপণ অথবা ফেরেশতাগণের স্পর্শ ছাড়াই সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয় আলোর বিকাশ। এরপর আরো অগ্রসর হলে তার

বোধশক্তি ধারণ করে দু'টি রূপ— ১. চিন্তা ও শ্রমলব্ধ জ্ঞান যা বিবেকের সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকে না। কিন্তু বিবেক যখন তা বুঝতে চায়, তখন তাকে উপস্থিত করাতে পারে। প্রতিচ্ছবি তো বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপণের। নয়তো বিবেক তার দর্শন লাভ করতে পারে না। বিবেক-চক্ষুর এই দর্শনকেই আমরা প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ২. আর যদি বিবেক-চক্ষুর সামনে ওই জ্ঞান সতত পরিদৃশ্যমান থাকে, তখন তার ওই অবস্থাকে আমরা বলতে পারি 'নূরের উপরে নূর'। জ্যোতির উপরে জ্যোতি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি তাঁর বিশুদ্ধ কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে আরো দু'টো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন—

'আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বপ্রদাতা। তিনিই এতদুভয়কে নিয়ে এসেছেন অনস্তিত্বের আড়াল থেকে। করেছেন তাঁর নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া।

'মাছালু নূরিহী' এর 'নূর' অর্থ অস্তিত্ব। 'নূর'কে মর্যাদায়িত করার উদ্দেশ্যেই এখানে আল্লাহ্ নূরের সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন তাঁর নিজের সঙ্গে। যেমন কাবাগৃহকে বলেছেন বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র গৃহ)। নবী সালেহের উষ্ট্রীকে বলেছেন 'নাকৃতুল্লাহ' (আল্লাহ্র উষ্ট্রী)। অথবা এরকমও বলা যে, আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির উপরে নূর নিক্ষেপকারী ও সৃষ্টিকে প্রদত্ত নূরের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাই দেখা যায় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্র-সূর্যের সম্মুখবর্তী, তার বিপরীত দিকেও প্রতিফলিত হয় চন্দ্র-সূর্যের কিরণ। কারণ পৃথিবী সতত আবর্তনপ্রবণ।

'কামিশকাতিন' অর্থ প্রদীপাধারের জ্যোতি। মোজাফ (সম্বন্ধপদ) এখানে উহ্য।

'ফীহা মিসবাহুন' অর্থ প্রদীপাধারের উপরে রয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, যার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে প্রদীপাধারও। এভাবেই আল্লাহ্তায়ালার সৌন্দর্যময় নাম ও গুণবত্তার নূরের ছায়া প্রতিচ্ছায়া থেকে সমগ্র সৃষ্টির মূল অর্জন করে অস্তিত্বগত নূর।

'আল মিসবাহু ফী যুজ্বাজ্বাতিন' অর্থ ওই প্রদীপের নূর আলোয় আলোয় ভরা। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেন, নবী ও অলিগণ ছাড়া অন্য সকলের ও সকল কিছুর সূচনাস্থল আল্লাহতায়ালার নাম গুণাবলীর সরাসরি প্রতিবিম্ব নয়, বরং প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া। এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা যেমন তাঁর নাম-গুণবত্তার আনূরূপ্যবিহীনতা সম্পর্কে অবহিত, তেমনি অবহিত আনূরূপ্যের জগতে প্রতিভাসিত তার প্রতিবিম্বিত প্রকাশ সম্পর্কেও। আর এই প্রতিভাস চিরন্তন নয়, যেহেতু তা মূল নয়, প্রতিবিম্ব। তাই প্রতিবিম্বের স্তরে দেখা দেয় বৈপরীত্য। যেমন

জীবন-মৃত্যু, জ্ঞান-অজ্ঞতা, সবল-দুর্বল, শ্রুতি-বধিরতা, দৃষ্টি-দৃষ্টিহীনতা, কথা-নীরবতা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সত্তা-নাম-গুণাবলী এরকম বৈপরীত্য থেকে সতত মুক্ত ও পবিত্র। আধ্যাত্মিক সাধকের জ্ঞান যখন এমতো বৈপরীত্যকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়, তখন তা রঞ্জিত হয় অক্ষয়তা ও চিরন্তনতার রঙে। তখনই ঘটে তার আত্মবিলোপন। অপরিণতি তখন পরিধান করে পরিণতি ও পূর্ণতার পরিচ্ছদ।

সুফিয়ানে কেরাম বলেন, সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছবি। তাই একে বলা যায় 'আয়ইয়ানে ছাবেতা' বা নাম-গুণাবলীর প্রকাশগত দিক, প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিচ্ছবিই সমগ্র সৃষ্টির ভিত্তি (আয়ইয়ানে ছাবেতা)। আল্লাহ্‌তায়ালাই এভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন। এই অবস্থাকেই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রদীপের উপমায়। আর তাঁর গুণাবলীর বিচ্ছুরণ হচ্ছে প্রদীপের আলো। প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাঁচের আবরণ বা আয়না। সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হচ্ছে প্রদীপাধার। প্রদীপের আলোয় তার কাঁচের আবরণ বা চিমনিও আলোকিত হয়। ফলে প্রদীপে আলোর সমুজ্জ্বল হয় স্বচ্ছ কাঁচ, অতঃপর ওই স্বচ্ছ কাঁচের দ্যুতিতে দ্যুতিময় হয় দীপাধার। দীপাধারে উৎসারিত হয় নূরের ঝলক।। এভাবেই সিফাতের (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) নূর আলোকিত করে তার প্রতিবিম্বকে। তাই বলা যেতে পারে প্রদীপ, প্রদীপাধার ও কাঁচের আবরণ আলোকিত হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালারই ইসম-সিফাতের নূরে, তাঁরই অভিপ্রায়ে ও দয়ায়। সৃষ্টির অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সচলতা তাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কেবলই অনুগ্রহ।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, নূর হচ্ছে আল্লাহর্ আনুরূপ্যবিহীন মুখাবয়বের পর্দা। ওই পর্দা উঠিয়ে নিলে একমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সমগ্র সৃষ্টি। সম্ভবতঃ এই হাদিসে উল্লেখিত 'নূর' অর্থ প্রতিবিম্বিত নূর। আর অবয়বের নূর হচ্ছে তাঁর সিফাতের নূর। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অস্তিত্বজ অযোগ্যতার কারণে সিফাতের প্রতিবিম্বের মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি সরাসরি সিফাত থেকে নূর আহরণ করতে পারে না। প্রতিবিম্বের এই মাধ্যম ছাড়া বিলুপ্ত হয়ে যেতো সমগ্র সৃষ্টি। অবশ্য আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ সরাসরি সিফাত থেকে নূর আহরণ করতে সক্ষম। বরং তারাই সিফাতের সরাসরি প্রতিবিম্ব। আর অন্য সকলে ও সকল কিছু প্রতিবিম্ব ওই প্রতিবিম্বের।

'আযযুজাজাতু কাআন্নাহাও কাওকাবুন দুরিয়্যুন' অর্থ প্রদীপের জ্যোতিতে কাঁচের আবরণ জ্যোতির্ময়। একারণেই কাঁচের আবরণকে কেউ কেউ মনে করে প্রদীপ। তারা প্রদীপ ও তার চিমনির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। এ অবস্থাকে জনৈক কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

রক্বক্বায যুজ্বাজু ওয়া রক্বক্বাতিল খমরু
ফাতাশাবাহা ওয়া তাশাকালাল আমরু

ফা কাআন্নামা খমরুন ওয়ালা যুজ্বাজুন ওয়া কাআন্নামা যুজ্বাজুন ওয়ালা খমরু।

অর্থঃ কাঁচ স্বচ্ছ, শরাবও স্বচ্ছ। দু'টোই দেখতে একরকম। তাই দেখলে মনে হয় শরাবই আছে, কাঁচপাত্র নেই। অথবা আছে কেবল কাঁচপাত্র, শরাব নেই।

সিফাতের প্রতিবিম্ব ও সিফাতও তেমনি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ নয়। তাই একদল আরেফ (আল্লাহ্‌র পরিচয়ধন্য) হয়েছেন 'ওয়াহদাতুল অজুদ' মতবাদের প্রবক্তা। তাঁদের দৃষ্টি বিহ্বল ও অদূরগামী। তাই তাঁরা প্রতিবিম্বকে মূল সিফাত মনে করেছেন। আবার সিফাতকেই মনে করেছেন জাত (সত্তা)। ধারণা করেছেন, সৃষ্টির উপরে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর যে নূর বর্ষিত হয়, ওই নূরই সৃষ্টির মূল। সেই নূরই মূল, সৃষ্টির অস্তিত্ব আদৌ নেই। তাই বলেছেন, জ্যোতিপ্রাপ্ত ও জ্যোতিদানকারী মূলতঃ অভিন্ন সত্তার দু'টি দিক। মূলে সবই এক, অবিভাজ্য আল্লাহ্। এমতো ভুল দর্শনজাত বিশ্বাসকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন এভাবে— লাইসা ফীল কাওনি ইল্লাল্লহ্ (জগতের অস্তিত্বে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই)। কেউ কেউ আবার বলেছেন— 'লাইসা ফী জুব্‌বাতী সেওয়াল্লহ' (আমার জোব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই)। জনৈক ওয়াহদাতুল অজুদ পন্থী কবি বলেছেন—

লা মুলকা সুলায়মানা ওয়ালা বিলকীসা ওয়ালা আদামিন ফীল কাওনী ওয়ালা ইবলিসা

অর্থঃ জগতের অস্তিত্বে না আছে সুলায়মানের সাম্রাজ্য, না বিলকিসের, না আদমের, না ইবলিসের।

আরো বলেছেন—

ওয়াল কুললু সুয়ারুন ওয়া আনতাল মা'না ইয়া মান হুয়া লিল কুলুবি মিক্বনাতীস্।

অর্থঃ হে ওই সত্তা যে অন্তরকে নিজের দিকের আকর্ষণ করার 'মিক্বনাতীস' (চুম্বকপাথর বিশেষ, যা প্রস্তরখণ্ডকে নিজের দিকে টানে) সদৃশ, তুমিই প্রকৃত অস্তিত্ব, অন্য সকল কিছু কেবলই প্রতিচ্ছবি, প্রতিকৃতি।

উল্লেখ্য, এধরনের বাক্যাবলী হচ্ছে প্রেমোন্মত্ততাজাত উচ্চারণ। এধরনের বক্তব্যপ্রদাতারা নূরগ্রহীতা ও নূরদাতার মধ্যে অস্তিত্বগত পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হননি।

'ইউকাদু মিন শাজ্বারাতিন মুবাররকাতিন যাইতুনাতিন' অর্থ ওই প্রদীপ কল্যাণময় জয়তুন বৃক্ষের তৈলের সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীর দিক রয়েছে দু'টি— একটি প্রকাশ্য, আর একটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দিকটি যেমন সম্ভাব্য, তেমনি অপ্রকাশ্য দিকটি অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রকাশ্য দিকটির সম্পর্ক রয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে, আর অপ্রকাশ্য দিকটি সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র সঙ্গে। সুতরাং সৃষ্টির দিকটি সম্ভাব্য এবং আল্লাহ্‌র দিকটি অবশ্যম্ভাবী। সিফাতের অবশ্যম্ভাবী দিকটিই নবী ও ফেরেশতাগণের মাবদায়ে তায়ুন (সূচনাস্থল)। আর সম্ভাব্য দিকটি সূচনাস্থল অন্য সকলের। অবশ্যম্ভাবী দিকটি যেহেতু সংগুপ্ত, তাই অদৃশ্য সত্তার সঙ্গেই তার প্রকৃত সম্পৃক্তি। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তা আনূরূপ্যবিহীনরূপে কল্যাণময়, যেনো তা কল্যাণের প্রতীক জয়তুন বৃক্ষ। আর ওই বৃক্ষ পূর্বমুখী যেমন নয়, তেমনি নয় পশ্চিমমুখী। অর্থাৎ তা সর্বমুখী কল্যাণপ্রদায়ক। আর গুণাবলী প্রদীপ সদৃশ যা জাত বা সত্তা থেকে অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে পৃথক ও অতিরিক্ত। এমতো ব্যাখ্যার প্রমাণ রয়েছে কোরআনে এবং রসুল স. এর বচনে। আর এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য।

ইমাম আবু হাসান আশরারী বলেছেন, সিফাত জাত নয়, আবার জাত থেকে পৃথকও নয়। দার্শনিকেরা ও মোতাজিলারা অতিরিক্তরূপে সিফাতের অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। জাতকেই তারা সিফাত বলে থাকে। আরো বলে, সিফাতকে জাত থেকে পৃথক করা হলে জাত হয়ে পড়বে সিফাতের মুখাপেক্ষী। আর এরকম হওয়া অসম্ভব। কেননা একাধিক সিফাতের মধ্যে তখন দেখা দিবে দ্বন্দ্ব। সুতরাং সিফাত কখনো জাত থেকে পৃথক অথবা অতিরিক্ত হতে পারে না। ইলমে কালামের আলেমগণ এর জবাবে বলেন, আপন গুণের প্রতি মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব ও অসম্মানজনক কিছু নয়। অন্যের মুখাপেক্ষিতাই কেবল অসম্ভব ও নিষিদ্ধ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেন, গুণাবলী অবশ্যই সত্তা থেকে অতিরিক্ত ও প্রকাশ্য জগতে অস্তিত্বশীল। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কোরআন ও হাদিসে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তা কখনো তাঁর নিজের গুণাবলীর মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ সত্তা স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ম্ভু। গুণাবলীর মাধ্যমে যা কার্যকর হয়, গুণাবলী ব্যতিরেকে কেবল তাঁর সত্তা দ্বারাই তা কার্যকর হওয়া সম্ভব। সুতরাং গুণাবলীর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ম্ভু সত্তা থেকে সকল নিয়ম পদ্ধতি যথাযথরূপে সচল থাকা সম্ভব। উদাহরণতঃ শ্রবণ ও দর্শন গুণ যদি অনুপস্থিতও থাকে, তবু কেবল সত্তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে শ্রবণ ও দর্শন। তখন সত্তাকেই বলতে হবে শ্রবণ ও দর্শন। সুতরাং বুঝতে হবে সকল গুণের ভিত্তি হচ্ছে সত্তা। আর প্রতিবিম্বের ভিত্তি হচ্ছে তার গুণাবলী। সুতরাং সম্মান, শক্তি ও নির্ভরতা সমস্তকিছুই ওই সত্তা থেকে সমুদ্ভূত তেলের ন্যায় , যা উৎপন্ন হয় কল্যাণময় জয়তুন বৃক্ষ সদৃশ সত্তায়। এটাই 'এটা প্রজ্জ্বলিত হয় তেল থেকে পুতপবিত্র

জয়তুন বৃক্ষের' বাক্যটির ব্যাখ্যা। অতএব বুঝতে হবে, গুণাবলীর অবিদ্যমানতায়ও সকল কার্যের সম্পৃক্তি সত্তার সঙ্গে সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ্র প্রতিটি গুণই প্রদীপের অগ্নি তুল্য। আর জয়তুন বৃক্ষ হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তার শক্তির উপমা।

'নূরুন আ'লা নূর' অর্থ— প্রথমত প্রদীপের নূর, যা আলোকিত করে রাখে মুকুর ও দীপাধারকে। দ্বিতীয়ত নূর জয়তুন বৃক্ষের তেলের । অর্থাৎ এক নূর সিফাতের, আরেক নূর জাতের। এভাবে সিফাতের মাধ্যমে এই দুই নূর আলোকিত করে রেখেছে সমগ্র সৃষ্টিকে। সুতরাং এ অবস্থারই নাম নূরুন আ'লা নূর (জ্যোতির উপরে জ্যোতি)।

এরপর বলা হয়েছে— ইয়াহদিল্লাহু লিনূরিহী মাঁইয়াশা' (আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন তাঁর মারেফাতের নূর। আর এ নূর যারা লাভ করেন তাঁরাই আরেফ (আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত)।

এই দলিলের ভিত্তিতে সকলকিছুর অস্তিত্ব পর্দা ও পর্দাহীনতা থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে এবং একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র সত্তাই সকল কিছুর সত্তা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। সুরা ক্বফের এক আয়াতে একথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে— 'নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারীদ' (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। এই আনুরূপ্যহীন নৈকট্যের যথাযথ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সুরা ক্বফের তাফসীরের যথাস্থানে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সংকলিত হয়েছে সলফে সালেহীনের বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে। ব্যাখ্যাটি এরকম— 'আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি' অর্থ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীবাসীগণকে মারেফতের পথ প্রদর্শনকারী। তাই তার জ্যোতির মাধ্যমেই তারা তার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। লাভ করে তাঁর নৈকট্য। 'ক্বরীবুম মিনাল মুহসিনীন' এবং 'আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাজীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান্ নূর'— এই আয়াতদ্বয়ে পরোক্ষভাবে এই নূরেরই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্যভাজন হয়, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। তখন আমি হই ওই প্রিয়ভাজনের কর্ণ ও চক্ষু, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে ও দেখে। উল্লেখ্য, এমতো নৈকট্যভাজনতার নামই বেলায়েত।

'মাছালু নূরিহী কামিশকাতিন ফীহা মিসবাহুন' অর্থ বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাঁর নূর এরকম, যেমন দীপাধারের জ্যোতি, যার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত থাকে প্রদীপ। সুতরাং বিশ্বাসীর অন্তর যেনো দীপাধার, যার মধ্যে বিকিরিত হয় আল্লাহ্র গুণাবলীর

জ্যোতিচ্ছটা। আর আল্লাহ্র গুণাবলী প্রদীপের আলোর মতোন। ওই প্রদীপ জ্বলে পূতপবিত্র জয়তুন বৃক্ষ সদৃশ আল্লাহ্র সত্তার তেল দ্বারা, সে বৃক্ষ আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোনোখানেই নেই। অর্থাৎ তা স্থানাতীত। ওই স্থানাতীত স্থান থেকেই প্রদীপ গ্রহণ করে তার আলো ও প্রজ্জ্বলন শক্তি।

'আলমিসবাহু ফী যুজ্বাজ্বাতিন, আয্যুজ্বাজ্বাতু কাআন্নাহা কাওবাবুন দুররিউন' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে— আউলিয়া সম্প্রদায় সাধারণতঃ আল্লাহ্র গুণাবলী থেকে সরাসরি জ্যোতি আহরণ করতে পারেন না। তাঁরা জ্যোতি আহরণ করেন প্রতিবিম্বের মাধ্যমে। ওই প্রতিবিম্ব হচ্ছে আল্লাহ্র গুণরাজির প্রতিবিম্ব। সরাসরি গুণরাজি থেকে নূর আহরণ করেন কেবল নবী-রসুলগণ। অন্যেরা করে গুণরাজির প্রতিবিম্ব থেকে। ওই প্রতিবিম্বের মধ্যেই সাধিত হয় আউলিয়াগণের ফানা ও বাকা। এবং তাঁদের নৈকট্যও ওই প্রতিবিম্বজাত। ওই নৈকট্যের নাম বেলায়েতে সোগরা। তবে অতি অল্পসংখ্যক কামেল ব্যক্তি শরিয়তপ্রণেতার নিখুঁত অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিবিম্বের বৃত্ত অতিক্রম করেন। সরাসরি নূর আহরণ করতে সক্ষম হন গুণরাজি থেকে। বরং তাঁরা উন্নীত হন আরো উচ্চ স্তরে— আল্লাহ্র শানসমূহের স্তরে। সেখানেই সংঘটিত হয় তাঁদের ফানা ও বাকা। এমতো পূর্ণতার রয়েছে আবার দু'টি দিক— একটি প্রকাশ্য, আর একটি গোপন। প্রকাশ্য দিকটি হচ্ছে বেলায়েতে কোবরা, যা আম্বিয়াগণের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। আর গোপন দিকটির নাম বেলায়েতে উলিয়া, যা নির্ধারিত বিশেষভাবে ফেরেশতাদের জন্য।

আম্বিয়াগণের মাকামের নিম্নবর্তী মাকাম হচ্ছে সিদ্দিকিয়াতের মাকাম। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা সিদ্দীক, তাঁদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালিন' (পূর্ববর্তীগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক এবং সাহাবী নন, এমন সিদ্দীকগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ওয়াক্বলীলুম মিনা আখিরীন' (আর পরবর্তীগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক)। সিদ্দীকগণ গুণরাজি ও শানসমূহের বৃত্ত অতিক্রম করে উপনীত হন নিছক সত্তা সকাশে এবং সেখান থেকেই সরাসরি আহরণ করেন নূর। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তা থেকে তাঁদের উপরে ঘটে জ্যোতিসম্পাত। গুণরাজি ও শানসমূহের পর্দা তখন থাকেই না। সিদ্দীকগণের এই দুই শ্রেণী সম্পর্কে অবশ্য আলোচ্য আয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। 'নূরের উপরে নূর' কথাটি তাই এখানে কেবল আউলিয়াগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথাটির অর্থ— নূরের উপরেও যেহেতু নূর আছে, তাই বুঝতে হবে আউলিয়াগণের বেলায়েতের মধ্যে আছে অনেক স্তরগত পার্থক্য।

'ইয়াহদিয়াল্লহু লিনূরিহী মাঁইয়াশা-উ' অর্থ 'আল্লাহ্ তাঁর নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করেন'। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেছেন অন্ধকারে, অতঃপর তার উপরে ঘটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূরের ছটা যে পেয়েছে, সে-ই পেয়েছে পথের সন্ধান। আর যে পায়নি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে ললাটলিপি লিপিবদ্ধ করার কালি। আহমদ, তিরমিজি। এর অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন অজ্ঞতার অন্ধকারে। তারপর তার উপরে নিক্ষেপ করেছেন নূর। ওই নূরের ঝলক যে পেয়েছে, সে পেয়েছে হেদায়েত এবং যে পায়নি, সে হয়েছে গোমরাহ্। আর ওই নূর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রতিসরিত ও পরিব্যপ্ত হয়েছে বিশ্বসমূহের রহমতরূপী রসুল স. এর মাধ্যমে এভাবে— তাঁর বক্ষদেশকে করা হয়েছে সম্প্রসারিত, তারপর তাতে ঢেলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নূর। পরিপূর্ণ করা হয়েছে তাঁর বিশ্বাসকে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁকেই একমাত্র অনুসরণীয় বলে মেনে নিলো, সে হয়ে গেলো ওই রহমতের আয়না, হলো ওই রহমতের নূরে সমুজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল ও সাধ্যমতো পরিপূর্ণ।

মানুষ তিন ধরনের— ১. যাঁরা লাভ করেছেন অক্ষয় বিশ্বাস। লাভ করেছেন পরিত্রাণ, দুনিয়ায় পাপ থেকে এবং আখেরাতে দোজখ থেকে। ২. যারা লাভ করে বিশ্বাসের মূল তত্ত্ব— এ তত্ত্ব আবার বহু স্তরবিশিষ্ট। ৩. যারা বিশ্বাসবিচ্যুত, এরাই পথহারা, গোমরাহ।

হজরত আবু আমবাসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্র নূরের আধার । অর্থাৎ পুণ্যবানগণের হৃদয় আল্লাহ্র নূরে পরিপূর্ণ। তাই তাঁরা হন বিনয়াবণত ও নম্র। তাঁরাই আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।

'ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লহুল আমছালা লিন্নাস' (আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন)। একথার অর্থ— আল্লাহ্ দুর্বোধ্য বিষয়াবলীকে বোধগম্য করবার জন্য উৎকৃষ্ট উপমার অবতারণা করে থাকেন। আলোচ্য বাক্যের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে উপমার জগতে ওই সকল বিষয়াবলীর প্রতিচ্ছবি দর্শন করান, বাস্তব জগতে যার কোনো সাদৃশ্য নেই। এটাকে সত্যদর্শনও বলা যেতে পারে। বান্দাগণ যে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন হন, তা তো কোরআন ও হাদিসের দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এই নৈকট্যের স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। ওই অবস্থা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অনুভূতির অতীত। বুদ্ধি-প্রজ্ঞা কোনোকিছুই ওই স্থান পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান-আত্মজ্ঞান

(ইলমে হুসুলী-ইলমে হুজুরী) কোনো জ্ঞানের সঙ্গে ওই নৈকট্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ওই জ্ঞান দান করা হয় সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এই অবস্থাকেই হাদিসে কুদসীতে পরোক্ষ ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি হই তার কর্ণ ও শ্রবণ, যার দ্বারা সে শোনে ও দেখে'। সত্তাসম্পৃক্ত সরাসরি এই প্রাপ্তি অন্য একটি মাধ্যমেও হওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে উপমার জগত। ওই জগতে এমন আকৃতি প্রতিভাসিত হয়, বাস্তব জগতে যার কোনো আকৃতি নেই। যেমন— শত্রুতা, ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অজ্ঞতা ইত্যাদি। অবশ্য বাস্তব জগতে বা পৃথিবীতে এগুলোর প্রকাশস্থল বিদ্যমান। সুফী-আউলিয়াগণ উপমার জগতে এগুলো দেখে থাকেন প্রতিবিম্বের বৃত্তে। তাঁদের নফল ইবাদত যতো বিশুদ্ধ হয়, ততোই তাঁদের ওই দর্শন লাভ করে অধিকতর নৈকট্য। পরিশেষে ওই বৃত্তের গভীরে হারিয়ে যায় তাঁদের সত্তা। এভাবে তাঁরা স্পর্শ করেন আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সর্বশেষ সীমানা এবং পরিপূর্ণরূপে রঞ্জিত হয়ে যান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর রঙে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো রঙও নেই। কারণ ওই স্তর রঙের অতীত। ভাষা ওই অবস্থা প্রকাশ করতে অক্ষম। 'রঙ' শব্দটি তাই ব্যবহার করা হয়েছে নিরূপায় হয়ে। এ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে আর একটি আয়াতে এভাবে— 'আমি তাদেরকে তাদের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, যেনো তাদের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌ই সত্য'।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অবগতিবিহীন কোনো তথ্য প্রকাশ করেন না, অজ্ঞতাপ্রসূত কোনো উপমাও দেন না। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৬

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

❑ আল্লাহ্ তাঁহার নাম স্মরণ করিবার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন সেথায় সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

---

এখানে 'সেই সকল গৃহ' অর্থ সেই সকল মসজিদ। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীর মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র গৃহ। পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন সমুজ্জ্বল,আকাশবাসীদের

দৃষ্টিতে পৃথিবীর মসজিদসমূহও তেমনি। আর মসজিদসমূহ সমুন্নত করার অর্থ পৃথিবীতে মসজিদসমূহ নির্মাণ করা। এরকম বলেছেন মুজাহিদ।

এখানে 'রফা' অর্থ সমুন্নত করা বা প্রতিষ্ঠা করা। শব্দটি 'প্রতিষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'ওয়া ইজ্ ইয়ূরফাউ' ইবরাহীমু ক্বাওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া ইসমাইল' (যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল আল্লাহ্র গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলো)। রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্র স্মরণ প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন জান্নাতে। হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে।

হাসান বলেছেন, এখানকার 'আজিনাল্লহু আন তুরফায়া' কথাটির অর্থ 'আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর গৃহের সম্মান করতে'। অর্থাৎ মসজিদে অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলা যাবে না। 'আন তাহ্হিরা বাইতিয়া' আয়াতটির অর্থও এরকম। অর্থাৎ মসজিদে নিরর্থক ও অসুন্দর কথা বলা যাবেই না। সালেহ্ ইবনে হাব্বান সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেন, হজরত বুরাইদা বলেছেন, কেবল চারটি মসজিদ মহাসম্মানিত, যেগুলো নির্মাণ করেছেন পয়গম্বরগণ। কাবা মসজিদ তৈরী করেছেন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইল, বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছেন হজরত দাউদ ও হজরত সুলায়মান। আর মদীনার মসজিদ ও মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা করেছেন রসুল স. স্বয়ং। এর মধ্যে কোবা মসজিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা ওই মসজিদ যা প্রথম দিবস থেকেই তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলি, যদিও উল্লেখিত মসজিদ চতুষ্টয় মহাসম্মানিত, তবুও এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল ওই চারটি মসজিদের কথা। বরং সকল মসজিদই এখানকার বক্তব্যভূত। আবার এরকম বলারও কোনো কারণ নেই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নূরের যে উপমা দিয়েছেন, সেই নূর হচ্ছে মসজিদসমূহে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ বা আলো। আমার কাছে এরকম ব্যাখ্যা দুর্বল। পূর্ববর্তী আয়াতের প্রসঙ্গ এই আয়াতে প্রবহমান নয়। আর এমতো ব্যাখ্যাও ভিত্তিহীন যে, মসজিদে ব্যবহৃত কাঁচ নির্মিত ঝাড়বাতির সঙ্গে রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'দীপাধার' 'প্রদীপ' ইত্যাদির সম্পৃক্তি। কারণ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের গৃহেও এর চেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল ঝাড়বাতি ব্যবহৃত হয়। এরকম বলাই বরং সুসঙ্গত হবে যে, পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন তাঁর জ্যোতির দিকে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে এই আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। কারণ মসজিদে ইতেকাফকারী ও নামাজ সম্পাদনকারীরাই সাধারণতঃ পথ পেয়ে থাকেন আল্লাহ্র নূরের দিকে। রসুল স. বলেছেন, নামাজ মুমিনগণের মেরাজ। আরো আজ্ঞা করেছেন, বান্দা সেজদাবনত অবস্থায় লাভ করে তার প্রভুপালকের

অধিকতর নৈকট্য। সুতরাং তোমরা সেজদাবনত অবস্থায় অধিক প্রার্থনা কোরো। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানকার বক্তব্যটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত নির্দেশের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে কথাটি দাঁড়ায়— তোমরা আল্লাহ্‌র গৃহসমূহে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করো।

'ওয়া ইউজকারা ফীহাসমুহু' অর্থ— আল্লাহ্ এরকমও নির্দেশ দিয়েছেন যে ওই গৃহসমূহে যেনো আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়— নামাজে হোক, অথবা নামাজের বাইরে। হজরত ইবনে আব্বাস 'তাঁর নাম স্মরণ করবার জন্য' কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁর কিতাব পাঠ করবার জন্য।

'ইউসাব্বিহু লাহু ফীহা বিল গুদুয়্যি ওয়াল আসল' অর্থ কিছুসংখ্যক লোক ওই গৃহসমূহে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পাঠ করা। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয় তো নামাজ পাঠের জন্যই। ফজরের নামাজ হচ্ছে সকালের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা এবং অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের নামাজ হচ্ছে সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা। 'আসাল' শব্দটি এখানে বহুবচনার্থক। এর অর্থ দিবসের শেষাংশ। কেউ কেউ বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনার কথা বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কেবল ফজর ও আসর নামাজকে। বিশেষভাবে এই দুই ওয়াক্তের নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ ফজরের সময়ে মানুষ থাকে সাধারণত নিদ্রামগ্ন এবং আসরের সময়ে থাকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় মুখর। তাই রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই শীতলতার সময়ের নামাজ পড়বে, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু মুসা থেকে। আর আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নামাজের যত্ন কোরো, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাজের' (আসরের)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সকালের পবিত্রতা বর্ণনা হচ্ছে চাশতের নামাজ। কারণ রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করে নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ইহরামবদ্ধ হজ পালনকারীর সমান পুণ্য। আর যে ব্যক্তি এভাবে পবিত্র হয়ে চাশতের নামাজ পড়তে যায়, সে লাভ করে ওমরা পালনকারীর সমান সওয়াব। তদুপরি তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয় পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ পাঠ করার মতো পুণ্য।

বাগবী ও তিবরানী হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পদব্রজে ফরজ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে গমন করে, সে যেনো পালন করে একটি হজ। আর যে ব্যক্তি গমন করে নফল নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে, সে যেনো পালন করে একটি নফল ওমরা।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ الزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

❐ সেই সব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহের স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িবে।

❐ তাহারা আল্লাহের মহিমা ঘোষণা করে যাহাতে তাহারা যে-সৎকর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না'। এখানে 'রিজ্বালুন' অর্থ সেই সব লোক। অর্থাৎ সেই সকল পুরুষ। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে কেবল পুরুষদের কথা। কারণ মেয়েদের জন্য সাধারণতঃ জামাতে নামাজ পাঠ ও জুমআ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করা অত্যাবশ্যক নয়। অথবা মেয়েরা সাধারণতঃ হয় অসতর্কা ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না। তাই তাদের কথা এখানে রয়েছে অনুল্লেখিত।

'তিজ্বারাত' অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়। এরপর বায়উন (বিক্রয়) শব্দটির উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'বিক্রয়' কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একারণে যে, ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয়ের গুরুত্ব অধিক। ক্রয়ের মধ্যে রয়েছে উপকার, কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কেউ কেউ আবার বলেন, 'তিজ্বারাত' এর অর্থ এখানে 'ক্রয়-বিক্রয়' না হয়ে হবে

কেবল 'ক্রয়' এবং 'বায়' অর্থ বিক্রয়। এভাবে শব্দ দু'টোর সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াবে ক্রয়-বিক্রয়। অথবা 'তিজারাত' অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য এবং 'বায়' অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। উল্লেখ্য, ক্রয় হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রারম্ভিকা।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'তিজ্বারাত' এর উদ্দেশ্য এখানে আদান-প্রদানের উপকারিতা। এরপর 'বায়' উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয়েছে বিক্রয়ের গুরুত্বকে। ফাররা বলেন, 'তিজ্বারাত' এর সম্পর্ক আমদানীকারকদের সঙ্গে আর রপ্তানীকারকদের সম্পর্ক 'বায়' এর।

'জিকরিল্লাহ্' (আল্লাহ্র স্মরণ) অর্থ নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন। সালেম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার আমি ছিলাম বাজারে। এমন সময় নামাজের একামত শুরু হলো। বাজারের লোকজন দোকান পাট বন্ধ করে শামিল হলো নামাজের জামাতে। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

অথবা এখানে 'জিকরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সার্বক্ষণিক জিকির। এভাবে 'জিকির' শব্দটি হবে ব্যাপক অর্থবোধক। ওই সকল ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সর্বক্ষণ থাকে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন। অন্তর্ভুক্ত হবে ওই সকল লোকও, যারা জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করে না বটে, কিন্তু যাদের অন্তর থাকে সতত স্মরণমুখর। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব দায়িত্ব যাদের অন্তরকে আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের বাহির পৃথিবীর প্রয়োজন সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ পার্থিবতা থেকে বিমুখ।

'ইক্বামিস্ সালাত' অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা। বাগবী লিখেছেন, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ যথাসময়ে নামাজ পাঠ। যথাসময়ে যারা নামাজ পাঠ করে না, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী নয়।

'ওয়া ঈতাইয্যাকাত' অর্থ জাকাত প্রদান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ যথানিয়মে, যথাসময়ে ও যথাপাত্রে যারা জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জাকাত' অর্থ সকল প্রকার পুণ্যকর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ভয় করে সেই দিনকে। যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে'।

এখানে 'তাতাক্বাল্লাবু' অর্থ ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে বা উলটপালট হয়ে যাবে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— সেদিন অবিশ্বাসীদের অন্তর অবস্থান গ্রহণ করবে অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার বিপরীতে। তাদের দৃষ্টি থেকে সরে যাবে ভ্রষ্টতার পর্দা। তাদেরকে দেখানো হবে এমন দৃশ্যাবলী, যা তারা কখনো দেখেনি

এবং যা তারা ইতোপূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি। বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে অন্যরকম। তারা তো পূর্ব থেকেই অনুগত ও তুষ্ট ছিলো আল্লাহ্র বিধানাবলীর প্রতি। তাই সেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি হয়ে যাবে পরিবর্তিত। তারা তখন তাদের প্রভুপালককে দেখবে চতুর্দশীর চন্দ্র অথবা চতুর্থ প্রহরের সূর্যের মতো।

কেউ কেউ বলেছেন, সেদিন শাস্তির ভয় ও মুক্তির আশায় বিহ্বল ও চঞ্চল হয়ে পড়বে বিশ্বাসীগণের অন্তরও। দৃষ্টি সঞ্চালিত হবে এদিকে ওদিকে। ক্ষণে ক্ষণে শংকিত ও আশান্বিত হয়ে দেখতে থাকবে কোনদিক থেকে আসবে ডাক— বাম দিক থেকে, না ডান দিক থেকে। আমলনামাই বা হাতে আসবে কী ভাবে, সম্মুখ থেকে, না পশ্চাৎ দিক থেকে, না উল্টো ঘুরে। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সে দিন ভয়ে ও ত্রাসে তাদের অন্তর্দেশে ঘটবে বিপর্যয়। অন্তর আটকে যাবে কণ্ঠদেশে— নিচেও নামবে না, যেতে পারবে না উপরেও। আর তখনকার ভয়াবহ অবস্থা দেখে চোখ হয়ে যাবে নিষ্পলক, পাথরের মতো নিশ্চল, অথবা দৃষ্টিবিবর্জিত।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করে যাতে তারা যে সৎকর্ম করে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন'। আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে ৩৬ সংখ্যক আয়াতের 'ইউসাব্বিহু' (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে), অথবা ৩৭ সংখ্যক আয়াতের 'তুলহীহিম' (ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না) এর সঙ্গে। তাই বলা যায় আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অথবা আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে' কথাটির সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের শুরুতে লিখিত 'লাম' অক্ষরটি হবে প্রতিফলজ্ঞাপক। তখন বলতে হবে, পূর্ববর্তী আয়াতের উদ্দেশ্য বা কারণ বর্ণনা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য নয়। কেননা ভয় ইত্যাদি ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ও কারণ স্বেচ্ছানির্ভর কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

'ওয়া ইয়াযীদাহুম মিন ফাদ্বলিহী' অর্থ 'এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন'। অর্থাৎ আমলের প্রতিদান প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন, দান করে তার চেয়ে বেশী, যা তাদের প্রাপ্য নয়, যা তাদের প্রতি প্রদত্ত দয়া এবং যা ছিলো তাদের ধারণার অতীত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। একথার অর্থ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন অগণন জীবনোপকরণ। তাঁর অভিপ্রায়কে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। কারণ তিনি যে তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে সতত স্বাধীন, চিরমুক্ত।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْــًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۙ﴿۳۹﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসম, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছুই নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্‌কে অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❒ অথবা উহাদিগের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরংগের পর তরংগ, যাহার উর্ধ্ব দেশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোনও জ্যোতিই নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের আমল তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কারণ তা মরুভূমির মরীচিকার মতো অস্তিত্বহীন। মরুভূমির পিপাসার্ত পথিকেরা মরীচিকাকে পানি মনে করে কাছে যায়, কিন্তু কিছুই পায় না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীও তেমনি তাদের স্বকপোলকল্পিত পুণ্যকর্মের বিনিময় আখেরাতে পাবে না। সেখানে পাবে কেবল আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে। আল্লাহ্ তখন তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি দিবেন পূর্ণ মাত্রায়। তখন সকলেরই হিসাব গ্রহণ করবেন তিনি। একজনের হিসাব গ্রহণ অন্য একজনের হিসাব গ্রহণকে বিলম্বিত করবে না। পৃথিবীর অর্ধদিবসের সমান সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তিনি হিসাব গ্রহণে অতুলনীয়রূপে তৎপর।

অবিশ্বাসীদের কর্মসমূহ সেদিন হবে নিষ্ফল। মরীচিকার মতো। মরীচিকা বলে চাকচিক্যময় বালুরাশিকে যা দৃষ্টিগোচর হয় মরুভূমিতে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রতাপে দূর থেকে ওই বালুকারাশী ভ্রম হয় পানি বলে।

'ক্বীয়া'হ' এবং 'ক্বায়' অর্থ একটি সমতল প্রান্তর। এর বহুবচনবোধক সর্বনাম হচ্ছে 'ক্বীয়ান'। আর 'ক্বুয়াইইন' হচ্ছে তাসগীরের (ন্যূনতাসূচক তার) শব্দরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বীয়াতুন' হচ্ছে 'ক্বাউন' এর বহুবচন। মরুভূমির প্রান্তরসমূহে দূর থেকে দর্শনীয় মরীচিকাকে মনে হয় পানি। সেই মরীচিকাকেই এখানে উপমা করা হয়েছে কাফেরদের কর্মসমূহের পরিণামের। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ব্যর্থতাই তাদের অবশেষ পরিণাম।

একটি সন্দেহ ঃ 'সে সেথায় পাবে আল্লাহ্কে' কথাটির অর্থ এখানে— সে মহাবিচারের দিবসে যখন তার হিসাব গ্রহণের স্থানে উপস্থিত হবে, তখন পাবে তার জন্য প্রস্তুত আল্লাহ্র শাস্তির সিদ্ধান্তকে অথবা শাস্তিকে। তাহলে কীভাবে বলা যাবে যে এখানকার 'ওয়াজ্বাদা' (সে পেলো) এর সর্বনামের সম্পর্ক হবে 'সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে'(কাফারু) এর সঙ্গে। যেখানে মরীচিকার মতো কাল্পনিকতা দৃষ্ট হয়, সেখানে আল্লাহ্কে লাভ করা তো একটি অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা।

সন্দেহের নিরসন ঃ আমার মতে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যেতে পারে দুইভাবে— ১. শেষ বিচারের দিবসে কাফেরেরা হবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত। তখন পানির আকারে তার সামনে দেখা দিবে আগুন। পানি মনে করে সে তখন সেদিকেই ছুটে যাবে। কিন্তু কাংখিত পানির বদলে সেখানে পাবে আল্লাহ্র আযাবরূপী আগুন। এভাবে তার প্রচেষ্টা পর্যবসিত হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায়। ২. এখানে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে, সে আযাব আখেরাতের নয়, দুনিয়ার। মানুষের অপকর্মই পার্থিব বিপদাপদসমূহের কারণ যার মর্মার্থ দুঃখ, অসফলতা। অধিক তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরীচিকার সামনে পড়লে যেমন হয়।। তাই অন্যত্র এরশাদ হয়েছে— 'তোমাদের উপরে যে বিপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল'। আর আল্লাহ্ তোমাদের অনেক অপরাধ ক্ষমা করে দেন (নতুবা শাস্তি হতো আরো অনেক বেশী)।

উত্তম উপায় হচ্ছে, 'হাত্তা' অর্থাৎ 'তার নিকট উপস্থিত হলে' কথাটিকে এখানে প্রারম্ভিকা ধরে নিলে একথা মেনে নিতে হবে যে, এর সম্পর্ক রয়েছে 'আ'মালুহুম কাসারাবিন' (তাদের কর্ম মরীচিকাময়) এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যখন সেখানে তাদের আপনাপন আমলের নিকটে পৌঁছবে এবং হিসাব প্রদানের কাজ শেষ করবে, তখন দেখবে সম্মুখে কেবল আল্লাহ্র শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতএব বুঝতে হবে এখানকার 'জ্বাআহু' কথাটির ''জ্বাআ' শব্দের সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে, 'জামআন' এর সঙ্গে হবে না। আর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক হবে আমল বা কর্মের সঙ্গে। মরীচিকার সঙ্গে নয়।

এরপর বলা হয়েছে — 'আর আল্লাহ্পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ একের হিসাব গ্রহণের বেলায় বিলম্বিত হবে না আরেকজনের হিসাব গ্রহণ। পৃথিবীর অর্ধ দিবস পরিমাণ সময়ের মধ্যে সাঙ্গ হবে হিসাব নিকাশ।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'অথবা তাদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ'। এখানকার 'অন্ধকার' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে মরীচিকার সঙ্গে। এভাবে বলা হয়েছে, তাদের কর্মসমূহ মরীচিকার মতো অথবা ঘন অন্ধকারের মতো, যে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে অতল সমুদ্র সম তলদেশে। তাই পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের কর্মসমূহ হবে অকল্যাণকর ও আক্ষেপ-উদ্রেকক।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'অথবা' উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মসমূহের প্রকারগত পার্থক্যের কথা। কারণ তাদের পাপকর্মের সাথে থাকে কিছু কিছু পুণ্যকর্মও— যেমন দান-ধ্যান, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদাচরণ ইত্যাদি। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের প্রথম প্রকারের আমল মরীচিকার মতো এবং দ্বিতীয় প্রকারের আমল অন্ধকারের মতো। কিংবা এখানে এরকম বলার সুযোগও রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের আমলের সময়গত ও স্থানগত বিভাজনকে। বলা হয়েছে, আখেরাতে তাদের আমল মরুভূমিতে পরিদৃষ্ট মরীচিকার মতো এবং দুনিয়ায় ঘোর অন্ধকার সমুদ্র সদৃশ।

'লুজ্জ্বীয়্যিন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই আঁধারকে যা বিদ্যমান থাকে অথৈসমুদ্রের অভ্যন্তরভাগে। 'লুজ্জুন' অর্থ ওই হ্রদ বা জলাশয়, যেখানে পানি আবদ্ধ থাকে। বায়যাবী বলেছেন, 'লুজ্জ্বীয়্যিন' অর্থ সমুদ্রের ওই অংশ, যেখানে থাকে অতল সলিল। 'নেহায়া' ও 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ অনেক পানি। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। 'মাওজুন' অর্থ তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যা উদ্বেলিত হয় ক্ষিপ্র বাতাসের প্রভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যার উর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপরে আরেক অন্ধকার, হাত বের করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না'। একথার অর্থ— সমুদ্রজ তমসাই কেবল নয় তার উপরে রয়েছে ঘন ও পুঞ্জীভূত মেঘ, যা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের দ্যুতিরোধক। এভাবে এক অন্ধকারের উপরে আর এক অন্ধকার। এরূপ অন্ধকারে নিপতিত ব্যক্তি কি তার হাত বের করলে দেখতে পায়? পায় না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো এরকম অন্ধকারেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

উল্লেখ্য, এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তুলনা করা হয়েছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ ঘোর অন্ধকার সমুদ্রের ও ঘনকালো জমাট মেঘমালার নিচে আটকে পড়া পথহারা এক নাবিকের সঙ্গে, যদিও এখানে সে নাবিকের স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

প্রকৃত কথা এই যে, কাফেরদের অপকর্মসমূহের কালিমা তাদের অন্তরে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, যা তার সত্যোপলব্ধি ও পথপ্রাপ্তির অন্তরায়। সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবৃত্তি হচ্ছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ অতলান্তিক অন্ধকার সমুদ্রের মতো। তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে চিরভ্রষ্টতার ঘনকালো মেঘের ছায়া সদৃশ মোহর। তাই তো তারা দেখতে পায় না ইমান ও ইসলামের চিরন্তন জ্যোতির্ময়তাকে। অস্বীকার করে মানুষের সর্বাপেক্ষা আপনজন নবী-রসুলগণকে। প্রত্যাখ্যান করে বসে তাদের আনীত গ্রন্থসমূহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজিকে। উপাসনায় প্রলিপ্ত হয় এক ও অবিভাজ্য মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তাকে ছেড়ে অন্যের বা অন্য কোনোকিছুর।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই'। একথার অর্থ আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন না, সে কখনোই পথপ্রাপ্ত হয় না। পথপ্রাপ্তি বা হেদায়েত হচ্ছে আল্লাহ্র বিশেষ দয়া ও দান। জ্ঞান-বুদ্ধিও আল্লাহ্র দান, কিন্তু আল্লাহ্র দয়া ও নির্দেশনা ব্যতিরেকে তা কখনো লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হতে পারে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাগতিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পরবর্তী পৃথিবী সম্পর্কে উদাসীন ও অজ্ঞ। আবার পার্থিব বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ চিরন্তন কল্যাণের পথে আত্মসমর্পিত। রসুল স. জানিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপরে ঘটিয়েছেন নূরের সন্নিপাত। ওই নূর যে লাভ করেছে, সে পেয়েছে হেদায়েত। আর যে ওই নূর পায়নি সে হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, শুকিয়ে গিয়েছে অদৃষ্টলিপি লিপিবদ্ধ করার কলমের কালি।

মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে উকবা ইবনে রবীয়া সম্পর্কে। মূর্খতার যুগে সে ছিলো সত্য ধর্মের অন্বেষক। তার স্বভাবে ও পোশাক পরিচ্ছদে প্রকাশ পেতো পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি। চটের পোশাক পরিধান করতো সে। কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটলো, তখন সে তাকে করলো প্রত্যাখ্যান।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪১, ৪২

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

❒ তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাহাদিগের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! প্রত্যাদেশ, বুদ্ধি, আত্মিক বিজ্ঞপ্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে একথা তো আপনি অবশ্যই অবহিত যে, আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ, জ্বিন ও অন্যান্য সৃষ্টি এবং উড়ন্ত বিহঙ্গের পাল সকলেই তাদের নিজ নিজ ভাষা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিরন্তর ঘোষণা করে চলেছে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা। আল্লাহ্র পবিত্রতা ও সপ্রশংস মহিমা বর্ণনের যথাপদ্ধতিও সকলের জানা। আর তাদের এমতো শুভকর্ম ও অন্যান্য কর্ম সম্পর্কেও আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

'মান' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কারণ তাদের সাক্ষ্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই বুঝতে হবে এখানে 'মান' ব্যবহার করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিবেকবান সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে 'ওয়াততুইরু সাফ্ফাতিন' (এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল)। পাখিদের কথা এভাবে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, পাখি আকাশে ওড়াউড়ি করলেও তার আবাস পৃথিবীতে। তাই পাখির উল্লেখ এসেছে এখানে আলাদাভাবে।

'কুল্লুন্ ক্বদ্ আ'লিমা সলাতাহু ওয়া তাসবীহাহ্' অর্থ এবং সকলে তাদের প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কথা জানে। এখানে 'সলাত' অর্থ দোয়া বা প্রার্থনা। এভাবে এখানকার শেষ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা ও প্রার্থনাসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই সকলেরও সকলকিছুর একক অধিকর্তা। সকলের সকল কিছুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব, গুণাবলী ও কার্যকলাপেরও একক সৃজয়িতা ও তাদের প্রতিপালনকারীও তিনিই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন'। একথার অর্থ— সকলের ও সকলকিছুর অবশেষ প্রত্যাবর্তন যে কেবল তাঁর দিকে, সে কথা সুনিশ্চিত। তখন সকলকে তিনিই দান করবেন যথাবিনিময়— পুরস্কার অথবা তিরস্কার। এমনকি পৃথিবীতে শিঙবিহীন ছাগল যদি শিঙবিশিষ্ট ছাগলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তবে মহাবিচারের দিবসে অত্যাচারিত ছাগলকেও দিবেন প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

❐ তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইত নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শীলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুতঝলক দৃষ্টি-শক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।

❐ আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবিষয়টিও তো আপনার প্রত্যক্ষগোচর ও জ্ঞানগোচর যে, আল্লাহ্ই সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে। প্রথমে সেগুলো থাকে টুকরো টুকরো, অনুল্লেখ্য বস্তুর মতো। তিনিই সেগুলোকে একত্র করেন, করেন পুঞ্জীভূত। তারপর তা থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আরো বর্ষণ করেন আকাশে ভাসমান শিলাস্তূপ বা বরফের পাহাড় থেকে শিলা বা বরফের টুকরা। সেই শিলাখণ্ডের মাধ্যমে তিনি কারো কারো হরণ করেন প্রাণ, ধ্বংস করেন কারো কারো ফসল ও অন্যান্য সম্পদ এবং কাউকে কাউকে বাঁচিয়ে দেন এমতো ক্ষতি থেকে। আবার মেঘজ বিদ্যুৎঝলক দেখুন কতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃষ্টিশক্তি নিষ্ক্রিয়ক। উল্লেখ্য, এখানে 'মিনাস্ সামায়ি মিন জ্বিবালিন' (আকাশস্থিত শিলাস্তুপ) কথাটির প্রথমোক্ত 'মিন' সূচনামূলক এবং শেষোক্তটি বর্ণনামূলক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশে রয়েছে শিলাস্তূপ বা বরফের পাহাড়। অর্থাৎ আল্লাহ্ বরফের বড় বড় পাহাড়সদৃশ টিলা থেকে ঘটান শিলাবৃষ্টি।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। এখানে 'দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান' অর্থ দিনের পরে আনেন রাত্রি এবং রাত্রির পরে দিন। অথবা অর্থ হবে—হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান দিবস ও রজনীর সময়ের পরিসরের। তাই শীতে ও গ্রীষ্মে দিন ও রাত হয়ে থাকে ছোট অথবা বড়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, আদম-সন্তান আমাকে দুঃখ দেয়। তারা দুর্নাম করে কালের। অথচ কালের বিবর্তন ঘটাই আমিই। আমারই নির্দেশে আবর্তিত হয় দিবস ও যামিনী।

'আলআবসার' অর্থ অন্তর্দৃষ্টি কর্তৃক অবলোকিত ও উপলব্ধ যথার্থ জ্ঞান। 'উলিল আবসার' অর্থ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এভাবে 'শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে মেঘপুঞ্জ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎঝলক, দিবস-বিভাবরীর নিয়মিত আবর্তন ইত্যাদি হচ্ছে এক অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত ও আনুরূপ্যবিহীন মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রতিপালনকর্তার স্বয়ম্ভু অস্তিত্বের প্রমাণ। সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়াধীন ও ক্ষমতায়ত্ব। সকলকে ও সকলকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তাঁর জ্ঞান। মহাসৃষ্টি সর্ববিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী, আর তিনি সকল কিছু থেকে চিরঅমুখাপেক্ষী। এই মহাসত্যবোধ বিশ্বাসে, চিন্তায় ও কর্মে লালন করতে পারেন কেবল তাঁরাই, যারা অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্বোধসম্পন্ন।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদিগের কতক বুকে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ অধিকাংশ প্রাণীকে অস্তিত্বায়িত করেছেন পানি থেকে। অধিকাংশ সমষ্টির তুল্য। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুল' (সমস্ত) শব্দটি। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রাণীর অস্তিত্বই সলিলজ, অথবা বীর্য-উদ্ভূত। বীর্যও একপ্রকার পানি। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী অস্তিত্ব লাভ করে বীর্য ব্যতিরেকেই। আবার ফেরেশতা ও জ্বিন 'দাব্বাত' (জীব) পদবাচ্য নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'পানি থেকে' কথাটি জীবজগতের সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলীকে। অর্থাৎ একথাই বলা এখানে উদ্দেশ্য যে, 'পানি থেকে' অথবা অন্য কোনো কিছু থেকে যা-ই বলা হোক না কেনো, সকলকিছুর একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্।

জ্ঞাতব্য ঃ এ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীগণ বলেছেন, প্রাণীসমূহের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি চারটি— পানি, বাতাস, মাটি ও আগুন। ইবনে সিনা এগুলোর নাম দিয়েছেন 'উসত্বাকুস্সাত' (মৌল চতুষ্টয়)। কোনো কোনো গ্রীক দার্শনিকদের মতে সৃষ্টবস্তুসমূহের মূল উপাদান দু'টি। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল বাতাস হচ্ছে সৃষ্ট বস্তুর মূল। পানি, মাটি ও আগুন হচ্ছে বাতাসেরই পরিবর্তিতরূপ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সৃষ্টির মূল হচ্ছে পানি। পানিই ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে পাথরে। ওই পানিই আবার রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়েছে বাতাস ও আগুনে। তাই বুঝতে হবে প্রতিটি প্রাণীর অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে পানি।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করেছেন পানি। তারপর ওই পানির কিছু অংশকে বানিয়েছেন বাতাস। ওই বাতাস দ্বারা তৈরী করেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে। আবার কিছু অংশকে বানিয়েছেন আগুন, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন জ্বিন। আবার তার কিছু অংশকে পরিণত করেছেন মৃত্তিকায়, যার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। আর অবশিষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য প্রাণীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে'। একথার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত প্রাণীকুল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাদের কেউ কেউ দ্বিপদ বিশিষ্ট— যেমন, মানুষ, পক্ষীকুল। কেউ কেউ আবার চরণহীন। তারা পথ চলে বুকে ভর দিয়ে। যেমন সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ চতুষ্পদ। তারা পথ চলে চার পায়ে ভর করে। এমন প্রাণীও রয়েছে যাদের পায়ের সংখ্যা

চারের অধিক। কিন্তু তাদের বিচরণও চতুষ্পদদের মতো। অর্থাৎ তারাও পথ চলবার সময়ে চতুষ্পদ জন্তুদের মতো মস্তক ও মুখ উপরের দিকে ওঠাতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করেন তাঁরই চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের অনুকূলে, যেহেতু তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী, কার্যাবলী— সকল বিষয়ে চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনিই তাঁর ইচ্ছা মতো 'মৌলিক' ও 'যৌগিক' সকল সৃষ্টিকে দিয়েছেন বিভিন্ন আকার, প্রকার, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে স্বাধীন ও সর্বশক্তিধর।

জ্ঞাতব্য ঃ গ্রীক দার্শনিকদের পরিভাষায় 'বাসিত্ব' বলে ওই সকল অবয়বকে, যাদের প্রতিটি অংশের নাম ও পরিচয় মূল পরিচয়ে বিধৃত। যেমন পানি। পানির প্রতিটি বিন্দুই পানি নামে অভিহিত ও পরিচিত। আর 'মোরাক্কাব' হচ্ছে ওই সকল বস্তু, যার ভগ্নাংশের নাম ও পরিচয় যায় বদলে। যেমন মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের মূল উপাদান পানি, মাটি, বাতাস ও আগুন। কিন্তু চারটি পদার্থই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও পরিচিত।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি'। একথার অর্থ— আমি তো অবতীর্ণ করেছি মহাগ্রন্থ আলকোরআন, যা সুস্পষ্ট নিদর্শনরাজিতে ভরপুর। অথবা অর্থ হবে— এই মহাসৃষ্টি যে আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন নাম-গুণাবলীর ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, তার সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জী আমি সন্নিবেশিত করেছি এই কোরআনে। যার ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই মহাসৃষ্টিই আল্লাহ্র অস্তিত্বের ও তাঁর অতুলনীয় সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই তো আমি মহাসত্যকে করেছি সুপ্রকাশিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে পরিচালিত করেন ইসলামের শাশ্বত-সুন্দর ও সরল পথে। ফলে সে পরিত্রাণ লাভ করে দোজখাগ্নি থেকে। পায় জান্নাত, সেই সাথে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তোষ। উল্লেখ্য, এখানেও এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, ইমান সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্র অনুগ্রহনির্ভর। বুদ্ধি অথবা চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে কখনো ইমান লাভ করা যায় না। কারণ আল্লাহ্ যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি-ধারনা-কল্পনার অতীত, তেমনি তাঁর প্রতি নিষ্কলুষ বিশ্বাসও।

বাগবী লিখেছেন, এক ইহুদী ও এক মুনাফিকের মধ্যে ছিলো জমাজমি সংক্রান্ত বিবাদ। ইহুদীর ভাবনা ছিলো, বিবাদ-মীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম। কারণ, সে জানতো তিনি স. ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু

মুনাফিক লোকটি বলে বসলো, চলো, আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে আমাদের বিবাদটা মিটিয়ে ফেলি। মোহাম্মদের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। তিনি আমাদের অধিকার খর্ব করবেন। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

❒ উহারা বলে, 'আমরা আল্লাহে ও রসূলে বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি;' কিন্তু ইহার পর উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্তুতঃ উহারা বিশ্বাসী নহে।

❒ উহাদিগকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করিলে উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ সিদ্ধান্ত উহাদিগের স্বপক্ষে হইবে মনে করিলে উহারা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটিয়া আসে।

❒ উহাদিগের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল উহাদিগের প্রতি জুলুম করিবেন? বরং উহারাই তো সীমা লংঘনকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশার ও তার মতো অন্যান্য মুনাফিকেরা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাদের একথা মৌখিক, আন্তরিক নয়। কারণ পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে তারা আল্লাহ্র রসুলের মীমাংসা মানতে চায় না। উল্লেখ্য, এখানে 'তারা' বলে বুঝানো হয়েছে সকল মুনাফিককে। আর আলোচ্য আয়াতে এই সতর্কবাণীটিও উচ্চারিত হয়েছে যে, কেবল মুখে মুখে বিশ্বাসী হওয়ার কথা বললেই ইমানদার হওয়া যায় না। সে বিশ্বাস রাখতে হয় অন্তরেও। বস্তুতঃ অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস।

এখানে 'আল মু'মিনীন' এর আলিফ লাম সীমিত অর্থে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসীর প্রতি যাদের অকপটতা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত। রসুল স.ও তাদেরকে প্রকৃত ইমানদার বলেই জানতেন। আলোচ্য আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই বলে দেয়া হয়েছে যে 'বস্তুত তারা বিশ্বাসী নয়'। অর্থাৎ যারা কেবল মুখে মুখে তাদের ইমানকে প্রকাশ করে, তারা ওই সকল ইমানদারগণের মত বিশুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠ নয়।

হাসান বসরী থেকে অপরিণত সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, কতিপয় মুনাফিকের স্বভাব ছিলো এরকম— তাদের সঙ্গে কারো বিবাদ উপস্থিত হলে যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে বলা হতো, তখন যদি তারা সত্যদাবির উপরে থাকতো এবং মনে করতো যে, এই মীমাংসা হবে তাদের অনুকূলে, তাহলে তারা এমতো প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেতো। আর যদি দেখতো সঠিক মীমাংসা করলে তা তাদের বিরুদ্ধে যাবে, তখন তারা রসুল স. এর শরণাপন্ন হতে অনীহা প্রকাশ করতো। বলতো, না, অমুক ব্যক্তিকে মীমাংসার দায়িত্ব দেয়া হোক। তাদের এ ধরনের মানসিকতা ও আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতটি(৪৮)।

বলা হয়েছে— 'তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে আহ্বান করলে তাদের এক দল মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দিকে' অর্থ আল্লাহ্র বিধান ও সেই বিধানানুসারে রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'সিদ্ধান্ত তাদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে তারা বিনীতভাবে রসুলের নিকট ছুটে আসে'। একথার অর্থ— যদি তারা বুঝতে পারে যে সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূল হবে, তবে তারা হয়ে যায় বিনয়ের অবতার। তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে ছুটে যায় রসুলের কাছে ।

শেষোক্ত আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, তারা সংশয় পোষণ করে? না, তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদের উপরে জুলুম করবেন? বরং তারাই তো সীমালংঘনকারী'। একথার অর্থ— তাদের এহেন অপআচরণ তাহলে কোন বিষয়টি প্রমাণ করে? তাদের হৃদয় কি ব্যাধিগ্রস্ত? না সংশয়াচ্ছন্ন? কী কারণে হে আমার রসুল! আপনার প্রতি তারা এমতো অনাস্থা স্থাপন করলো? তবে কী তারা এই ভয়ে ভীত যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল তাদের অধিকার হরণ করবেন? আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষে কি এরকম জুলুম হওয়ার কল্পনা করা যায়? কখনোই নয়। বরং বুঝতে হবে, তারাই জালেম, সীমালংঘনকারী। কারণ তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের প্রতি অনীহা প্রকাশ করার তিনটি কারণ বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে— ১. তাদের অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ততা ২. বিচার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ৩. সন্দেহ দু'টি বিষয়ের— বিশ্বাসভাজনতার এবং অধিকার হরণের। উল্লেখ্য, নবী রসুলগণের বিশ্বাসভাজনতা ও অধিকার রক্ষার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তাই শেষোক্ত কারণ দু'টিকে 'বরং' (বাল্) কথাটির মাধ্যমে নিবারণ করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে প্রথম কারণটিকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, নবী-রসুলগণের সুসিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা যেহেতু সংশয়াতীত এবং কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করার প্রবণতা যখন তাঁদের একেবারেই নেই, তাই বুঝতে হবে রসুল স. এর সিদ্ধান্ত মানতে না চাওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের অন্তরের কপটতারূপ ব্যাধি, অন্য কিছু নয়। প্রকৃত অর্থে তারাই সীমালংঘনকারী, মুনাফিক। ইমানদার যদি তারা হতো, তবে অবশ্যই হৃষ্টচিত্তে আন্তরিক আস্থা ও বিনয় নিয়ে সরল বিশ্বাসে ধাবিত হতো রসুল স. এর যথাসিদ্ধান্তের দিকে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

❒ যখন বিশ্বাসীদিগকে তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা তো কেবল এই কথাই বলে 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' উহারাই সফলকাম।

❒ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁহার শাস্তি হইতে সাবধান থাকে তাহারাই সফলকাম।

❒ উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহের শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা জিহাদের জন্য বাহির হইবেই; তুমি বল, 'শপথ করিও না, তোমাদিগের আনুগত্য তো জানাই আছে! তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিন্তু বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সতত অনুগত। তাই তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তের দিকে ডাকা হয়, তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করেন 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম'। এধরনের কাপট্যহীন সরলচিত্ত বিশ্বাসীরাই সফলকাম হবে, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম'। একথার অর্থ— যারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে, পাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকায় ভয় করে আল্লাহ্‌কে এবং সাবধান থাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে, তারাই লাভ করে সাফল্য— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে' অর্থ সুখ ও শোক উভয় অবস্থায় অনুগত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি।

'তাঁর শাস্তি থেকে সাবধান থাকে' অর্থ আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে যথাযথরূপে পালন করে তাঁর নির্দেশাদি ও বিরত থাকে তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, তুমি তাদের আদেশ করলে তারা জেহাদের জন্য বের হবেই'। বাগবী লিখেছেন, এখানে উক্ত হয়েছে মুনাফিকদের বক্তব্য। তারা রসুল স. এর সম্মুখে শপথ করে বলতো, আল্লাহ্‌র কসম। আমরা সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবো। যুদ্ধযাত্রা করতে বললেও পিছপা হবো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি বলো, শপথ কোরো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে জানিয়ে দিন, সাবধান! এভাবে মিথ্যা শপথ উচ্চারণ কোরো না। তোমাদের আনুগত্যের কপটতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালো করেই জানেন।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে' কথাটির অর্থ— তোমাদের আনুগত্য বাহ্যিক, আন্তরিক নয়। অর্থাৎ মুখে মুখে আনুগত্যের ব্যাপারে কসম করলে কী হবে, অন্তরে তোমরা কদাচ অনুগত নও। এ বিষয়টি আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি অন্তর্যামী। কোনো কোনো তাফসীরকার কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের এ মৌখিক আনুগত্য যে কপটতাময় ও আন্তরিক বিশ্বাসবিবর্জিত, সেকথা আল্লাহ্‌র অজানা নয়। মুকাতিল কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তোমাদের নিকট থেকে আন্তরিক আনুগত্য

প্রকাশিত হওয়াই ছিলো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তোমরা তা করতে পারো না। কারণ তোমরা মুনাফিক, মুমিন নও। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদের এমতো কপট আনুগত্যের প্রত্যাশী আল্লাহ্ নন, প্রত্যাশী উত্তম আনুগত্যের।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কেই তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং কাপট্য ও ছল-চাতুরী তাঁর কাছে অচল।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৪

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

❒ বল, 'আল্লাহের আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলে দিন, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্র ও তাঁর রসুলের। যদি তা না করো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, রসুলের কোনো অনিষ্ট হবে না। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিলো স্পষ্টভাবে আল্লাহ্র বিধান বর্ণনা করা, আর তোমাদের দায়িত্ব ছিলো যথানিয়মে তা পালন করা। সুতরাং সাবধান হও। রসুলের অনুসরণ করলে উপকৃত হবে তোমরাই। লাভ করবে জান্নাতের পথ। আর একথাও মনে রেখো যে, আল্লাহ্র বিধান স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া ছাড়া রসুলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

এখানে 'আল বালাগ' অর্থ জানিয়ে দেয়া বা পৌঁছে দেয়া। আর 'আল মুবিন' অর্থ স্পষ্টভাবে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এই শাশ্বত তথ্যটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকগণের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্রই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহের সুস্পষ্ট প্রচার।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে তিবরানী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং কেবল হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. যখন

মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন আরো অনেক মুহাজির। মদীনার আনসার সাহাবীগণ তাঁদেরকে আশ্রয় দিলেন। অপরপক্ষে প্রায় সমগ্র আরব শত্রু হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের। জীবন যাপন থেকে উধাও হয়ে গেলো স্বাভাবিকতা। শত্রুর আক্রমণাশংকায় অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় অতিবাহিত হতো রজনী, প্রত্যুষ। পরিস্থিতি এমন সঙ্গিন হয়ে পড়লো যে, তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, শান্তি ও নিরাপত্তা কি আর ফিরে আসবে আমাদের প্রাত্যহিকতায়? আর কি আমরা এমন একটি রাত পাবো, যে রাত আমাদের অতিক্রান্ত হবে শত্রুর আক্রমণাশংকা ছাড়া আল্লাহ্র ভয়ে? এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৫

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

❒ তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের দ্বীনকে যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেনই। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই'। এখানে 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে' বলে বলা বলা হয়েছে, ওই সকল সাহাবীগণের মধ্যে কাউকে কাউকে আল্লাহ্ করবেন আরব ও আরববহির্ভূত অনেক ভূখণ্ডের শাসক ও বিচারক। অথবা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন আধিপত্য দান করবেন, যেমন আধিপত্য থাকে রাজা-বাদশাহদের। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে'। একথার অর্থ— যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন বনী ইসরাইলকে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা। উল্লেখ্য, রসুল স. এর মহাআবির্ভাবের পূর্বে নবুয়ত ও রাষ্ট্রক্ষমতা প্রবহমান ছিলো বনী ইসরাইলদের মধ্যে। মিসর ও সিরিয়ার রাজা-বাদশাহদের উপরে আল্লাহ্পাক তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। হজরত মুসাকে দিয়েছিলেন সিরিয়া বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় সে বিজয় বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বনী ইসরাইলদের অবাধ্যতার কারণে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছিলো তীহ্ প্রান্তরের বন্দী জীবন। হজরত মুসার মহাতিরোধানের পর নবুয়ত পেয়েছিলেন হজরত ইউশা ইবনে নূন। চল্লিশ বৎসরের বন্দীত্বের অবসানের পর তাঁর নেতৃত্বেই অর্জিত হয়েছিলো প্রতিশ্রুত ও কাংখিত বিজয়। এভাবে দেখা যায়, রসুল স. এর পৃথিবীবাসের সময়েও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রতিনিধিত্ব বা বিজয় অর্জিত হয়নি। হয়েছিলো তাঁর মহাতিরোধানের পরে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের শাসনামলে।

হজরত আবু বকর ভণ্ডনবী মুসায়লামার বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে। এভাবে সমগ্র আরবভূমিকে করেছিলেন নিরাপদ। আর হজরত ওমর জয় করেছিলেন সিরিয়া ও ইরাক। ইরাক অভিযানের পূর্বে তিনি যখন অন্যান্য সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করেছিলেন, তখন হজরত আলী আলোচ্য আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে বলেছিলেন, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কারণ আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বেশ কয়েকটি গ্রন্থে এই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'নাহজুল বালাগা' তেও লিপিবদ্ধ হয়েছে ঘটনাটি। বলা হয়েছে, হজরত আলী তখন বললেন, সেনাসংখ্যার আধিক্য অথবা স্বল্পতার উপরে বিজয় নির্ভরশীল নয়। বিজয় তো আল্লাহ্তায়ালার দান। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে বিজয় দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন'। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন'। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— এবং আল্লাহ্ অবশ্যই ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করে দিবেন। এভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেনই'। একথার অর্থ— ইমানদারদের বর্তমান নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রার অবসান ঘটবেই। বাতিল ধর্মমত ও ধর্মমতানুসারীদের উপরে প্রতিশ্রুত বিজয় কার্যকর করে তিনি তাদের নিরাপত্তা বিধান করবেনই। অথবা আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বাক্য, যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভের কারণ বা উপায়। আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা।

আবুল আলীয়া বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রসুল স. এর একচ্ছত্র শাসন। আরবের সকল গোত্র গ্রহণ করেছিলো ইসলাম। এভাবে মুসলমানদেরকে দান করেছিলেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। তাঁর মহাতিরোধানের পরে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত ওসমানের খেলাফতের সময়েও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো ইসলামের। ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছিলো মুসলিম শাসনের সীমানা। এভাবে তাদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ছিলো অটুট। অবশ্য হজরত ওসমানের খেলাফতের শেষ দিকে দেখা দিয়েছিলো মুসলমানদের আত্মকলহ, গৃহবিবাদ। ফলে তাদের নিরাপত্তা হয়ে পড়েছিলো বিপর্যস্ত।

আবুল আলীয়ার বর্ণনায় আরো এসেছে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির প্রথম দিকে রসুল স. তাঁর সহচরবৃন্দকে নিয়ে মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। মক্কার অংশীবাদীরা তখন বিভিন্নভাবে সাহাবীগণকে নির্যাতন করতে শুরু করলো। রসুল স. তাঁদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। এরপর আল্লাহ্র ইশারায় তিনি স. হিজরত করলেন মদীনায়। অংশীবাদীরা সেখান থেকে তাঁকে উৎখাত করবার জন্য গ্রহণ করলো যুদ্ধ প্রস্তুতি। রসুল স.ও অনুমতি পেলেন জেহাদের। সাহাবীগণের জীবনযাত্রায় দেখা দিলো নিরাপত্তাহীনতা। শত্রুর আক্রমণাশংকায় তাঁদেরকে সব সময় থাকতে হতো অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। এমতো সঙ্গিন পরিস্থিতিতে একজন তো একবার বলেই ফেললেন, অস্ত্রবিহীন নিরাপদ জীবন আর কখনো কি আমরা ফিরে পাবো? তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদেরকে লক্ষ্য করে, যখন আমরা অতিবাহিত করতাম নিরাপত্তাহীন দিবস ও রজনী। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ভয়-ভীতি দূর করে দিয়ে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন নিরাপত্তা। বিস্তীর্ণ ভূমিতে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন ইসলাম ও আমাদের প্রভাব।

আলোচ্য আয়াত রসুল স. এর রেসালতের সত্যতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রমাণ খলিফা চতুষ্টয়ের সত্যতারও। কারণ তাঁদের শাসনামলেই প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিলো প্রকৃত ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের সুশাসন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো ইসলামের আলো। বিশাল ভূভাগ জুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিলো মুসলিম শাসন। ফলে মুসলমানেরা হয়েছিলেন পূর্ণ নিরাপদ। একথাও বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। আর এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, শিয়াদের মতবাদ ভ্রান্তিবিদ্ধ। তারা বলে, ইমামগণ সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবনযাপন করেছেন। ইমাম মেহেদীও নাকি এখন পর্যন্ত ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। তাদের এমতো বিশ্বাস এই আয়াতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই বুঝতে হবে এই আয়াতের 'নিরাপত্তা দান করবেনই' কথাটির উপরে তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই।

এখানে 'মিনকুম' (তাদেরকে) বলে বুঝানো হয়েছে সাহাবীগণকে। সুতরাং শিয়াদের এমতো ধারণাটিও অসত্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ইমাম মেহেদীর আবির্ভাবের পর। এ বিশ্বাসটিও ভিত্তিহীন যে, আল্লাহ্পাক সাহাবীগণকে প্রদত্ত অঙ্গীকার হাজার বছর পরেও পূর্ণ করেননি। এমতো মূর্খজনোচিত অপবিশ্বাস থেকে আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় যাচনা করি।

রসুল স. কর্তৃক মুক্ত ক্রীতদাস হজরত সাফীনা বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, 'আমার পরে খেলাফত থাকবে তিরিশ বছর। তারপর আগমন ঘটবে বাদশাহীর'। তিনি আরো বর্ণনা করেন, আবু বকরের খেলাফত দুই বছর, ওমরের দশ বছর, ওসমানের বারো বছর এবং আলীর ছয় বছর— এভাবে খেলাফতের মোট সময়সীমা দাঁড়ায় তিরিশ বছর।

হজরত আদী ইবনে হাতেম বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বললো আমি ক্ষুধার্ত। আর একজন এসে বললো, পথে আমার মালামাল লুণ্ঠিত হয়েছে। তিনি স. আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আদী! তুমি কি হীরা দেখেছো? আমি বললাম, না। তবে আমি এ সম্পর্কে জানতে বাসনা রাখি। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারো, তাহলে দেখতে পাবে, এক মহিলা হীরা থেকে একাকী এসে কাবা গৃহ তাওয়াফ করে নির্বিঘ্নে স্বস্থানে ফিরে যাবে। আল্লাহ্ ছাড়া তখন সে আর কাউকেও ভয় পাবে না। আমি মনে মনে বললাম, বনী তাঈয়ের দুর্ধর্ষ দস্যুরা তাহলে তখন কোথায় থাকবে, যারা এখন দেশটাকে তছনছ করে ফেলছে। তিনি স. বললেন, তুমি যদি আর কয়েক বছর হায়াত পাও, তবে স্বচক্ষে দেখবে পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার তোমাদের হাতের মুঠোয়। আমি নিবেদন করলাম, পারস্যরাজের ধনভাণ্ডার? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পর বললেন, যদি তোমার বয়স আরো দীর্ঘায়িত হয়, তবে দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি

সোনারূপা নিয়ে গ্রহীতাকে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু কোনো গ্রহীতা খুঁজে পাবে না। তারপর দুনিয়ার জীবন সাঙ্গ হলে তোমরা সকলে হাজির হবে তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের সকাশে। তখন তোমাদের ও তাঁর মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। আল্লাহ্ তার এক বান্দাকে বলবেন, তোমাদের নিকটে কি আমার রসুল প্রেরিত হয়নি? সে বলবে, অবশ্যই। তিনি বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে ধন-সম্পদ দেইনি? তোমার প্রতি দয়া করিনি? সে বলবে, নিশ্চয়ই। এরপর সে দেখবে, তার বাম ও দক্ষিণ উভয় পাশে জাহান্নাম। অতএব, হে আদী! জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা কোরো, একটি খেজুর দান করে হলেও। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে যাচ্ঞাকারীকে বিদায় দিয়ো মিষ্টি কথায়। হজরত আদী এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তাঁর দুই ছাত্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এক মহিলা একাকী হীরা থেকে এসে কাবাগৃহ তাওয়াফ করে চলে যেতো। পথিমধ্যে দস্যু-তস্কর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় সে করতো না। তোমাদের বয়স যদি দীর্ঘ হয়, তবে তোমরাও দেখতে পাবে লোকে মুঠো ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে দান করবার জন্য গ্রহীতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে রকম কাউকে পাচ্ছে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী'। একথার অর্থ— প্রকৃত বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মশীলেরা যখন পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, বিশাল ভূভাগ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, তখন কৃতজ্ঞচিত্ত বিশ্বাসীরা কায়মনোবাক্যে সমর্পিত হবে আমার উপাসনায়। আমার সঙ্গে তারা কাউকে অথবা কোনোকিছুকে অংশীদার বানাবে না। কিন্তু তাদের পরবর্তীদের মধ্যে কেউ কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে আল্লাহ্র এই বিশেষ দানের প্রতি। তারা বাহ্যত বিশ্বাসী হলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য-পরিত্যাগী।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্র এই দানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলো ওই সকল লোক, যারা শহীদ করেছিলো তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানকে। তিনি শাহাদত বরণ করলে আল্লাহ্ তাঁর এই বিশেষ দান প্রত্যাহার করে নেন। ফলে তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে অবিশ্বাস ও শংকা। তারা তখন প্রলিপ্ত হয় গৃহবিবাদ ও রক্তপাতে।

হুমাইদ ইবনে হেলাল সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তখন বিদ্রোহীদেরকে বলেছিলেন, যখন রসুল স. এই মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন থেকে রক্ষী ফেরেশতারা এই শহরকে বেষ্টন করে রয়েছে। যদি তোমরা আমিরুল মুমিনীনকে হত্যা করো, তবে ওই ফেরেশতারা স্থানত্যাগ করে

চলে যাবে। আর কখনো তারা ফিরে আসবে না। আরো শোনো, খলিফার হত্যাকারী আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হবে হস্তকর্তিত অবস্থায়। আল্লাহ্র তলোয়ার এখনো কোষবদ্ধ। যদি উন্মুক্ত হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা কোষমুক্ত থাকবে। আল্লাহ্র শপথ! কোনো নবীকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তার বদলারূপে প্রাণসংহার করা হয় সত্তর হাজার লোককে। আর খলিফার হত্যার বদলা নেয়া হয় পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে।

আমি বলি, আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে যে প্রতিনিধিত্ব ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন, তার প্রতি প্রথম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রাফেজী (শিয়া) ও খারেজীর দল। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হজরত মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের প্রতি। সে রসুল স. এর প্রিয় দৌহিত্র ও অনেক সাহাবীকে হত্যা করিয়েছে। অবমাননা করেছে নবীবংশের। গর্ব করেছে এই বলে যে, আজ গ্রহণ করা হলো বদর দিবসের প্রতিশোধ। মদীনা মনোয়ারার অমর্যাদাও করেছে সে। করেছে লুণ্ঠন। অসম্মান করেছে মসজিদে নববীর, যার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের বাগান। প্রথম দিন থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই মসজিদের সম্মানহানি ঘটাতেও সে পিছপা হয়নি। আবার কাবাগৃহের প্রতি পাথরনিক্ষেপক কামানের মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছে পাথর। এভাবে যুদ্ধে নিহত করেছে হজরত আবু বকরের প্রিয় দৌহিত্র খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে। এতোকিছু করা সত্ত্বেও সে ক্ষান্ত হয়নি। ঘটিয়েছে ধর্মবিভ্রাটও। হারামকে ঘোষণা করেছে হালাল বলে।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

❒ সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

❒ তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করিও না। উহাদিগের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতে সালাত প্রতিষ্ঠা এবং জাকাত প্রদানের নির্দেশের সাথে সাথে পুনঃনির্দেশ দেয়া হয়েছে রসুল স. এর আনুগত্যের। এমতো পুনঃনির্দেশের প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে রসুলানুসরণের বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের

জন্য। একথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির বিষয়টিও তাঁর রসুলের আনুগত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো'।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে কোরো না। তাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি, কতো নিকৃষ্ট এই পরিণাম'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুলের অনুসারীবৃন্দ! তোমরা এরূপ কখনো ভেবো না যে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বর্তমান দাপট চিরস্থায়ী ও অজেয়। আল্লাহ্‌ তাদেরকে পাকড়াও করতে অসমর্থও নন। কিন্তু তাদের এ আস্ফালন যে সাময়িক। স্থিরনিশ্চিত নরকাগ্নিই হচ্ছে তাদের প্রকৃত পরিণতি। সুতরাং তাদের প্রাবল্যের এই সাময়িকতা উপেক্ষণীয়। অবশেষের করুণ পরিণতির বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। হায়! কতোইনা মন্দ পরিণতি হবে তাদের।

মুকাতিল ইবনে হাব্বান সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আসমা বিনতে মুরছাদের এক ক্রীতদাস যখন তখন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতো তাঁর কক্ষে। দাসের এমতো আচরণ তাঁর একেবারেই পছন্দ হতো না। তাই তিনি একদিন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমার পরিচারক ক্রীতদাসটি যখন তখন আমার কামরায় ঢুকে পড়ে অনুমতি ছাড়াই। তার এরকম আচরণ আমার মোটেও ভালো লাগে না। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। এরশাদ করা হলো—

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৮

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

❑ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়োপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা

বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদিগের জন্য এবং তাহাদিগের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদিগের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ'। কিন্তু বিশ্বাসিনীগণও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে সম্বোধন করার পর এই বিধানটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী এবং কিশোর বালক-বালিকারা তাদের আপনাপন মালিক ও অভিভাবকদের ঘরে ফজরের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে এবং এশার নামাজের পর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এই তিন সময় মানুষ সাধারণতঃ থাকে শিথিলবসন এবং শিথিলবসনা। এই তিন সময় হচ্ছে একান্ত বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অবলম্বনের কাল। অন্য সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ তখন প্রাত্যহিক প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতেই হয়। শেষে বলা হয়েছে 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. তাঁর এক আনসারী ক্রীতদাসকে হজরত ওমরকে ডেকে আনার জন্য তাঁর গৃহে প্রেরণ করলেন। ওই ক্রীতদাস হজরত ওমরের গৃহে গিয়ে সোজাসুজি ঢুকে পড়লো তাঁর কামরায়। হজরত ওমর তখন ছিলেন অসংবৃত অবস্থায়। ফলে দু'জনেই হলেন অপ্রস্তুত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'যারা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়নি' অর্থ যারা এখানো যৌবনে পদার্পন করেনি। উল্লেখ্য, যৌবনকালের নিকটবর্তীরাও প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত।

ফজরের নামাজের পূর্বে অনুমতি ব্যতিরেকে কারো ঘরে প্রবেশ নিষেধ একারণে যে, তখন মানুষ গাত্রোত্থান করে এবং নিজেদের শিথিল বেশবাস ঠিক করে নেয়। দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময়ও অনুমতি ছাড়া কারো প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়া অনুচিত। কারণ বিশ্রামকালেও মানুষ থাকে আলুথালু অবস্থায়। এরকম অবস্থাতেও অন্যের অনাহুত উপস্থিতি বিব্রতকর। আর এশার নামাজের পরে মানুষ অতিরিক্ত পোশাক আশাক খুলে ফেলে শয্যাগ্রহণ করে। অন্যের অনুমতিহীন উপস্থিতি তাই এমতো অবস্থায়ও অনভিপ্রেত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়' কথাটির অর্থ হবে— এই তিন সময় তোমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ উন্মোচনের সময়। উল্লেখ্য, আবরণীয় অঙ্গসমূহ প্রকাশ্যে উন্মোচন মন্দ কর্ম। বায়যাবী কথাটির অর্থ করেছেন— এই তিন সময় তোমাদের মন চায়

খোলামেলা অবস্থায় থাকতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'আওরত' (গোপনীয়তা) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আ'র'(মন্দ, নিকৃষ্ট) থেকে। সুতরাং বুঝতে হবে মানুষের যে সকল অঙ্গ উন্মুক্ত করা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়, সে সকল অঙ্গই আওরত। আবার 'আওরত' বলা হয় মন্দ কথাকে, কাপড়ের পর্দাকে এবং গৃহের দরজা ধসে পড়াকে। এক আয়াতে এসেছে— 'ইন্না বুয়ুতানা আ'ওরতুন' (আমাদের গৃহ পতিত, ভগ্ন)।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'আওরত' অর্থ সীমারেখা। এরকম নিভৃত সময় তিনটি— ফজরের পূর্ব সময়, দ্বিপ্রহরের সময় ও এশার পরে শয্যাগ্রহণের সময়। মানুষ এই তিন সময় বাইরের লোকের উপস্থিতি পছন্দ করে না। আবার 'আওরত' বলা হয় পাহাড়ের গুহাকেও।

মাসআলা : বর্ণিত তিন সময় প্রাপ্তবয়স্ক অথবা কিশোর গোলামের জন্য অনুমতি ছাড়া তার মালিকের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাঁদীও বিনা অনুমতিতে ওই তিন সময় তার প্রভুপত্নীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে ক্রীতদাসী তার প্রভুর নিকট সর্বদা গমনাগমন করতে পারবে। কারণ সে তার প্রভুর স্ত্রীর মতোই। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক অথবা কিশোর ক্রীতদাস কখনোই তার প্রভুপত্নীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ তার সঙ্গে রয়েছে তার প্রভুপত্নীর শরিয়ত নির্দেশিত পর্দা। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'কুললিল মু'মিনীনা ইয়াগুদু মিন আবসরিহিম ওয়ালা ইউব্দিনা যীনাতাহুন্না ইল্লা লিবুউ'লাতিহিন্না'। এখানে পর্দা করতে বলা হয়েছে সকল প্রকার ক্রীতদাস থেকে। আর ক্রীতদাসীদেরকে রাখা হয়েছে এ বিধানের বাইরে।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় দাস-দাসী ও কিশোর বালক-বালিকারা অনুমতি ছাড়াই তাদের মালিক ও অভিভাবকের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ দাস-দাসী ও বালক-বালিকা গৃহবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও গৃহে তাদের উপস্থিতি হয় সার্বক্ষণিক। তাদের যাতায়াত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাই বার বার অনুমতি গ্রহণ তাদের জন্য একটি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' অর্থ আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই তো তোমাদের প্রতি প্রবর্তিত তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ হতে পারে এতো বাস্তবমুখী ও সুস্পষ্ট। আর নিঃসন্দেহে এভাবে শরিয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর অপার ও অতুলনীয় প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে, না এখনো কার্যকর আছে, সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, ওই সময় পর্দার প্রচলন ছিলো না। বালক-বালিকা ও পরিচারক-পরিচারিকারা তাই অবাধে প্রবেশ করতে পারতো সকলের ঘরে। আর তাদের দৃষ্টিতে প্রায়শঃই গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীরা বিবস্ত্র অথবা প্রায়বিবস্ত্র অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু এরকম অবস্থা কারো কাম্য ছিলো না। সেকারণেই আল্লাহ্তায়ালা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করেছেন। এরপর মুসলমানদের অবস্থা যখন স্বচ্ছল হলো, তখন প্রত্যেকেই তৈরী করে নিলো ঘরের পর্দা ও কপাট। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষিত হতে লাগলো পর্দা ঝুলিয়ে অথবা কপাট লাগিয়ে। তাই অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজনই আর রইলো না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়নি। সুফিয়ান সওরীর বর্ণনায় এসেছে, মুসা ইবনে আয়েশা বলেছেন, আমি একবার শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আয়াতের বিধান কি রহিত? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্র কসম! আমি বললাম, মানুষ তো এর উপরে আমল করে না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, লোকে বলে, এই আয়াত মনসুখ (রহিত) আল্লাহ্র কসম, এই আয়াত মনসুখ নয়। বরং মানুষ এই আয়াতের উপরে আমল করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেই করে না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, বর্তমানে প্রায় সকল গৃহেই দরজা ও পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই অনুমতি গ্রহণের অবকাশ তেমন নেই। অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো তখন, যখন মানুষের গৃহ ছিলো পর্দাহীন ও দরজাবিহীন। এখন যে কারণে অনুমতির আবশ্যক ছিলো, সেই কারণগুলোই নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনও আর নেই। তাই বিধানটি এখন কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, বিধানটি রহিত। হজরত ইবনে আব্বাস অবশ্য একে রহিত বলেছেন রূপকার্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ বিধানটিকে রহিত বলে মনে হয় এ কারণে যে, বিধান কার্যকর হওয়ার কারণগুলো আর নেই। তাই অনুমতি গ্রহণের নিয়মটি এখন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয়।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

❒ এবং তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠদিগের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❒ বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বহির্বাস খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগের বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেনো তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো অনুমতি প্রার্থনা করে'। একথার অর্থ— তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যৌবনে পদার্পন করলে অথবা যৌবনপ্রাপ্ত হলে তাদেরকেও তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো বন্ধ করে দিতে হবে ঘরের অবাধ যাতায়াত। উল্লেখ্য, আলোচ্য নির্দেশটি সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল মুহরিম ও গায়ের মুহরিম পুরুষ ও রমণীর ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, একবার আমার কাছে আবু মুসা এসে বললেন, খলিফা ওমর এক লোকের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যথারীতি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাইরে থেকে তিনবার বললাম 'সালামুন আলাইকুম'। কিন্তু কোনো জবাব পেলাম না। তাই ফিরে এলাম। পুনরায় ডেকে পাঠালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, ফিরে গেলেন কেনো? আমি বললাম, রসুল স. এর নির্দেশ এরকমই। তিনি বললেন, সাক্ষ্য পেশ করো। আবু মুসা আমাকে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনিও তো রসুল স. এর এই নির্দেশ শুনেছেন যে, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তার বাড়ীর বাইরে থেকে তিন বার সালাম দিতে হবে। জবাব না পেলে ফিরে আসতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে। শোনেননি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলুন, খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলাম খলিফা ওমর সকাশে। বোখারী, মুসলিম।

আতা ইবনে ইয়াসারের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করতেও কি অনুমতি চাইবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, আমি তো আমার মায়ের সঙ্গে একই ঘরে থাকি। তিনি স. বললেন, তবুও। লোকটি বললো আমি তো তাঁর খাদেম। তাঁর সব কাজকর্ম আমাকেই করে দিতে হয়। তিনি স. বললেন, তবুও। তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? লোকটি বললো, না। তিনি স. বললেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি গ্রহণ কোরো। ইমাম মালেক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, মাতৃ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। এমতো অনুমতি গ্রহণের বিধান জানানোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আমি বলি, সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত অনুমতি প্রার্থনার বিধানটি মোস্তাহাব প্রকৃতির, অত্যাবশ্যক প্রকৃতির নয়। তাই কেউ যদি স্বগৃহে প্রবেশ করতে চায় এবং সেখানে যদি এমন নারীও উপস্থিত থাকে, যার সঙ্গে পর্দা অত্যাবশ্যক, তবুও সে যদি বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করে, তবে তা হবে মাকরূহে তানজীহী, হারাম নয়। কারণ অন্যের গৃহে বিবস্ত্র হওয়ার সম্ভাবনা এমতোক্ষেত্রে নেই। তবুও এমতো পরিস্থিতিতে অনুমতি প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। কিন্তু অন্যের গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ সর্বাবস্থায় হারাম। কেননা আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ কোরো না' (২৭)। অনুরূপ যে গৃহে অপরিচিতা নারী থাকে, সেখানেও তার নিকট বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'বিশ্বাসীদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে(৩০)।

বায়যাবী লিখেছেন, যারা বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাস যদি তার প্রভুপত্নীর নিকটে যেতে চায় তবে তার জন্য অনুমতিপ্রার্থনা ওয়াজিব, তারা তাদের অভিমতের অনুকূলে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেন এই আয়াতকে। কিন্তু অভিমতটি যথাযথ নয়। কারণ আলোচ্য আয়াতে ক্রীতদাসের কথা বলাই হয়নি। বলা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততির কথা। তবে বায়যাবীর বক্তব্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক ক্রীতদাসের পক্ষে তার প্রভুপত্নীর নিকটে অবাধ গমনাগমনের বিষয়টি মতানৈক্যমণ্ডিত। আর মতানৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে, ক্রীতদাস তার প্রভুপত্নীর মুহরিম (বিবাহনিষিদ্ধ পুরুষ) কিনা। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, সে মুহরিম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, মুহরিম নয়। যদি

মুহরিম হয়, তবে প্রভুপত্নীর কক্ষে প্রবেশের জন্য তার অনুমতি প্রার্থনা হবে মোস্তাহাব যেমন মোস্তাহাব অন্যান্য মুহরিম নারীদের বেলায়। আর যদি মুহরিম না হয়, তবে অনুমতি প্রার্থনা হবে ওয়াজিব।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে খুলে রাখে তাদের বহির্বাস'। একথার অর্থ— যে সকল বৃদ্ধা নারী ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণের বয়স অতিক্রম করেছে, হারিয়ে ফেলেছে পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা এবং বিবাহের প্রতি যাদের আদৌ আকাংখা জাগে না তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের বহির্বাস বা অতিরিক্ত আবরণ উন্মোচন করে, তবে এতে করে তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধিনী সাব্যস্ত হবে না। রবীয়া বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই বিগত যৌবনা রমণীর কথা, পুরুষেরা যার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তবে বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের সৌন্দর্য কিছুটা বিদ্যমান থাকে, তারা এই আয়াতে উল্লেখিত শিথিলতাবহির্ভূত।

হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব এখানকার 'ছিয়াবাহুন্না' কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'মিন ছিয়াবিহিন্না' যার 'মিন' আংশিক অর্থবোধক। এরকম উচ্চারণ করলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং কোনো স্বাধীনা বিগতযৌবনা নারীও পরপুরুষের সামনে মাথা ও মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ উন্মোচন করতে পারবে না।

'গইরা মুতাবাররিজাতিন' অর্থ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। 'বারজ' এর শাব্দিক অর্থ দুর্গ, দৃঢ় অট্টালিকা। আকাশের তারকার সমাবেশকে একারণেই বলা হয় বুরুজ। 'তাবাররুজ' অর্থ গোপন বস্তুকে বিচিত্র সাজে প্রকাশ করা। 'সফিনায়ে বারেজা' বলে ওই নৌকাকে যার উপরে ছই বা আচ্ছাদন থাকে না। চোখের মনির চারপাশের সুপ্রকাশিত শাদা অংশকেও বলে বুরুজ। আর 'তাবাররুজ' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বেপর্দা নারীদের পুরুষদের সামনে আগমনের ক্ষেত্রে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. দশটি বস্তুকে নিকৃষ্ট মনে করতেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাজসজ্জা করে নারীদের গৃহের বাইরে বের হওয়া। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, 'তাবাররুজ' অর্থ পরপুরুষের সামনে নারীদের আবরণ প্রকাশ করা। এমতো রূপপ্রদর্শন শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ। তবে নারীরা তাদের স্বামীগণের সামনে তাদের রূপ-যৌবন পূর্ণরূপে উন্মোচন করতে পারবে।

এখানে 'সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' বলা হয়েছে এই অর্থে যে, বিগতযৌবনাগণের বহির্বাস উন্মোচন ওই সময় দূষণীয় হবে না, যখন তাদের সৌন্দর্যপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকবে। যদি সৌন্দর্যপ্রদর্শনের জন্য তারা এরূপ করে, তবে অবশ্যই তা হবে পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম'। এখানে 'ইয়াসতা'ফিফনা' অর্থ বিরত থাকা। 'ইফ্‌ফাত' অর্থ নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সংযত হওয়া। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' গ্রন্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— দূষণীয় না হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষদের সামনে বহির্বাস খোলা অপেক্ষা না খোলাই বিগতযৌবনাগণের জন্য উত্তম। কারণ এতে রয়েছে পাপাশংকা থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

শেষে বলা হয়েছে— ' আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— রমনীরা পুরুষদের সম্পর্কে যে সকল কথা বলাবলি করে তা তিনি উত্তমরূপে অবহিত। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তাদের বহির্বাস উন্মোচনের নেপথ্যে তাদের মনে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, সে সকল ভাবনা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

সূরা নূর ঃ আয়াত ৬১

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ
اَشْتَاتًا ۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

❒ অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদিগের নিজদিগের জন্যও দূষণীয় নহে আহার করা তোমাদিগের সন্তানদিগের গৃহে, অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে,

পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুলদিগের গৃহে, খালাদিগের গৃহে অথবা সেই সব গৃহে যাহার চাবি আছে তোমাদিগের হস্তে অথবা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম বলিবে— ইহা আল্লাহের নিকট হইবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের,জুহাক প্রমুখ বলেছেন, অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা সুস্থ লোকদের সঙ্গে একত্রাহার থেকে বিরত থাকতো। কারণ সুস্থ লোকেরা ভোজনকালে তাদের সঙ্গ পছন্দ করতো না। অন্ধরা ভাবতো, আমি হয়তো বেশী খেয়ে ফেলবো, তাই চক্ষুষ্মানেরা আমাদেরকে ভোজনসঙ্গী করতে পছন্দ করে না। খঞ্জরা মনে করতো, আমাদের বসতে জায়গা লাগে বেশী, তাই মনে হয়, সুস্থ ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে একত্রাহারে অনীহ। তাদের এমতো মনোভাব ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বলা হয়েছে এ সকল প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে সুস্থ লোকদের একত্রভোজন দূষণীয় নয়।

বাগবী আরো লিখেছেন, ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হয় 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি', তখন মুসলমানেরা প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনের ব্যাপারে করতে থাকে ইতস্ততঃ। মনে করতে থাকে, অন্ধরা তো উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখতে সক্ষমও নয়। সুতরাং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে নাকি? আবার বিকলাঙ্গরা আহার্যদ্রব্য অন্যের হাতে চলে গেলে তা ফিরিয়েও আনতে পারে না। কারণ চলাচল করা তো দূরের কথা, তারা তো বসতেও পারে না ভালো করে। আর পীড়িত যারা তারা তো এমনিতেই দুর্বল। যথাঅধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতাই তো তাদের নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনে আমরা কীরূপে এমতো আশ্বস্ত বোধ করতে পারি যে, আমরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারবো। তাদের এমতো দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শুরু থেকে 'মাফাতিহাহু' পর্যন্ত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, সাহাবীগণ যখন জেহাদে যেতেন, তখন কোনো কোনো বিকলাঙ্গদেরকে রেখে যেতেন তাঁদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার জন্য। গৃহের চাবিও দিয়ে দিতেন তাঁদেরকে। বলে যেতেন, ঘরে রক্ষিত আহার্যবস্তু ভক্ষণের ব্যাপারে তোমরা অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বিকলাঙ্গরা এতে করেও একথা

ভেবে সংকোচবোধ করতেন যে, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কি আমাদের পক্ষে শোভন? তখন আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁদের এমতো সংকোচকে দূর করা হয়।

হাসান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যের মাধ্যমে বিকলাঙ্গদের ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে এ প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে 'মিন বুয়ূ্যতিকুম' অর্থ তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের সন্তানদের গৃহে। সন্তানের গৃহও নিজের গৃহ। রসুল স. বলেছেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার। হাদিসটি গ্রন্থিত হয়েছে 'আসহাবুস্ সিত্তাহ' গ্রন্থষষ্ঠক রচয়িতা কর্তৃক। আর ইবনে মাজা ও হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

জননী আয়েশা থেকে আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পবিত্রতম জীবিকা হচ্ছে স্বহস্ত উপার্জিত জীবিকা। এরকম সন্তানগণেরও উপার্জন। স্ত্রীগণেরও। তাই স্ত্রী ও সন্তানের সম্পদ ভক্ষণে কোনো দোষ নেই। এরকম বর্ণনা করেছেন ইবনে কুতাইবাও।

'মা মালাকতুম মাফাতিহাহু' অর্থ সেই সব গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে। অর্থাৎ যে সকল গৃহে আছে তোমাদের একচ্ছত্র অধিকার। স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপকদের গৃহ, যারা নিয়োজিত থাকে সম্পদ অথবা পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে, তাদের দ্বারা উপার্জিত ও উৎপাদিত সম্পদ ভক্ষণও তাদের মালিকদের জন্য হালাল। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ আপন দাস-দাসীর গৃহ। তাদের সকল কিছুই তো তাদের মালিকদের। 'মাফাতিহ্' অর্থ ধনভাণ্ডার। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গইবি লা ইয়া'লামুহা ইল্লাহুয়া' (তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের ভাণ্ডার, যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না)। 'মাফাতিহ্'এর আর এক অর্থ চাবিসমূহ।

ইকরামা বলেছেন, চাবির অধিকারীই হচ্ছে স্বত্বাধিকারী। আর স্বত্বাধিকৃত সম্পদভক্ষণে দোষের কিছু নেই। সুদ্দী বলেছেন, কেউ যদি কোনো লোককে তার সম্পদের স্বত্বাধিকারী বানায়, তবে স্বত্বাধিকারী তার আওতাভূত সম্পদ ভক্ষণ করতে পারবে। এতে করে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে না।

বায্যার কর্তৃক যথাসূত্রসহযোগে বর্ণিত হয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, মুসলমানেরা রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহান্বিত ছিলো। যুদ্ধগমনের সময় তারা তাদের গৃহের চাবিগুলি বিকলাঙ্গদেরকে দিয়ে বলতো,

তোমরা যত ইচ্ছা আমাদের গৃহ থেকে আহার করতে পারবে। কিন্তু এমতো অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও বিকলাঙ্গদের দ্বিধাসংকোচ কাটতো না। তারা মনে করতো, এরকম অনুমতি দিয়েছে তারা নিরূপায় হয়ে। সুতরাং তাদের সম্পদ ভক্ষণ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো মনোভাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার জুহরীকে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, মুসলমানেরা যুদ্ধে গেলে তাদের গৃহে রেখে যেতেন এদেরকে। ঘরের চাবি দিয়ে বলতেন, আমরা যা রেখে গেলাম, তা থেকে তোমরা পানাহার কোরো। অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু ওই সকল লোক পানাহার করতে ইতস্ততঃ করতো। মনে করতো, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে তাদের গৃহে প্রবেশ আমাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মা মালাকতুম মাফাতিহাহু' অর্থ— যে সকল সম্পদ তোমরা জমা করে রাখো, তা ভক্ষণ করতে পারো। মুজাহিদ ও কাতাদা কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা তোমাদের মালিকানাভূত আপন গৃহের সম্পদ ভক্ষণ করতে পারো। এটা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

'আওসাদিক্বিকুম' অর্থ— অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুগৃহে তাদের অনুপস্থিতিতেও পানাহার করা যায়। কারণ বন্ধু কখনো বন্ধুর অসুবিধা পছন্দ করে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হারেছ ইবনে আমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই বাক্যটি। তিনি এক যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান মালেক ইবনে জায়েদকে। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হারেছ দেখতে পান তাঁর বন্ধু মালেক রুগ্ন ও দুর্বল। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে ও তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার গৃহের আহার্যদ্রব্য ভক্ষণ করাকে আমি বৈধ মনে করিনি। তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সা'লাবী তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে মালেক ইবনে জায়েদের স্থলে এসেছে খালেদ ইবনে জায়েদের নাম।

বাগবী লিখেছেন, হাসান ও কাতাদা এই আয়াতের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন, বন্ধুর গৃহে তার বিনা অনুমতিতে পানাহার করা বৈধ। কিন্তু কোনোকিছু নিয়ে যাওয়া বা জমা করে রাখা অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের বিধানটি কার্যকর ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। পরে এই আয়াত রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিধান কার্যকর। তবে এমতো কর্মে গৃহকর্তার অনুমতি আবশ্যক। অথবা যে কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, এমতো পানাহারে গৃহকর্তার কোনো আপত্তিমাত্র নেই। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে কেবল তাদের প্রসঙ্গ যাদের সঙ্গে রয়েছে অন্তরঙ্গতা। এরকম অন্তরঙ্গজনের গৃহে, অর্থাৎ সন্তান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য, ফুফু, খালা ও অধীনস্থ জনের গৃহে পানাহার গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর জন্য আনন্দজনক। তাই এমতো পানাহার স্বাভাবিক ও নির্দোষ। আর এরকম পানাহারের উপরেই টিকে আছে আত্মীয়তা, সম্প্রীতি ও সামাজিকতা। তাই আমরা বলি, সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির গৃহেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুমতিহীন পানাহার বৈধ, যদি কোনোক্রমে একথা জানতে পারা যায় যে, এতে রয়েছে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি।

মাসআলা ঃ এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মুহরিম ও নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে পানাহারে থাকে গৃহকর্তার সানন্দ সম্মতি। তাই হানাফীগণ বলেন, এরকম নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যদি সে এমন কারো বাসায় চুরি করে, সে সম্পদ তার মুহরিম নিকটাত্মীয়েরই তবে তার উপর প্রযোজ্য হবে হস্তকর্তনের বিধান। অপরের বাসায় তার প্রবেশ ছিলো নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমাবস্থায় সম্পদ সুরক্ষিত ছিলো না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ছিলো সুরক্ষিত।

একটি সন্দেহ ঃ যদি তাই হয়, তবে একথাও তো বলা যেতে পারে যে, বন্ধুর গৃহের কিছু চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না।

সন্দেহভঞ্জন ঃ আত্মীয়তার মতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থায়ী নয়। চুরি করলেও চোরের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না। কিন্তু বন্ধুগৃহে চুরি করলে, তখন সে আর বন্ধুই থাকে না। কারণ অপহরণ বন্ধুত্ববিরোধী।

বাগবী লিখেছেন, অন্ধ, খঞ্জ ও দুর্বল লোকেরা গৃহে গৃহে আহার্য যাচ্ঞা করতো। গৃহকর্তার নিকটে পানাহার করানোর মতো কিছু না থাকলে তারা যাচ্ঞাকারীদেরকে নিয়ে যেতেন আয়াতে উল্লেখিত আপজনদের গৃহে। এভাবে প্রাপ্ত আহার ভক্ষণ করতে সংকোচ করতো যাচ্ঞাকারীরা। তারা মনে করতো আমাদেরকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরানো হচ্ছে। আর গৃহকর্তার বিনা অনুমতিতে করানো হচ্ছে পানাহার। তাদের এমতো চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্নদের এবং তোমাদের নিজেদের কোনো অপরাধই হবে

না যদি তোমরা একাকী অথবা তাদের সঙ্গে একত্রাহার করো তোমাদের সন্তান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য, ফুফু, খালা ও কর্মচারীদের গৃহে, স্বগৃহে অথবা বন্ধুবর্গের গৃহে।

আতা খোরাসানীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন তাঁদের দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের বাসায় গমন করতো, তখন তাদের আত্মীয়স্বজনেরা পানাহারের সামগ্রী উপস্থিত করতো অতিথিদের সামনে। ধনাঢ্যরা বলতো, আল্লাহ্র শপথ! আমরা এমতো পাপ করতে পারি না যে তোমাদের আহারে অংশগ্রহণ করি। আমরা হলাম ধনাঢ্য। আর তোমরা তো কাঙ্গাল। তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'তোমরা একত্রে আহার করো অথবা পৃথকভাবে আহার করো তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই'— বাগবী লিখেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে বনী লাইছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। তাঁর গোত্রের এক লোক মেহমান ছাড়া পানাহার করতেন না। কখনো কখনো খাবার সামনে নিয়ে মেহমানের অপেক্ষায় বসে থাকতেন দিনভর। তারপর মেহমান পেলে খেতেন। না পেলে সন্ধ্যার দিকে হয়তো সামান্য কিছু আহার করতেন। উটের ওলান দুধে ভরপুর হতো, কিন্তু মেহমান না পেলে দুগ্ধ দোহন করতেন না। এরকম বর্ণনা করেছেন কাতাদা, জুহাক ও ইবনে জুরাইজ।

ইবনে জারীর ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা ও আবু সালেহ্ বলেছেন, আনসার সাহাবীগণের অভ্যাস ছিলো তাঁদের গৃহে কোনো অতিথি থাকলে তাদের সঙ্গে ছাড়া তাঁরা একা একা পানাহার করতেন না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁদেরকে একা একা পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁরা অতিথির সঙ্গে অথবা একা একা আহার করলে তাতে কোনো দোষ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে'। একথার অর্থ নিজের অথবা অন্যের গৃহে প্রবেশ কালে তোমরা একে অপরকে শান্তিসম্ভাষণ জানিয়ো। উল্লেখ্য, সালাম বা শান্তিসম্ভাষণ বিনিময় হতে পারে কেবল স্বধর্মাবলম্বী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। 'আন্ফুস্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্বধর্মাবলম্বী অথবা স্বজন সম্পর্কে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'লা তুখ্রিজু আনফুসাকুম মিন দিয়ারিকুম, লা তালমিজু আনফুসাকুম, জান্নাল মু'মিনুনা ওয়াল মু'মিনাতি বি আনফুসিহিম খইরা' (তোমাদের স্বজাতিদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না তোমাদের দেশ থেকে, পার্থক্য কোরো না তোমাদের স্বজনদের মধ্যে, বিশ্বাসী নর-নারীগণ নিজের সম্পর্কে পোষণ করে উত্তম ধারণা)।

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা তোমাদের বা অন্যের গৃহে প্রবেশ করে সেখানে কাউকে উপস্থিত না পাও তবে নিজেকে সালাম কোরো। বোলো, আস্‌সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিস্‌সলিহীন। এরকম সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকে ফেরেশতারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র নিকট হবে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন'। এখানে 'তাহিয়্যাত' অর্থ পবিত্রতা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী আদমকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য স্থিরীকৃত আকৃতিতে। তাঁর উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। তাঁর অবয়ব তৈরীর পর তার উপরে ঘটান আত্মার সম্পাত। বলেন, যাও ওই উপবিষ্ট ফেরেশতাদেরকে সালাম বলো এবং তারা কী জবাব দেয় শোনো। তারা যা বলবে, তাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরগণের সালামের উত্তর। নবী আদম তখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আস্‌সালামু আ'লাইকুম। ফেরেশতারা বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্।

'মিন ইনদিল্লাহ্' (এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে) অর্থ এই সালাম শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। এরকমও হতে পারে যে, এখানে মিন ইনদিল্লাহ্ কথাটির সম্পর্কযুক্ত 'তাহিয়্যাতান' এর সঙ্গে। 'তাহিয়্যাতান' অর্থ জীবনের শুভকামনা বা যে জীবনকাল লাভ হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

'মুবারাকান' অর্থ কল্যাণময়, যে কল্যাণময়তা সম্পৃক্ত রয়েছে অভিবাদনের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে। সেকারণেই অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে বলা হয় 'ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রহমাতুল্লহ্ (তোমার বা তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক অসংখ্য শান্তি ও সুপ্রচুর কল্যাণ)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রতিঅভিবাদনকে 'কল্যাণময়' বলার কারণ এই যে, এতে রয়েছে অসংখ্য মঙ্গল ও পুণ্য।

'ত্বয়্যিবাতান' অর্থ পবিত্র। অর্থাৎ অপরিচ্ছন্নতা ও অহংকার থেকে পবিত্র, বিশুদ্ধ অন্তরোৎসারিত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ত্বয়্যিবা' অর্থ ওই উচ্চারণ, যা শ্রুতিসুখকর ও অন্তরানন্দজনক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুবারাকান ত্বয়্যিবাতান' অর্থ নন্দিত সুন্দর। হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যখন তোমরা আমার কোনো উম্মতের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তাকে সালাম বলবে। এতে করে তোমরা পাবে দীর্ঘ হায়াত। আর স্বগৃহে প্রবেশ করলে সালাম বলবে গৃহবাসীদেরকে। এতে করে তোমাদের গৃহে বর্ষিত হবে কল্যাণ। আর তোমরা চাশতের নামাজও পাঠ কোরো। এই নামাজই আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হওয়ার

(আউয়্যবীনের) নামাজ। হাদিসটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং সা'লাবী ও হামযা ইবনে ইউসুফ জুরজানী 'তারিখে জুরজান' পুস্তকে। অবশ্য হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম করতে হবে। হজরত জাবের, তাউস, জুহুরী, কাতাদা এবং আমর ইবনে দীনারও এরকম বলেছেন। কাতাদা বলেছেন, তোমরা গৃহপ্রবেশকালে গৃহবাসীদেরকে সালাম বোলো। আর তোমাদের সালামের তারাই অধিক প্রাপক। জনশূন্য গৃহে প্রবেশ করলে বলবে 'আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন'। আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, এরকম সালামের প্রত্যুত্তর প্রদান করে ফেরেশতারা।

বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' কাতাদার একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণনা করেন, গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় গৃহবাসীদের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের মাধ্যমে বিদায় গ্রহণ কোরো।

তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. আমাকে নির্দেশ করেছেন, বৎস! গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের সময় গৃহবাসীদেরকে অভিবাদন জানিয়ো। এর মধ্যে রয়েছে তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কল্যাণ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গৃহে কাউকে না দেখলে বলবে 'আস্সালামু আ'লাইনা মির রব্বিনা, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস সলিহীনা, আস্সালামু আ'লা আহলিল বাইতি ওয়া রহমাতুল্লাহি' (আমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি, শান্তি বর্ষিত হোক পুণ্যবান দাসদের প্রতি, গৃহবাসীদের প্রতিও বর্ষিত হোক আল্লাহ্র দয়া। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বলবে 'আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, একবার এক লোক রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলামে কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ছয়টি— ১. পীড়িতকে দেখতে যাওয়া ২. মৃতের জানাযায় উপস্থিত হওয়া ৩. নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান ৫. হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' এবং ৬. উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্য কল্যাণকামনা। নাসায়ী, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেন, রসুল স. জানিয়েছেন, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে মুমিনও হতে পারবে না। আমি কি বলবো, পারস্পরিক মহব্বত দৃঢ় হওয়ার মাধ্যম কোনটি? তা হচ্ছে, সালামের ব্যাপক প্রচলন।

হজরত আবু হোরায়রার একটি সুপরিণত শ্রেণীর বর্ণনায় এসেছে, বাহনারোহী ব্যক্তি সালাম প্রদান করবে পদব্রজে গমনকারী পথিককে। পদব্রজে গমনকারী সালাম দিবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে। আর অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সালাম দিবে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে। বোখারী, মুসলিম।

বোখারী কর্তৃক হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, বয়োকনিষ্ঠরা সালাম করবে বয়োজ্যোষ্ঠদেরকে।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আ'লাইকুম। তিনি স. বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম। লোকটি বসে পড়লো। তিনি স. পুনরায় বললেন, তোমার লাভ হলো দশটি পুণ্য। কিছুক্ষণ পর আর এক লোক উপস্থিত হয়ে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্'। তিনি স.ও তাকে অনুরূপ জবাব দিলেন সে বসে পড়ার পর বললেন, তোমার পুণ্য অর্জিত হলো বিশটি। কিছুক্ষণ পর আর এক জন এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্'। রসুল স.ও তাকে প্রত্যুত্তরে একই কথা বললেন। তারপর সে বসে পড়ার পর বললেন, তিরিশটি। তিরমিজি, আবু দাউদ। হজরত মুয়াজ ইবনে আনাস থেকে আবু দাউদও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— এরপর আরও একজন এলো এবং বললো 'আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু'। রসুল স. বললেন, চল্লিশ। একজন অপেক্ষা অন্যজনের মর্যাদার তারতম্যও এরকম।

হজরত আবু উমামার একটি সুপরিণতসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেন, ওই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্যভাজন যে সর্বাগ্রে সালাম দেয়।

সুপরিণতসূত্রে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, কোনো সমাবেশে উপস্থিত হলে প্রথমে সালাম বলবে আগন্তুক ব্যক্তি। তারপর মন যদি চায়, তবে সে সেখানে বসে পড়তে পারে। তারপর প্রত্যাবর্তনকালেও সালাম

বলবে দণ্ডায়মান হয়ে। মনে রাখতে হবে, এমতোক্ষেত্রে প্রথম সালাম অপেক্ষা দ্বিতীয় সালাম অধিক পুণ্যার্জক নয়। তিরমিজি, আবু দাউদ।

হজরত আলী বলেছেন, পথচারীদের একজনের সালাম তাদের সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজনের সালামের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট উপবিষ্ট অন্যান্যদের জন্যও। বাগবী বর্ণিত উক্তিটিকে সাব্যস্ত করেছেন হজরত আলীর উক্তিরূপে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন বাণীটি স্বয়ং রসুল স. এর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। এই কথাটি উচ্চারিত হয়েছে তৃতীয়বারের মতো (প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লেখ এসেছে ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক আয়াতে)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের শেষে এমতো উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে বক্তব্যের দৃঢ়তা, গুরুত্ব ও মর্যাদা। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'। আর এখানে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবি এরকমই। আর এখানের বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে— সত্যোপলব্ধি ও উত্তম বিধানাবলী জ্ঞাত করানোই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, আহযাব যুদ্ধের সময় মদীনা আক্রমণ করে বসে কুরায়েশ, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। তারা সেনাসমাবেশ ঘটায় মদীনার রুম্মাহ্ কূপের মজমাউল আসইয়াল নামক স্থানে। ওই যুদ্ধে তাদের সেনাধিনায়ক ছিলো আবু সুফিয়ান। আর গাতফান গোত্রের সৈন্যরা তখন অবস্থান গ্রহণ করেছিলো উহুদ পাহাড়ের একপাশে নকিবাইন নামক স্থানে। রসুল স. তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করান। তিনি স. নিজেও খনন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। সাহাবীগণের সঙ্গে মুনাফিকেরাও বাধ্য হয়ে খননকার্যে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু তারা ছিলো অমনোযোগী। রসুল স.এর অনুপস্থিতিতে তারা চলে যেতো নিজ নিজ বাড়ীতে। সাহাবীগণের মধ্যে কারো কারো অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দিলে রসুল স. এর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁরাও কখনো কখনো অপারগ হয়ে স্থান ত্যাগ করতেন। কিন্তু প্রয়োজন শেষে তৎক্ষণাৎ তাঁরা আবার এসে কাজে যোগ দিতেন। এমতো পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن
لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ لَا
تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

❐ তাহারাই বিশ্বাসী যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাস করে এবং রসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হইলে তাহার অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না; যাহারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❐ রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করিও না; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপি চুপি সরিয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

❐ জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন। যেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে এবং রসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না'। এখানে 'আমরিন জামিয়িন' অর্থ সমষ্টিগত কার্য— যেমন পরিখা খনন, জেহাদ, জুমআর নামাজ, ঈদের নামাজ ইত্যাদি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আপনি ও আপনার সহযোগীরা যখন শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য পরিখা খননের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত, তখন আপনার অনুমতি ছাড়া যারা স্থান ত্যাগ করে না, তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর প্রকৃত আস্থা স্থাপনকারী, খাঁটি মুমিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তার রসুলে বিশ্বাসী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! পুনরায় শুনুন, যারা অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার নিকট স্থান ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে, তারপর আপনি অনুমতি দেয়ার পর অন্যত্র চলে যায়, তারাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। কারণ তাঁরা কেবল অনুমতি প্রার্থনাকেই যথেষ্ট মনে করে না, অপেক্ষা করে আপনার সম্মতির। বলা বাহুল্য যে, এখানে 'বিশ্বাসী' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর একনিষ্ঠ সহচরবৃন্দকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন পরিপূর্ণ ইমানদার, কপটতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। সুতরাং বুঝতে হবে রসুল স. এর অনুমতি ব্যতিরেকে যারা কঠিন বিপদের সময় তাঁর মহান সান্নিধ্য থেকে অন্যত্র গমন করে, তারা বিশ্বাসী নয়, কপটাচারী (মুনাফিক)। আরো বুঝতে হবে, এখানে পরপর দু'বার একই কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বিশ্বাসীগণের মহান মর্যাদাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিয়ো'। একথার অর্থ— যখন তখন কর্মস্থল ত্যাগ করা বিশ্বাসীদের স্বভাব নয়। তাই হে আমার রসুল! নিরূপায় অবস্থায় যখন তারা অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হয়, তখন তারা অনুমতি প্রার্থনা করলে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। এমতো অনুমতি প্রদান আপনার জন্য আবশ্যিক নয়। বরং তা আপনার অভিপ্রায়নির্ভর। উল্লেখ্য, এরকম অনুমতি প্রদান করা না করার অধিকার রয়েছে রসুল স. এর খলিফাগণেরও।

কেউ কেউ বলেছেন, অনুমতি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটি রসুল স. এর অভিপ্রায়নির্ভর নয়। বরং তা তাঁর বিবেচনানির্ভর। অর্থাৎ রসুল স. যদি দেখেন, অনুমতিপ্রার্থী সত্যি সত্যিই স্থানান্তরে গমন করার ব্যাপারে অপারগ, তবে তিনি স.

তাঁকে অনুমতি দিবেন। আর যদি দেখেন তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারটি অপরিহার্য নয়, গৌণ এবং তার অনুপস্থিতিতে বড় কোনো ক্ষতি হবে, তা হলে তিনি স. তাকে অনুমতি দিবেন না।

'এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু'। একথার অর্থ— ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ সর্বাগ্রগণ্য। তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হলেও, তা হবে এক ধরনের অপরাধ। এরকম কার্য অবশ্যই এক ধরনের সংকীর্ণতা। ধর্মীয় বিষয়ের উপরে জাগতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার মতো। সুতরাং হে আমার রসুল! নিরূপায় হয়ে অন্যত্র গমনকারীদের জন্যও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি তাদের উপায়বিহীনতাজাত এমতো অপরাধকে ক্ষমার্হ বিবেচনা করবেন।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন এই তথ্যটি— রসুল স. তাঁর মিম্বরে আরোহণ করে যখন ভাষণ দিতেন, তখন কারো বাইরে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সাথে সাথে বেরিয়ে যেতেন না। বরং দাঁড়িয়ে রসুল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। রসুল স. ইশারায় তাঁকে বহির্গমনের অনুমতি প্রদান করতেন।

মুজাহিদ বলেছেন, জুমআর দিন খুতবা পাঠকালে ইমাম একান্ত জরুরী প্রয়োজনে বহির্গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইশারায় অনুমতি দিতে পারেন। আলেমগণ বলেন, ইসলামের সকল সমষ্টিগত কার্যের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের এই বিধানটি প্রযোজ্য। তাই মুসলমানেরা কখনোই কোনো সমাবেশ থেকে অধিনায়কের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন করতে পারবে না। আবার অধিনায়কের এমতো স্বাধীনতা রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে অনুমতি দিবেন অথবা দিবেন না। কিন্তু কতক ক্ষেত্রে অধিনায়কের অনুমতি প্রার্থনা ওয়াজিব নয়। যেমন মসজিদে হঠাৎ কোনো নারীর ঋতুস্রাব শুরু হলো, অথবা অপবিত্র হলো অন্য কোনো কারণে, কিংবা সহসা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেলো কোনো রোগের প্রকোপ ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'রসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না'। একথার অর্থ— যখন কোনো সামষ্টিক স্বার্থে রসুল তোমাদেরকে ডাকেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দাও। তাঁর ডাককে অন্য কারো ডাকের সঙ্গে তুল্য ভেবো না। এরকম কদাচ মনে কোরো না যে, অন্যের ডাকে যেমন ইচ্ছা করলে সাড়া দেয়া যায়, অথবা না-ও দেয়া যায়— রসুলের আহ্বান সেই প্রকৃতির নয়, কখনোই সেরকম নয়। উল্লেখ্য, রসুল স. এর ডাকে তৎক্ষণাৎ 'এই যে আমি' (লাব্বাইক) বলে সাড়া দেয়া ফরজ

এবং তাঁর সমাবেশ থেকে বিনা অনুমতিতে চলে আসা হারাম। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাললাজীনা আমানুস্ তাজ্বীবু লিল্লাহি ওয়া লির রসুলি ইজা দায়াকুম লিমা ইউহ্য়িকুম (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি ডাক দিবেন তোমাদেরকে)।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'দুয়া'আর রসুল' কথাটি সম্পর্কযুক্ত কর্মপদের সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— অন্য লোককে তোমরা যেভাবে সম্বোধন করো, আল্লাহ্র রসুলকে কখনোই সেভাবে সম্বোধন কোরো না। তাঁকে কখনো নাম ধরে ডেকো না। আহ্বান কোরো যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে।

আবু নাঈম তাঁর 'আদ্দালায়েল' গ্রন্থে জুহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাযাবর বেদুইনেরা রসুল স.কে সম্বোধন করতো ' ইয়া মোহাম্মদ' 'ইয়া আবাল কাসেম' বলে। তাদের এমতো অপসম্বোধন নিষিদ্ধকরণার্থেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। তারপর থেকে সকলে তাঁকে আহ্বান করতে থাকে 'ইয়া নবীআল্লাহ্' 'ইয়া রসুলাল্লাহ্' বলে। উল্লেখ্য, এই ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, রসুল স. সকাশে অনুমতি প্রার্থনা করা না করার কথা। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রার্থনাপূর্ব সম্বোধনের বিধানের কথা। যেনো বলা হয়েছে, তোমরা অনুমতি প্রার্থনার পূর্বে অথবা অন্য যে কোনো কারণে যখন রসুলকে সম্বোধন করো, তখন তাঁকে ডাকো সম্মানসূচকতার সঙ্গে 'হে আল্লাহ্র নবী' 'হে আল্লাহ্র রসুল'— এভাবে। অন্য মানুষকে যেমন নাম বা জাগতিক কোনো পদবী ধরে সম্বোধন করা হয়, সেভাবে তাঁকে কখনোই আহ্বান কোরো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তোমরা কখনো আল্লাহ্র রসুলকে অপ্রসন্ন কোরো না। বেঁচে থেকো তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা থেকে। কারণ তাঁর অপ্রসন্নতা ও অপপ্রার্থনা অন্য কারো মতো নয়।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী লিখেছেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে কতিপয় ইহুদী উপস্থিত হয়ে বললো 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার ধ্বংস হোক, মৃত্যু হোক)। তিনি স. প্রত্যুত্তরে বললেন, 'ওয়া আলাইকুম'। (তোমারও)। এ কথা শুনতে পেয়ে আমি বললাম 'আসসামু আলাইকুম ওয়া লানাতুল্লহি ওয়া গদ্বেবু আলাইকুম' (তোমার মৃত্যু হোক, তোমার প্রতি পতিত হোক আল্লাহ্র অভিসম্পাত ও রোষ)। তিনি স. বললেন, আয়েশা! সংযত হও। বিনম্র হও। রক্ষা পাও রূঢ় ও অশ্লীল বচন থেকে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি শুনতে পাননি

তারা কী বললো? তিনি স. বললেন, তুমি কি শুনতে পাওনি আমি কী বললাম? আমার জন্য তাদের প্রার্থনা গৃহীত হবে না। কিন্তু তাদের জন্য আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে।

আমি বলি, এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বুঝতে হবে, এখানে 'আলাইকুম' শব্দটি উহ্য রয়েছে। তখন প্রকৃত বক্তব্যটি হবে এরকম— 'লা তাজ্আ'লু দুয়াআর রসুলি আলাইকুম কাদুয়ায়ি বা'দ্বিকুম আ'লা বা'দ্বিন'। 'দুয়া 'শব্দের পরে 'আ'লা বসলে অর্থ হবে অপপ্রার্থনা। আর শব্দটির পরে 'লাম' বসলে (যেমন লাহুম, লাকা, লাহু, লি ইত্যাদি) অর্থ হবে উত্তম প্রার্থনা। আর সংযোজক শব্দ ও হরফে জ্বর যদি না থাকে তবে অর্থ হবে আহ্বান করা, সম্বোধন করা, ডাকা বা ভালো-মন্দ কাজের জন্য দোয়া করা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ছোটরা বড়দের কাছে প্রার্থনা করলে বড়রা হয়তো তা গ্রহণ করে অথবা নাকচ করে দেয়। তোমরা রসুলের প্রার্থনাকে এমন মনে কোরো না। আল্লাহ্ সকাশে তাঁর প্রার্থনা অবশ্য গ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন'। এখানে 'সাললুন' অর্থ চুপি চুপি। অপহরণের মতো গোপনীয়তার সঙ্গে রয়েছে শব্দটির সম্পৃক্তি। যেমন 'সাললাল বায়িরু ফী জাওফিল লাইলি' অর্থ রাতে উটটি চুপিসারে চলে গিয়েছে। 'ইনসাল্লা' 'ইসতাল্লা' শব্দ দু'টোও সমার্থবোধক। এরকম বলা হয়েছে 'কামুস' নামক অভিধানে।

এখানকার 'লিওয়াজ্বান' শব্দটি এসেছে 'লিওয়াজ্ব' থেকে। শব্দটি 'বাবে মুফায়ালা' এর ধাতুমূল। শব্দটির রূপান্তরণ এরূপ— 'লাওয়াজ্বা'— 'ইউলায়িজ্জু'— লিওয়াজ্বান। মূল শব্দ হচ্ছে 'রিয়াজ্বান'। 'লিওয়াজ্ব' অর্থ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা, অন্যের নিকট থেকে গোপন করা, অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া। যেমন একটি দোয়ায় বলা হয়েছে 'আল্লাহুম্মা আলুজ্বিকা' (হে আল্লাহ্' আমি তোমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী)। 'লাওয়াজ্ব' অর্থ প্রথমজন দ্বিতীয়জনের এবং দ্বিতীয় জন প্রথম জনের সাহায্যে পরস্পরের আড়াল গ্রহণ করে চলে যায়। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— মুনাফিকেরা চুপি চুপি সরে যায় বা চলে যায়। অথবা অর্থ হবে— যারা স্থানত্যাগের অনুমতি পেতেন, তাদেরকে আড়াল করে যারা সরে যায়।

'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'লিওয়াজ্ব' শব্দটি 'লিওয়াজ্ব' এর মতোই। শব্দ দু'টোর অর্থ কোনো কিছুর আড়ালে গোপন হওয়া বা আত্মগোপন করা। উল্লেখ্য, আহযাব যুদ্ধের পরিখা খননকালে মুনাফিকেরা এভাবেই আত্মগোপন করে চুপিসারে সরে পড়তো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জুমআর দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং খুতবা শ্রবণ করা ছিলো মুনাফিকদের জন্য বড়ই অস্বস্তিকর। তাই তারা সাহাবীগণকে আড়াল করে চুপি চুপি সরে পড়তো।

'ক্বদ ইয়া'লামুল্লহ' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। অর্থাৎ তারা যে শাস্তিযোগ্য তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। আর যথাসময়ে তাঁর এই শাস্তি কার্যকরও হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে'। এখানে 'আ'ন আমরিহি' (তাঁর আদেশের) কথাটির 'আন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। কেউ কেউ এরকম বলেছেন। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— যারা তাঁর আদেশের চরম বিরুদ্ধাচরণ করে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'মুখলিফুন' কথাটির মধ্যে রয়েছে চরম বিমুখতার অর্থ। আর 'আন' ওই চরম বিমুখতার পরিচায়ক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র আদেশের প্রতি প্রদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈমুখ্য। যেমন 'খলাফা আনিল আমরি' অর্থ সে বিমুখ হয়েছে, প্রত্যাবর্তন করেছে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে এখানকার কর্মপদ রয়েছে অনুক্ত। আর এখানকার 'আ'ন আমরিহি' এর 'হি' (তাঁর) সর্বনামটি স্থলাভিষিক্ত হবে আল্লাহ্র অথবা আল্লাহ্র রসুলের।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার 'ফিৎনাতুন' (বিপর্যয়) অর্থ জাগতিক বিপদ বা শাস্তি। আর 'আ'জাবুন আ'লীম' (কঠিন শাস্তি) অর্থ আখেরাতের আযাব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যদি আমর বা আদেশের ওয়াজিব— মোস্তাহাব কোনোটাই হওয়ার কারণ না থাকে এবং ওই কারণ দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ না পায়, তবে মূল শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশটি ওয়াজিব শ্রেণীরই হয়ে থাকে। সাধারণ আদেশ একাধিক অর্থবোধক হয় না। আবার হয় না কেবল ওয়াজিব, অথবা কেবল মোস্তাহাব। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মোবাহের মধ্যে, না হয় ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ্ ও তাহদীদের মধ্যে, যেমন বলে শিয়া মতাবলম্বীরা। ইবনে শোরাইহ্ এর অভিমতও শিয়াদের অভিমতের মতো। সাধারণ আদেশকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের অভিমতের প্রত্যয়ন হয় এই আয়াতের মাধ্যমেও। কেননা এখানকার আদেশের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে শাস্তি হবে বলে বলা হয়েছে। আর একথা বলা বাহুল্য যে, বিপর্যয় ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয় ওয়াজিব পরিত্যাগ ও হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার কারণেই।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ্‌রই। একথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির একক অধিকর্তা কেবলই আল্লাহ্।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা জানেন'। একথার অর্থ— হে মনুষ্য সমাজ! তোমাদের জন্য যে বিধানাবলী আমি প্রবর্তন করেছি, তোমরা তা মান্য করো কি করো না, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। এরকমও হতে পারে যে, এখানে বলা হয়েছে কেবল মুনাফিকদের কথা। আর এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যে মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির একক অধীশ্বর, তিনি তো সকলের প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে জানবেনই। তিনি যে সর্বজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করতো'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যখন সকলকে একত্র করা হবে, তখন আল্লাহ্ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করবেন যে, কে পুরস্কারের যোগ্য এবং কে যোগ্য তিরস্কারের। আর সেই মতে তিনি তা পুরোপুরি কার্যকরও করবেন।

এখানে 'ফা ইউনাব্বিউহুম' (জানিয়ে দিবেন) এর 'ফা' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। আর 'ইয়াওমা ইউরজ্বাউ'না' (যেদিন প্রত্যাবর্তিত হবে) 'ইউনাব্বিউহুম' এর কর্মকারক। যেমন এক সুরায় বলা হয়েছে— 'লি ইলাফি কুরাইশিন ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতাঈ ওয়াস সইফ ফাল ইয়া'বুদু রব্বাহাজাল বাঈত'। এখানে 'লিইলাফি' এর সম্পর্ক 'লিইয়া'বুদু' এর সঙ্গে এবং 'ফালইয়া'বুদু' এর 'ফা' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নিকট কোনো কিছুই অজ্ঞাত বা গোপন নয়।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, নারীদেরকে বালাখানায় রেখো না এবং তাদেরকে লিপিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ো না। বরং তাদেরকে শিক্ষা দিয়ো বস্ত্রবুনন কর্ম ও সুরা নূর। আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও তাঁর সহচরবৃন্দ সত্য কথাই বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্। সুরা নূরের তাফসীর শেষ হলো আজ ২৯ শে রমজান, ১৩০৪ হিজরী সনে।

সূরা ফুরক্বান

সুরা ফুরক্বানের আয়াত-সংখ্যা ৭৭ এবং রুকুর সংখ্যা ৬। সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইয়াসিনের পরে।

ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি একবার হিশাম ইবনে হাকিমকে নামাজের মধ্যে সুরা ফুরক্বান পাঠ করতে শুনলাম। দেখলাম, সে সুরাটি পাঠ করছে কিছু অতিরিক্ত শব্দ সংযোজনা সহকারে। মনে হচ্ছিলো নামাজের মধ্যেই তাকে সতর্ক করে দিই। কিন্তু তা না করে নামাজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। নামাজ শেষ হতেই তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, তোমাকে এভাবে সুরা পাঠ করতে কে শিখিয়েছে? সে বললো, স্বয়ং রসুল স.। আমি বললাম, তুমি ভুল বললে। তিনি স. তো আমাকে এই সুরা শিখিয়েছেন অন্যভাবে। একথা বলেই আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যেভাবে সুরা ফুরক্বান শিখিয়েছেন, হিশাম সেভাবে পাঠ করে না। রসুল স. হিশামকে বললেন, পড়তো দেখি। হিশাম পাঠ করলো। রসুল স. বললেন, ঠিকই আছে। সুরাটি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার তুমি পাঠ করো। আমি নির্দেশ পালন করলাম। পাঠ শেষ হলে তিনি স. বললেন, ঠিকই আছে। এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ফুরক্বান। আসলে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাতটি উচ্চারণরীতিতে। যে রীতির পাঠ তোমাদের জন্য সহজ হয় তোমরা সেই রীতিতেই পাঠ কোরো। উল্লেখ্য, হরফে কাছীর অর্থ ধ্বনিমাত্রিক বর্ণ। আমার মতে শব্দটির অর্থ হবে ভিন্ন পাঠরীতি। আল্লাহ্‌ই সমধিক জ্ঞাত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

❒ কত মহান তিনি যিনি তাঁহার দাসের প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমিকত্বে তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাবারকাল্লাজী নায্যালাল ফুরক্বানা আ'লা আ'বদিহী' (কতো মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন), এখানকার 'তাবারক' (মহান) শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বারকাত' থেকে। শব্দটির ব্যাকরণ গত রূপান্তর হয় না এবং শব্দটি নির্দিষ্ট কেবল আল্লাহ্র জন্য। বারকাত অর্থ অতুলনীয় কল্যাণ বা অতুলনীয়রূপে মহান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল প্রকার কল্যাণ যার দিক থেকে সমাগত হয়। হাসানও এরকম বলেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটির অর্থ সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম। সকল বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান। শব্দটির মধ্যে রয়েছে অতুলনীয় আধিক্যের ভাব। তাই জুহাক এর অর্থ করেছেন মহামর্যাদাশালী।

'ফুরক্বান' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ পার্থক্য নির্দেশক। যেমন 'ফাররাক্বা বাইনাশ্ শাইআইন' অর্থ সে দু'টি বস্তুকে পৃথক করে দিয়েছে। কোরআন মজীদ মিথ্যাকে সত্য থেকে পৃথক করে দেয় বলেই এর নাম ফুরক্বান। কোরআন সত্যানুগামী ও মিথ্যানুসারীকে পৃথক করে দেয়। অথবা কোরআনকে 'ফুরক্বান' বলা হয়েছে এই অর্থে যে, এর অবতারণা বা উপস্থাপনা এক সঙ্গে করা হয়নি, করা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনা অথবা সময়ের প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক সময়ে ও পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে খণ্ড খণ্ড রূপে। এক সঙ্গে নয়। আর যেহেতু কোরআনে রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ, তাই এর অবতারক আল্লাহ্কে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে 'কতো মহান'(তাবারক) অভিধায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে'। একথার অর্থ— যাতে এই কোরআন যার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সেই মহান রসুল মানুষ ও জ্বিনকে সতর্ক করতে পারেন আল্লাহ্র অসন্তোষ অথবা শাস্তি সম্পর্কে। এখানে 'বিশ্বজগত' অর্থ মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়। কেননা তাঁর রেসালাত সমগ্র মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের জন্য।

'নাজীরা' অর্থ সতর্ককারী। শব্দটি 'মুনজীর' (ভীতিপ্রদর্শনকারী) এর অর্থ প্রদায়ক। যেমন 'নাকীর' ও 'মুনকীর' সমার্থবোধক।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি'। উল্লেখ্য, খৃষ্টানেরা বলে 'মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র'। তাদের এমতো অপবিশ্বাসকে এখানে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে একথা বলে যে, 'তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোনো অংশী নেই'। একথা বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে অগ্নিউপাসক ও মূর্তিপূজকদের অপবিত্র বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য, অগ্নি উপাসকেরা বলে, স্রষ্টা দু'জন। একজন কল্যাণের এবং অপরজন অকল্যাণের। আর মূর্তিপূজকেরা তো বহু স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তাদের এমতো অপধারণার অপনোদন করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে আরো স্পষ্ট করে। বলা হয়েছে—

'তিনিই সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন'। একথার অর্থ কেবল তাঁর অভিপ্রায়েও সৃজনে অনস্তিত্ব থেকে সমদ্ভূত হয়েছে সমগ্র সৃষ্টি। সকলের এবং সকল কিছুর সত্তাগত স্বভাবও তাঁর দান। যেমন মানুষকে দিয়েছেন অনুসন্ধিৎসা, বিবেক, বুদ্ধি, ভালোবাসা। অর্থাৎ সৃষ্টির অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্যাবলী সকল কিছুর স্রষ্টা এক, একক, অংশীহীন ও আনুরূপ্যবিহীন মহাসৃজয়িতা আল্লাহ্। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যেমন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের আয়ুষ্কাল। কখনো কখনো 'খলাক্ব' শব্দটির অর্থ করা হয় 'অস্তিত্ব প্রদাতা'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই সমস্তকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং দান করেছেন তাদের প্রকৃতিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমূহকে, যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় প্রকৃতিগত পার্থক্য। বজায় থাকে প্রত্যেকের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ। যেনো না তারা হতে পারে একে অপরের মধ্যে একাকার।

কোনো কোনো আলেম এখানকার 'প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন' কথাটির অর্থ করেছেন—আল্লাহ্ সকলের ও সকলকিছুর আয়ু, কর্মপরিধি ও জীবনোপকরণ নির্ধারণ করেছেন তাদের অস্তিত্বপ্রাপ্তির আগেই। সেই নির্ধারণানুসারেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তাদের উত্থান, অর্জন ও বিলয়।

তখনকার মক্কাবাসীরা ছিলো আল্লাহ্র এককত্ব ও তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের প্রতি অবিশ্বাসী। পরবর্তী আয়াতত্রয়ে তাই খণ্ডন করা হয়েছে তাদের অবিশ্বাস ও অপবিশ্বাসকে এভাবে—

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩, ৪, ৫

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ

عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

❒ তবুও তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরকে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজদিগের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

❒ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহম্মদ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে'। উহারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে।

❒ উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে কালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'আল্লাহই সকলকিছুর অস্তিত্বদাতা ও প্রত্যেকের যথোচিত প্রকৃতিপ্রদাতা হওয়া সত্ত্বেও অংশীবাদীরা উপাসকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাসমূহকে, যেগুলো তাদের মতোই সৃষ্ট এবং যেগুলো সম্পূর্ণরূপে জড় ও স্থবির, ভালো অথবা মন্দ কোনোকিছুই করার ক্ষমতা যেগুলোর নেই, জীবন-মৃত্যু-মৃত্যুপরবর্তী উত্থান কোনোকিছুর উপরেই যেগুলোর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নেই।

'তারা নিজেদের ভালোও করতে পারে না মন্দও করতে পারে না' কথাটির মর্মার্থ— আল্লাহ্ তাদের কল্যাণ না চাইলে যেমন তারা নিজে নিজে কল্যাণ লাভ করতে পারে না, তেমনি প্রতিহতও করতে পারে না আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো অমঙ্গল বা ক্ষতি। এমনকি ক্ষুদ্র মক্ষিকাও যদি সেগুলোর সামনে থেকে তাদের উপাসককুল প্রদত্ত প্রসাদের কোনো অংশ নিয়ে উড়ে চলে যায়, তবুও সেগুলো থাকে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ মক্ষিকাকুলকে বিতাড়নের ক্ষমতাও তাদের নেই। উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসমূহই শুধু কল্যাণ অকল্যাণ সাধনে অক্ষম তা নয়, বরং মহা মর্যাদাসম্পন্ন নবী হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশ্তামণ্ডলীও অক্ষম, তাদের কল্যাণ অকল্যান সাধনে। তাই এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'কুল্ লা আমলিকু লিনাফসি নাফআঁও ওয়ালা দ্বররান ইল্লা মা শাআল্লাহ ওয়ালাও কুনতু আ'লামুল গইবা লাস্তাকছারতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাস্সানিয়াস্ সুউ' (আপনি

বলুন, আমার নিজের জন্য আমি কোন কল্যাণ অকল্যাণের অধিকারী নই। তবে হ্যাঁ যা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হয়। আমি যদি জানতাম অদৃশ্যকে তবে অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ সাধন করতাম আমি। আর আমাকে সম্পর্শও করতোনা কোনো অনিষ্ট)।

'জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরেও কোনো ক্ষমতা রাখে না' কথাটির অর্থ তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ জীবন যেমন দিতে পারে না, তেমনি প্রতিহত করতে পারে না মৃত্যুকেও। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ঘটানো তো আরো অনেক দূরের ব্যাপার। এ সমস্ত কাজ ঘটাতে পারেন কেবল এক, অবিভাজ্য ও আনুরূপ্যবিহীন উপাস্য আল্লাহ্‌। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অনন্ত স্বস্তি অথবা শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টিও কেবল তাঁর ক্ষমতায়ত্ব।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়। মোহাম্মদ এটা উদ্ভাবন করেছে এবং সম্প্রদায়ের লোক তাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে'। একথার অর্থ কাফেররা বলে, এই কোরআন অসত্য। এটা মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত কিছু লোক। উল্লেখ্য, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কেবল তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্বে অবিশ্বাসীরাই কাফের নয়, প্রেরিত বার্তাবাহক বা নবী-রসুলগণকে অস্বীকারকারীরাও কাফের বা সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারী। কেননা কেবল বুদ্ধি প্রকৃত তওহীদ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম নয়। রেসালাতের মাধ্যম অত্যাবশ্যক। তাই এখানে রসুল স. এবং তাঁর উপরে অবতীর্ণ কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। দার্শনিকরা তাই রেসালতের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌র সত্তা-নাম-গুণাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে পথচ্যুত হয়েছে। অন্যকেও করেছে পথভ্রান্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আব্দুল কয়েসের প্রতিনিধিদলের এক ঘটনায় এসেছে, রসুল স. একবার তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জানো এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? তারা বললো, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, তওহীদ হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌।

এখানে 'হাজা' অর্থ এই কোরআন, যা অবতীর্ণ হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপর। 'ইফ্‌কুন' অর্থ অসত্য, যা ফিরিয়ে দেয় সঠিক পথ থেকে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র কালাম নয়, মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা।

'ক্বওমুন আখারূন' অর্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ ইহুদীদের একটি দল, বলেছেন মুজাহিদ। হাসান বলেছেন, এর অর্থ ওবায়েদ ইবনুন হসর নামক এক

আবিসীনিয় ক্রীতদাস। সে ছিলো গণক। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে মক্কার কয়েকজন ক্রীতদাসকে, যাদের নাম জবর, ইয়াসার ও আদাস। তারা ছিলো আহলে কিতাব সম্প্রদায়ভূত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে'। একথার অর্থ রসুল স. ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারী। এখানে 'জুলুম' অর্থ সীমালংঘন এবং 'জুর' অর্থ মিথ্যা। বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'জ্বাআ' শব্দটি 'আতা' (করেছে বা করে) অর্থেও ব্যবহৃত। এরকম হলে শব্দটি হবে ফেলে মুতাআদ্দি (সকর্মক ক্রিয়া)।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, এগুলি তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়'। নজর ইবনে হারেছ বলতো, কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নয়। এ হচ্ছে প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী যা কথিত ও শ্রুত হয় জনশ্রুতির মাধ্যমে। তার ওই উক্তিকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর 'সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়' কথাটির অর্থ এখানে— ওই মিথ্যাবাদীরা বলে, মোহাম্মদ তো অক্ষর পরিচয়বিচ্যুত। তাই তাকে ওই সকল কল্পকাহিনী তার নিকটে পাঠ করে শোনায় জাবর, ইয়াসার, আদাস প্রমুখ ইহুদী গল্পকারেরা, যাতে সেগুলোকে সে স্মৃতিস্থ করতে পারে।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ۙ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ○ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ○

❑ বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ উহারা বলে, 'এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে; তাহার নিকট কেন কোন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সঙ্গে থাকিত সতর্ককারীরূপে?

❑ তাহাকে ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন? যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে; সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ।'

❑ দেখ, উহারা তোমার কি উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারীদের অপবক্তব্য খণ্ডনার্থে বলুন, এই কোরআন মানব রচিত নয়। এটা এমন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর সত্তার বাণী যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাইতো শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকেরা এরকম বাণী নির্মাণ করতে যেয়ে পরাভব মেনেছে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই কোরআনে ওই মহাসৃজয়িতার পরিচয় লাভ করা যায় যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রহস্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতএব বুঝতে হবে এ বাণী মানব রচিত নয়, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দিন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! আল্লাহ্‌র কালামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে তোমরা অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। তবুও তোমরা সাময়িকভাবে হলেও শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছো এ কারণে যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, এ কেমন রসুল যে আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফিরা করে'। একথার অর্থ—সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি যদি রসুলই হতে তবে তোমার জীবনযাত্রা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। পানাহার, হাটে-বাজারে চলাফিরা এসব তোমার মধ্যে কিছুতেই থাকতো না। এ সকল কিছু তো সাধারণ মানুষের কাজ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স.কে লক্ষ্য করে মক্কার মুশরিকেরা বলতো, তুমিতো ফেরেশতাও নও। যদি হতে তবে তো নিশ্চয় আমাদের মতো পান-ভোজন করতে না। আবার সম্রাটও তো নও তুমি। হলে নিশ্চয় আমাদের মতো হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে না। সুতরাং তোমাকে রসুল বলে মান্য করি কীভাবে?

আমি বলি, কথাটি এমন নয়। কারণ রসুল স. কখনোই নিজেকে ফেরেশতা বা সম্রাটরূপে জাহির করেননি। বরং তিনি বলেছেন 'আমি তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আমার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়'। অর্থাৎ তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বা রসুলরূপে। আর পানাহার এবং বাজারে গমনাগমন কখনই রসুল হওয়ার অন্তরায় নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে মানবিক বৈশিষ্ট্য। আর মানুষের রসুল তো মানুষই হন। অন্য কোনো সৃষ্টি মানুষের রসুল হতে পারে না। কারণ উপকার আদান-প্রদানের জন্য সমসম্প্রদায়ভূত হওয়া প্রয়োজন। অন্য এক আয়াতে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে তাদের জন্য আমি আকাশ থেকে রসুল হিসেবে অবতীর্ণ করতাম ফেরেশতাকেই'। অতএব বুঝতে হবে মানুষের রসুল মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার নিকট কেনো কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে'। একথার অর্থ— তারা আরো বলে, রসুল হওয়ার দাবিদার এই ব্যক্তি নিজে তো ফেরেশতা নয়ই, তদুপরি তার রেসালতের সাক্ষ্যদাতারূপে তার সঙ্গে কোনো ফেরেশতাও নেই, যার সাক্ষ্য শুনে আমরা তার রেসালতের সত্যতা সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেনো, অথবা তার একটি বাগান নেই কেনো, যা থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে'? একথার অর্থ— তারা আরো বলে, আকাশ থেকে যদি তাকে কোনো ধনভাণ্ডার দেয়া হতো, তবে তাকে পার্থিব প্রয়োজনে হাটে বাজারে গমনাগমন করতে হতো না। অথবা অন্ততঃপক্ষে একটি বাগানও যদি তার থাকতো, তবুও তো সে ওই বাগানের ফলমূল ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। আয়-উপার্জনের চিন্তা তাহলে তাকে করতে হতো না। কিন্তু এগুলোও তো তার নেই।

পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের আপত্তি ছিলো তিনটি— ১. রসুল ফেরেশতা নয় কেনো ২. যদি নিজে সে ফেরেশতা না হয় তবে তার পক্ষে সাক্ষ্যদাতারূপে কোনো ফেরেশতাই বা থাকলো না কেনো ৩. যদি এগুলো না-ই হয় তবে পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য তার গোপন ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগানই বা থাকলো না কেনো, যেমন থাকে বিত্তশালীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীরা আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো'। একথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা রসুল স. এর প্রিয় সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা তো সত্যি সত্যিই

নির্বোধ। সেকারণেই তো অনুসারী হয়েছো যাদুগ্রস্ত এই তথাকথিত রসুলের। এখানে 'মাসহুর' অর্থ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ প্রতারক। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ সত্যবিমুখ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি কর্মকারক হলেও কর্তৃকারকের অর্থপ্রদায়ক। এভাবে শব্দটির অর্থ হয় যাদুকর।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'দেখো, তারা তোমার কী উপমা দেয়'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় বাণীবাহক! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সীমালংঘনের নমুনা দেখুন। দেখুন তাদের অবিমৃশ্যকারিতার দৃষ্টান্ত। তারা আপনার উপমা দেয় এক এক বার এক এক জনের সঙ্গে এক এক ভাবে। কখনো আপনাকে তুলনা দেয় অসত্যভাষীদের সঙ্গে, কখনো বলে আপনি নাকি প্রাচীন যুগের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর বর্ণনাকারী, যা আপনি অন্যের কাছ থেকে শিখেছেন। আবার কখনো যাদুকরের সঙ্গে নির্মাণ করে আপনার সৌসাদৃশ্য। কখনো বলে, আপনি ফেরেশতা নন কেনো, আপনার সঙ্গে সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতা নেই কেনো, যদি তা না-ই থাকে তবে বিত্তবৈভব অথবা বাগান নেই কেনো? এগুলো কি তাদের বিভ্রান্তির স্পষ্ট নিদর্শন নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে'। একথার অর্থ— তাদের এসকল অপভাষণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা সত্য পথ পরিত্যাগ করেছে। হয়েছে পথভ্রষ্ট। অথচ আপনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মানুষ ও রসুল। আর রসুলগণ নিষ্পাপ ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ্প্রদত্ত মোজেজাই পার্থক্য নির্দেশ করে সত্য রসুল ও মিথ্যা রসুলের দাবিদারদের মধ্যে, যেমন করেছে এই অলৌকিক গ্রন্থ কোরআন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারা পথ পাবে না'। একথার অর্থ— এবং তারা স্বেচ্ছাভ্রষ্ট বলেই হেদায়েতের পথ আর পাবে না। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তাদের অপউক্তিগুলো স্ববিরোধী, তাই তাদের পথপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নেই।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাইছুমা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ একবার রসুল স.কে জানালেন, হে আমার রসুল! আপনি যদি চান, তবে আমি আপনাকে দান করবো পৃথিবীর ধনাগারের চাবি। এতে করে আপনার পরবর্তী পৃথিবীর প্রাপ্তি এতটুকুও কমবে না। আর আপনি যদি চান, তবে এখানকার দানকেও আমি একত্রিত করে রাখবো পরলোকের সম্পদের সাথে। রসুল স. জবাব দিলেন, আমাকে যা দান করতে চান, তার সকল কিছুই জমা রাখা হোক পরকালের জন্য। এটাই আমার বিনীত অভিপ্রায়। রসুল স. এর এ অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ○ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ○ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ○ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ○

❒ কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু—উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

❒ কিন্তু উহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি।

❒ দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার;

❒ এবং যখন উহাদিগকে হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণস্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সেই আল্লাহ্ কতোই না মহান, যিনি ইচ্ছে করলে, হে আমার প্রিয় রসুল, আপনাকে দিতে পারেন পৃথিবীর উদ্যানরাজি অপেক্ষা অনেক উত্তম উদ্যান, যেগুলোর মধ্যে বয়ে যাবে স্রোতস্বিনীসমূহ, আরো দিতে পারেন সুরম্য প্রাসাদমালা। কিন্তু তিনি তা করেননি। আপনার জন্য সমস্ত বৈভব জমা করে রেখেছেন আখেরাতে।

ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— মহানতম আল্লাহ্ তো ইচ্ছে করলে আপনাকে অবশ্যই দিতে পারতেন বাজারে চলাফিরা করা এবং উপার্জনান্বেষণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম নেয়ামতসম্ভার।

এখানে 'কুসুরান' অর্থ সুদৃঢ় ভবন। আরববাসীরা 'কৃসর' বলেন মজবুত প্রাসাদকে।

হজরত আবু উমামা বাহেলী থেকে আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম সূত্রবিশিষ্ট' আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমার জন্য মক্কার পার্বত্যভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিবেদন করেছি, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি এরকম চাই না। আমি চাই একদিন পানাহার করবো, আর একদিন থাকবো অনাহারে। পানাহারবিহীন দিবসে হবো প্রার্থী। আর পানাহার বিশিষ্ট দিবসে হবো কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি ইচ্ছে করলে আমার পশ্চাতে চলতে থাকতো স্বর্ণের পাহাড়। একদিন দীর্ঘদেহী এক ফেরেশতা, যার কটিদেশ ছিলো কাবাগৃহের ছাদ বরাবর, আমাকে এসে বললো, আপনার প্রভুপালনকর্তা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলেছেন, আপনি ইচ্ছা করলে হতে পারেন নবী ও সম্রাট, অথবা নবী ও দাস। আমি নিকটে উপস্থিত ভ্রাতা জিবরাইলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তিনি আমকে ইঙ্গিতে গ্রহণ করতে বললেন বিনয়বনতাকে। আমি বললাম, আমি থাকতে চাই নবী ও দাস। জননী আয়েশা বলেন, এরপর থেকে রসুল স. হেলান দিয়ে পানাহার করতেন না। পানাহারকালে বলতেন, আমি উপবেশন ও আহার গ্রহণ করি দাসের মতোন।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে'। পূর্ববর্তী আয়াতের (৭) 'তারা বলে' কথাটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সম্পর্ক। আর আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'বাল' (কিন্তু) উল্লেখিত হয়েছে বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা রসুল সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর কথাই কেবল বলে না, উপরন্তু অস্বীকার করে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসকে। অথবা মর্মার্থ হবে— হে আমার রসুল! সীমালংঘনকারীরা অনর্থক আপনাকে বাক্যবানে জর্জরিত কেবল করে না, অধিকন্তু অবিশ্বাস করে কিয়ামতকে। তাদের দৃষ্টি পার্থিব প্রাপ্তিকে অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তারা মহাপ্রলয়ের প্রতি আস্থাশীল হবে কীভাবে? অথবা বক্তব্যার্থ হবে এরকম— তারা তো কিয়ামতকেই স্বীকার করে না, সুতরাং একথা তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে যে, আখেরাতে আমি আপনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি কল্পনাতীত অনুগ্রহসম্ভার। কিংবা কথাটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে বলে মনোক্ষুণ্ন হবেন না। তারা এর চেয়ে আরো মর্মপীড়াদায়ক কথা বলতে অভ্যস্ত। তারা তো কিয়ামতকেই বিশ্বাস করতে চায় না, যা অনিবার্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি'। এখানে 'সায়ীরা' অর্থ জ্বলন্ত অগ্নি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সায়ীর' একটি জাহান্নামের নাম।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার'। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞ লিখেছেন, এখানে দেখার বিষয়টি যখন দোজখাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে আদতেই দোজখের আগুন হবে চক্ষুষ্মান। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর কলংক লেপন করবে সে যেনো তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় আগুনের দুই চোখের মাঝখানে। উপস্থিত সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আগুনের কি চোখ থাকবে? তিনি স. বললেন, তোমরা কি শোনোনি আল্লাহ্‌র বাণী— 'দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার'।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে দেখার প্রসঙ্গটি রূপকার্থক, প্রকৃতার্থক নয়। অর্থাৎ তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দোজখের ফেরেশতারা দেখবে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— দোজখের লেলিহান আগুন যখন এসে পড়বে দৃষ্টির সীমানায় তখন শ্রুত হবে তার ক্রুদ্ধ আওয়াজ ও ভয়ংকর নাদ। উল্লেখ্য, দোজখের এই দেখার দূরত্ব হবে একশত বছরের পথের দূরত্বের সমান। এরকম বলেছেন কালাবী। কেউ কেউ বলেছেন, দোজখের আগুন তাদেরকে দেখতে পাবে পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান দূর থেকে।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাদেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে'। এখানে সংকীর্ণ কোনো স্থানে নিক্ষেপ করার অর্থ ভয়াবহতম শাস্তিতে নিপতিত করা। কারণ প্রশস্ততার তুলনায় সংকীর্ণতা অধিক শাস্তিদায়ক। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে উসাইদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স.কে একবার এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে এমনভাবে চেপে দেয়া হবে, যেমন দেয়ালের উপরে ঠুকে দেয়া হয় পেরেক। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, যেমন বস্তায় বিদ্ধ বর্শা। কাতাদাসূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, কাফেরদের জন্য জাহান্নাম সংকীর্ণ হবে এরকম, যেমন দেয়ালে বিদ্ধ বল্লম।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, চিরস্থায়ী দোজখবাস যাদের জন্য নির্ধারিত হবে, তাদেরকে প্রথমে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে, তারপর

ওই সিন্দুককে প্রবেশ করানো হবে আর একটি লোহার সিন্দুকে, তারপর নিক্ষেপ করা হবে দোজখের তলদেশে। তাই দোজখীরা নিজেকে ছাড়া অন্য কারো শাস্তি দেখতে পাবে না। সুয়াইদ ইবনে গাফলা সূত্রে আবু নাঈম ও বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

'মুক্বাররানীনা' অর্থ হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় বা খামের সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বা শৃঙ্খলিত অবস্থায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে তখন বেঁধে ফেলা হবে শয়তানের সঙ্গে বা শয়তানের দঙ্গলের সঙ্গে।

'ছুবুরা' অর্থ ধ্বংস বা ধ্বংস কামনা। এরকম অর্থ করেছেন জুহাক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ছুবুরান' অর্থ 'ওয়ালান' (ধ্বংস, বিলয়)।

আহমদ, বাযযার, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম ইবলিসকে আগুনের পোশাক পরানো হবে। সে তখন ওই পোশাক টানাটানি করতে করতে চিৎকার করে বলতে থাকবে 'ইয়া ছুবুর' 'ইয়া ছুবুর' (হায় ধ্বংস, হায় ধ্বংস)। তার বংশধরেরাও এভাবে আগুনের পোশাক পরে চিৎকার করতে করতে চলতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। পরিশেষে সকলে প্রবেশ করবে জাহান্নামের ভিতর। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কোরো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো'। একথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ○ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ○ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ○

❑ উহাদিগকে বলা হইবে, 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।'

❑ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে সাবধানীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

❑ সেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ধ্বংস তাদের কেবল একবার হবে না। হবে বার বার। তাই তাদেরকে বলা হবে, একবার নয়, তোমরা ধ্বংসকে আহ্বান করতে থাকো বার বার। অথবা তখন তাদের ধ্বংসাত্মক শাস্তি হবে বার বার। তাই তখন যেনো তারা একবার নয়, বার বার 'ধ্বংস' 'ধ্বংস' বলে চিৎকার করতে থাকে। অন্য আয়াতে এসেছে— 'যতোবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, ততোবার আমি সৃষ্টি করবো তাদের নতুন চামড়া যেনো তারা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতে পারে আযাবের স্বাদ। অথবা এখানকার 'ছুবুরান কাছীরান' কথাটির অর্থ হবে, ধ্বংস থেকে তারা কোনো সময়েই মুক্ত থাকতে পারবে না। তাদের এমতো অবস্থা হবে নিরবচ্ছিন্ন।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, দোজখের ওই ভয়াবহ আযাব অথবা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার ও বাগান অপেক্ষা কি জান্নাতের চিরসুখময় বসবাস শ্রেষ্ঠ নয়, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে? প্রশ্নটি একটি স্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে তাকরিরী)। আর এর মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন উপহাস ও বৈমুখ্য।

এখানে 'আল মুত্তাকুন' অর্থ সকল শ্রেণীর বিশ্বাসী। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপরীতে এসেছে 'আলমুত্তাকুন'। সুতরাং এখানে শব্দটিকে বিশেষায়িত করা যায় না। তাই বুঝতে হবে শাব্দিক অর্থে (সাবধানী বা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী) শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। আর একারণেও কথাটিকে এখানে সাধারণায়ন করা যেতে পারে যে, জান্নাত তো লাভ হবে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিশ্বাসীর।

'জান্নাতুল খুলদ' (স্থায়ী জান্নাত) কথাটির মাধ্যমে এখানে একথাই প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের স্থায়িত্ব সাময়িক নয়, চিরকালীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল'। এখানে 'কানাত' অতীতকালবোধক শব্দরূপটিকে মান্য করলে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এটাই ছিলো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ এখানকার এই পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থলের কথা পূর্বাহ্নে সংরক্ষিত ছিলো আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অথবা লওহে মাহফুজে। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যেমন এখন হলো।

'জাযাআন' অর্থ পুরস্কার বা আমলের বিনিময়। আর 'মাসীরান' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। শব্দটিতে 'তানবীন' সংযুক্ত হয়েছে প্রত্যাবর্তনস্থলের মর্যাদা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে এবং স্থায়ী হবে'। উল্লেখ্য, অপূর্ণ বিশ্বাসীরা ওই সকল নেয়ামত পাবে না, যা লাভ করবে পরিপূর্ণ বিশ্বাসীরা। আর আলোচ্য বাক্যে একথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষের সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হবে জান্নাতে, দুনিয়ায় নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব'। একথার অর্থ— এই প্রতিশ্রুতি যেহেতু আল্লাহ্পাক তাঁর চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে দিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি লংঘন যেহেতু একটি দোষ এবং তিনি যেহেতু সকল দোষ-ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র, তাই বাধ্যগতভাবে বা অক্ষম হয়ে নয়, আপন অভিপ্রায়, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রকাশার্থেই তিনি করুণা করে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি সেদিন পরিপূরণ করবেনই। এ দায়িত্ব তাঁর স্বেচ্ছাচারিতাপ্রসূত, বাধ্যগত কিছুতেই নয়।

'মাসউলা' অর্থ আল্লাহ্পাক এমন এক অতুলনীয় সত্তা যাঁর সকাশে প্রার্থনা করা যায়। আর তিনি তা দয়া করে পূরণও করেন, যেমন পূরণ করবেন তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অথবা শব্দটির অর্থ, তিনি সকলের প্রার্থনাস্থল। তাইতো সকলে প্রার্থী হয় তাঁর সকাশে। যেমন প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জান্নাত দান করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার বচনবাহকগণের মাধ্যমে'।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, তখন ফেরেশতারা প্রার্থনা করতে থাকবে 'রব্বানা আদ্খিলহুম জান্নাতি আদনিনিল্ লাতী ওয়াআদ্তাহুম'(হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তাদেরকে তুমি প্রবেশ করিয়ে দাও স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিয়েছো)।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢبُوْرًا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ۝

❐ এবং যেদিন তিনি একত্রিত করিবেন অংশীবাদীদিগকে এবং উহারা আল্লাহের পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি উহাদিগের উপাস্যগুলিকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'তোমরাই কি আমার এই দাসদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে, না উহার নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল'?

❐ উহারা বলিবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।'

❐ আল্লাহ্ অংশীবাদীদিগকে বলিবেন, 'তোমরা যাহা বলিতে উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন অংশীবাদীদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে'। এখানে 'মা ইয়া'বুদুন' অর্থ আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মহাবিচারের দিবসে যখন আল্লাহ্ একত্র করবেন অংশীবাদী ও তাদের উপাস্যসমূহকে। 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিবেকসম্পন্ন ও বিবেকহীন উভয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে 'তাদের উপাস্যসমূহ' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতা, জ্বিন, হজরত ঈসা ও হজরত উযায়ের সহ প্রতিমাপূজারীদের অন্যান্য প্রতিমাসমূহকে। এরকম বলেছেন মুজাহিদ। আর ইকরামা, জুহাক ও কালাবী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে কেবল বিবেকহীন জড় প্রতিমাগুলোর কথা। কেননা ব্যাকরণবেত্তাগণের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, 'মা' ব্যবহৃত হয় কেবল জড়পদার্থের বেলায়। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে মহাবিচারের দিবসে ওই প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করা হবে। সচল করা হবে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ এবং দেয়া হবে কথা বলার ক্ষমতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেদিন তিনি তাদের উপাস্যগুলোকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরাই কি আমার এই দাসদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলো'? একথার অর্থ— হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের, ফেরেশতা, জ্বিন এবং জীবনপ্রাপ্ত প্রতিমা, পাথর ইত্যাদিকে অথবা কেবল প্রতিমাসমূহকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ সেদিন বলবেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্র অংশীরূপে (আল্লাহ্র পুত্র, কন্যা বা সুপারিশকারী) উপাসনা করবার কথা কি তোমরাই অংশীবাদীদেরকে শিখিয়েছিলে, না তারা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পূজা করেছিলো তোমাদের?

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের উপাস্যসমূহ তখন বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠবে, পবিত্রতম ও মহানতম তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা কীভাবে অন্যকে উপসনা করার কথা ভাবতে পারি। আর যা আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসবহির্ভূত তা আমরা অন্যকে শিক্ষা দিতেই বা পারি কীরূপে! এখানকার 'কুলু' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক। তৎসত্ত্বেও এখানে ভবিষ্যতকালের অর্থ (জিজ্ঞেস করবেন) নেয়া হয়েছে একারণে যে, বিষয়টি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত। এখানে 'তারা বলবে' বলে যদি হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের বা ফেরেশতাকে বুঝানো হয়, তবে তাদের পক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কথা তো ভাবাই সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা নিষ্পাপ। তাই অংশীবাদিতা শিক্ষা দেয়ার মতো এতো গুরু অপরাধ তাঁরা করতেই পারেন না। তাই বিষয়টি তাঁদের কাছে বিস্ময়কর তো হবেই। সেকারণেই বিস্ময় প্রকাশার্থে তাঁরা তখন বলবেন 'পবিত্র ও মহান তুমি'। আর 'তারা বলবে' অর্থ যদি এখানে ধরে নেয়া হয় জড়প্রতিমাগুলো বলবে, তবে সেগুলোর পক্ষেও 'পবিত্র ও মহান তুমি' বলে বিস্ময় প্রকাশ করা স্বাভাবিক। কারণ তারা পৃথিবীতে ছিলো অচেতন ও শক্তিহীন। সুতরাং তারা তাদের পূজারীদেরকে তাদের পূজা করার কথা বলতেই বা পারবে কীভাবে?

অথবা জড়প্রতিমাগুলো একারণে বিস্ময় প্রকাশ করবে যে, আমরা তো আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সতত নিয়োজিত। আমাদের সম্পর্কে তো একথা বলাই হয়েছে যে— 'ওয়া ইম্‌মিন শাইয়্যিন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহী'। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে পারি, শিক্ষা দিতে পারি অংশীবাদিতার।

'মা কানা ইয়ামবাগী লানা' অর্থ আমাদের জন্য এরকম করা বৈধই ছিলোনা। কারণ আমাদেরকে বানানো হয়েছে নিষ্পাপ, সুতরাং আমরা কস্মিনকালেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তাই আমাদের পক্ষে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার বিষয়টি চরম বিস্ময়কর বৈকি। উল্লেখ্য, এধরনের জবাব আসবে ফেরেশতা, নবী ও জড়প্রতিমাগুলোর পক্ষ থেকে। কিন্তু যারা নিজেরাই অন্যের প্রভুপ্রতিপালক সেজে বসেছিলো, তাদের পক্ষ থেকে এরকম জবাব আসবে না, তারা মানুষ অথবা জ্বিন যেই হোক না কেনো। তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! যিনি আমাদের প্রভুপালক, আমরা মুশরিক ছিলাম না। শয়তান বলবে 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ছিলো সত্য। আল্লাহ্ তা পূর্ণ করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদের উপর আমার কোনো বলপ্রয়োগ ছিলো না, শক্তি ছিলো না'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহ্র পুত্র-কন্যা জ্ঞান করতো তাঁরা অথবা যাদেরকে মনে করতো আল্লাহ্ সকাশে সুপারিশকারী সেই প্রতিমাগুলো তখন বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপালক! তুমিই তো তাদেরকে দিয়েছিলে জীবন-যৌবন, শারীরিক সুস্থতা, বিত্ত-বৈভব, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অথচ তারা ঘোর পার্থিবতায় গা ভাসিয়ে স্খলিত হয়েছিলো তোমার স্মরণ থেকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে, ভুলে গিয়েছিলো তারা সর্ববিষয়ে তোমার মুখাপেক্ষী, উপেক্ষা করেছিলো কোরআনকে, কোরআনের বিধানাবলীকে, এভাবে পরিণত হয়েছিলো ধ্বংসপ্রাপ্ত এক সম্প্রদায়ে।

মুতাজিলারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। তাই আল্লাহ্র সঙ্গে পাপকর্মের সম্পর্ক করা যাবে না। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিলো এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে'। তাফসীরকারগণ এর জবাবে বলেন, মানুষ পাপ-পুণ্য অর্জনকারী, আর আল্লাহ্ পাপ-পুণ্যের স্রষ্টা। সুতরাং পাপের সম্পর্ক এখানে মানুষের সঙ্গে করা হয়েছে তাদের অর্জন হিসেবে। আল্লাহ্র সঙ্গে যদি এর সম্পর্ক করা হতো তবে বুঝতে হতো সে সম্পর্ক স্রষ্টা হিসেবে! সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, এই আয়াত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমতের পরিপোষক এবং মুতাজিলাদের অপবিশ্বাস খণ্ডনকারী।

'ওয়া কানু ক্বওমাস্ বূরান' অর্থ এবং পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। অর্থাৎ আল্লাহ্র শাশ্বত সিদ্ধান্তানুসারে ওই সকল অংশীবাদীরা পরিণত হয়েছিলো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীতে। এখানকার 'বূরান' (ধ্বংসপ্রাপ্ত) শব্দটি একটি মূল শব্দ। একবচন বহুবচন সকল ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহার্য। কারো কারো মতে শব্দটি 'বায়িরুন' এর বহুবচন। যেমন 'উজুন' বহুবচন 'আয়িজুন' এর।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে'। একথা বলা হয়েছে পৃথিবীবাসী অংশীবাদীদেরকে। এর অর্থ— আখেরাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর এই মুশরিক জনগোষ্ঠীকে বলবেন, দ্যাখো, এখন তোমাদের উপাস্যরাই তোমাদের অপবচনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। মহাবিচারের দিবসে এমতো ঘটনা অনিবার্য, তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ। যেনো তা ঘটেই গিয়েছে। বলা হয়েছে 'ফাক্বদ কাজ্জাবুকুম বিমা তাক্বুলুন'। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— 'ইজাস্ সামআউন্ শাক্বক্বত'।

কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— সেদিন আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমরা তাদেরকে উপাস্য স্থির করেছিলে, এখন আবার বলছো ওরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, দ্যাখো এখন তারাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না'। একথার অর্থ— অতএব শোনো হে অংশীবাদী জনতা। আজ তোমাদের শাস্তি অনিবার্য। সে শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্য তোমাদের নেই। আর এব্যাপারে তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। অথবা অর্থ হবে— তোমরা শাস্তিকে রদ তো করতেই পারবে না, তদুপরি পারবে না নিজেকে সাহায্য করতে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'সরফ' শব্দটির অর্থ উপায়, প্রচেষ্টা। আরববাসীগণ বলেন 'ফুলানুন ইয়াতাসরাফু' (অমুক ব্যক্তি কিছু উপায় বের করেছে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা এখন না বের করতে পারবে কোনো উপায়, না পাবে কারো সহযোগিতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে, আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাবো'। একথার অর্থ— যে শিরিক করবে, তাকে আমি মহাশাস্তি দিবই দিব। এখানে 'সীমালংঘন' (জুলুম) অর্থ অংশীবাদিতা (শিরিক)। শিরিকের শাস্তি অবধারিত। আলেমগণ এব্যাপারে একমত। কিন্তু 'জুলুম' অর্থ যদি এখানে দুরাচারিতা (ফিসক্ব) গ্রহণ করা হয়, তবে তার জন্য মহাশাস্তি হবে না। হবে সাধারণ শাস্তি, তা-ও আবার সর্বসম্মত অভিমতানুসারে ক্ষমাও করা হতে পারে। আর আমাদের মতে তা তওবা ছাড়াও কেবল আল্লাহ্র দয়ায় অথবা শাফায়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যেতে পারে।

জুওয়াইবীর সূত্রে ওয়াহিদী, জুহাক সূত্রে বাগবী এবং সাঈদ ও ইকরামা সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুশরিকেরা রসুল স.কে অভাবগ্রস্ততা ও দরিদ্রতার অপবাদ দিলো, বললো 'এ কেমন রসুল যে আহার করে, হাটে বাজারে চলাফিরা করে, তখন তিনি স. মনোক্ষুণ্ন হলেন। তাঁর ওই মনোক্ষুণ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২০

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

❒ তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করিয়াছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।

প্রথমেই রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করতো ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করতো'।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য করেছি পরীক্ষা সদৃশ। যেমন দরিদ্রদের জন্য পরীক্ষা ধনবানেরা। দরিদ্ররা তাই আক্ষেপ করে বলে, 'আমি অমুকের মতো ধনবান হলাম না কেনো? এভাবে পীড়িত ব্যক্তি আক্ষেপ করে নিরোগ ব্যক্তিকে দেখে। অনভিজাতরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অভিজাতদের দিকে তাকিয়ে দেখে ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস পূর্বোক্ত বাক্য এবং এই বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এভাবে— হে মানুষ! আমি তোমাদের একজনকে করেছি অপরজনের জন্য পরীক্ষা। যেনো তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা ও অসংযত কথাবার্তা শুনেও আত্মপ্রবোধ দিতে পারো। সহিষ্ণুতার সঙ্গে চলতে পারো সহজ সরল পথে।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করে। তখনকার অবস্থাটা ছিলো এরকম— প্রভাবশালী কোনো লোক হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করলো। ইত্যবসরে দেখা গেলো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো। এমতাবস্থায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাবতো, এখন আমি মুসলমান হলে অগ্রগামীর মর্যাদা তো আর পাবো না। একথা ভেবে সে আর মুসলমান হতে চাইতো না। এটাই ছিলো এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করার প্রেক্ষিত। কালাবী এরকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল, ওলীদ ইবনে উতবা, আ'স ইবনে নওফিল ও নজর ইবনে হারেছ সম্পর্কে। তারা যখন দেখলো হজরত আবু জর, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার, হজরত বেলাল, হজরত সুহাইব এবং হজরত আমের ইবনে ফুহাইরা মুসলমান হয়েছেন, তখন তারা বলতে লাগলো, এখন যদি আমরা মুসলমান হই, তবে আমাদের সম্মানহানি হবে, মর্যাদায় আমরা হয়ে যাবো তাদের সমতুল।

কাতাদা বলেছেন, মুশরিকেরা যখন সাহাবীগণকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে বলতে শুরু করলো, দ্যাখো মোহাম্মদের অনুচরদের অবস্থা। আমাদের ক্রীতদাস

ও আমাদের সমাজের নিম্নবিত্তরাই তার সঙ্গী, তখন আল্লাহ্পাক সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ করলেন 'আমি তোমাদের মধ্যে এক কে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি'।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? একথার অর্থ হে সত্যানুসারী বিশ্বাসবানেরা! বলো, অংশীবাদীদের বাক্যবানে জর্জরিত হয়েও তোমরা কেবল আমার পরিতোষ লাভের বাসনায় ধৈর্যধারণ করবে, না করবে না? ধৈর্যধারণ করলে পাবে উত্তম বিনিময়। আর না করলে বাড়তে থাকবে তোমাদের মর্মবেদনা ও আক্ষেপ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের ধৈর্য ও ধৈর্যহীনতাসহ তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র অবলোকনের আওতায়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে উর্ধ্বগামী যদি করো, তবে নিম্নগামী করতেও ভুলো না (উন্নতদের দেখে যে আক্ষেপ আসবে, তা দূর হবে অনুন্নতের দেখলে, লাভ হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য)।

উনবিংশ পারা

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝ وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ۝

❒ যাহারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তাহারা বলে, 'আমাদিগের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদিগের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' উহারা উহাদিগের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহারা সীমালংঘন করিয়াছে গুরুতররূপে।

❒ যেদিন উহারা ফেরেশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

❒ আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব, অতঃপর সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করিয়া দিব।

'যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না' অর্থ— যারা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হওয়াকে স্বীকার করে না। অর্থাৎ আখেরাতের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ কোনোকিছুর প্রতিই যাদের বিশ্বাস নেই। এখানকার 'রিজ্বা' শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভীতি অর্থে। 'তাহামাহ্'দের ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় ভয় ও আশা উভয় অর্থে। ফার্‌রাও এরকম বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'মালাকুম লা তারজুনা লিল্লহিওয়াক্কুরা' (তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ভয় করোনা কেনো)।

'লিক্বা' অর্থ কোনো কিছু পর্যন্ত পৌঁছানো, কোনো কিছুর সম্মুখীন হওয়া বা কারো সাথে সাক্ষাৎ করা। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র শাস্তি পর্যন্ত পৌঁছানো অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়না কেনো'? একথার অর্থ মক্কার মুশরিকেরা বলে, মোহাম্মদের সঙ্গীরূপে কোনো ফেরেশতা আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না কেনো, যে আমাদের সামনে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। অথবা আল্লাহ্ দূতরূপে আমাদের কাছে কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে'। একথার অর্থ— তারা আমার নবীর প্রতি পোষণ করে চরম ঔদ্ধত্য। অথবা কোরআনের প্রতি প্রদর্শন করে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবজ্ঞা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে'। একথার অর্থ তারা লংঘন করেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানের সর্বশেষ সীমা, পৌঁছে গিয়েছে অবিশ্বাসের সর্বোচ্চ শিখরে। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ তারা প্রদর্শন করেছে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবাধ্যতা। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— তারা করেছে সত্যের প্রতি চরম বিরুদ্ধতা। বাগবী লিখেছেন, কথাটির মর্মার্থ— তারা করেছে অত্যধিক কুফরী এবং বড় ধরনের জুলুম। 'উত্‌ওয়ান কাবীরা' অর্থ তারা পৌঁছেছে সত্যপ্রত্যাখানের চরম শিখরে। এমন কি দাবি তুলেছে আল্লাহকে দেখার।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'উত্‌ওয়ান কাবীরা' (গুরুতর সীমালংঘন) অর্থ সুস্পষ্ট মোজেজা স্বচক্ষে অবলোকন করেও তারা তা অস্বীকার করেছে, এমন কিছু দাবি করে বসেছে, যা উচ্চ স্তরের জ্ঞানীদেরও অর্জনার্হ নয়।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। একথার অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতের দিন যখন সীমালংঘনকারীরা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন তাদের জন্য কোনো শুভসংবাদ আর থাকবে না। অথবা ওই ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে 'আজ অপরাধীদের জন্য কোনো শুভসংবাদ নেই'। আতিয়া বলেছেন, কথাটির অর্থ কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দিবে আর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের জন্য আজ কোনো ভালো সংবাদ নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মৃত্যুকালে অথবা মহাবিচারের দিবসে ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কোনো সুসংবাদ দিবে না। জান্নাতের সুসংবাদ দিবে বিশ্বাসীগণকে।

'লিল মুজ্‌রিমীন' অর্থ অপরাধীদের জন্য। বাহ্যত মনে হয় এখানে 'লাহুম' কথাটির সংযোজন আবশ্যক ছিলো। কিন্তু এভাবে সর্বনামের স্থলে প্রত্যক্ষভাবে 'মুজ্‌রিমীন' বলায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের অপরাধী হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধ। আর বিষয়টিও এতে করে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অপরাধী হওয়ার কারণেই তারা সেদিন হবে সুসংবাদ থেকে বঞ্চিত।

'হিজ্‌রাম্‌ মাহজুরা' অর্থ— 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখে অপরাধীরা তখন বলতে থাকবে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো'। আতা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা তখন তাদেরকে দেখে বলবে— হারাম, হারাম। অর্থাৎ যারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌' কালেমায় বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

মুকাতিল বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবে 'তোমাদের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যখন পাপিষ্ঠদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তখন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখে নিজেরাই এরকম বলবে। ইবনে জারীহ্‌ সূত্রে বাগবী লিখেছেন, আরববাসীরা বিপদ মুসিবতে পতিত হলে বলে থাকে 'হিজ্‌রাম মাহজুরা' (রক্ষা করো, রক্ষা করো)। সুতরাং বুঝতে হবে পাপিষ্ঠরাই সে সময় আযাবের ফেরেশতা দর্শন করে 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো' বলে চিৎকার করবে।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দিব'। একথার

অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সৎকর্মসমূহ, যেমন অতিথি সৎকার, পরিবার পরিজনের ভরনপোষণ, জনকল্যাণমূলক কাজ, মানুষের সঙ্গে সদাচার ইত্যাদিকে আখেরাতে গণ্য করবো নিষ্ফল কর্মরূপে। এগুলোর জন্য কোনো সওয়াব তারা পাবে না। কারণ তাদের ইমানই নেই। উল্লেখ্য, ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে ইমান। আর কাফেরদের সৎকর্মাবলীর সঙ্গে ইমানের সংযোগ থাকে না বলেই তা হয় নিষ্ফল।

হজরত আলী বলেছেন, এখানকার 'হিবা' এর শাব্দিক অর্থ ওই ধূলিকণা যা দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়ে রৌদ্রকিরণে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যা হাত দিয়ে ধরা যায় না এবং ছায়াতেও যা দৃষ্টিগাচর হয় না। হাসান, মুজাহিদ ও ইকরামাও এরকম বলেছেন। আর এখানে 'মানছুরা' অর্থ হয়রান পেরেশান।

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হিবা' হচ্ছে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণা। মুকাতিল বলেছেন, দৌড়ের সময় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে যে ধূলিকণা ওড়ে, ওই ধূলিকণার নাম 'হিবা'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'হিবাআম মানছুরা' হচ্ছে দরজা বা জানালার ফাঁকে প্রবিষ্ট সূর্যালোকে দৃষ্ট ধূলিকণা, আর 'হিবা আমমামবাছ' হচ্ছে অশ্বপদাঘাতে উত্থিত উড়ন্ত ধূলিকনা।

মোটকথা, আখেরাতে কাফেরদের সৎকার্যাবলী হবে ধূলিকণার মতো অনুল্লেখ্য, নিষ্ফল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সে কথাকেই আলোচ্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে 'হাবাআম মানছূরা' কথাটির মাধ্যমে। অর্থাৎ সেদিন তাদের সৎকর্মসমূহ হবে বাতাসে উড়ন্ত ধূলিকণার মতো মূল্যহীন, গুরুত্বহীন।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৪

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

❒ সেই দিন জান্নাতবাসীদিগের বাসস্থান হইবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হইবে মনোরম।

'মুসতাক্বর' অর্থ বাসস্থান, আবাস, মানুষ যেখানে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে। আর 'মাক্বীলান' অর্থ ওই গৃহ, স্ত্রী-সান্নিধ্যের আশায় মানুষ যেখানে বার বার ফিরে ফিরে আসে। অথবা 'মাক্বীল' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ওই স্থানকে যে স্থানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। কারণ জান্নাতে শ্রান্তি-পরিশ্রান্তি বলে কিছু নেই। সুতরাং সেখানে বিশ্রামস্থলেরও কোনো প্রয়োজন নেই।

আজহারী বলেছেন, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামকে বলে 'ক্বাইলুলা' বা 'মাক্বীল' নিদ্রাভিভূত না হলেও। তাই নিদ্রা না থাকলেও জান্নাতে সেখানকার উপযোগী বিশ্রামের ব্যবস্থা তো থাকবেই। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে 'এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম'।

'আহসান' অর্থ এখানে সুন্দর বা মনোরম। এখানে শব্দটির প্রয়োগায়ন একথাই প্রমাণ করে যে, বেহেশতের বিভিন্ন স্থান থাকবে বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও সাজ-সজ্জায় চিত্রিত ও অলংকৃত। এরকমও হতে পারে যে, এখানাকার 'মুসতাক্বর' ও 'মাক্বীল' দু'টো শব্দই মূল শব্দ এবং জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ তাদের সেখানকার বসবাসস্থল ও বিশ্রামের সময় হবে এতো উন্নত ও চিত্তাকর্ষক, যা কল্পনাও করা যায় না। অথবা আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পৃথিবীবাসীদের আরামআয়েশের সময় ও বসবাসস্থল অপেক্ষা বেহেশতবাসীদের বিশ্রামকাল ও আবাস হবে অনেক বেশী উত্তম ও মনোমুগ্ধকর।

ইবনে মোবারকের 'জুহুদ' পুস্তকে, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচার সমাপনের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জান্নাতী ও জাহান্নামীরা উপস্থিত হবে তাদের স্ব স্ব আবাসে। বর্ণনাটিকে 'বিশুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন হাকেম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, হিসাব-কিতাব সমাপনের পর দুপুর না হতেই বেহেশতীরা পৌঁছে যাবে বেহেশতে এবং দোজখীরা পৌঁছে যাবে দোজখে। তারপর তিনি পাঠ করেন 'ছুম্‌মা মাক্বীলাহুম লা ইলাল জ্বাহীম'। হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য আয়াত পাঠ করেছেন এভাবেই। ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং আবু নাঈমের 'হুলিয়া' পুস্তকে এসেছে, ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এই ধারণাটিই সুপ্রচল যে, মহাবিচারকালে অর্ধ দিবসের মধ্যে সমাপ্ত হবে সকলের হিসাব-কিতাব। তারপর দুপুরের মধ্যে অথবা দুপুরে জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতীরা এবং দোজখে গিয়ে শাস্তি ভোগ করবে দোজখীরা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই বিচারানুষ্ঠান শুরু হবে দিবসে এবং দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময় জান্নাতে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে জান্নাতবাসীরা। বাগবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, বিশ্বাসীদের জন্য মহাবিচারের দিবসকে করে দেয়া হবে সংক্ষিপ্ত। তাদের কাছে বিচারকালকে মনে হবে আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মতো সংক্ষেপিত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৫

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا○

❐ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরেশ্‌তাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে—

এখানে উল্লেখিত মেঘপুঞ্জের কথা এসেছে সূরা বাকারার ২১০ সংখ্যক আয়াতে এভাবে— 'তারা শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাসহ তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে'। এখানে 'গামাম' অর্থ এক ধরনের শাদা হালকা মেঘমালা, যা আল্লাহ্পাক তীহ্ প্রান্তরে অবতীর্ণ করেছিলেন কেবল বনী ইসরাইলদের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়াওমা তাশাক্কাক্কুস সামাউ বিল গামামি' (সেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে)। বাগবী লিখেছেন, 'বিলগামামি'র 'বি' এখানে 'আন' (থেকে) অর্থজ্ঞাপক। যেমন আরববাসীরা বলে 'রমাইতুস্ সাহমা বিল কওসি' (আমি ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছি)। এখানেও তেমনি আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে— যেদিন মেঘপুঞ্জ ফেটে (থেকে) বের হবে আকাশ।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে'। ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়ার 'কিতাবুল আহওয়ালে' এবং হাকেম, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন। জ্বিন, মানুষ, পশু-পাখি ও অন্যান্য সকল প্রাণীর সমাবেশ ঘটবে সেখানে। সেদিন বিদীর্ণ হবে আকাশ ও পৃথিবী। নিকটতম আকাশ থেকে অবতরণ করবে পৃথিবীবাসীদের চেয়েও বেশী আকাশবাসী। পৃথিবীবাসীদেরকে ঘিরে ফেলবে তারা। পৃথিবীবাসীরা তাদেরকে বলবে, তোমরা কি আমাদের প্রভুপালনকর্তাকে দেখেছো? তারা বলবে, না। এরপর অবতীর্ণ হবে দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীরা। তাদের সংখ্যা হবে আগের দুই দল অপেক্ষা বেশী। পৃথিবীবাসী ও প্রথম আকাশবাসী তখন একযোগে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদের প্রভুপালয়িতা কি তোমাদের মধ্যে রয়েছেন? তারা বলবে, না। এভাবে একে একে নেমে আসবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের অধিবাসীরা। প্রতিটি নবাগত দলের জনসংখ্যা হবে পূর্ববর্তী দল অপেক্ষা অধিক, তারা পরিবেষ্টন করে রাখবে পূর্ববর্তী দলসমূহকে। আর পূর্ববর্তীরা নতুন দলকে একইরূপ প্রশ্ন করে যাবে। পরবর্তীদের জবাবও হবে একইরকম। অবশেষে মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হবে নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা। তাদের সংখ্যা হবে পৃথিবী ও সাত আকাশের ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী। সেখানে আরো উপস্থিত থাকবে আরশবাহী ফেরেশতারা। বর্শাফলকের মতো ধারালো হবে তাদের শিঙ। তাদের দুই পায়ের ব্যবধান হবে অনেক...অনেক। তাদের পদতল থেকে পায়ের গ্রন্থি

পর্যন্ত ব্যবধান হবে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের সমান। গ্রন্থি থেকে হাঁটু এবং হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বও হবে পাঁচশ বছরের দূরত্বের সমান। কোমর থেকে কণ্ঠনালীর দূরত্বও তদ্রূপ। আবার ঘাড় থেকে কানের দূরত্বও তেমনি।

এই হাদিস ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে সুরা বাকারার ২১০ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে। আর বর্ণিত হাদিসটির সূত্রপরম্পরা তেমন শক্তিশালী নয়। কারণ এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন কতিপয় অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী।

ইবনে জারীর ও ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, কিয়ামতের সময় আকাশ তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে বিদীর্ণ হবে। ফেরেশতারা থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে। তারা অবতরণ করে ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। এভাবে একে একে নেমে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা। এরপর সকলে দাঁড়িয়ে যাবে সারিবদ্ধভাবে। এক কাতারের পরে থাকবে আর এক কাতার। এরপর এমন একজন ফেরেশতা আগমন করবে যার বাম দিকে থাকবে জাহান্নাম। পৃথিবীবাসীরা ওই জাহান্নাম দেখে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে। কিন্তু যেদিকেই তারা যাবে, সেদিকেই দেখবে অটল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফেরেশতাদের সারি। তাদের এরকম কাতার থাকবে সাতটি। পলায়নপর জনতা তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসবে পূর্বের স্থানে। এ অবস্থার বর্ণনা এসেছে অন্য আয়াতেও— যেমন ১. ইন্নি আখাফু আলাইকুম ইয়াওমাত্‌তানাদ ইয়াওমা তুওয়াল্‌লুনা মুদবিরীনা ২. ওয়া জ্বাআ রব্বুকা ওয়াল মালাকু সফ্‌ফান সফ্‌ফা ৩. ওয়া জ্বিআ ইয়াওমায়িজ্বিম বিজ্বাহান্‌নামা ৪. ইয়া মা'শারাল জ্বিন্‌নি ওয়াল ইনসি ইনিস্‌ তাত্ব'তুম আনতানফুজু মিন আক্বত্বরিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ফানফুজু ৫. ওয়াআনশাক্‌ক্বাতিস সামাউ ফাহিয়া ইয়াওমাইজিঁউ ওয়াহিয়াতুঁও ওয়াল মালাকু আ'লা আরজ্বাইহা।

সূরা ফুরক্বান : আয়াত ২৬

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ٍالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۝

❑ সেইদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হইবে দয়াময়ের এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের'। একথার অর্থ— সেদিন রূপকার্থেও কর্তৃত্ব কারো থাকবে না। কর্তৃত্ব থাকবে কেবল আল্লাহ্‌র।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেই দিন হবে কঠিন'। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে সেই দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যখন এক দিবসের পরিসর হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তিনি স. বললেন, যার আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! বিশ্বাসীদের কাছে ওই সময় মনে হবে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, উকবা ইবনে আবী মুয়ীতের অভ্যাস ছিলো, সে কোনো সফর থেকে ফিরে এলে ভোজের আয়োজন করতো। নিমন্ত্রণ করতো গোত্রপতিদেরকে। ওই গোত্রপতিরা প্রায়শঃ রসুল স. এর সঙ্গে বসে থাকতো। একবার সে এক সফর থেকে ফিরে এসে গোত্রপতিদের সঙ্গে রসুল স.কেও দাওয়াত করে বসলো। রসুল স. তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনে আহার্যদ্রব্য নিয়ে এলে তিনি স. বললেন, উকবা! তুমি 'লাইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্' কলেমার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমি আহার করবো না। একথা শুনে সে কলেমা পাঠ করলো। রসুল স. হৃষ্টচিত্তে তার পরিবেশিত আহার্য ভক্ষণ করলেন। এসংবাদ পৌঁছে গেলো উকবার অন্তরঙ্গ বন্ধু উবাই ইবনে খালফের কাছে। সে তৎক্ষণাৎ এসে উকবাকে বললো, তুমি বিধর্মী হয়ে গিয়েছো। উকবা বললো, আল্লাহ্র কসম। আমি বিধর্মী হইনি। মেহমানকে সন্তুষ্ট করেছি মাত্র। না হলে তিনি যে আমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না। উবাই বললো, আমি তোমার একথায় কিছুতেই প্রসন্ন হবো না, যতক্ষণ না তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসবে। উকবা রসুল স. এর কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র বদনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। তিনি স. বললেন, উকবা! মনে রেখো, মক্কার বাইরে যেদিন তোমাকে পাবো সেদিন আমি অবশ্যই তোমার স্কন্ধে তরবারীর আঘাত হানবো। এরকমই ঘটেছিলো। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো। শেষে করা হয়েছিলো হত্যা। উবাই ইবনে খালফকেও বদর যুদ্ধের সময় রসুল স. স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। ইবনে জারীরও অপরিণত সূত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, উবাই তখন উকবাকে বললো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপরে তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর কাঁধে পদাঘাত করেছো এবং তার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করেছো। উকবা সেরকমই করলো। নামাজ পাঠকালে তিনি স. যখন সেজদাবনত হলেন মন্ত্রনাগৃহে, তখন সে তাঁর পবিত্র স্কন্ধদেশে করলো পদাঘাত। রসুল স. নামাজ শেষে বললেন, শোনো উকবা! মক্কা থেকে দূরে তোমাকেও আমি ভাগে পাবো একদিন। তখন আমি তলোয়ারের আঘাত করবো তোমার মাথায়। তাই হয়েছিলো। বদর যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়েছিলো।

রসুল স.ও যথারীতি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। আর যুদ্ধ চলাকালে তিনি স. উবাইয়ের দিকে ছুঁড়ে মারেন একটি বল্লম। ওই বল্লমের জখম নিয়ে সে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অল্প কয়েকদিনের মাথায় পতিত হয় মৃত্যুমুখে। সেই উকবা ও উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ۝

❐ সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, 'হায়, আমি যদি রসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম'

❐ 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম'!

❐ 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছিবার পর।' শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারী সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে'। এখানে 'সীমালংঘনকারী' বলে বুঝানো হয়েছে উকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উবাই ইবনে খালফ রসুল স. এর কাছে যাতায়াত করতো। উকবা ইবনে মুয়ীত তাকে ফিরিয়ে রাখতো। তার এমতো গর্হিত অপকর্ম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতত্রয়।

বাগবী লিখেছেন, এখানে হস্তদ্বয় দংশন করার অর্থ ক্ষোভে ও ক্রোধে নিজের হাতের আঙুল কামড়ানো।

জুহাক বলেছেন, উকবা রসুল স. এর দিকে যে থুথু নিক্ষেপ করেছিলো, সে থুথু ফিরে এসে পতিত হয়েছিলো তার নিজের মুখেই। ফলে পুড়ে গিয়েছিলো তার দুই চোয়াল। আর ওই পোড়ার দাগ অবশিষ্ট ছিলো তার মৃত্যু পর্যন্ত। শা'বী বর্ণনা করেন, উকবা ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উকবা ইসলাম গ্রহণ

করলে উমাইয়া বললো, তুমি মুসলমান হয়েছো। তাই তোমার ও আমার পারস্পরিক মুখ দর্শন নিষিদ্ধ। একথা শুনে উকবা তার ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করে, হয়ে যায় ধর্মত্যাগী। তার এমতো অপকর্মের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে তাকে আখ্যায়িত করা হয় 'সীমালংঘনকারী'। এই সীমালংঘনের কারণেই সে আখেরাতে লজ্জায় ও আক্ষেপে তার আপন হস্ত দংশন করতে থাকবে।

কাতাদা বলেছেন, সে আখেরাতে নিজের হাত দংশন করতে করতে কনুই পর্যন্ত ভক্ষণ করবে। পুনরায় তার হাত তৈরী করে দেয়া হবে। পুনরায় সে হাত দংশন করতে করতে খেয়ে ফেলবে। পুনরায় নির্মিত হবে নতুন হাত। এভাবে পুনঃ পুনঃ তার হস্তদংশন চলতেই থাকবে বিরতিহীনভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলবে, হায়, আমি যদি রসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম'। একথার অর্থ— সে তখন হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় পৃথিবীতে যদি আমি রসুল স. এর অনুগমন করে শুভপথানুসারী হতাম। উবাই ইবনে খালফের কথা যদি না শুনতাম।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, হায়, আজ কী দুর্দশা আমার। যথাসময়ে আমি সত্যপথের পরিচয় পাইনি। তাই শয়তান অথবা শয়তানের দোসর উবাইকে গ্রহণ করেছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। এরকম যদি না করতাম।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিলো আমার নিকটে কোরআন পৌঁছবার পর'। এখানে 'জিক্‌র' অর্থ কোরআন মজীদ অথবা রসুল স. এর সদুপদেশ কিংবা কলেমায়ে শাহাদাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে'। এখানে 'শয়তান' অর্থ ভ্রষ্ট পথের দিকে পরিচালনাকারী সুহৃদ, আল্লাহ্‌র পথের সর্বপ্রকার অন্তরায়, মানুষ অথবা জ্বিন।

'খুজুলান' অর্থ সহায়হীনভাবে পরিত্যাগ করা', প্রয়োজনের সময় সাহায্য না করা। মর্মার্থ হচ্ছে— শয়তান কারো বন্ধু নয়। সে তার অনুসারীকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সঙ্গ ত্যাগ করে।

আলোচ্য আয়াতত্রয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলেও এর বিধান এ ধরনের সকল ব্যক্তির প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পাপকর্মের ভিত্তিতে যারা পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য যে 'শয়তান (মানুষ অথবা জ্বিন) তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে'।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্য ও পাপ যথাক্রমে মেশক আম্বর ও কামারের হাপরের মতো। কারো কাছে মেশকের সৌগন্ধ যদি থাকে তবে তুমি তার কাছে হয়তো তা বিনা মূল্যে পেতে পারো, অথবা তা নিতে পারো কিনে। তার সঙ্গ লাভ করলেও তুমি পেতে পারো সুঘ্রাণ। আর হাপরের কাছে থাকলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পুড়িয়ে দিতে পারে তোমার পরিধেয় বস্ত্র, বা কমপক্ষে দুর্গন্ধ তো নিশ্চিত। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কারো সান্নিধ্যে যেয়ো না। আর তোমাদের খাদ্য যেনো পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায় (নিমন্ত্রণ কোরো কেবল পুণ্যবানদেরকে)। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ সাধারণতঃ অনুসরণ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন। তাই প্রথম থেকেই তার দেখে নেয়া উচিত, সে কার সংসর্গ অবলম্বন করতে যাচ্ছে। বাগবী।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও সুনান রচয়িতাবৃন্দ এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গী।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩০, ৩১

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

❐ রসূল বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যজ্য মনে করে।'

❐ আল্লাহ্ বলেন, 'এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্বসম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখানের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন করে রসুল স. বলেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা তো এই কোরআনের প্রতি বিমুখ। তাদের কাছে এর বিধানাবলী পরিত্যাজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মাহজুর' (পরিত্যাজ্য) শব্দটি এসেছে 'হুজ্রুন' থেকে। 'হুজ্রুন' অর্থ নিরর্থক উক্তি, বাগাড়ম্বর , বাচালতা। এভাবে

বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! আমার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো এই কোরআনকে মনে করে নিরর্থক বচন। কেউ বলে 'কবির কল্পনা', কেউ বলে 'যাদু', কেউ বলে 'প্রাচীনকালের উপকথা'। নাখয়ী ও মুজাহিদ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পৃথিবীতেই রসুল স. বলেছেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় যে এই মহাগ্রন্থকে পরিত্যাগ করেছে। অথবা বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তির মাধ্যমে রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আর এর জবাবে আল্লাহ্তায়ালা সান্ত্বনা প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয়তম রসুলকে।

পরবর্তী আয়াতে (৩১) সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ বলেন, এভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আচরণে দুঃখিত হবেন না। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব এভাবেই চলে এসেছে আবহমানকাল থেকে। আপনার পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধেও আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেকে করে দিয়েছিলাম শত্রু।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেমের বর্ণনায় এবং জিয়ার 'আলমুখতার' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, মোহাম্মদ যদি আল্লাহ্র নবীই হবেন, তবে তাকে আল্লাহ্ এভাবে বার বার কষ্ট দেন কেনো, কেনো একবারে অবতীর্ণ করে না সম্পূর্ণ কোরআন। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ○ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ○ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ○

❒ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? ইহা আমি তোমার নিকট এইভাবেই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি তোমার হৃদয়কে মজবুত করিবার জন্য।'

❒ উহারা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করিলে আমি তোমাকে উহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।

❒ যাহাদিগকে মুখে-ভর দিয়া চলা অবস্থায় একত্রিত করা হইবে ও জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, উহাদিগেরই স্থান হইবে অতিনিকৃষ্ট এবং উহারাই পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, সমগ্র কোরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেনো? এখানকার 'নুয্যিলা' অর্থ উনযিলা। অর্থাৎ একবারে, ক্রমে ক্রমে নয়। কারণ এর পরেই এসেছে 'জুমলাতাঁও ওয়াহিদাতান' কথাটি। অর্থাৎ সমগ্র কোরআন।

বায়যাবী লিখেছেন, কাফেরদের এমতো অভিযোগ ছিলো ভিত্তিহীন। কারণ কোরআন পৃথক পৃথকভাবে বা একবারে যেভাবেই অবতীর্ণ করা হোক না কেনো, কোনো অবস্থাতেই এর অনবদ্যত্ব ও অলৌকিকত্ব ক্ষুণ্ন হতো না। বরং পৃথক পৃথক ভাবে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পরবর্তীতে সেকথাই বলে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি, তোমার হৃদয়কে মজবুত করবার জন্য'। এখানে 'কাজালিকা' (এটা) এর 'কাফ' এর সঙ্গে উহ্য রয়েছে একটি ক্রিয়াপদ। বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি এটা এরকমভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যাতে এর প্রতিটি আয়াত কাফেরদের অহমিকা ও মূর্খতাকে পরাস্ত করতে পারে আর এভাবে যেনো আমার রসুলের মন-মানসিকতা হয়ে যায় অধিকতর বলিষ্ঠ। জিবরাইলও যেনো আমার নির্দেশে আমার রসুলের হৃদয়ের শক্তি-বৃদ্ধি ঘটায়। উল্লেখ্য, এভাবে বিরতি সহকারে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে নাসেখ-মানসুখের বিষয়টিও বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে ফুটে ওঠে কোরআন মজীদের অপরাজেয় বচনশৈলির বৈশিষ্ট্য।

'রাত্তালনাহু তারতীলা' অর্থ স্পষ্টভাবে। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি কোরআনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। 'তারতীল' অর্থ 'তুরসাল', থেমে থেমে পরিমিত বিরতিসহ আবৃত্তি। সুদ্দী অর্থ করেছেন- খণ্ড খণ্ডরূপে, পৃথক পৃথক ভাবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— এক অংশের উল্লেখ অপর

অংশের পশ্চাতে। নাখয়ী ও হাসান অর্থ করেছেন— আমি একে বন্টন করে দিয়েছি ভিন্ন ভিন্ন অংশে। উভয় দন্তপাটির সুসমঞ্জস একত্রায়নের মধ্যেই প্রকাশ পায় 'তারতীলে'র উচ্চারণগত রূপ।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমার নিকট কোনো সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে তার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বিরুদ্ধবাদীরা আপনাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করে। সেগুলোর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদানও এমতো খণ্ড খণ্ডরূপে সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে কোরআন অবতীর্ণ করার আর একটি উদ্দেশ্য।

'ইল্লা জ্বি'নাকা বিলহাক্কি' অর্থ সঠিক সমাধান। 'আহসানা তাফসীরা' অর্থ সুন্দর ব্যাখ্যা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন আমি আপনাকে দেই আমার পক্ষ থেকে বিশেষ প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে আপনি সমস্যাকে যেমন উন্মোচন করেন, তেমনি দেন সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সঠিক সমাধান। বিকশিত হয় আপনার নবুয়তের মূল উদ্দেশ্য।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট'।

এখানে 'তারাই পথভ্রষ্ট' অর্থ তারা পৃথিবীতে রসুল স.কে পথভ্রষ্ট মনে করতো, কিন্তু তারাই আদতে পথভ্রষ্ট। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— এসকল লোক দুনিয়ায় রসুল স.কে মনে করতো পথভ্রষ্ট। কিন্তু আখেরাতে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে পথভ্রষ্ট আসলে কে? তাদের তখন মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং নিয়ে যাওয়া হবে দোজখের দিকে। তাদের ওই বাসস্থান কতোইনা নিকৃষ্ট।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কযুক্ত ২৪ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে 'সেই দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম'। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে পথপ্রাপ্ত জান্নাতবাসীদের বিপরীত অবস্থা হবে তাদের। জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট ও মনোরম, আর জাহান্নামবাসীদের অবস্থা হবে অতি নিকৃষ্ট। কারণ জান্নাতবাসীরা পথপ্রাপ্ত এবং জাহান্নামবাসীরা পথভ্রষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হাশর প্রান্তরের মানুষকে চালিত করা হবে তিনভাবে। কাউকে আনা হবে বাহনে চড়িয়ে, কাউকে পায়ে হাঁটিয়ে এবং কাউকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়।

উপস্থিত একজন এই অদ্ভুত অবস্থার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি স.বললেন, যিনি পা দ্বারা মানুষকে চালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থায় চালাতেও সক্ষম। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার রসুল স.কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! বিচারের ময়দানে মুখে ভর দিয়ে মানুষ চলবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যিনি পা দিয়ে মানুষকে চালনা করেন, তিনি নিশ্চয় মুখে ভর দেয়া অবস্থাতেও মানুষকে চালনা করতে পারবেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. বলেছেন, মানুষের হাশর হবে তিনভাবে— সওয়ারী হয়ে, পদব্রজে এবং মুখের উপরে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন এর সূত্রপরম্পরা উত্তম পদবাচ্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র সত্যবাদী নবী আমাকে বলেছেন, বিচারের ময়দানে মানুষ উপস্থিত হবে তিনভাবে— একদল আগমন করবে বাহনারোহী হয়ে, একদল পায়ে হেঁটে এবং আর একদল মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়। আরোহীরা থাকবে পরিতৃপ্ত ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত। আর ফেরেশতারা চালিয়ে নিয়ে যাবে মুখে ভর দিয়ে দাঁড়ানোদেরকে। নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۡ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

❒ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারুণকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম,

❒ এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম।

❒ এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। সীমালংঘনকারীদিগের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

❒ আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামূদ, রস্‌বাসী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও।

❒ আমি উহাদিগের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করিয়াছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং, তার ভ্রাতা হারুণকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! স্মরণ করুন, আপনার পূর্বসূরী রসুল মুসাকে আমি দান করেছিলাম মহাগ্রন্থ তওরাত, আর তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে সাহায্যকারী করে দিয়েছিলাম নবী হারুণকে। এখানে 'ওয়াযীরা' অর্থ পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী। উল্লেখ্য, হজরত হারুণকে এখানে 'সাহায্যকারী' বলাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নবী ছিলেন না। অবশ্যই তিনিও ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। কিন্তু তিনি তাঁর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর ভ্রাতা হজরত মুসার সঙ্গে যৌথভাবে। অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে দু'জন একত্রিত হলে একজন অপরজনের সাহায্যকারীই হয়ে থাকে। তাই এখানে তাঁকে বলা হয়েছে 'সাহায্যকারী'।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'এবং বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে'। একথার অর্থ— আমি ওই নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা ফেরাউন ও তার অনুসারীদের নিকটে যাও, তারা আমার এককত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করেছে, দিনাতিপাত করে চলেছে অহমিকা ও পৌত্তলিকতা নিয়ে। তাদেরকে তোমরা আহ্বান জানাও অক্ষয় মহাসফলতার দিকে, মহাসত্যের দিকে।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'নিদর্শনাবলী' অর্থ হজরত মুসার মোজেজাসমূহ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার 'যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে' বলে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজরত মুসার মোজেজাসমূহকে স্বীকার করতো না। এখানে 'আয়াতিনা' (নিদর্শনাবলী) অর্থ তওরাতের আয়াত নয়। আর তওরাতের আয়াতে অবিশ্বাসের দায় ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপরে বর্তে না। কারণ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের ধ্বংসের পর।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম'। এখানে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে করেই পরিপূরিত হয়েছে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকগণকে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। আর প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। অবশ্য নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের আহ্বানকার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে অনেক ঘটনা। যথাস্থানে সেগুলোর বিবরণও দেয়া হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম।' উল্লেখ্য, একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অবাধ্যরা অস্বীকার করেছিলো কেবল হজরত নুহকে। তাদের এই অস্বীকৃতি ছিলো সকল নবীর প্রতি অস্বীকৃতি তুল্য, প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র নবুয়তের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'এবং নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো'। কথাটির অর্থ কেবল হজরত নুহ ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অস্বীকৃতি— এরকম অর্থও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে যে, নবী-রসুলগণের আবির্ভাবকে তারা প্রজন্ম- পরম্পরায় প্রত্যাখ্যান করে চলতো। রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপের কথা এখানে বলা হয়েছে সে কারণেই । অর্থাৎ তাদের মনোভাব ছিলো এরকম— যতো নবী-রসুলই প্রেরণ করা হোক না কেনো, আমরা তাকে অথবা তাদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবো না। আমরা অনুসরণ করবো কেবল পিতৃপুরুষদের ধর্মমত।

এরপর বলা হয়েছে—'সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি'। একথার অর্থ ওই সকল অবাধ্যকে আমি পৃথিবীতে সলিলসমাধি তো দিয়েছিই, তদুপরি আখেরাতে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি দোজখের অন্তহীন ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, ছামুদ, রসবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্পদায়কেও'। সুরা আ'রাফ ও অন্যান্য সুরায় আদ ও ছামুদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রসবাসীর কথা অবশ্য অন্যান্য সুরায় আসেনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'রস' বলে কোনোকিছুর অগ্রভাগকে। কূপের উপরিভাগকে ঘিরে রাখা, সংস্কার করা, ভেঙে ফেলা, খনন করা ও মৃতকে দাফন করাকে 'রস' বলা হয়। আবার আজারবাইজানের একটি পার্বত্য উপত্যকার নাম 'রস্‌সুল হিমা' অথবা 'রসিসুল হিমা', যার অর্থ ধূলোবালির পুরোভাগ।

ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা, একই সঙ্গে সত্যপ্রত্যাখ্যানের পুরোধা। তাই এখানে তাদেরকে বলা হয় রসবাসী। বৃহৎ কূপের মালিক ছিলো তারা। বাস করতো 'রস' নামক এক পার্বত্য উপত্যকায়। তাই তাদের নাম 'রস্‌মি' বা 'রসবাসী'। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে রসবাসী বলে বুঝানো হয়েছে হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়কে। তারাই একটি বৃহৎ কূপের পাশে এক পার্বত্য এলাকায় বসবাস করতো। তারা ছিলো পশুপালক ও প্রতিমাপূজক। চরম অবাধ্য হয়ে উঠলে একদিন আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে সেখানে সংঘটিত হয় ভয়ংকর ভূমিধ্বস। ফলে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে তাদের আপনাপন আবাসে। এই বিবরণটি দিয়েছেন ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকের বিবরণটির সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন কাতাদার সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, 'রস্‌' হচ্ছে ইমামা এলাকার একটি কূপ। ওই কূপের পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দিয়েছিলো। পরিণামে তাদের প্রতি নেমে এসেছিলো সর্বগ্রাসী ধ্বংস।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, ছামুদ সম্প্রদায়ের যে সকল লোক আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পেয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিলো উন্মুক্ত পার্বত্য উপত্যকার একটি কূপের পাশে। রসবাসী তারাই। এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'ওয়া বি'রিম্‌ মুয়া'ততা্‌লাতিঁউ ওয়া কাস্‌রিম মাশীদ'(আর অকেজো কূপ ও সুউচ্চ ভবন)। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম এই বিবরণটির বর্ণনাকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন কাতাদাকে। বাগবী লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, রসবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন নবী হানযালা ইবনে সাফওয়ান। তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে। পরিণামে আল্লাহ্‌র রোষানলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পতিত হয়েছিলো অনেক বিপদ-মুসিবত। দীর্ঘ গলা বিশিষ্ট একটি বাজপাখি থাকতো সেখানকার পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ে। দীর্ঘ গলা থাকার কারণে পাখিটিকে বলা হতো সি মোরগ। পাখিটি ওই সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। হজরত হানযালা ওই পাখিটির জন্য বদদোয়া করেন। ফলে একটি বজ্রপাতের আঘাতে পাখিটি অক্কা পায়। রসবাসী হয়ে যায় নিরাপদ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারাই আবার হজরত হানযালার প্রতি হয়ে ওঠে মারমুখী। এক সময় তারা তাঁকে শহীদও করে দেয়। পরিণামে হয় বিনাশপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, কা'ব, মুকাতিল ও সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, রস হচ্ছে ইনতাকিয়ার একটি কূপ। জনগণ হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ওই কূপে নিক্ষেপ করেছিলো। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তার সম্প্রদায়ের আলোচনা এসেছে সুরা ইয়াসিনের তাফসীরে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আসহাবুল উখ্দুদ'ই 'আসহাবুর 'রসু'। তারা তাদের সম্প্রদায়ের ইমানদারদের নিধনের উদ্দেশ্যে খনন করেছিলো বড় বড় গর্ত এবং তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো আগুন। ইকরামা বলেছেন, তারা তাদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়েছিলো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'রস' বলে খনিকে,খনির মালিককে। 'রস' এর বহুবচন 'রসাস'।

'ক্বুরুনুন' শব্দটি 'ক্বরনুন' এর বহুবচন। ক্বরনুন বলে সমসাময়িক যুগের লোকদেরকে। 'ক্বরনুন' এর সম্বন্ধ যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়, তবে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তির অনুসারীদের অন্তর্ভূতদেরকে। হাদিস শরীফে 'ক্বুরুনে খইর'(উত্তম যুগ) বলা হয়েছে এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতেই।

রসুল স. বলেছেন, নিশ্চয় সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ, তারপর তৎপরবর্তী, তারপর তৎপরবর্তী। এভাবেই নির্ণীত হয়েছে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগ। অর্থাৎ এই যুগ প্রতিটি সময়ের পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম।

যদি 'ক্বরণ' কে এখানে সম্পর্কযুক্ত করা না হয়, তবে বুঝতে হবে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমসাময়িক যুগের শিশু যুবক বৃদ্ধ সকলকে। এভাবেই চলতে থাকে প্রজন্মায়ন। একারণেই রূপকার্থে 'ক্বরণ' শব্দটিকে সম্পৃক্ত করতে হয় একটি বিশেষ সময়-পরিসরের সঙ্গে। সে সময় পরিসর হতে পারে দশ, বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, যাট, সত্তর, আশি অথবা নব্বই বৎসরের। কেউ কেউ বলেছেন একশত বিশ বছরে হয় এক 'ক্বরণ'। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, 'ক্বরণ' অর্থ এক শতাব্দী। কেননা রসুল স. এক বালকের শতায়ু হওয়ার দোয়া করেছিলেন। তিনি বেঁচেছিলেন এক শতাব্দীকাল। আর যদি এখানে 'ক্বরণ' অর্থ 'সময়' গ্রহণ করা হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি কোনো কোনো যুগের সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করেছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম'।

'ওয়াকুল্লা ত্বরাব্না' অর্থ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আখফাশ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তছনছ করে দিয়েছিলাম তাদের সবকিছু। জুজায বলেছেন, কোনোকিছুকে টুকরো টুকরো করা বা তছনছ করে দেয়াকে বলে তাত্বীর। স্বর্ণ ও রূপার টুকরাকে 'তিব্র' বলা হয় একারণেই।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا
يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ
إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا
لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا

❐ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল শাস্তি তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ উহারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

❐ উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এ-ই কি সে যাহাকে আল্লাহ্ রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

❐ 'সে তো আমাদিগকে আমাদিগের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়াই দিত যদি না আমরা তাহাদিগের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম।' যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিলো শাস্তি, তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না'? এখানে 'সেই জনপদ' অর্থ সাদুম ও তৎসন্নিহিত জনপদসমূহ, যেখানে বসবাস করতো হজরত লুতের সম্প্রদায়। তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো সমকামিতার মতো ঘৃণ্য অপরাধে। হজরত লুতের শত আহ্বানেও তাদের চৈতন্যোদয় ঘটেনি। তাই আল্লাহ্র গজবরূপে তাদের উপরে বর্ষিত হয় পাথরের বৃষ্টি। এভাবে ধ্বংস করা হয় তাদেরকে। মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কেউ কেউ ওই জনপদের পাশ দিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য ব্যপদেশে যাতায়াত করতো। সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে'। এভাবে কিছুসংখ্যক লোকের যাতায়াতকে সকলের যাতায়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। কোরআন মজীদের অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হজরত সালেহের উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিলো কিছুসংখ্যক লোক। তবু সকলকে জড়িত করা হয়েছে সেই অপকর্মের সঙ্গে। বলা হয়েছে— 'ফা কাজ্জাবুহু ফাআক্বারুহা'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত লুতের সম্প্রদায়ের বসতি ছিলো পাঁচটি জনপদে। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনপদটি রক্ষা পেয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজব থেকে। ওই জনপদগুলো ছিলো সিরিয়া গমনাগমনের পথে।

'আফালাম ইয়াকুনু' 'ইয়ারাওনাহা' অর্থ তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর অর্থ— মুশরিকেরা তো ওই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসচিহ্ন তাদের যাতায়াতের পথে প্রায়শঃই লক্ষ্য করে, তবু তারা আল্লাহ্‌তায়ালার গজবের ওই নিদর্শনাদি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনা কেনো, সতর্ক হয় না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না'। একথার অর্থ— প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের চোখের দৃষ্টি অন্ধ নয়। অন্ধ তাদের অন্তর্দৃষ্টি। তাই ধ্বংসের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তারা সাবধান হয় না। ফিরে আসে না সত্যের পথে। মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, পরকালের সওয়াব ও আযাব এসব কিছুর প্রতি তাদের বিশ্বাস মাত্র নেই।

পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে'। এখানে 'হুযুওয়ান' অর্থ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র। শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং কর্মবাচক বিশেষ্য।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও তার সতীর্থদের সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে, 'এবং বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রসুল করে পাঠিয়েছেন'? একথার অর্থ— আবু জেহেল ও তার সতীর্থরা বিস্ময় ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরকমও বলে, এই লোকই কি সেই লোক যাকে আল্লাহ্ রসুল করে পাঠিয়েছেন? তাজ্জব ব্যাপার তো! প্রশ্নটি একটি বিস্ময়বোধক প্রশ্ন। তাদের ধারণায় রসুল স. ছিলেন রসুল হওয়ার অযোগ্য। তাই তারা এমতো প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতো তাদের ঘৃণ্য বিস্ময়।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ থেকে দূরে সরিয়েই দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম'। একথার অর্থ— আবু জেহেলেরা বলতো আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অটল। না হলে মোহাম্মদের অপ্রতিরোধ্য আহ্বান নিশ্চয় আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে আলাদা করে দিতো।

আবু জেহেলদের এমতো উক্তি একথাই প্রমাণ করে যে, রসুল স. এর আহ্বান তাদের সামনে বিকশিত হয়েছিলো পরিপূর্ণরূপে। তিনি স. প্রদর্শন করেছিলেন

অনেক মোজেজাও। এর ফলে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো অংশীবাদিতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু চিরবঞ্চিত ও চিরহতভাগ্যরা তবুও ছিলো তাদের অপবিত্র বিশ্বাসে অনড়। একারণেই তো তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। গ্রহণ করতে পারে না সহজ সরল সত্যকে।

'লাওলা আন সবারনা আ'লাইহা' অর্থ যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। এখানে 'লাওলা' (যদি না তাদের) কথাটির বিধেয় রয়েছে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি না আমরা আমাদের দেব-দেবীদের আনুগত্যে অটল থাকতাম। একথার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, পৌত্তলিকেরা রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে সর্বান্তঃকরণে পথভ্রষ্ট বলে মনে করতো। পরবর্তী বাক্যে একথাই প্রকাশ পেয়েছে।

তাই শেষে বলা হয়েছে— 'যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে পথভ্রষ্ট'? একথার অর্থ— বিষয়টি চিরদিন এভাবে মীমাংসাহীন অবস্থায় থাকবে না। যথাসময়ে তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্‌র আযাব। তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে কে পথভ্রষ্ট এবং কে নয়। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

❐ তুমি কি দেখ না তাহাকে যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে?

❐ তুমি কি মনে করো যে, উহাদিগের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? উহারা তো পশুরই মত; বরং উহারা আরও অধম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে ফেরাবেন কী করে? তারা যে তাদের অপপ্রবৃত্তির অনুগামী, প্রবৃত্তিপূজক, তাদের ধর্মাদর্শ তাদেরই কামনা-বাসনা নির্ভর। সত্য প্রমাণনির্ভর নয়। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! দেখুন ওই

পথভ্রষ্টকে, যে তার কামনা-বাসনার উপাসক। সে তার প্রভুপালকের ইবাদত পরিত্যাগ তো করেছেই, তার উপরে নত হয়েছে প্রস্তর প্রতিমার কাছে, যে প্রতিমা তার নিজের কামনা-বাসনার প্রতীক।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্বপ্রবৃত্তির অনড় অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বলুন, কী করে আপনি তাকে পৌত্তলিকতা থেকে ফেরাবেন?

'ওয়াকিল' অর্থ কর্মবিধায়ক, জিম্মাদার। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের প্রথম প্রশ্নটি বিস্ময় বিমিশ্রিত স্বীকৃতিসূচক এবং পরের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। এদু'টো বাক্যের মাধ্যমে রসুল স.কে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! তাদের অনড় অংশীবাদিতা যদিও আপনার মনোকষ্টের কারণ, তথাপি একথাটিও সুনিশ্চিত যে, আপনি এ ব্যাপারে মোটেও দায়বদ্ধ নন।

কালাবী বলেছেন, সংগ্রামের আয়াত দ্বারা এ আয়াত রহিত।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এই প্রশ্নের মাধ্যমে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই অংশীবাদীদের অন্তর্দুয়ার অবরুদ্ধ। বধির তাদের হৃদয়ের কান এবং অন্ধ তাদের অন্তরের চোখ। তাই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শন তাদের মর্মে পশে না। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আর একটি কথাও প্রমাণিত হয় যে, সত্যের প্রতিটি প্রমাণ বিশুদ্ধ, উপকারপ্রদায়ক ও শুভপরিণতিমুখী। কিন্তু কোনো প্রমাণই মানুষকে প্রকৃত সত্যে উপনীত করায় না। সত্যোপলব্ধি ও সত্যপ্রাপ্তি নির্ভর করে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও দয়ার উপর।

'আকছার' অর্থ অধিকাংশ। এখানে এই শব্দটি প্রয়োগের মাধমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকলেই না বুঝে সত্য পরিত্যাগ করেনি, কিছু লোক ঈমান এনেছিলো তাদের মধ্য থেকে। আবার অনেকে সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে বুঝে শুনে। এর পশ্চাতে ছিলো তাদের অহমিকা, বিদ্বেষ ও নেতৃত্ব হারানোর আশংকা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো পশুরই মতো, বরং তারা আরো অধম'। একথার অর্থ তাদেরও আছে পশুর মতো কান ও হৃৎপিণ্ড। পশুর মতো তারাও ব্যবহার করে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও অস্তিত্বরক্ষার অনুভূতি। কিন্তু পশুরা যেমন বোধ-বুদ্ধিহীন, তারাও সেরকম। সেকারণেই সদুপদেশ ও অলৌকিক নিদর্শনাদি শুনে ও দেখে তাদের বোধোদয় ঘটে না। বরং তারা পশুরও অধম। কারণ পশুকুল সত্তাগত ভাবেই সত্যোপলব্ধির যোগ্যতারহিত। কিন্তু তাদের

সত্যপোলব্ধির যোগ্যতাকে তারা কাজে লাগিয়েছে বিপরীতভাবে। মিথ্যাকে মনে করেছে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা। এরকম গর্হিত কর্ম পশুরাও করে না। সুতরাং তারা তো পশুরও অধম। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পশুকুল তাদের মালিকের অনুগত। কিন্তু অংশীবাদীরা তাদের প্রভুপালকের অবাধ্য। পশুরাও পলায়ন করে অনিষ্ট থেকে। কিন্তু অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা মাত্র করে না।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, পশুরা তাদের স্রষ্টাকে জানে। তারা তাদের আপনাপন অভিব্যক্তিতে ও ভাষায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতাও বর্ণনা করে। কিন্তু অংশীবাদীরা প্রশংসা করে তাদের দেব-দেবীদের। সুতরাং তারা পশুরও অধম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক লোক তার বলদকে নিয়ে একস্থানে যাচ্ছিলো। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো সে। তাই চড়ে বসতে চাইলো বলদের উপর। বলদটি তখন বললো, আমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষিকাজের জন্য। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ একথা শুনে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! গরুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমি একথা বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও বিশ্বাস করে। ওই সময় তাঁরা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রসুল স. বললেন, এক লোক ছাগল চরাচ্ছিলো। হঠাৎ একটি নেকড়ে ছাগলটিকে আক্রমণ করে বসলো। লোকটি নেকড়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো তার ছাগলকে। নেকড়েটি বললো, কিয়ামতের দিন তুমি কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! হিংস্র পশুও তাহলে কথা বলে! রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, আমিতো বিশ্বাস করি। আবু বকর ও ওমরও করে। তাঁরা দু'জন তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে আত্মা ও বিবেক, আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আছে কেবল প্রবৃত্তি। আর মানুষের মধ্যে আছে ফেরেশতা ও পশু উভয়ের বৈশিষ্ট্য। তাই তার পশুপ্রবৃত্তি আত্মা ও বিবেকের উপরে প্রবল হলে সে হয়ে যায় পশুর চেয়ে অধম। আর আত্মা ও বিবেক যখন তার প্রবল হয়ে যায় পশুপ্রবৃত্তির উপর, তখন সে হয়ে যায় ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

❒ তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করিলে ইহাকে স্থির রাখিতে পারিতেন; বরং তিনি সূর্যকে করিয়াছেন ইহার নির্দেশক।

❒ অতঃপর তিনি ইহাকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনেন।

❒ এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদিগকে দিয়াছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিয়াছেন দিবস।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখোনা, কীভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি অবলোকন করেননি আপনার প্রভুপালকের ছায়াসৃষ্টির কৌশল? দেখেননি কি যে, কীভাবে তিনি ছায়াকে প্রলম্বিত ও বিস্তৃত করেন? উল্লেখ্য, সৃষ্টিই তার স্রষ্টার প্রমাণ। আর ছায়াও আল্লাহ্তায়ালার একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। সুতরাং ছায়াও প্রমাণ করে তার স্রষ্টার প্রজ্ঞাময়তা ও সৃজনকৌশলকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর সৃজনেনৈপুণ্যের দিকে।

'জিল' (ছায়া) বলে ফজরের সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে। ওই সময়ের ছায়া বিস্ময়কর। কারণ ওই সময় ছায়া থাকে, কিন্তু সূর্য থাকে না। অর্থাৎ তখনকার ছায়া হয় সূর্যের উপস্থিতিহীন। যেমন জান্নাতের ছায়া সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া জিল্লিম মাম্দুদিন'। অথবা শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে, যা দৃষ্ট হয় সূর্যের উপস্থিতিতে দেয়াল বা বৃক্ষরাজির আড়ালে।

আবু উবায়দা বলেন, যে ছায়া সূর্যের আলো দ্বারা অপসারিত হয়, তাকে বলে 'জিল'। আর যে ছায়া দ্বারা রৌদ্র অপসারিত হয়, তাকে বলে 'ফাই'। সুতরাং বুঝতে হবে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে হয় 'জিল' এবং সূর্য ঢলে পড়ার পরে আসে ফাই। 'ফায়উন' অর্থ প্রত্যাবর্তন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরের ছায়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্তে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'জিল' হচ্ছে শেষ রাত্রির ওই আবছায়া অন্ধকার যা অপসারিত হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ছায়াকে অপরিবর্তনীয়ও রাখতে পারতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয় আর ঘটতোইনা। কিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো রাত্রি। এরকম অর্থ করলে বুঝতে হবে, এখানকার 'সাকিনুন' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'সাকানা' থেকে। 'সাকানা' অর্থ স্থির। অথবা 'সাকিনুন' এর অর্থ আবর্তনশীল। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে 'সাকিনুন' শব্দটি এসেছে 'সুকুন' থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ সূর্যকে রাখেন একস্থানে স্থির।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক'। একথার অর্থ— আমি সূর্যকে দান করেছি ছায়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। তাই সূর্য না থাকলে ছায়া থাকে না। আলো না থাকলে অন্ধকারের পরিচয় জানা যায় না। বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে। তাছাড়া ছায়ার সংকোচন প্রসরণও নিয়ন্ত্রিত হয় সূর্যের দ্বারা।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি তাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন'। একথার অর্থ— সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ছায়া দূর হয়ে যায়। আর এই বিদূরণ কর্মও সংঘটিত হয় ধীরে, ধীরে শেষে ছায়ার আর অস্তিত্ব মাত্র থাকে না।

আমার নিকটে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে অন্যভাবেও। বলা যেতে পারে, 'জিল' বা ছায়া দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকে। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য জগত অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আল্লাহ্তায়ালার নাম-গুণাবলীর ছায়া। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনি কী অনুধাবন করেননি, আল্লাহ্ কীভাবে তাঁর এই মহাসৃষ্টিকে অস্তিত্বায়িত করেছেন। তারপর এছায়াকে সম্প্রসারিত করেছেন শত-সহস্র প্রকৃতিতে ও বৈচিত্রে? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এই মহাসৃষ্টিকে রাখতে পারতেন এক স্থানে স্থির। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। তিনি একে দিয়েছেন চলমানতা ও বিবর্তনশীলতা। আবার একে বানিয়েছেন বিলুপ্তি ও বিলীয়মানতার নিদর্শন, যাতে এ সৃষ্টি থাকে আল্লাহ্র অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের ও নাম-গুণাবলীর সতত মুখাপেক্ষী। 'বরং তিনি সূর্যকে করেছেন এর নির্দেশক' অর্থ আমি নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটাকে করেছি সুফীগণের হৃদয়ের পথনির্দেশক। ওই জ্যোতিসম্পাতের কারণে তারা বুঝতে পারে সমগ্র সৃষ্টি আমার নাম-গুণাবলীর জ্যোতিচ্ছটার ছায়া। এর ফলে দূর হয়ে যায় তাদের ধারণার পূর্বতন অস্বচ্ছতা। 'অতঃপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেন' অর্থ তারপর আমি তাদেরকে নিয়ে আসি আমার একান্ত সন্নিধানে, তখনই তারা হয় আমার নৈকট্যভাজন, তাদের ওই নৈকট্যভাজনতা বোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও বোধাতীত। রসুল স.বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন— নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা হয় আমার সমীপবর্তী। হয় প্রিয়ভাজন। আমি তখন তাকে ভালোবাসি। হই তার কর্ণ, যে কর্ণ দিয়ে সে শোনে।

সুফী সাধকগণ বলেন, যার দুই দিবস একরূপ, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ যার পরবর্তী দিবসের আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্ববর্তী দিবস অপেক্ষা উন্নততর নয়, সে আত্মিক পরিব্রাজনার দিক থেকে বঞ্চিত।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ। বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা'। একথার অর্থ— অন্ধকার

রজনীকে তিনি তোমাদের জন্য করেছেন আত্মগোপনের পরিচ্ছদ সদৃশ। আর নিদ্রাকে করেছেন তোমাদের জন্য শ্রান্তিনিবারক। এখানে 'লিবাসা' অর্থ আবরণ, পরিচ্ছদ। আর 'সুবাতান' অর্থ ছিন্ন করা। নিশিথের নিদ্রা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় দিবসের কর্মমুখরতাজনিত পরিশ্রান্তিকে। অথবা 'সুবাতান' অর্থ হতে পারে মৃত্যু। অন্য এক আয়াতে নিদ্রাকে তুলনা করা হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে। যেমন— 'হুয়াল লাজী ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম বিল্‌লাইলি'(তিনি ওই পরম সত্বা যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন নিশাগমে)। এ অর্থের প্রেক্ষিতে মৃতকে বলা হয় 'মাসবুত'।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং কর্মের জন্য দিয়েছেন দিবস'। একথার অর্থ— আর তিনি তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনার্থে দিয়েছেন দিবস। তাইতো তোমরা আলোকিত দিবসে হতে পারো যত্রতত্র কর্মমুখর।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

وَهُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝ لِّنُحْـِۧىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ۝

❐ তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন—

❐ উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন'। এখানে 'ত্বহুরা' অর্থ ওই বস্তু যার দ্বারা বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। যেমন 'সাহুর' অর্থ সেহেরীর খাদ্য, ফাতুর অর্থ ইফতারির আহার্য। রসুল স. বলেছেন, পানির অনুপস্থিতিতে পবিত্র মৃত্তিকা মানুষের জন্য পবিত্রতাপ্রদায়ক, দশ বছর এভাবে অতিবাহিত হলেও। আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু জর গিফারী থেকে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তিনি স. একথাও বলেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদ। আর সমগ্র পৃথিবীর মাটি পবিত্র।

অথবা 'কাবুল' যেমন মূল শব্দ, তেমনি মূল শব্দ'ত্বহুর'ও। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন,

তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে ওই পাত্র ধৌত করতে হবে সাতবার। প্রথমবার পাত্রটি মাজতে হবে মাটি দিয়ে। এখানেও পানিকে ত্বহুর বলা হয়েছে। কিংবা 'ত্বহুর' নিজেই আধিক্য প্রকাশক। অর্থাৎ পবিত্র হওয়ার দিক থেকে পূর্ণ। যেমন 'সাবুর' অর্থ বড়ই ধৈর্যশীল। 'শাকূর' অর্থ বড়ই কৃতজ্ঞতাপরায়ন। 'কাতু' অর্থ অধিক কর্তনক্ষম। 'দ্বাহুক' অর্থ অধিক হাস্যময়।

বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ মনে করেন, 'ত্বহুর' ওই পদার্থ যা বার বার পবিত্র করে দেয়। যেমন 'সবুর' ওই ব্যক্তি যার মাধ্যমে বার বার প্রকাশ পায় ধৈর্য। এভাবে পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর নাম 'শাকূর'। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক বলেন, ওজুতে ব্যবহৃত পানি দ্বারা পুনরায় ওজু করা যায়।

আমি বলি, কথাটি ভিত্তিবিবর্জিত। কারণ পবিত্র হওয়া ও পবিত্র করার মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। শব্দরূপ ফাউলের মধ্যে শব্দরূপ তাফয়ীলের প্রভাব আদৌ নেই। সুতরাং ত্বহুরের সঙ্গে তাতহীরেরও কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকন্তু বলা যেতে পারে, ফাউলের শব্দরূপ এখানে ক্রিয়ার আধিক্য নির্দেশক। ক্রিয়াপরম্পরা নির্দেশকারী নয়। তবে এরকম বলা যেতে পারে যে, 'ত্বহুর' অর্থ পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা। পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা হতে পারে দু'ভাবে— ১. নিজে পবিত্র হবে ২. পবিত্র করবে অপবিত্রতাকে। শরিয়তের অকাট্য প্রমাণ, সুবিদিত বিবরণ ও উম্মতের ঐকমত্যের মাধ্যমে এবিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী। পানিকে অন্য কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। এরকম বলেছেন ইমাম মালেক। তিনি একথা প্রমাণ করেন রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। সুনান চতুষ্টয়ে এসেছে, ইন্নাল্ মাআ লা ইউখবাছু' (পানি নাপাক হয় না)। দারাকুতনী আবার এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা থেকে।

তিবরানীর 'আলআওসাত' গ্রন্থে, হজরত শরীক থেকে আবু ইয়ালী, বায্যার, আবু আলী ইবনে সাকানের বর্ণনায় এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই বোদাকুপের পানিতে কি ওজু করা যাবে, যেখানে মূর্খতার যুগে ধোয়া হতো মেয়েদের ঋতুস্রাবের রক্ত মাখা কাপড়, ফেলা হতো মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা? তিনি স.বললেন, পানির পবিত্রতাকে কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। কারণ পানি হচ্ছে 'ত্বহুর' (স্বয়ং পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী)।

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, যে সকল জলাশয়ে নেমে হিংস্র প্রাণী, কুকুর, গাধা ইত্যাদি পানি পান করে, ওই সকল জলাশয়ের পানি দিয়ে ওজু করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে একবার রসুল স.কে প্রশ্ন করা হলে তিনি স.জানালেন, ওই সকল পশুর পানি ততটুকুই যতটুকু তারা তাদের উদরে তুলে নিয়েছে। অবশিষ্ট পানি পাক।

একটি সন্দেহঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, বর্ণিত হাদিসদ্বয় পরিত্যাজ্য। এমনকি ইমাম মালেক বলেন, বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ, পানির এ সকল গুণ পরিবর্তিত হলে তা হয়ে যায় নাপাক। সাধারণ অর্থে তখন তা আর পানি পদবাচ্য থাকে না। আর আমাদের বক্তব্য এই সাধারণ পানির পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কে।

সন্দেহভঞ্জনঃ বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে ওই সকল জলাশয়ের কথা, যেগুলোতে পানি থাকে অনেক। সুতরাং বর্ণিত হাদিসদ্বয়কে আর অগ্রহণীয় মনে করা যায় না। কেননা অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, পানিতে নাপাক বস্তু পতিত হলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক, তার গুণত্রয় অবশিষ্ট থাকলেও।

মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে ওই পাত্র পবিত্র করতে হবে সাতবার পানি দিয়ে ধুয়ে। প্রথমবার মাজতে হবে মাটি দিয়ে। তিনি স. আরো বলেছেন, আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে সেই পানিতে আবার তোমরা ওজু কোরো না যেনো। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, নিদ্রাভঙ্গের পর তোমরা তিনবার হাত না ধুয়ে কোনো পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ো না। কেননা কেউ একথা জানে না যে, নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে। হাদিসটি এসেছে হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের এবং হজরত আয়েশা সূত্রেও।

বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অধিক পরিমাণ পানি নাপাক বস্তু দ্বারা নাপাক হয়ে যায় না। নাপাক হয় অল্প পানি। তবে অধিক ও অল্প পানি কাকে বলে সে সম্পর্কে অবশ্য আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে দুই মটকা পানিকেই বেশী পানি বলা যায়। এই পরিমাণ পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলেও ওই পানি নাপাক হবে না। তবে পতিত নাপাক বস্তুর কারণে যদি পানির বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদে পরিবর্তন আসে, তবে বেশী পানিও হয়ে যায় নাপাক। আবার অল্প পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হওয়ার পর পানির বৈশিষ্ট্যত্রয় অক্ষুণ্ন থাকলেও তা হয় নাপাক।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, যদি এ ধারণা প্রবল থাকে যে, পানির একধারে পতিত অপবিত্রতা অপরদিকের পানিতে প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম, তবে ওই দিকের পানি বিবেচিত হবে পবিত্র বলে। এরকম না হলে ওই পানিকে ধরতে হবে অল্প পানি। পরবর্তী সময়ের আলেমগণ বেশী পানির একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দশগজ দৈর্ঘ্য ও দশ গজ প্রস্থ জলাধারের পানি বেশী পানি। কেউ কেউ মাপ নির্ধারণ করেছেন পনেরো গজ দৈর্ঘ্য পনের গজ প্রস্থ। কেউ কেউ বলেছেন, দৈর্ঘ্য বারো হাত, প্রস্থ বারো হাত। কেউ কেউ বলেছেন আট-আট। আবার কেউ কেউ বলেছেন সাত-সাত।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বেশী পানির পরিমাণ সম্পর্কে কিছুই বলেননি, কেননা শরিয়ত প্রবর্তক স. এব্যাপারে কোনো সীমানির্দেশ করেননি। দুই মটকা সম্পর্কিত হাদিস শিথিলসূত্রবিশিষ্ট, সুতরাং তা প্রমাণ হিসেবে ধর্তব্য নয়। তাই বেশী পানির পরিমাণের বিষয়টি তার উপরে ছেড়ে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত, যে পানি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফেয়ী, ও ইমাম মালেক দুই মটকা বিশিষ্ট হাদিসকে দলিলরূপে গণ্য করেছেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত, যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ইবনে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, দারাকুতনী, বায়হাকী ও সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই পানির বিধান কি যে পানি পান করে যায় হিংস্র জানোয়ার ও অন্যান্য চতুষ্পদ পশু? তিনি স. বললেন, ওই পানি যদি দুই মটকা পানির সমপরিমাণ হয়, তবে ওই পানিকে কেউ বা কোনোকিছু অপবিত্র করতে পারে না। আবু দাউদ ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, ওই পানি নাপাক হয়ে যায় না। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত ও শায়খাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) শর্তানুসারী । ইবনে মানদাহ্ বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রাবলী ইমাম মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। তাহাবীও এই হাদিসের বিশুদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন।

একটি সন্দেহ ঃ হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম শুনেছেন ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে। তাঁর পূর্বে কখনো এসেছে মোহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যোবায়েরের নাম। আবার কখনো নাম এসেছে মোহাম্মদ ইবনে উব্বাদ ইবনে জাফরের। তাঁর ঊর্ধতন বর্ণনাকারী হিসেবে এসেছেন কখনো আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবার কখনো ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। এভাবে হাদিসটির সূত্রপরম্পরা হয়েছে ত্রুটিযুক্ত।

অপনোদন ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এরকম সূত্রগত ত্রুটি হাদিসের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করতে পারে না। কেননা এর সকল বর্ণনাকারীকে যদি নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয় তবে বিষয়টি হবে এক নির্ভরযোগ্যতা থেকে অন্য নির্ভরযোগ্যতার দিকে প্রত্যাবর্তনের মতো। এতে করে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তবে বিচার্য বিষয় হচ্ছে, ওলীদ ইবনে কাছীর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দুই সূত্রে— ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্। বর্ণনাকারীদের একটি দল আবার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দু'টি পদ্ধতিতে। এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিসম্বলিত সূত্র আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নয়।

দারাকুতনী বলেছেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ। ওলীদ ইবনে কাছীর থেকে দু'টি সূত্রেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উসামা । তৃতীয় আরেকটি সূত্রকেও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে মুঈন। সূত্রটি এরকমঃ হাম্মাদ ইবনে সালমা—আসেম ইবনে মুনজির—আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ এক বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়াহমিল খাবছা'। (অপবিত্রতা বহন করে না)। অপর বর্ণনায় এসেছে 'লাম ইয়ুনাজ্জিসুহু শাইউন' (তাকে অপবিত্র করে না কোনো কিছুই)। আর এক বর্ণনায় এসেছে 'লা ইয়াতানাজ্জাসু (তা-অপবিত্র হয় না)। এগুলো কি তবে বর্ণনাবিভ্রাট নয়?

জবাব ঃ না। কারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবল শব্দগত ভিন্নতা। অর্থগত দ্বন্দ্ব এতে নেই। সুতরাং একে বর্ণনাবিভ্রাট বলা যায় না।

দ্বিতীয় সন্দেহ ঃ হাদিসের 'কুল্লাতাঈন' (দুই মটকা) শব্দটি সন্দেহপূর্ণ। কেননা সেখানে বলা হয়েছে 'ইজা বালাগাল মা উকুল্লাতাঈন আও ছালাছান' (পানি যখন দুই অথবা তিন মটকা হয়)। আসলে 'আও' (অথবা) শব্দটি এখানে সৃষ্টি করেছে সন্দেহ। এই শব্দাবলীসহ ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে সুপরিণতরূপে ওয়াকী সূত্রে থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। দারাকুতনী ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে এবং এর আগে ওয়াকী ও ইয়াজিদ আসেম ইবনে মুনজির থেকে উবাইদুল্লা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হজরত উমর থেকে সুপরিণত সূত্রে। ইবনে জাওজী লিখেছেন, হাম্মাদের অধঃস্তন বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ ও কামিল ইবনে তালহা হাম্মাদ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন উপরে বর্ণিত শব্দ সহযোগে। কিন্তু আফ্ফান, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হাজরামী, বিশর ইবনে সাররা, আলা ইবনে আবদুল জব্বার, মুসা ইবনে ইসমাইল ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুসা আবসী হাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন 'ইজা কানাল মাউ কুল্লাতাঈন'। সেখানে এর পূর্বে 'ছালাছান' শব্দটি নেই। রয়েছে কেবল 'কুল্লাতাঈন'।

অনুরূপ ইয়াজিদ ইবনে হারুন সূত্রে ইবনে সাবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও রয়েছে সন্দেহসূচক 'আও' শব্দটি। কিন্তু হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় সেরকম কিছু নেই। সুতরাং এরকম বর্ণনার উপরে আমল করা যায়।

এরকমও বলা যেতে পারে যে 'আও' শব্দটি সন্দেহসূচক নয়। বরং এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটি এসেছে প্রত্যাখ্যান অথবা গ্রহণ প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— দুই মটকা হোক অথবা তিন মটকা।

একারণেও অবশ্য সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো কোনো হাদিসে এসেছে চল্লিশ মটকার কথা। যেমন দারাকুতনী, ইবনে আদী ও উকাইলী মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রসুল স.এর পবিত্র নির্দেশনা ছিলো এরকম— যখন চল্লিশ মটকার সমান পানি হবে, তখন অপবিত্রতার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

একথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবু জারআ ও আবী হাতেম রাযী বলেছেন, বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ্ অসত্যভাষী। সে নিজে নিজে হাদিস তৈরী করে। সুতরাং তার সূত্রসংযুক্ত হাদিস দ্বারা যথাসূত্রসম্বলিত কোনো হাদিসকে ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা যাবে না। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি কেউ এমতো সন্দেহ প্রকাশ করে বসে যে, তাহলে দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যও তো এরকম। যেমন— 'ইজা বালাগাল মাউ আরবায়ীনা কুল্লাতিন লাম ইয়াতানাজ্জাস্'। এই হাদিসটি এসেছে রওহা ইবনে কাসেমের সনদে ইবনে মুনকাদির সূত্রে হজরত ইবনে ওমর থেকে। অবশ্য হাদিসটি সুপরিণত শ্রেণীভূত নয়, পরিণত শ্রেণীভূত। ওয়াকী ইবনে সুফিয়ান সওরী এবং মা'মারও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনকাদির সূত্রে। আর বর্ণনাকারীর উক্তি যদি তার বর্ণনার বিপরীত হয়, তবে তা হাদিসের বিবরণকে করে দেয় ত্রুটিযুক্ত। একারণেই বলতে হয়, ইবনে ওমরের সুপরিণত শ্রেণীর বিবরণটি ত্রুটিযুক্ত।

আমরা বলি, ইমাম আবু হানিফার নিকটে সাধারণভাবে কোনো অবস্থাতেই শর্তের অর্থ দলিলরূপে গণ্য হয় না। আর ইমাম শাফেয়ীর নিকটে যদি প্রশ্নের জবাবকে শর্তযুক্ত করা হয়, তবে তার অর্থ দলিল হয় না। সুতরাং 'ইজা বালাগাল মাউ আরবায়ীনা কুল্লাতিন' কথাটির অর্থ এরকম হতে পারে না যে, চল্লিশ মটকার কম পানিতে নাপাক কোনোকিছু পতিত হলে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়। কেননা কারণের শর্ত কখনো হুকুম বলে গণ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত ঃ 'কুল্লাতিন' শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। ছোট বড় মাটির পাত্র, পানির পাত্র, লোটা, ঘড়া সবকিছুকেই বলা হয় কুল্লা। সুতরাং বর্ণিত

হাদিসসমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে,কুল্লাতাঈনের হাদিসের উদ্দেশ্য দু'টি বড় মটকা। আর চল্লিশ মটকার হাদিসের উদ্দেশ্য বিশ লোটার সমান এক মটকা, এভাবে চল্লিশ লোটার সমতুল্য দুই মটকা।

অতিরিক্ত সন্দেহ : কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'কুল্লাতুন' অর্থ ঘড়া, মশক, ডোল, পাহাড়ের চূড়া, চুলের বেনী, উটের কুঁজ, বড় কূপ, বড় ঘড়া, সাধারণ ঘড়া, পেয়ালা ইত্যাদি। যদি তাই হয় তবে এর শব্দার্থটি তো অবশ্যই হবে স্বনির্বাচিত। আর পাথরের মটকার কথা কোনো যথাসূত্রবিশিষ্ট হাদিসে আসেনি। তবে ইবনে আদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন 'ইজা বালাগাল মাউ কুল্লাতাঈনি মিন কিলালি হাজরিন লাম ইয়ানজাসহু শাইউন'। এই হাদিসে অবশ্য পাথরের মটকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এর সূত্রপরম্পরাভূত মুগীরা ইবনে সাকলান হচ্ছে মুনকিরুল হাদিস (হাদিস শাস্ত্রানুসারে পরিত্যজ্য)। সুতরাং কুল্লাতাঈনের সঠিক অর্থ চিহ্নিত করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। তাই এরকম বর্ণনার উপরে আমল না করাই শ্রেয়।

আমরা বলি, পাহাড়ের চূড়া, উটের কুঁজ অথবা মাথার চুলের বেনীর কথা এখানে বলা হয়নি। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। আর পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর কথা বলাও এখানে অযৌক্তিক। উটের কুঁজের প্রসঙ্গও এখানে নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে অল্প বা বেশী পানির কথা। আর পানির পাত্র যেহেতু বিভিন্নরকম হয়, তাই সবগুলোর ক্ষেত্রেই 'কুল্লাতিন' শব্দটি প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে পাথরের মটকার বিষয়টিই অগ্রগণ্য। কেননা আরবী কবিরা তাদের কবিতায় এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এরকম বলেছেন আবু উবায়দা তার কিতাবুত্ তুহুরে। বায়হাকী বলেছেন, আরবে পাথরের মটকার ব্যবহারই ছিলো বহুল প্রচলিত। সেকারণেই রসুল স. তাঁর মেরাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি দেখেছি ওই বৃক্ষের পাতা হাতির মতো এবং ফল পাথরের মটকা সদৃশ। এভাবে শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট করার আর একটি কারণ এই যে, আজহারী বলেছেন, পাথরের মটকাই ছিলো আরব দেশের সর্ববৃহৎ মটকা। শরিয়ত প্রণেতা স. যখন মটকার সংখ্যা দ্বারা পানির পরিমাপ বুঝাতে চেয়েছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি স. বলতে চেয়েছেন সর্ববৃহৎ মটকারই কথা। কেননা একটি বড় পাত্র যদি দু'টি ছোট পাত্রের সমান হয়, তবে বড়টিকে ছেড়ে ছোটটির উল্লেখ বাস্তবসম্মত নয়।

তৃতীয়তঃ দু'টি ছোটো মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে যদি পানি নাপাক না হয়, তবে দু'টি বড় মটকার পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়লে তো ওই পানির নাপাক না হওয়া আরো বেশী নিশ্চিত। তাই সতর্কতা প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে বড় মটকার কথা। আর ছোট মটকার পানির সংকুলান তো বড় মটকাতেও হয়।

একটি প্রচণ্ড বিরোধ এই যে, কুল্লাতাঈনের হাদিসকে শিথিলসূত্রবিশিষ্ট বলেছেন হাফেজ ইবনে আবদুল বার, আসী ইসমাইল ইবনে ইসহাক এবং আবু বকর ইবনে ওলী। তাঁরা তিনজন ছিলেন মালেকী মাজহাবের অনুসারী। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, শাফেয়ীর উক্তি বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে যেমন দুর্বল, তেমনি বর্ণনা পরম্পরাগত দিক দিয়েও সুপ্রমাণিত নয়। এই বর্ণনাটি সম্পর্কে আলেমগণের একটি দলের মতপ্রভেদ রয়েছে। তদুপরি কোনো যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে কুল্লাতাঈনের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়নি। আর বিষয়টি ঐকমত্যসমর্থিতও নয়। এমতো মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নসমূহ আলেমগণের উক্তিতে এসেছে সংক্ষিপ্তরূপে। কিন্তু এই হাদিসের বর্ণনাকারীদেরকে কেউই দুর্বল আখ্যা দেননি। তাঁরা সকলেই ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ। সুতরাং মালেকী মাজহাবের ত্রয়ী আলেমের মন্তব্যটি অগ্রহণীয়।

মাসআলা : পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা ওজু ও গোসল করা ঐকমত্যানুসারে অসিদ্ধ। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, পানি না পাওয়া গেলে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে তায়াম্মুমের মাধ্যমে, মাটি দ্বারা। অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ কোরআনে নেই। কিন্তু প্রকৃত নাপাকি পানি ব্যতীত অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা জায়েয কিনা? জমহুর বলেন, নাজায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জায়েয। বাগবী মত প্রকাশ করেছেন জমহুরের পক্ষে। তিনি তাঁর অভিমতের সমর্থনে দলিলরূপে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য আয়াতকে। লিখেছেন, এখানে 'ত্বহুর' (পবিত্র) অর্থ 'মুতহির' (পবিত্রতাকারী)। কেননা অন্য আয়াতে বৃষ্টির পানিকে বলা হয়েছে মুতাহ্হির। যেমন— ওয়া ইউনায্যিলু আ'লাইকুম মিনাস্ সামায়ি মাআন লিইউত্বহ্হিরাকুম'। এতে করে বুঝা যায় পবিত্র করার গুণ রয়েছে কেবল পানির মধ্যেই। যদি অন্য কোনো তরল পদার্থের মধ্যে এই গুণ আছে বলে ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে ওই তরল পদার্থ দিয়ে ওজু ও গোসলও সিদ্ধ। বাগবীর এই দলিল বিশুদ্ধ নয়। কারণ আয়াতে পানিকে 'পবিত্রতাকারী' বলা হলেও একথা বলা হয়নি যে, অন্য কোনো তরল পদার্থ অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম নয়। বরং পানিকে 'পবিত্রতাকারী বলার অর্থ এই যে, কেবল পানিই পবিত্র, অন্য কোনো তরল পদার্থ পবিত্র নয়,এমনটি নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হদস (ওজুহীনতা ও জানাবাতের অপবিত্রতা) এবং নাজাসাতে হাকীকীর (মৌলিক অপবিত্রতা) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হদস্ (বিধানগত অপবিত্রতা) নাজাসাতে হুকমী। এরকমই সাব্যস্ত করেছে শরিয়ত। যে কোরআন মজীদ ও ঐকমত্যানুসারে এ ধরনের অপবিত্রতা দূর করা যেতে পারে

কেবল পানির দ্বারা। অনুরূপ অপবিত্রতা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারাও দূর হতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অপবিত্রতা (নাজাসাতে হাকীকী) তো দৃশ্যমান। তাই তা পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা দূর করা যায় না।

আমি বলি, ইমাম আবু হানিফার হদস্ ও নাজাসাতের এমতো পার্থক্য নিরূপণের বিষয়টি অযথার্থ নয়। কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে কিছুটা বৈপরীত্য। যেমন কোনো নাপাকিতে কোনো পাক পানি ঢেলে দিলে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। সুতরাং ওই পানি দিয়ে কোনো কাপড় তিনবার বা সাতবার ধৌত করা হলে ওই কাপড় পাক হবে, এরকম বলা যাবে না। আবার প্রতিবার নতুন নতুন পানিতে কাপড় চুবিয়ে ও চিপে ফেললেও তো ওই কাপড় পাক হওয়ার আশা নেই। কারণ ভালো করে চিপে পানি নিংড়ে ফেলা সত্ত্বেও কিছু না কিছু পানি তো ওই কাপড়ে থেকেই যায়। বিষয়টিকে এভাবে কিয়াস করা হলে তো বলতে হয় নাপাক কাপড় কখনোই পাক করা যায় না। সেকারণেই পূর্ববর্তী শরিয়তে বলা হয়েছিলো, কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লাগবে, ওই অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের শরিয়তের বিধান এরকম কঠোর নয়। আমাদের বিধানে তিনবার ধৌত করা ও চিপে পানি নিংড়ে ফেলাই যথেষ্ট। এটা কিয়াসের বিপরীত। আর যে বিধান বিধিবদ্ধ হয় কিয়াসের বিপরীতে, সে বিধান থেকে কিয়াস করা নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থি। তাই এমতোক্ষেত্রে কিয়াস অচল। আমাদের শরিয়তে অন্যান্য তরল পদার্থ তাই পানির সমান্তরাল নয়।

মাসআলা ঃ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে যেমন পানি নাপাক হয়ে যায়, তেমনি নাজাসাতের উপরে পানি পতিত হলেও তা হয়ে যায় নাপাক। কেননা উভয় ক্ষেত্রে ঘটেছে পাক-নাপাকের মিশ্রণ। ইবনে জাওজী বলেছেন, ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে, শরীর অথবা কাপড়ের নাজাসাত ধৌত করা পানির বর্ণ-গন্ধ-স্বাদে যদি পরিবর্তন না ঘটে, তবে তা পাক। অনুরূপ মাটি অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিত প্রস্রাবের উপর যদি পানি প্রবাহিত করে দেয়া হয়, আর এর ফলে যদি প্রস্রাবের চিহ্ন মুছে যায় এবং পানির বৈশিষ্ট্যত্রয় থাকে অটুট, তবে ওই পানিও পাক। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে এই হাদিস— হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, রসুল স. একদিন মসজিদে আগমন করে দেখতে পেলেন, এক বেদুইন সেখানে প্রস্রাব করেছে। তিনি স. উপস্থিত একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, এক বালতি পানি এনে এর উপর প্রবাহিত করে দাও। আহমদ। বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে। বোখারী অবশ্য হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

আমরা বলি, বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধ কিয়াসের পরিপন্থী। সুতরাং হাদিসের মর্মার্থ করতে হবে এভাবে— প্রথমে রসুল স. দিয়েছিলেন ওই স্থানের মাটি অপসারণের নির্দেশ। তারপর পানি প্রবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন তার উপর দিয়ে। কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম স্পষ্ট উল্লেখও এসেছে। যেমন দারাকুতনী আবদুল জব্বারের বরাত দিয়ে, ইবনে উআইনিয়ার বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এক বেদুইন একবার মসজিদে প্রস্রাব করলো। রসুল স. নির্দেশ দিলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে অপসারণ করো। তারপর ওই স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে দাও এক বালতি পানি।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। দারাকুতনী অবশ্য সন্দেহ করে বলেছেন যে, ইবনে উআইনিয়া সম্পর্কে আবদুল জব্বারের সন্দেহ রয়েছে। কেননা ইবনে উআইনিয়ার সঙ্গী যিনি হাফেজে হাদিসের মর্যাদা রাখেন, তিনি ইবনে উআইনিয়ার মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদসূত্রে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে খনন করার নির্দেশের উল্লেখ নেই।

আমরা বলি, আবদুল জব্বার নির্ভরযোগ্য। এরকম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কিঞ্চিত অতিরঞ্জনও গ্রহণযোগ্য।

দারাকুতনী হজরত ইবনে মাসউদ প্রমুখ সূত্রেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসটির সূত্রপরম্পরা শিথিল। কিন্তু এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই অসত্যভাষণের অপবাদ থেকে মুক্ত।

দারাকুতনী ও আবু দাউদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল থেকেও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। দারাকুতনী একথাও বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল ছিলেন তাবেয়ী এবং তাঁর সূত্রপরম্পরাগত সকল বর্ণনাকারীই বলিষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর মস্তিষ্কে গোলোযোগ দেখা দিয়েছিলো। তাই তাঁর পুত্র ওয়াহাব তাঁকে হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় আর হাদিস বর্ণনা করেননি। ইবনে মুঈন বলেছেন, জারীর ইবনে হাকিম যখন কাতাদা সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখন বুঝতে হবে তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

আমি বলি, এই হাদিস কাতাদা সূত্রে বর্ণিত হয়নি। বরং বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের সূত্রে। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী। বোখারী ও মুসলিমও তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমদ এই বর্ণনাকে সাব্যস্ত করেছেন 'পরিত্যাজ্য' বলে। কিন্তু তাঁর উক্তি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নয়। উপযুক্ত ব্যপ্তি ছাড়া এরকম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাঁর যুক্তি কেবল এতটুকুই যে, তাঁর মতে প্রসিদ্ধ হাদিস সমূহে খনন

করার কথা নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি অচল। কারণ বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীদের কিঞ্চিত অতিরঞ্জিত অপ্রসিদ্ধ হাদিসও গ্রহণযোগ্য।

তাহাবী ইবনে উআইনিয়ার বরাত দিয়ে ওমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি তাউস থেকে এবং সাঈদ ইবনে মনসুর ইবনে উআইনিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন নির্দেশ করলেন, ওই স্থানের মাটি খনন করে ফেলে দাও এবং তার উপরে পানি ঢেলে দাও। হাদিসটি অপরিণত সূত্রবিশিষ্ট। আর ইমাম আবু হানিফার নিকট অপরিণত শ্রেণীর হাদিস মুসনাদ শ্রেণীর হাদিস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মত এর বিপরীত। কিন্তু একথাও ঠিক যে, অপরিণত শ্রেণীভূত হাদিস দলিলরূপে গ্রাহ্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইমাম শাফেয়ীর মতে অপরিণত শ্রেণীতে পাঁচটি শর্তের যে কোনো একটি না পাওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। শর্ত পাঁচটি হচ্ছে— ১. অন্য কোনো বর্ণনাকারী একে বর্ণনা করেছেন 'মুরসাল' (অপরিণত) অথবা মুসনাদ সূত্রে কিন্তু হাদিসের ওস্তাদ বিভিন্ন। ২. বর্ণনাটি কোনো সাহাবীর উক্তি। ৩. অধিকাংশ আলেম কর্তৃক সমর্থিত। ৪. বর্ণনাটি এসেছে ন্যায়পরায়ণ কোনো বর্ণনাকারী থেকে । ৫. বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ না করলেও তাঁর এরূপ অভ্যাস আছে যে, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বর্ণনাকারী থেকেই সূত্রপ্রবাহ অনুল্লেখ রাখেন।

এখানে তাউস কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদিসটি গ্রহণীয়। কেননা আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল দ্বারা তা সত্যায়িত হয়েছে। আর এই সূত্রটি উত্তমও বটে। আর হজরত আনাসের মুসনাদও বিশুদ্ধ, অথবা উত্তম। অবশ্য হজরত ইবনে মাসউদের মুসনাদ দুর্বল।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিমে) হজরত আনাসের বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও অধিক অগ্রাধিকারীরূপে গৃহীত হয়েছে, তা হলে তার জবাবে আমরা বলবো, সহীহাইনের হাদিস সূত্রগত দিক দিয়ে অবশ্যই বিশুদ্ধ, কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে তা দুর্বল। কেননা এর পরিপূর্ণতা ওই হাদিসসমূহের দ্বারা হয়, যা কমপক্ষে সুবিদিত এবং যা হয় নাজাসাতের মিশ্রণে পানি অপবিত্র হওয়ার প্রমাণবাহী। আর একটি বিষয় এই যে, অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন দেখা দেয় বর্ণনাবৈষম্য। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। বরং উল্লেখিত সকল হাদিসে এসেছে মাটি খনন করার কথা। খননের কথা নেই কেবল হজরত আনাসের হাদিসে। তাই কোনো হাদিসকেই অগ্রহণীয় বলা যাবে না।

মাসআলা ঃ হদস দূরীকরণার্থে এবং কেবল সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ওজুর ব্যবহৃত পানি জমহুরের নিকট পাক। হাসান থেকে ইমাম আবু হানিফা বর্ণনা

করেন, এরূপ পানি গুরু অপবিত্র (নাজাসাতে গলীজা)। ইমাম আবু ইউসুফের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এরকম পানি লঘু অপবিত্র (নাজাসাতে খফীফা), কেননা এরকম পানি সম্পর্কে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এরকম ব্যবহৃত পানি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য জমহুরের অনুকূল। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানি পাক। সাধারণভাবে হানাফীগণ ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে। আর কিয়াসের দাবিও এরকম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে জানাবাতের পবিত্রতা অর্জনের গোসল না করে। আবু দাউদের বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে— কেউ যেনো আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে এবং জানাবাতের গোসল না করে। এরকম কর্ম নিষিদ্ধ। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ওই পানি তখন নাপাক হয়ে যায়। তারা বলেন ওই নিষিদ্ধতা লঘু অর্থে, গুরু অর্থে নয়। কেননা এক্ষেত্রে এমতো সম্ভাবনা রয়েছে যে, যার উপরে গোসল ফরজ হয়েছে, তার শরীরের কোনো অংশে লেগেছিলো মনী বা বীর্য। এমতাবস্থায় বদ্ধ পানিতে যদি সে নামে তবে ওই পানি হয়ে যায় নাপাক। বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত। মতানৈক্য তো রয়েছে কেবল নাজাসাতে হুকমীয়ার বেলায়। যেমন নিদ্রা থেকে জাগ্রত ব্যক্তিকে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ নিদ্রাবস্থায় নাজাসাতে হাকীকী দ্বারা নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার হস্ত। সেকারণেই রসুল স. বলেছেন, তোমরা ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ো না। অবশিষ্ট রইলো কিয়াস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ। একথা তো স্পষ্ট যে, যে পানির দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর হয়, তা নাপাক। সুতরাং আমরা এই প্রক্রিয়ানুসারে তুলনা করে থাকি হদস বিদূরক ও সওয়াব অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানিকে।

আমরা আরো বলি, এমতো প্রতিতুলনা হয়তো ঠিক নয়। কারণ এমতোক্ষেত্রে তুলনা ও তুলনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নাজাসাতে হাকীকীবিদূরক পানি একারণে নাপাক যে, এর সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় অপবিত্রতা। আর নাজাসাতে হুকমিয়া বিদূরণকারী পানিতে নাজাসাতে হুকমিয়ার অংশ মিলিত বা মিশ্রিত হয় না। কেননা লঘু ও গুরু উভয় প্রকার হচ্ছে একটি হুকমী আমর বা আদেশী কাজ। এরূপ নাজাসাতের কোনো অংশ হয় না। কেননা একটি অঙ্গ ধৌত করলে কেউ পবিত্র পদবাচ্য হয় না, বরং অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র হতে হলে ধৌত করতে হয় তার সমস্ত শরীর। আর যে ওজু করে, তাকে ধৌত করতে হয় চারটি অঙ্গ। এতে করে বুঝা যায় ওজুর পানির এক একটি অংশ পাক। এভাবে পাক অংশ পাক অংশের সঙ্গে মিলিত হলে সমষ্টিগতভাবেও তখন তা আর নাপাক থাকে না।

ওজু থাকা সত্ত্বেও যদি কেবল পুণ্যার্জনার্থে কেউ ওজু করে তাহলে হানাফীগণ তার ওই ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেন। কেননা রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওজু করে, তার গোনাহসমূহ তার শরীর থেকে ঝরে পড়ে যায়। এমনকি ঝরে যায় তার আঙুলের নিচের গোনাহ্ও। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ওসমান থেকে এবং মুসলিম হজরত আবু হোরায়রা থেকে। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, গোনাহ্ যেহেতু নাপাক, তাই গোনাহমিশ্রিত পানিও নাপাক। উল্লেখ্য, হানাফীগণের এই অভিমতটি ভুল। কারণ গোনাহর কোনো আকৃতি নেই। আর এতে এমন কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য অপবিত্রতাও নেই যে, তা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে। গোনাহ নাজাসাতে হাকীকীর মতো নয়। অর্থাৎ তা এমন কোনো বস্তু নয় যা শরীর থেকে ঝরে পড়ে পানির সাথে মিশ্রিত হবে এবং পানিকে করে দিবে নাপাক। বরং এখানে গোনাহ ঝরে পড়ার অর্থ গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া। গোনাহ যদি বাহ্যিক নাপাকির মতো হতো, তবে তো পাপী বিশ্বাসীদের নামাজ পাঠ বৈধই হতো না। অথচ এরকম বিশ্বাসীদের নামাজ হয় তাদের পাপের ক্ষতিপূরণ। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ইন্নাল হাসানাতি ইউজহিবনাস সায়্যিয়াতি' (পুণ্য কর্মসমূহ দূর করে পাপসমূহকে)। রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তাদের মধ্যবর্তী সময়ের, জুমআর নামাজ পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সময়ের এবং এক রমজান আর এক রমজান পর্যন্ত সময়ের পাপের ক্ষতিপূরক। তবে শর্ত হচ্ছে এমতো আমলকারীকে বেঁচে থাকতে হবে বৃহৎপাপ থেকে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক চুম্বন করে বসলো এক রমণীকে। একথা সে প্রকাশ করে দিলো রসুল স. এর কাছে। তখন অবতীর্ণ হলো 'আক্বিমিস্ সলাতা ত্বরাফাইনিন্ নাহারি ...... শেষ পর্যন্ত। বোখারী, মুসলিম।

ব্যবহৃত পানিকে যারা পাক বলেন, তাদের অভিমতের পরিপোষকতায় রয়েছে কয়েকটি হাদিস। যেমন— হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, আমি একবার পীড়িতাবস্থায় হয়ে গেলাম সংজ্ঞাহীন। জ্ঞান ফিরলে জানলাম, রসুল স. এসে ওজু করে ওজুর ব্যবহৃত পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন আমার উপর। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছি সে কারণেই। আমি তখন নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই— না মাতা-পিতা, না সন্তান-সন্ততি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, একবার আমার খালা আমাকে নিয়ে গেলেন রসুল স. এর মহান দরবারে। বললেন, এই ছেলেটি আমার ভগ্নির। সে দুঃখী ও অসুস্থ। রসুল স.তখন তার বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর ওজু করে ব্যবহৃত পানি পান করতে দিলেন আমাকে। আমি তা পান করলাম। বোখারী, মুসলিম।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বিবরণে এসেছে, হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসুল স. এর থুথু কেউ মাটিতে পড়তে দিতো না। সাহাবীগণ তা হাত পেতে নিতেন এবং মাখতেন মুখে ও শরীরে। আর তিনি স. যখন ওজু করতেন, তখন ওজুর ব্যবহৃত পানি নেয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে লেগে যেতো কাড়াকাড়ি। বোখারী।

মাসআলা ঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, হদস দূর করার জন্য এবং সওয়াব অর্জনের জন্য ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা যায়। যারা বলেন, এরকম পানি নাপাক, তাঁদের মতে এরকম পানি নাজাসাতে হাকীকী দূর করতে সমর্থ নয়। কিন্তু ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপ্রভেদ রয়েছে। ইমাম মোহাম্মদ বলেন, সওয়াব অর্জনের জন্য যে পানি দ্বারা একবার ওজু করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা যাবে না। এরকম পানি পবিত্র বটে, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। আর ইমাম জোফার ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, হদস দূর করার জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে, ওই পানি দ্বারা পুনরায় ওজু অথবা গোসল করা নাজায়েয। কারণ ওই পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, হদস দূরীকরণ, অথবা কেবল সওয়াব অর্জন উভয় উদ্দেশ্যে ওজু ও গোসলে ব্যবহৃত পানি পবিত্র, কিন্তু পবিত্রকারী নয়। তাঁর এমতো অভিমত তিনি প্রমাণ করেছেন হাদিস ও কিয়াস উভয়ের দ্বারা। প্রামাণ্য হাদিসটি এই— রসুল স. জানিয়েছেন, তোমাদের কেউ যেনো বদ্ধ পানিতে স্নান না করে। হাদিসে উল্লেখিত এমতো নিষিদ্ধতার কারণ হতে পারে দু'টি— ১. ওই পানি নাপাক হয়ে যায় ২. ওই পানি পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। এরকম ব্যবহৃত পানিকে অবশ্য নাপাক বলা যায় না। সুতরাং বলতে হয়, এরকম পানি পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়। আমরা বলি, এই নিষিদ্ধতা তাহরীমি নয়, তানযিহী। অর্থাৎ এরকম পানি নিশ্চিত নাপাক নয়, তবে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা এতে রয়েছে। সুতরাং ওই পানিকে যেমন নিশ্চিতভাবে নাপাক বলা যায় না, আবার পবিত্রকারী হওয়া পানির যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে কথাকেও করা যায় না অস্বীকার।

হদস দূর করা অথবা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানিকে 'পবিত্রকারী নয়' বলে মত প্রকাশকারীরা ওই পানিকে তুলনা করে থাকেন জাকাতের সঙ্গে। এর কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন, জাকাত প্রদান করলে যেমন ফরজ দায়িত্ব পালিত হয়, তেমনি অর্জিত হয় সওয়াব। জাকাতের সম্পদ নাপাক, তাই তা হাশেমীগণের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সম্পদকে নিশ্চিতরূপে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়নি। অনুরূপ হদস বিদূরণকারী ও সওয়াব প্রদায়ক ওজু ও গোসলের ব্যবহৃত পানি হারিয়ে ফেলে তার পুনঃপবিত্রতাপ্রদায়ক শক্তি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওই পানিকে অপবিত্র বলা যায় না। এমতো অভিমত অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইসকাতে ফরজ (ফরজের রূপায়ণ) ও ইকামাতে কুরবত (নৈকট্যের প্রতিষ্ঠা) এর দ্বারা মধ্যবর্তীতে এসেছে যার ঘনত্ব ও অপবিত্রতা। হাশেমীদের জন্য জাকাত নিষিদ্ধ করার নির্দেশটি বুদ্ধি-বিবেকের উর্ধে ইবাদতমূলক নির্দেশ। স্মর্তব্য যে, শরীর ও পোশাকের দ্বারা নামাজ আদায় করা যায় এবং এতে করে আদায় হয়ে যায় ইসকাতে ফরজ। আবার অর্জিত হয় সওয়াবও। কিন্তু এর কোনোটির দ্বারাই প্রমাণিত হয় না নিশ্চিত ঘনত্ব অথবা অপবিত্রতা। কোরবানীর বিষয়টিও তদ্রূপ। কোরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়, কিন্তু কোরবানীর গোশতে মিশ্রিত হয় না কোনো অপবিত্রতা। তাই রসুল স. নিজেও কোরবানীর গোশত খেয়েছেন।

তাছাড়া সাধারণভাবে পবিত্রকারী হওয়া পানির একটি অত্যবশ্যক গুণ। যা নিজে পবিত্র, তাতো অন্যকে পবিত্র করতে পারবেই। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'পানি না পাওয়া গেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো'। নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। অতএব বুঝতে হবে ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতেও মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম নাজায়েয, বরং এমতোক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওজু করা হবে ওয়াজিব। যদি কেউ বলে, ব্যবহৃত পানি সাধারণ পানি নয়। সাধারণ পানি হচ্ছে ওই পানি, যার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র নেই। এরকম পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় নামাজের জন্য ওজু করা জায়েয। এর পরিপ্রেক্ষিত আমরা বলি, সাধারণ পানি যে পবিত্র পানি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এরকম পানিতে অক্ষুণ্ন থাকে তার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ এই বৈশিষ্ট্যত্রয়। কিন্তু ব্যবহৃত পানিতেও সাধারণত এই গুণত্রয়ের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। সেকারণেই জুহুরী বলেন, ওজু করার জন্য তাজা পানি না থাকলে কুকুর মুখ দিয়েছে এরকম পাত্রের পানি দ্বারাও ওজু করা যাবে, তবু তায়াম্মুম করা যাবে না। সুফিয়ান সওরী বলেন, ফেকাহশাস্ত্রের দিক থেকে এমনটিই বোধ্য। পানি না পেলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কোরো— নির্দেশটির অর্থ সাধারণ পানি না পেলে তায়াম্মুম কোরো। বোখারী এরকম বর্ণনা করেছেন প্রলম্বিত সূত্রে।

কিন্তু আমরা বলি, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে অপবিত্র পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ওয়ায়িয়াবাকা ফাত্বহ্‌হির ওয়ার রুজ্‌যা ফাহ্‌জুর। অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'ওয়ালাকিঁইইয়ুরিদু লিইয়ুত্বহ্‌হিরাকুম'। হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের কারো পানির পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে ওই পাত্রের পানি ফেলে দিয়ো। তারপর পাত্রটি ধৌত কোরো সাতবার। অন্য এক হাদিসে এসেছে, ওই নাপাকীসমূহের কোনো একটিতে যদি কাউকে লিপ্ত হতে হয়, তবে সতর্কতা অবলম্বন কোরো আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে।

এক আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'ইউহিললু লাহুমুত্ ত্বয়্যিবাতি ওয়া ইউহার্‌রিমু আলাইহিমুল খবায়িছা'(তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে পবিত্রবস্তু আর হারাম করা হয়েছে অপবিত্রবস্তু)। এখন কেউ নাপাক পানি পেলেও সে কিন্তু শরিয়ত কথিত পানি পায়নি। কারণ নাপাক পানি ব্যবহার শরিয়তে নিষিদ্ধ। পরিস্থিতিটি এরকম— যেমন কেউ কূপের পাশে বসে আছে। কিন্তু কূপ থেকে পানি তোলার রশি বা বালতি তার কাছে নেই। তেমনি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পানি উপস্থিত থাকলেও রোগবৃদ্ধির আশংকায় সে তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। ব্যবহৃত পানির বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। কারণ তা নাপাক নয়। সুতরাং ব্যবহৃত পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম অসিদ্ধ। আর ওই পানি পবিত্র তো বটে, পবিত্রকারীও।

মাসআলা ঃ যদি কোনো পাক জিনিস পানিতে পতিত হয়, তার ফলে পানির তিনটি গুণে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, পানির মৌলিকত্বে নতুন কিছু যদি সংযুক্ত না হয়, তবে ওই পানি দ্বারা ওজু জায়েয। কিন্তু পানির এক বা একাধিক গুণ যদি এতে করে পরিবর্তিত হয়, এমতো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় যা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, যেমন বর্ষাকালের পানির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ঘাস, পাতা ইত্যাদি এতে করে পানির গুণে কিঞ্চিত পরিবর্তনও আসে, এমতোক্ষেত্রে আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, পানির ঘনত্ব ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত না হওয়ার শর্তে এরকম পানি দিয়ে ওজু করা সিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু হবে না। কারণ এরকম পানি সাধারণ পানি নয়। বরং তা রস বা সুরা পদবাচ্য।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম পানি দিয়ে ওজু সিদ্ধ। তবে যদি কোনো ঘন বস্তু পতিত হওয়ার কারণে পানি গাঢ় হয়ে যায়, অথবা যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় পানির অধিকাংশ গুণ, যেমন নাবিজ (এক প্রকার মদ্য), অথবা যদি কোনো তরল পদার্থ পানিতে পড়ে পানির চেয়ে অধিক পরিমাণ হয়ে যায়, পানির অংশ

হয়ে যায় অম্ল, অথবা এতে করে নষ্ট হয়ে যায় পানির অধিকাংশ গুণ, অথবা ওই তরল পদার্থ পানিতে পাক করার ফলে হয়ে যায় সূরা বা রস, তবে ওই পানি দিয়ে ওজু সিদ্ধ হবে না। কিন্তু পানি অধিকতর উত্তম করার জন্য যদি আমপাতা বা বরইপাতা দ্বারা পানি সিদ্ধ করা হয়, তবে পানির গুণে সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলেও ওই পানি ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে খুজাইমা ও নাসাঈ হজরত উম্মে হানী সূত্রে বর্ণনা করেন, রসুল স. এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হজরত মায়মুনা একবার একটি বড় পাত্রে রক্ষিত পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন। অথচ ওই পানিতে ছিলো আটার খামিরের চিহ্ন। বোখারী হজরত উম্মে আতিয়া নাম্মী এক আনসার রমণী থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. এর প্রিয় কন্যা পরলোক গমন করলে তিনি স. আমাদের কাছে এসে বললেন, তাকে গোসল করাও তিনবার, পাঁচবার অথবা আরো অধিকবার কুলের পাতা দ্বারা সিদ্ধ পানি দিয়ে। আর ওই পানিতে মিশিয়ে দাও কিছু কর্পুর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্যার বর্ণনা করেছেন, সালমা ইবনে আমাল যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন রসুল স. তাঁকে বললেন, কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে প্রথমে গোসল করে নাও। কায়েস ইবনে আসেমের বর্ণনামতে এরকম কথা এসেছে।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'উহা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য'। এখানে 'বালদাতান' অর্থ ভূখণ্ড, শহর, নগর, জনপদ। সেকারণেই এর বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক 'মাইতান' শব্দটি।

'আনাসিয়্যা' অর্থ প্রান্তরের প্রাণীকুল ও যাযাবর শ্রেণীর মানুষ, কেননা তাদের জীবনযাপন নির্ভরশীল বৃষ্টির পানির উপর।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা মানুষের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ব্যাপক নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয়, মানুষের আগে উল্লেখ করেছেন 'অসংখ্য জীবজন্তু'র কথা। এর কারণ হচ্ছে মানুষের জীবন অনেকাংশে অন্যান্য প্রাণীকুলের উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টির পানির দ্বারা তাদের পরিতৃপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে আগে। আবার তার আগে উল্লেখিত হয়েছে মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করার কথা। কারণ মৃত্তিকা সঞ্জীবিত না হলে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। প্রাণীকুলের খাদ্য তো জন্মে মাটিতেই। আর মাটিই বুকে করে ধরে রাখে নদ-নদী, জলাশয় ও অন্যান্য পানির আধার।

এখানে 'আনাসিয়্যা' অর্থ মরুচারী, যাযাবর, বেদুইণ, যেহেতু তাদের জীবিকা নির্ভর করে বারিবর্ষণের উপর। এর একবচন 'ইনসিউন' অথবা 'ইনসান', যেমন

‘জারাবীউন’ বহুবচন ‘জারবানুন’ এর। যদি ‘আনাসিয়্যা’ কে ‘ইনসান’ এর বহুবচন সাব্যস্ত করা হয়, তবে বলতে হয় শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো ‘আনাসীনুন’, যেমন ‘বুসতানুন’ এর বহুবচন বাসাতীন। এখানে ‘নূন’ পরিবর্তিত হয়েছে ‘ইয়া’ দ্বারা এবং একে সূচারুরূপে মিলিত করে দেয়া হয়েছে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে।

শহর মফঃস্বলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ বসবাস করে নদী-খাল-বিলের উপকণ্ঠে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করে নদী-বিল-খাল থেকেই। বারিপাতের প্রতি তারা তেমন মুখাপেক্ষী নয়।

আলোচ্য আয়াতে মানবের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামত রাশির কথা স্মরণ করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। মানবের প্রধান উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। তাই তার উল্লেখ হয়েছে মানুষের পূর্বেই। তার পূর্বে উল্লেখ হয়েছে ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার কথা। যেহেতু বারিপাতে জীবন্ত হয় ভূমি। আর ভূমির তৃণলতা দ্বারা প্রাণবন্ত হয় চতুষ্পদ জন্তু।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۡ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

❒ এবং আমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

❒ আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম।

❒ সুতরাং তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি’। একথার অর্থ— এবং আমি বৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পতিত করাই বিভিন্ন ভূখণ্ডের উপর।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, এক বছর অপেক্ষা অন্য বছরের বৃষ্টি অধিক হয় না। কারণ আল্লাহ্‌ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত। সুপরিণত শ্রেণীর এক বর্ণনায় এসেছে, দিবস-রাত্রির মধ্যে এমন সময় নেই, যখন বৃষ্টিপাত না হয়। আল্লাহ্‌ যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই ঘুরিয়ে দেন বৃষ্টির গতিবিধি। ইবনে

ইসহাক, ইবনে জারীর ও মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, এক বছরের চেয়ে অন্য বছরের বৃষ্টি বেশী হয় না। আল্লাহ্ই রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন। নিম্নাকাশের মেঘপুঞ্জে রেখে দিয়েছেন বৃষ্টির ভাণ্ডার। সেখান থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান পৃথিবীতে। মানুষ পাপাচারী হলে তিনি বৃষ্টির গতি ঘুরিয়ে দেন বিজন বন অথবা সমুদ্রের দিকে।

কেউ কেউ বলেছেন, বৃষ্টিপাত হয় কখনো মুষলধারায়, আবার কখনো স্বাভাবিক ছন্দে। 'বৃষ্টি বিতরণ করি' কথাটির মধ্যে রয়েছে এ বিষয়েরই ইঙ্গিত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও জলাশয়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া বা বিতরণ করা। আবার কেউ বলেছেন, এখান 'সররাফনা' (বিতরণ করি) অর্থ— এসকল কথা আমি আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বার বার বিবৃত করি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে তারা স্মরণ করে'। একথার অর্থ— যাতে তারা আল্লাহ্র এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর অপার দয়া ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে এবং সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে সদুপদেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে'। একথার অর্থ— বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্ই। অথচ অধিকাংশ লোক বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। এভাবে তারা হয়ে যায় আল্লাহ্র অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞচিত্ত। হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহুনী বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের রাতে বৃষ্টিপাত হলো। ফজরের নামাজ শেষে রসুল স. বসলেন তাঁর সহচরবৃন্দের মুখোমুখি। বললেন, তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বলেছেন? সহচরবৃন্দ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই এ সম্পর্কে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, ভোরবেলা আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ হয় বিশ্বাসী এবং কেউ কেউ হয়ে যায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। একদল বলে, আমাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে আল্লাহ্র দয়ার বৃষ্টি। এরা তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আর একদল বলে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে অমুক তারকার প্রভাবে। তারা তারকার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী। বোখারী, মুসলিম।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম'। নবী-রসুলগণ মানুষকে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তির প্রতি সতর্ক করে থাকেন। তাই তাঁদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'সতর্ককারী'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার গুরুদায়িত্বের ভার আমি লাঘব করে দিতে পারতাম।

প্রতিটি জনপদে পাঠাতে পারতাম পৃথক পৃথক রসুল। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমি আপনাকে প্রদান করবো অতুলনীয় মর্যাদা। করবো সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত। তাই তো আপনি হয়েছেন মহামানবতার ও মহানিসর্গের মহানতম সতর্ককারী, মহিমময় রসুল।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আনুগত্য কোরো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে তাদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! সৃষ্টির প্রতি আপনার অতিরিক্ত মমত্ববশতঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পথ প্রদর্শনের চিন্তায় তাদের প্রতি তো আনুগত্য প্রদর্শন করবেনই না, বরং হৃদয়ের বিশ্বাস ও কোরআনের বাণীর মাধ্যমে চালিয়ে যাবেন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫৩, ৫৪

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

❒ তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

❒ এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর, উভয়ের মধ্যে তিনি রেখেছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান'। এখানে 'মারাজ্বাল বাহরাইনি' বলে বুঝানো হয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই সমুদ্রের সম্মিলিত প্রবহমানতাকে। এরকম সম্মিলনের কারণে দুই সমুদ্রের একাকার হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। কারণ পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দুই সমুদ্রের স্রোতের আপনাপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখাই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। আর তাঁর চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়ের ব্যত্যয় কদাচ ঘটে না।

'ফুরাতুন' অর্থ পিপাসা নিবারণকারী, সুপেয়। আর 'উজ্বাজুন' অর্থ পিপাসাবর্ধক, লবনাক্ত, অত্যধিক খর হওয়ার কারণে বিস্বাদ। 'বারযাখান' অর্থ অন্তরায়। 'হিজ্‌রাম মাহজুরা' অর্থ অনতিক্রম্য ব্যবধান।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'অনতিক্রম্য ব্যবধান' এমন, যেনো বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করে সমুদ্রাভ্যন্তরকে চিরে দিয়েছে। এভাবে প্রবহমান পাশাপাশি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে যুগল সমুদ্র। দুটোর পানি দু'রকম। একটির আস্বাদ অপরটির আস্বাদকে এতটুকুও প্রভাবিত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'সুপেয় পানির দরিয়া' দ্বারা বুঝানো হয়েছে নীল, ফোরাত ইত্যাদি মিঠা পানির নদ-নদীকে। 'আর লোনা পানির দরিয়া' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদ্রসমূহকে। আর 'অন্তরায়' ও 'অনতিক্রম্য ব্যবধান' বলে বুঝানো হয়েছে নদী-সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত দোয়াব অঞ্চলকে।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, অতঃপর তিনি মানব জাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে দিয়েছেন'। এখানে 'নসব' অর্থ বংশগত বা রক্তগত সম্বন্ধ, যার উৎসারণ স্থল পুরুষ। কারণ বংশগত সম্পর্ক পরিচিতি লাভ করে প্রধানতঃ পুরুষের সঙ্গে। আর 'সিহরান' অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধ, যার ভিত্তি হচ্ছে নারী। এবিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'জ্বাআলা মিনহুম্‌ যাওজ্বাইনিজ্‌ জাকারা ওয়াল উনসা' আয়াতে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রক্তগত সম্পর্ক' অর্থ নারীপুরুষের বংশগত ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ যেমন পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং 'সিহরান' অর্থ নারী-পুরুষের বৈবাহিক আত্মীয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করেন তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে। যেভাবে খুশী, সেভাবে। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। সৃষ্টি করেন নারী অথবা পুরুষ। দান করেন তাদেরকে অঙ্গ সৌষ্ঠবগত ও স্বভাবগত পৃথকতা। অথচ তাদের উভয়ের সৃষ্টি একই আকৃতির শুক্রকণা থেকে। এভাবে আবার কাউকে কাউকে করেন যমজ।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ۝ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

❒ উহারা আল্লাহের পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা উহাদিগের উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

❒ আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

❒ বল, 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; তবে, যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের উপকার করতে পারে না অপকারও করতে পারে না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। তারা করতে পারেনা উপাসকদের কোন হিত সাধন। আবার অহিত সাধনও করতে পারেনা যারা পূজা করে না তাদের।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'জহীরুন' কথাটির অর্থ লাঞ্ছিত করেছে। আর এক অর্থ বিরোধী হয়েছে। যেমন 'জ্বাআ'লানী জহীরা' অর্থ সে আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। 'জহারতুশ্ শাইয়ান' অর্থ আমি ওই বস্তুকে ঘৃণাভরে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছি। অর্থাৎ দয়া পাওয়ার অযোগ্য করে দিয়েছি।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনাকে কারো জিম্মাদার করে প্রেরণ করিনি। প্রেরণ করেছি বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের সুসংবাদদানকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, এই যে আমি তোমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান করে চলেছি, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পার্থিব কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই না। সুতরাং তোমরা মনে কোরো না যে, সত্যকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে কোনো অর্থদণ্ড দিতে হবে। অতএব, আমার এ নিঃস্বার্থ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমরা যারা চাও, তারা তাদের প্রভুপালনকর্তার পথ গ্রহণ করো। এটাই আমার একান্ত কামনা।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধসমূহ পালনার্থে রসুল স. এর আনুগত্যকেই এখানে রেসালাতের বিনিময়রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পার্থিব বিনিময়কে। এতে যেনো কেউ এই সন্দেহে পতিত না হয় যে, রসুলের দাবিদার

এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম করে পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী হতে চায়। শেষে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এমতো নিঃস্বার্থ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। আপন ইচ্ছায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত সত্য ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। আর এমতো সত্যগ্রহণই হচ্ছে রসুলের রেসালাতের বিনিময়। যেহেতু রসুলের মাধ্যমে মানুষ পথপ্রাপ্ত হয় তাই সত্য পথপ্রাপ্তির সওয়াব লাভ হবে রসুলের। এক হাদিসে একথা খোলাখুলি বলেও দেয়া হয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন পুণ্যপথ প্রদর্শনকারীও পুণ্য অর্জনকারীর মতো সওয়াব লাভ করবে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায্যার হজরত ইবনে মাসউদ থেকে, তিবরানী হজরত সহল ইবনে সা'দ ও হজরত আবু মাসউদ সূত্রে, ইমাম আহমদ, সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রণেতাগণ, কিছু অতিরিক্তসহ জিয়া, হজরত বুরাইদা থেকে এবং ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া 'ক্বদাউল হাওয়ায়িজ' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে। জিয়ার অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু এই— আল্লাহ্ বিপদগ্রস্তদের প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। হজরত জারীর থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম অনুসরণের জন্য কোনো উত্তম পদ্ধতি প্রবর্তন করবে, তার জন্য সে লাভ করবে সওয়াব এবং লাভ করবে ওই সকল ব্যক্তির আমলের সমান সওয়াব যারা অনুসরণ করবে ওই পদ্ধতির। আর এতে করে অনুসারীদের সওয়াবও কিছুমাত্র কমবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'ইল্লা মান শাআ' (তবে যে ইচ্ছা করে) বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এর অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছুক সে এরূপ করবে। আর 'আমি নিজের জন্য কিছু চাই না' অর্থ আমিতো নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করি না। তবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ কামনার জন্য আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন ও আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করতেও আমি বাধা দেই না।

জাকাত ও সদকার বিধান প্রবর্তনের কারণে কেউ যদি এরকম সন্দেহ করে যে, এর মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর সম্পদ লাভের অভিলাষ, তাহলে তার এমতো সন্দেহ হবে ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স. ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য জাকাত ও সদ্‌কার সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ অসিদ্ধ। তাই কোরআন, হাদিস ও ফেকাহশাস্ত্র শিক্ষাদান এবং আজান প্রদান, ইমামতি, ধর্মীয় বক্তৃতা ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদির জন্য বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ (السجدة)

❒ তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার দাসদিগের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

❒ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই 'রহমান', তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

❒ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'সিজদাবনত হও 'রহমান' -এর প্রতি।' তখন উহারা বলে, 'রহমান' আবার কে?' তুমি কাহাকেও সিজ্‌দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্‌দা করিব। ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আপনি নির্ভর করুন কেবল তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাকে স্পর্শ করতে পারে না। বরং তিনিই সকলের ও সকলকিছুর জীবনদাতা ও মৃত্যুপ্রদাতা। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা থেকে এবং মানুষের অর্থ সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী রাখতে পারেন কেবল তিনিই। সুতরাং কেবল আশ্রয় করুন তাঁর মুখাপেক্ষিতাকে। বর্ণনা করুন শুধু তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। আর পাপিষ্ঠদের সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা সম্পর্কে ভাববেন না। তিনি তাদের পাপাচরণ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। যথাসময়ে তাদের শাস্তিবিধান তিনি করবেনই।

এরপর বলা হয়েছে, — 'তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন তাঁর প্রশংসাসহ। তিনি যথেষ্ট অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।'

এখানে 'সাব্বিহ্' অর্থ মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ একথার স্বীকৃতি দিন যে, তিনি যাবতীয় অপূর্ণ এবং দুষণীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

'বিহামদিহী' অর্থ — হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি সাধুবাদ দিন তাঁর যাবতীয় পরিপূর্ণ গুণের । আর আকাঙ্খী হোন তাঁর অনুগ্রহ রাশির । কোনো কোনো আলেম 'সাব্বিহ্' শব্দের অর্থ করেছেন— নামাজ পড়ুন। আর 'বিহাম্দিহী' কথার অর্থ করেছেন. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন তাঁর অনুগ্রহ সম্ভারের। সেক্ষেত্রে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তাঁর অনুগ্রহসম্ভারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই নামাজ আদায় করুন।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন'। একথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ই যখন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তখন সকল বিষয়ে নির্ভর করতে হবে কেবল তাঁর উপর। আর সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বলে এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ধারাক্রম ও ধীরতা-স্থিরতার শিক্ষা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও একমুহূর্তে ও এক সঙ্গে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করেননি। করেছেন ধারাবাহিকভাবে, ধীরে ধীরে, ছয় দিনে। সুতরাং মানুষের উচিত তাদের সকল কর্মকাণ্ডকে এভাবে ধারাবাহিকতাভূত এবং ধীরতাসম্ভূত করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো'। কালাবী আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার রহস্য সম্পর্কে এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে, জ্ঞানীগণের শরণাপন্ন হও।

এখানে 'খবীরুন' বলে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্তায়ালাকে, অথবা হজরত জিব্রাইলকে অথবা ওই সকল আলেমকে, যাঁরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ পাঠ করেছিলেন। কারো কারো নিকট এখানকার 'বিহি' (তাঁকে) এর 'হি' সর্বনাম 'রহমান' বা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যদি কেউ আল্লাহ্র জন্য 'রহমান' সম্বোধনটিকে অসমীচীন মনে করে, তবে তোমরা এ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা তোমাদের জানাবে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও 'রহমান' নামটি উল্লেখিত হয়েছে 'আল্লাহ্' নামের সমার্থকরূপে। উল্লেখ্য, জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে 'সাআলা আনহু' এবং 'সাআলা বিহী' উভয় বাক্যরীতি সুপ্রচল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ফাসআল' এর সম্বোধিতরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ এখানে তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে— হে মানুষ! তোমরা 'রহমান' সম্পর্কে জানতে হলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তাঁরা তোমাদেরকে এব্যাপারে সঠিক দিকদর্শন দিতে পারবে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তাদেরকে বলা হয় সেজদাবনত হও 'রহমান' এর প্রতি, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সেজদা করবো'? উল্লেখ্য, মুশরিকেরা আল্লাহ্‌কে রহমান বলে স্বীকার করতো না। বলতো, ইয়ামামার রহমান (মুসায়লামা ইবনে কাজ্জাব) ছাড়া আর কোনো রহমানকে আমরা চিনি না। তাই রসুল স. যখন তাদেরকে বলতেন, তোমরা 'রহমান' এর প্রতি সেজদাবনত হও, তখন তারা বলতো, তুমি কি যাকে তাকে সেজদা করতে বললেই আমরা সেজদা করবো?

শেষে বলা হয়েছে— 'এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়'। একথার অর্থ— এরকম অস্বীকৃতির কারণে সত্যের প্রতি প্রকাশ পায় তাদের অধিকতর বৈমুখ্য ও অবজ্ঞা।

নির্দেশনা ঃ ৬০ সংখ্যক আয়াত যারা আরবীতে পাঠ করেছেন, তারা সেজদা করে নিবেন।

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

❐ কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

❐ এবং যাহারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাহাদিগের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে।

❐ 'রহমান'-এর দাস তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা জবাব দেয় প্রশান্তভাবে;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কতো মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র'।

হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'বুরুজ্' অর্থ রাশিচক্র। বৃহদাকৃতির তারকাপুঞ্জকে বলে বুরুজ্। আতিয়া ও আউফি বলেছেন, বুরুজ্ বলে ওই সকল বড় বড় প্রাসাদকে, যে গুলোতে নিয়োজিত থাকে প্রহরী।

'সিরাজ্বান' অর্থ আলোকময় প্রদীপ, অর্থাৎ সূর্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—ওয়া জ্বাআ'লাশ্ শামসা সিরাজ্বা'। ক্বারী কুসাই এবং ক্বারী হামযার ক্বেরাতে উচ্চারিত হয়েছে শব্দটির বহুবচনরূপ 'সুরুজ্বান'। 'সুরুজ্বান' উচ্চারণ করলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে সূর্য। অন্যান্য তারকা ও চন্দ্র এর অর্ন্তভূত হবে না। আর চন্দ্র তো নিজস্ব আলোকে আলোকময় নয়। সূর্যের আলোতেই সে আলোকময়রূপে দৃষ্ট হয়। আর এখানে চন্দ্রের উল্লেখও এসেছে আলাদাভাবে। বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বমারাম মুনীরা' (এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র)।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে'। এখানে 'খিলফাতান' অর্থ পরস্পরের অনুগামী বা স্থলাভিষিক্তরূপে। একারণেই কারো কোনো আমল দিবস ও রাত্রিতে বাদ পড়ে গেলে তা করে নিতে হয় যথাক্রমে রাতে ও দিনে।

বাগবী লিখেছেন, এক লোক হজরত ওমরের দরবারে এসে বললো, আমার রাতের নামাজ ফউত হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, এখন দিনে তা আদায় করে নাও। কেননা আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— 'এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে, পরস্পরের অনুগামীরূপে'।

মুজাহিদ বলেছেন, 'খিলফাতান' অর্থ বিপরীত, পরস্পরবিরোধী। যেমন রাত কালো, দিন শাদা।

'ইয়াজ্জাক্কারা' অর্থ অনুসন্ধিৎসু। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহসম্ভার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। অনুসন্ধান করে ফেরে সেগুলোর রহস্য এবং উত্তমরূপে অবগত হয় যে, এসকল কিছুর সৃজয়িতা কতো প্রজ্ঞাময়, কতো দয়াময়। অথবা কথাটির অর্থ— ওই সকল দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি যারা তাদের দিবসের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পাদন করে রাতেই এবং রাতের পরিত্যক্ত কর্ম সম্পন্ন করে দিবসের মধ্যেই।

'আও আরদা শাকুরা' অর্থ অথবা কৃতজ্ঞচিত্ত। অর্থাৎ যারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তির কথাকে স্মরণ করে। আর একারণে প্রকাশ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

জ্ঞাতব্য ঃ হাসান বর্ণনা করেন, একবার হজরত ওমর চাশতের নামাজ পড়লেন অতি বিলম্বে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো এরকম আমল আগে কখনো করেননি। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আমার রাতের বাদ পড়ে যাওয়া আমল। অর্থাৎ রাতের পরিত্যক্ত আমল আদায় করলাম এখন। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৬৩)বলা হয়েছে— 'রহমান এর দাস তারাই যারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা জবাব দেয় প্রশান্ত ভাবে'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাগণের অভিব্যক্তি ও আচারাচরণ হয় বিনম্র, পদবিক্ষেপ হয় বিনয়মণ্ডিত। অজ্ঞ লোকের উগ্র ও বচসাপ্রবণতাকে তাঁরা মোকাবিলা করেন ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে। বলেন, শান্তি, শান্তি। একবার হজরত ওমর এক যুবককে দর্পভরে পথ চলতে দেখে বললেন, এরকম দম্ভিত পদচারণার প্রয়োজন হয় সমরক্ষেত্রে। শান্তির সময়ে এমতো বীরত্বব্যঞ্জকতার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'ইবাদুর রহমান' (রহমানের দাস) বলে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাগণের মর্যাদা। অথবা একথা বুঝানো হয়েছে যে, রহমানের বান্দাগণই আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা। 'আবিদুন' এর বহুবচন 'ইবাদুন' যেমন 'তাজ্বীর' এর বহুবচন 'তিজ্বার' এখানে আল্লাহ্‌র অন্যান্য নামের বদলে 'রহমান' উল্লেখ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটি নিহিত রয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রকৃত দাসগণকে দান করবেন পরিপূর্ণ রহমত। তাদের প্রতি এটা হচ্ছে তাঁর পরিপূর্ণ মেহেরবানী।

'ইয়ামশুনা আ'লাল আরদ্বি' হাওনান' অর্থ ভূপৃষ্ঠে চলাফিরা করে নম্রভাবে। অর্থাৎ যাদের পদবিক্ষেপে থাকেনা গর্ব বা আত্মপ্রদর্শনেচ্ছা। 'হাওনুন' এর শাব্দিক অর্থ নম্রতা। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, স্থিরতা। এক হাদিসে শব্দটি এসেছে এই অর্থেই। যেমন রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীরা হয় ধীর, স্থির চালচলন সম্পন্ন। এমনকি অত্যধিক নম্রতার কারণে তাদেরকে কখনো কখনো মনে হয় নির্বোধ। শিথিল সূত্রসহযোগে বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

'ওয়া ইজা খাতাবাহুমুল্ জাহিলুনা ক্বলু সালামা' অর্থ এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম'। মুজাহিদ ও মুকাতিল ইবনে হাব্বান এখানকার 'সালাম' এর অর্থ করেছেন সাদাদ (সোজা-সরল কথা), যদ্দারা নিরাপদ থাকা যায় পাপ থেকে। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দারা অজ্ঞ লোকের অজ্ঞানোচিত আচরণের জবাবে সমান্তরাল আচরণ করেন না, অবলম্বন করেন ধৈর্য। হাসান বলেছেন তাঁরা উচ্চারণ করেন, শান্তি, তোমাদের উপরে শান্তি। কেননা এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে— 'ওয়া ইজা সামিউল্‌লা লাগ্‌ওয়া আ'রাদ্বু আনহু ওয়া ক্বলু লা'না আ'মালুনা ওয়া লাকুম আ'মালুকুম সালামুন আ'লাইকুম'। আবুল আলীয়া বলেছেন, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

আসল ব্যাপার হলো আয়াতটি রহিত নয়, বরং কার্যকরী। কারণ, সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্র বাণীকে সমুচ্চ করবার জন্য। মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ মেনে নিলে অথবা জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে যুদ্ধের অবকাশ আর থাকে না। রসুল স. বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যতক্ষণ না মানুষ বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। বোখারী ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে।

অতএব বুঝতে হবে 'যে সকল লোক ইমান গ্রহণ করবে না যুদ্ধ করো তাদের সাথে.... এমন কি তারা যেনো পরাস্ত হয়ে জিযিয়া দিতে শুরু করে' এই আয়াত আলোচ্য আয়াতের রহিতকারী নয়। এখানে তো শিক্ষা দেয়া হয়েছে কেবল অজ্ঞ লোকদেরকে উপেক্ষা করার বিধান। বলা হয়েছে, অজ্ঞ লোকেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেও বিশ্বাসীগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে শান্তিসম্ভাষণের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া, উপেক্ষা করা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, একবার এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসুল! আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলেও আমার কোনো কোনো আত্মীয় আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি । অথচ তারা আমার সঙ্গে করে মন্দ ব্যবহার। আমি এগুলো সহ্য করি নীরবে। রসুল স. বললেন, তুমি যদি এরকমই করে থাকো, তবে তো তুমি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে চলেছো ধূলো। যতক্ষণ তুমি এরকম সদাচরণ বজায় রাখবে, ততক্ষণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গী হিসেবে থাকবে একজন সাহায্যকারী।

এক বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী এই আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং বলতেন, এরকমই ছিলো সাহাবীগণের দিবাকালীন বিশেষত্ব। আর তাঁদের রাত্রিকালীন বিশেষত্ব উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সূরা ফুরক্বান ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

❒ এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদিগের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া;

❒ এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ',

❒ আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে'। হাসান বলেছেন, রাত্রিকালীন ইবাদত যেমন অহমিকার আশংকামুক্ত, প্রদর্শনেচ্ছাহীন, তেমনি কষ্টকর। তাই প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের রাত্রিকালীন ইবাদত বন্দেগীর কথা। তাছাড়া দিবসে রয়েছে অন্যান্য ইবাদতের সুযোগ ও অপরাপর দায়িত্ব। যেমন জেহাদ, শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, পুণ্যবানগণের সাহচর্য ইত্যাদি। কিন্তু রাতের ইবাদত একান্ত অনুরাগরঞ্জিত, গোপনীয়তামণ্ডিত।

'সুজ্জাদান' অর্থ সেজদাবনত হয়ে। শব্দটি 'সাজ্বেদুন' এর বহুবচন। যেমন 'ক্বিয়ামান' বহুবচন 'ক্বায়িমুন' এর। 'ক্বিয়ামান' অর্থ দণ্ডায়মান হয়ে। শব্দটি একটি মূল শব্দ। এটা কর্তৃকারক। রাতের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের নেতৃবর্গ হবে কোরআন বহনকারী (হাফেজে কোরআন) এবং রাতে নামাজ আদায়কারী। বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে নিশীথের নামাজ। আহমদ।

হজরত আবু উমামা বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা রাত্রিকালীন দণ্ডায়মানতায় অভ্যস্ত হয়ো। কেননা এমতো অভ্যাস ছিলো পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবানদের। রাতের নামাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্যদায়ক, পাপের ক্ষতিপূরক এবং ভবিষ্যতের পাপাশংকার প্রতিরোধক। তিরমিজি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের লোকের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ প্রীত হন— ১. গভীর নিশীথে জাগ্রত হয়ে নামাজ পাঠকারী ২. কাতারবদ্ধ হয়ে নামাজ পাঠকারী ৩. শত্রুর বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে সংগ্রামকারী। বাগবী।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পর দুই রাকাত অথবা ততোধিক নামাজ পাঠ করে, সে যেনো সারারাত্রি থাকে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে সে যেনো দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়ে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। মুসলিম।

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত করো', একথার অর্থ— ওই সকল বিশ্বাসীরা সূচারুরূপে ইবাদত বন্দেগী সম্পাদন ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকেন এবং এই মর্মে প্রার্থনা করেন যে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমিতো চির অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার চিরমুখাপেক্ষী। আমরা তো আমাদের আমলের উপরে নির্ভরশীল নই। তোমার দয়ার উপরেই আমাদের সতত নির্ভরতা। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, রক্ষা করো তোমার অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে, বিশেষতঃ দোজখের শাস্তি থেকে।

হজরত আলী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের জনৈক নবীর নিকটে একবার আল্লাহ্পাক এই মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, তোমার উম্মতের পুণ্যবানদেরকে বলে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভরশীল না হয়। কেননা মহাবিচারের দিবসে আমি যাকে খুশী তাকে শাস্তি দিব। আর তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত না করে (আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হয়)। কেননা সেদিন আমি যাকে খুশী তাকে ক্ষমা করে দিব। আবু নাঈম।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্না আ'জাবাহা কানা গরামা' (জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ)। 'গরামা' অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত, দেউলিয়া। ঋণগ্রস্তকে গরীম' বলা হয় একারণেই। বাগবী লিখেছেন, 'গরাম' অর্থ কঠোর হস্তে দমনকারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ধ্বংস, বিনাশ। এরকমও বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন অত্যধিক বিপদ মুসিবতে পতিত হয় তখন তাকে বলে গরাম।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, মানুষের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ। কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তা লংঘন করে। তাই আল্লাহ্পাক তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন কঠোর শাস্তি। জাহান্নামই হবে তাদের সার্বক্ষণিক আবাস। হাসান বলেছেন, প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি একসময় বিপদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামীরা কখনোই পৃথক হতে পারবে না জাহান্নাম থেকে।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট'। একথার অর্থ— জাহান্নামের আশ্রয় ও বসবাস সর্বাপেক্ষা অধিক অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট। উল্লেখ্য, এখানে 'মুসতাক্বররা' (আশ্রয়) এবং 'মুকাম' (বসতি) শব্দ দু'টো ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। কারণ দু'টো শব্দই মূল শব্দ।

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

❐ এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন তাহারা অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।

❐ এবং তাহারা আল্লাহের সহিত কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না, আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যাহারা এইগুলি করে তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অমিত ব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না'। এখানে 'লাম ইউস্‌রিফু' অর্থ অমিত ব্যয়, পাপ পথে খরচ, অত্যল্প হলেও। আর 'ইক্‌তার' অর্থ কার্পণ্য, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হওয়া। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে জুরাইজ। হাসান আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পথে যেমন ব্যয় করে না, তেমনি কুণ্ঠিত হয় না আল্লাহ্‌র অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ব্যয় করতে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়কে বলে অপব্যয়, যা সম্পদবিনষ্টির নামান্তর। আর প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করাকে বলে কার্পণ্য। ইব্রাহিম আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এভাবে— তারা অন্নহীনকে রাখেনা অভুক্ত এবং বস্ত্রহীন রাখেনা বস্ত্রবিবর্জিতদেরকে। আবার এতো অধিক ব্যয়ও করে না, যাতে করে জনসমক্ষে হয়ে যায় অপচয়ক।

আমি বলি, শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কেননা বৈধ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও শরিয়তের সীমা অতিক্রম অপচয়ের পর্যায়ভূত। এরকম কর্মও নিষিদ্ধ ও পাপ। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'ইন্‌নাল মুবাজ্‌জিরীনা কানু ইখওয়ানাশ্ শায়াত্বীনি ওয়া কানাশ্ শায়ত্বানু লিরব্বিহী কাফুরা (নিশ্চয় অমিতব্যয়ীরা শয়তানের দোসর। আর শয়তান তার পালনকর্তায় অবিশ্বাসী)। সুতরাং শরিয়তের নির্দেশ এই যে, নিরন্ন ও নির্বস্ত্র মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় অত্যাবশ্যক, এমতোক্ষেত্রে কৃপণতা নিষিদ্ধ। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়ও তেমনি অসিদ্ধ।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতের আমল পরিপূর্ণরূপে দৃশ্যমান হতো সাহাবীগণের জীবনযাপনে। তাঁরা ভোজনবিলাসী যেমন ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি আকৃষ্ট। তাঁরা অন্নগ্রহণ করতেন ইবাদতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরতেন আবরণীয় অঙ্গ ঢেকে রাখা এবং শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, এটাও অপচয় যে, মানুষের যা অভিরুচি তাই ক্রয় করবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে'। এখানে 'ক্বওয়ামান' অর্থ মধ্যবর্তী পন্থা। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী দুই অতিরিক্ততার মধ্যবর্তী পরিমিতি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সর্ববৃহৎ পাপ কোনটি? তিনি স. বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ধারণা করা, অথচ আল্লাহ্‌ই তোমার একমাত্র সৃজক। আমি বললাম, তারপর? তিনি স. জবাব দিলেন, এই ভয়ে সন্তান বধ করা যে, সে তোমার অন্নে অংশগ্রহণ করবে। আমি বললাম, তারপর। তিনি স. বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার। উল্লেখ্য, রসুল স. এর এমতো বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৬৮) তাই বলা হয়েছে— 'এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো ইলাহ্‌কে শরীক করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না'। এখানে 'বিল হাক্কি' অর্থ সত্য পন্থায়, যথার্থ কারণসহ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— এবং তারা আল্লাহ্‌র অংশীদাররূপে অন্য কারো অস্তিত্ব যেমন স্বীকার করে না, তেমনি শরিয়তসম্মত কারণ (কেসাস, সঙ্গেসার ইত্যাদি) ব্যতিরেকে কারো জীবন সংহার করে না এবং বিরত থাকে অবৈধ যৌনচরিতার্থতা থেকে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সাহাবীগণের ইবাদত-বন্দেগীর আলোচনা ইতিবাচক বাক্যে। আর আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে তাঁদের পাপাচরণবিমুখতার বিবরণ নেতিবাচক বাক্যে। যারা আনুগত্যের ভিত্তিমূলের রঙে রঞ্জিত, পাপ প্রবণতা থেকে বিমুক্ত; তারাই তো পরিপূর্ণ পুরুষ। শেষ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে— 'যারা এগুলো করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে'। একথার অর্থ— যারা সাহাবীগণের মতো ইবাদতপ্রিয়, পুণ্যকর্মপ্রেমিক এবং শিরিক, অবৈধ হত্যা ও ব্যভিচারিতা থেকে মুক্ত নয়, তারাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এমতো অবাধ্যতার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত।

এখানে 'আছামা' অর্থ শাস্তি, বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম বলেছেন আবু উবায়দাও। আর মুজাহিদ বলেছেন, 'আছামা' হচ্ছে জাহান্নামের একটি আগ্নেয় উপত্যকার নাম। বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ বলেছেন, জাহান্নামের দু'টি কুপের নাম 'গাই' ও 'আছাম'। সেখানে গিয়ে জমা হবে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ ও রক্ত।

আমি বলি, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, জাহান্নামের একটি জ্বলন্ত উপত্যকার নাম 'আছাম'। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, এরকম মন্তব্য করেছে সুফিয়ান সওরীও।

ইবনে জারীর, তিবরানী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দশ আউকিয়া ওজনের কোনো পাথর দোজখের তীর থেকে ভিতরে ফেলে দিলে তা সত্তর বছর পর গিয়ে পৌঁছবে গাই ও আছামে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! গাই ও আছাম কী? তিনি স. বললেন, জাহান্নামের তলদেশের দু'টি স্রোতধারা। সেখানে জমা হবে নারকীদের গলিত পুঁজ ও রুধির ধারা। এ দু'টোর উল্লেখ রয়েছে এক আয়াতে এভাবে—'ফাসাওফা ইয়ালক্বাওনা গাইয়ান' এবং অন্য আয়াতে— 'ওয়া মাঁইঁইয়াফয়াল জালিকা ইয়ালক্বা আছামা'।

সূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا

❒ কিয়ামতের দিন উহাদিগের শাস্তি বর্ধিত করা হইবে এবং সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়;

❒ তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ উহাদিগের পাপ ক্ষয় করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সেই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহের অভিমুখী হয়।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেয়া হবে দ্বিগুণ শাস্তি। সেখানে তারা পতিত হবে চরম অবমাননার মধ্যে। তাদের ওই অবমাননা ও শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আর যারা এখন এই পৃথিবীতে সর্বান্তঃকরণে তওবা করবে, ঈমান আনবে, সৎকর্মপরায়ণ হবে, আল্লাহ্ তাদের

পাপসমূহ মোচন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াপরবশ। বিশুদ্ধ তওবাকারী ও সৎকর্মপরায়ণেরাই হয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র পথের অভিযাত্রী।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিছুসংখ্যক মুশরিক ছিলো মহাপাপী। হত্যা ও ব্যভিচারে তারা করেছিলো সীমালংঘন। একদিন তারা রসুল স.-এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনার আহবান অত্যুত্তম। কিন্তু আমরা যে মহাপাপী। আপনার ধর্মে কি আমাদের পাপমোচনের ব্যবস্থা আছে? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৬৮ সংখ্যক আয়াতের 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' থেকে ৭০ সংখ্যক আয়াতের 'তারা নয়, যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে' পর্যন্ত।

হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, এখানে 'তওবা' অর্থ পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং 'আমানা' অর্থ আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। উল্লেখ্য, ৬৭ সংখ্যক আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী প্রমুখ বর্ণনা করেন, 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহ্কে শরীক করে না' যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কার মুশরিকেরা বলে, আমরা এতদিন ধরে দেব-দেবীদের পূজা অর্চনা করেছি, অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়েছি অনেক। তদুপরি করেছি অজস্র ব্যভিচার। এমতাবস্থায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের পরিণতি কী হবে? তাদের এমতো জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ৭০ সংখ্যক আয়াতটি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সময়ে দুই বৎসর যাবত আলোচ্য সুরার ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত পাঠ করে যাচ্ছিলাম। তারপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৭০ ও ৭১ সংখ্যক আয়াত এবং সূরা ফাতাহ্ এর ১ম ও ২য় আয়াত। তিনি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। আমি আগে কখনো তাঁকে এতো আনন্দিত দেখিনি।

একটি সন্দেহঃ ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় উপস্থাপিত হয় ব্যক্তিরিক্তের সাথে। আর এখানে লক্ষ করা যায় ব্যতিক্রম বিশিষ্ট বিষয় ও ব্যক্তিরিক্তের মধ্যে রয়েছে দুই বৎসরের ব্যবধান যা অসঙ্গত। তাহলে একথা কী করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, বর্ণিত ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পর অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতটি?

সন্দেহের নিরসনঃ আমরা বলি, প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো কেবল ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াত ব্যতিক্রম ছাড়াই। দুই বছর পর পুনরায় আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে ৭০ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত একত্রে। তাই বলা যেতে পারে, পরে অবতীর্ণ

৬৮, ৬৯ ও ৭০ সংখ্যক আয়াতত্রয়ের সঙ্গে পূর্বে অবতীর্ণ ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে একযোগে। তাই ধরে নেয়া যায় বিষয়গত সুপরিমিতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় রহিত।

অতিরিক্ত সন্দেহঃ ফেকাহ্ শাস্ত্রের এই রীতিটি সুবিদিত যে, বিধান রহিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না। আর আলোচ্য ত্রয়ী আয়াত হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমূলক। এগুলোতে কোনো বিধানের উল্লেখ নেই। তাহলে এখানে রহিত হওয়ার প্রসঙ্গটি প্রশ্রয় পায় কীভাবে?

সন্দেহের অপনোদনঃ বিজ্ঞপ্তি রহিত হয় না, একথা ঠিক। কারণ এতে করে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের বিজ্ঞপ্তিটি ছিলো মিথ্যা। আর আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে মিথ্যার কোনো সংস্রবই থাকতে পারে না। কিন্তু যে বিজ্ঞপ্তি শাস্তিমূলক, সে বিজ্ঞপ্তি রহিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরস্বাধীন ও চিরঅমুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর শাস্তি রহিত করতে পারেন। আর ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক আয়াতে ছিলো শাস্তির বিজ্ঞপ্তি। পরে আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে ৭০ সংখ্যক আয়াত যোগ করে শাস্তি ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির উপায় বলে দেয়া হয়েছে মাত্র। আর এরকম হওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে সিদ্ধ। অবশ্য বিভ্রান্ত মুতাজিলাদের অভিমত এর বিপরীত।

এরপর এসেছে 'আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা'। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন—তওবা করার পর আল্লাহ্ তাদের পূর্বের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন তাদের পরবর্তী সময়ের পুণ্যসমূহ। অথবা—পাপকর্ম করার যে শক্তি তাদের মধ্যে ছিলো, তওবা করার পর আল্লাহ্তায়ালা তাদের সে শক্তিকে পরিণত করে দিবেন পুণ্য অর্জনকারী শক্তিতে। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ, ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, জুহাক ও সুদ্দী। একথার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, তওবাকারী লাভ করে শিরিকের বদলে ইমান, পাপের বদলে পুণ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসী হত্যার বদলে অবিশ্বাসী হত্যার সুযোগ এবং ব্যভিচারের বদলে পবিত্র দাম্পত্যজীবন।

কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আখেরাতে তওবাকারীদের পূর্বের পাপপুঞ্জকে পরিণত করে দিবেন পুণ্যে। এরকম বলেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মাকহুল, জননী আয়েশা, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত সালমান ফারসী। হজরত আবু জরের এক বর্ণনাতেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের হিসাব গ্রহণকালে তার সামনে আনা হবে তার ক্ষুদ্র

পাপসমূহকে। আর বৃহৎপাপসমূহকে করা হবে গোপন। সে তার ক্ষুদ্র পাপসমূহের কথা স্বীকার করবে আর আশংকা করবে, এই বুঝি বড় পাপগুলো সামনে আনা হচ্ছে। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত দেয়া হবে, এর পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দেয়া হোক, তখন সে বলে উঠবে, আমার তো আরো পাপ রয়েছে, সেগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে রসুল স. এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, উন্মোচিত হলো তার অধিকাংশ দন্ত। মুসলিম।

হজরত সালমান ফারসী থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, শেষ বিচারের দিনে এক লোককে তাঁর আমলনামা দেয়া হবে। আমলনামা পড়তে শুরু করলেই সে হয়ে পড়বে বিষণ্ণ। কিন্তু পড়তে পড়তে শেষের দিকে সে দেখবে অজস্র পুণ্য। সবিস্ময়ে আরো দেখবে আগের লেখা পাপগুলোও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে পুণ্যে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহা বিচারের দিবসে আল্লাহ্ এমন কিছু লোককেও তাঁর ক্ষমার অন্তর্ভূত করবেন, যারা ধারণা করতো তাদের পাপ অসংখ্য। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল, ওই সকল লোক কারা? তিনি স. বললেন, যাদের পাপ পরিবর্তিত করা হবে পুণ্যে।

একটি সন্দেহঃ পাপ আল্লাহ্র অপছন্দ, আর পছন্দ পুণ্য। তাহলে পাপকে তিনি পুণ্যে পরিণত করতে পারেন কীভাবে? অপছন্দনীয় কোনো কিছু কি গ্রহণ করার চিন্তা করা যায়?

সন্দেহভঞ্জনঃ এই সন্দেহটি ভঞ্জন করা যেতে পারে দু'ভাবে। যেমন—১, আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ বা তকদীর অনুসারে আল্লাহ্র কোনো পুণ্যবান বান্দার দ্বারা পাপ কর্ম সংঘটিত হলে তিনি হয়ে যান লজ্জিত, অনুতপ্ত, মনে করেন তাঁর মতো নিকৃষ্ট কেউ নয়। তখন আল্লাহ্র ভয়ে শুরু করেন রোদন এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন মহান আল্লাহ্ সকাশে। পরিশেষে তাঁর উপরে এমন রহমত বর্ষিত হয় যা কখনোই বর্ষিত হতো না, যদি তিনি পাপ না করতেন। এভাবে দেখা যায়, যে পাপ ছিলো শাস্তির কারণ, বিশুদ্ধ তওবার পর সেই পাপই হয়ে যায় অভাবিত পুণ্য। এক হাদিসে তাই বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, তোমরা পাপ না করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উঠিয়ে নিতেন, তার বদলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতেন এমন সৃষ্টি যারা পাপ করতো, তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

রসুল স. আরো বলেছেন, মা'জ ইবনে মালেকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। সে খাঁটি তওবাকারী। তার তওবা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও তা

তাদের পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, হজরত মা'জ ছিলেন একজন সাহাবী। তকদীরের নির্ধারণানুসারে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো ব্যভিচার। সে কারণে অনুতাপে জর্জরিত হয়ে তিনি রসুল স. এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করেন এবং চেয়ে নেন শরিয়তের শাস্তি।

গামেদ গোত্রীয় এক রমনীও ব্যভিচার করার পর অনুতাপে দগ্ধীভূত হয়ে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে পবিত্র করুন। রসুল স. তাঁর উপরে প্রয়োগ করেছিলেন সঙ্গেসার। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ তাঁর সম্পর্কে অনুত্তম মন্তব্য করলে তিনি স. বলেছিলেন, খালেদ! চুপ করো। শপথ ওই সত্তার যার অধিকারে আমার জীবন, মেয়েটি এমন তওবা করেছে, তা কোনো মাকস্ওয়ালা করলেও ক্ষমা পেয়ে যাবে (মাকস ওই অবৈধ কর, যা সরকারী লোকেরা ওশরের বাহানা করে আদায় করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে)। হজরত বুরাইদা থেকে হজরত মা'জ ও গামেদীয় রমণীর ঘটনা দু'টো বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

বর্ণিত ঘটনা দু'টোর মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা ও তওবা প্রদর্শনপ্রবণতা পুণ্যকর্ম অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ্ প্রেমিকেরাও প্রবল প্রেমাতিশয্যবশতঃ কখনো এমন উক্তি করে থাকেন, যা বাহ্যত শরিয়তবিরুদ্ধ। তাঁরা প্রেমসমুদ্রেসতত সন্তরণকারী। তাই তাঁদের মত্ততাসম্ভূত উক্তির পাপকে আল্লাহ্তায়ালা পরিণত করে দেন পুণ্যে। মওলানা রুমীর এক কবিতায় রয়েছে বিষয়টির সুসঙ্গত উদ্ভাস, যা হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেখানে বলা হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে এক লোকের ছোট পাপগুলো আনা হলে বলা হবে, এ লোকের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিণত করে দাও, তখন ওই লোক তার গোপন বড় পাপগুলোর কথা মনে করে বলবে, আমার তো আরো অনেক পাপ রয়েছে। সম্ভবতঃ এ রকম ঘটবে আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে। কারণ তাঁরাই প্রেমদহনে দগ্ধীভূত হয়ে উচ্চারণ করেন এমন উক্তি যা প্রকাশ্যতঃ পাপ। শরিয়তের দৃষ্টিতে ওই সকল পাপ হচ্ছে সগীরা গোনাহ্, কবীরা গোনাহ নয়। ওই পাপগুলোকেই আল্লাহ্পাক পুণ্যে পরিণত করে দেন। আর কবীরা গোনাহগুলোকে রাখেন গোপনে এবং গোপনে গোপনেই তা মাফ করে দেন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র বলেই ক্ষমা করে দেন ছোট বড় সকল ধরনের পাপ, তওবার মাধ্যমে, অথবা তওবা ছাড়াই।

আমি বলি, 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ইলাহকে শরীক করে না' আয়াতে (৬৮) ইঙ্গিত করা হয়েছে কল্বের ফানার দিকে। কলবের ফানা সংঘটিত হওয়ার পর মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কল্পনাই করে না। নির্ভরও করে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয়ও তখন থাকে না তার অন্তরে। আল্লাহ্ই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ রকম একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপাস্য। এই আরাধ্য উপাস্যের উপস্থিতিতে অন্য সকলের অস্তিত্ব হয়ে যায় বিলীন। অন্য সকলের মতো সে তখন নিজেকেও মনে করে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অনুল্লেখ্য কোনো প্রতিবিম্ব বা ছায়া।

একটি সন্দেহঃ সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীই তো একথা স্বীকার করে যে আল্লাহ্র অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব। অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব প্রতিবিম্বসম্ভূত। তাহলে একথা বুঝতে আবার কলবের ফানা হওয়ার আবশ্যকতা কী?

সন্দেহের নিরসনঃ আমি বলি, সাধারণ বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস ভাবগত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিত্তিক নয়। তাই দেখা যায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি তাদের লোভ ও ভয়ের উদ্রেক হয়। সেকারণেই বুঝতে হবে, সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের (৬৮) 'আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না' কথাটির মধ্যে রয়েছে নফসের ফানা হওয়ার ইঙ্গিত। 'নাফসুন আম্মারাতুন বিস্সু' (পাপের প্রতি প্ররোচনাপ্রদায়ক প্রবৃত্তি) যখন ফানা বা বিলীন হয় তখন লাভ হয় প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নফসে মুত্মাইন্না)। এই প্রশান্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে পাপপ্রবণতার সম্পর্ক আর থাকেই না। সে হয়ে যায় তখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের পূর্ণ অনুগত। সুতরাং বুঝতে হবে ৬৩ সংখ্যক আয়াত থেকে এ পর্যন্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে প্রশান্ত প্রবৃত্তিধারী প্রকৃত বিশ্বাসীগণের অর্থাৎ সাহাবীগণের। সাধারণ বিশ্বাসীরা এ প্রসঙ্গের অন্তর্ভূত নয়। অবশ্য পরোক্ষভাবে সকল বিশ্বাসীই এ প্রসঙ্গের অধীন।

এর পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে—'যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে-ই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়'। একথার অর্থ— যে লোক লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে শিরিক ও অন্যান্য পাপ পরিহারপূর্বক আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, জীবনকে করে আল্লাহ্র আনুগত্যমণ্ডিত ও সৎকর্মশোভিত, সে-ই পায় আল্লাহ্র ক্ষমা। তার পূর্বোক্ত পাপকেই আল্লাহ্ পরিবর্তিত করে দেন পুণ্যে। কারণ সে হয় তখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারী।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানকার 'মাতাবান' (আল্লাহ্র অভিমুখী) কথাটিতে 'তানবীন' সংযুক্ত হয়েছে সম্মানার্থে, তওবাকারীদের প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে,

তওবাকারীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রিয় এবং তাঁর দয়ায় সম্মানার্হ। তাই তাদের তওবা পাপমোচক এবং পুণ্যপ্রদায়ক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়ার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পূর্বের আয়াতেও তওবার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত তওবা ও আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত তওবা এক প্রকারের নয়। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে— শিরিক, হত্যা ও ব্যভিচারবিমুক্ত যে ব্যক্তি ইমান আনয়নের পর সৎকর্মমগ্ন হয়, তার তওবা ওই ব্যক্তির তওবা অপেক্ষা উত্তম যার তওবাপূর্ব জীবন ছিলো পাপমগ্ন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত তওবা হবে প্রতিদান। আর শেষোক্তটি সম্মান।

আমি বলি, পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে ওই সকল তওবাকারীকে যাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রেমোন্মত্ততাপ্রভাবিত, প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় এমন উক্তি, যা বাহ্যত শরিয়তবিরুদ্ধ। আল্লাহ্ তাদের ওই সকল অপরাধকে পরিণত করে দেন পুণ্যে। আর আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সচেতন আল্লাহ্‌প্রেমিকদের কথা, সকল অবস্থায় যারা থাকেন সতর্ক ও চৈতন্যময়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই সর্বোত্তম। রসুল স. এর সম্মানিত সহচরবৃন্দ এরকমই ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রভাবই যুগে যুগে অনুসৃত হয়ে চলেছে নকশবন্দিয়া তরিকায়।

সূরা ফুরক্বানঃ আয়াত ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ
إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِيْنَ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۝ أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ
فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

❐ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার-ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে উহা পরিহার করিয়া চলে

❐ যাহারা, তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না,

❒ যাহারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে আমাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদিগকে সাবধানীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর,'

❒ তাহাদিগকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

❒ সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট!

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না'। এখানে 'যূর' অর্থ মিথ্যা সাক্ষ্য। বাগবী লিখেছেন, জুহাক এবং অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে 'যূর' অর্থ শিরিক।

আমি বলি, শব্দটির অর্থ 'শিরিক' ধরলে প্রতিষ্ঠিত হয় পুনরাবৃত্তি। কেননা ৬৮ সংখ্যক আয়াতেও শিরিক নিষিদ্ধ হওয়ার কথা এসেছে। আলী ইবনে তালহা বলেন 'শাহাদাতে যূর' দ্বারা এখানে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার এবং মুখে চুনকালি দিয়ে বাজারে ঘুরিয়ে আনা দরকার।

ইবনে আবী শায়বা আবু খালেদের সূত্রে হাজ্জাজের বরাত দিয়ে মাকহুল ও ওলীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়ায় নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিকটে এইমর্মে লিখিত রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা প্রেরণ করেছিলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে করতে হবে চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তারপর তার মস্তক মুণ্ডন করে মুখে লাগাতে হবে চুনকালি এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখতে হবে দীর্ঘ দিন। আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে মাকহুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছিলেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আ'লা ও ইয়াহ্ইয়া থেকে আহওয়াস্ ইবনে হাকিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আহওয়াস্ তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, হজরত ওমর মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরকম— তার মুখে চুনকালি মাখানো হবে এবং তাকে ঘুরিয়ে আনতে হবে জনসাধারণের সামনে দিয়ে।

হজরত ওমরের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে দিতে হবে সতর্কতামূলক শাস্তি (চল্লিশ বেত্রাঘাত)। তারপর তাকে হাজির করতে হবে জনসমক্ষে যাতে সকলে অবহিত হয়ে যায় যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। ইমাম মালেক লিখেছেন, তাকে উপস্থিত করতে হবে মসজিদে ও বাজারে। ইমামগণ

আরো বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদান কবীরা গোনাহ। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর সহচরবৃন্দের সমাবেশে বললেন, তোমরা কী জানো, সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র সমকক্ষ নির্ধারণ ও মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ। ওই সময় তিনি স. ছিলেন হেলান দেয়া অবস্থায়। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আরো শোনো, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মিথ্যাকথন। তিনি স. একথা উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন বিরতিহীনভাবে। আমরা মনে মনে কামনা করছিলাম, তিনি স. যদি বিরত হতেন।

আল্লাহ্তায়ালা এক আয়াতে শিরিক ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পর্কে একসাথে মিলিয়ে এরশাদ করেছেন— 'ফাজ্তানিবুর রিজ্সা মিনাল আওছানি ওয়াজ্তানিবু ক্বওলায্ যুরি' (তোমরা বিরত থাকো প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে, আরো বিরত থাকো মিথ্যা সাক্ষ্য দান থেকে)। অতএব একথা সত্য যে, মিথ্যাসাক্ষ্যদান মহাপাপ। কিন্তু শরিয়ত এর জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেনি। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে করা হয়েছে কেবল ভীতি প্রদর্শন। তাই এর জন্য প্রচারই যথেষ্ট। বেত্রাঘাত ও বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। এরকম শাস্তির মধ্যে রয়েছে কঠোরতা, যা তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি প্রদানের অন্তরায় তাই তার জন্য প্রয়োজন লঘু শাস্তি, যাতে সে তার অপরাধ স্বীকার করার সাহস পায়। নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচার প্রমাণ করা কঠিন। এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। আর হজরত ওমর কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি (বেত্রাঘাত ইত্যাদি) ছিলো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাভিত্তিক। শরিয়ত রাষ্ট্রনায়ককে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এরকম কঠোর আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে।

কাজী শোরাইহ্ এর অভিমতও ইমাম আবু হানিফার বক্তব্যের মতো। ইমাম মোহাম্মদ তাঁর কিতাবুল আছারে লিখেছেন, কাজী শোরাইহ যদি কোনো মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে ধরতে পারতেন, আর লোকটি যদি হতো নগরবাসী তাহলে তিনি তাকে জনসমক্ষে পাঠিয়ে দিতেন,সঙ্গে পাঠাতেন একজন ঘোষক। তাকে বলতেন, তুমি লোকের কাছে গিয়ে আমার সালাম বোলো, আরো বোলো কাজী সাহেব আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তির মিথ্যাচারের প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনারা তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। অপরাধী যদি স্থানীয় না হয়ে আরব গোত্রভূত হতো, তবে তিনি ঘোষক পাঠাতেন মসজিদে। ইবনে আবী শায়বাও কাজী শোরাইহ্ এর এমতো সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। ইবনে জুরাইজের নিকটে 'যূর' অর্থ সকল প্রকার মিথ্যাচার, কেবল শিরিক নয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না' অর্থ যারা মিথ্যাচর্চার মজলিশে যোগদান করে না। এই তাফসীরের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, কিস্সাকাহিনী ও কবিয়ালদের আসরে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। মুজাহিদ এরকমই বলেছেন। তাঁর উক্তির অর্থ হচ্ছে— যারা অংশীবাদীদের বিভিন্ন পর্ব ও উৎসবে যোগদান করে না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ যারা মৃতব্যক্তির জন্য মাতমকারীদের সমাবেশে যোগ দেয় না। কাতাদা অর্থ করেছেন— যারা অনর্থক ও বাতিল কাজকে সমর্থন ও সাহায্য করে না। মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া অর্থ করেছেন— নির্লজ্জ ও নৃত্যগীতের সমাবেশে যোগদান করে না। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অপসঙ্গীত মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করে অপবিত্রতা, যেমন পানি উৎপন্ন করে শস্য।

বাগবী লিখেছেন, 'যূর' এর প্রকৃত অর্থ কোনো কিছুকে আকর্ষণীয়রূপে উপস্থাপন এবং প্রকৃত অবস্থার বিপরীত রূপ প্রদর্শন। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, এখানে 'যূর' অর্থ মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপ দেয়া, যেনো মনে হয় এটাই সত্য। আমি বলি, 'যূর' এর শাব্দিক অর্থ ঘুরিয়ে দেয়া বা ফিরিয়ে দেয়া। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'তাযাওয়ারু আন্ কাহ্ফিহিম'। মিথ্যার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু সত্য থেকে ফিরিয়ে দেয় মিথ্যা। একারনে অনর্থক বচনকেও 'যূর' বলে।

কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'যূর' অর্থ শিরিক, মিথ্যা, ইহুদী— খৃষ্টানদের পালাপার্বন, মদ্যপানের আসর, নাচ-গানের আসর, বাতিল উপাস্য। আমি বলি, শুধু জননেতা ও শক্তি ছাড়া সকল অর্থই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে'। 'যূর' অর্থ যেমন পাপাচার, তেমনি 'লাগবি' অর্থও পাপাচরণ। আর শুহুদ অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাসান ও কালাবী এরকমই বলেছেন। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে—যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাপের সমাবেশে গমন করে না, যদি ঘটনাক্রমে তারা পাপ-সমাবেশের পাশ দিয়ে যায়, তবে মুখ ফিরিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করে অতি দ্রুত।

মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে—তারা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখনিঃসৃত কষ্টদায়ক বচন শোনেন, তখন ক্ষমা করে দেন ও মুখ ফিরিয়ে নেন। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, মুজাহিদের বক্তব্যও এরকম।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত রহিত হয়েছে পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে। আমি বলি, এই আয়াতের সঙ্গে জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ যুদ্ধ ও হত্যার নির্দেশ জিযিয়া দিতে সম্মত

হলে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু গালিগালাজ ও অন্যান্য কষ্ট প্রদানের কারণে তো কখনোই জেহাদের হুকুম দেয়া হয়নি।

পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে—'যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না'। একথার অর্থ—সদুপদেশ, কোরআনের আয়াত, অথবা তওহীদের প্রকাশ্য-গোপন দলিলসমূহ যখন তাদের সামনে উচ্চারিত অথবা প্রদর্শিত হয়, তখন তারা উৎকর্ণ করে তাদের শ্রুতিকে এবং দৃষ্টিকে করে সজাগ, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করে সত্যকে। অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে অবস্থার নিষিদ্ধতাকে। ক্রিয়ার নিষিদ্ধতাকে বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ তাদের অবস্থা তখন অন্ধ ও বধিরের মতো হয় না। যেমন বলা হয় 'লা ইয়ালক্বানী যায়দুন রকিবান' (জায়েদ আরূঢ় অবস্থায় আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি)।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে—'যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর করো'। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষুদ্রতম বহুবচনবোধক শব্দ।

'আ'ইউনিন' (নয়নপ্রীতিকর)কে বৃহত্তম বহুবচনবোধক 'উয়ুন' বলা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা। আর তাদের সংখ্যা হয় অল্পই। এখানকার 'মিন আযওয়াজ্বিনা এর 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিকা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের পরিবার পরিজনকে পুণ্যবান বানিয়ে দাও, যেনো তাদেরকে দেখে আমাদের নয়ন হয়ে যায় শীতল।

কুরতুবী লিখেছেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র অনুগত দেখা অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুই একজন বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে অধিক নয়নপ্রীতিকর নয়।

হাসান বলেছেন, 'কুররাতুন' শব্দটি একটি মূল শব্দ। তাই শব্দটিকে এখানে একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কুর্রাতুন' এর শাব্দিক অর্থ ঠাণ্ডা, শীতল, উষ্ণতার বিপরীত। আরবদেশ গ্রীষ্মকালপ্রভাবিত। তাই আরববাসীরা শীতলতাপ্রেমিক। তাঁরা আরামদায়ক পরিস্থিতিকে বলেন 'চোখের শান্তি'। আর তপ্ত চক্ষু বলেন অশান্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াকে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, শান্তি ও আনন্দের অশ্রু শীতল। আর অশান্তির অশ্রু তপ্ত। আজহারী বলেছেন, 'কুররাতুল আইনি' অর্থ কাংখিতজনদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো'। একথার অর্থ তারা আরো প্রার্থনা করে, আমাদেরকে দান করো সতর্কতাশোভিত ও পুণ্যপ্লাবিত বিশুদ্ধ জীবন, যাতে করে বিশুদ্ধ জীবনের

অভিলাষী যারা তাদের জন্য আমরা হই আদর্শস্থানীয়। এখানে ব্যবহৃত 'ইমাম' (আদর্শস্থানীয় বা অগ্রণী) শব্দটি একবচনবোধক। একটি দলের ক্ষেত্রে এরকম একবচন বোধকতার নিয়মটি সুপ্রচল। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—'ছুম্মা ইউখরিজুকুম তিফ্‌লান ফা ইন্‌নাহুম আদুয়্যুলি ইল্‌লা রব্বাল আ'লামীন'.....( )।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইমাম' শব্দটি 'আম্মা' শব্দের ধাতুমূল। যেমন 'সিয়াম' 'ক্বিয়াম' ইত্যাদি। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, কথাটির অর্থ—আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে বানিয়ো বিশুদ্ধাচারীদের নেতা। এরকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন—'ইন্‌না রসুলু রব্বিকা'। এখানেও 'রসুল' এর স্থলে বলা হয়েছে 'রসুল'। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইমাম' 'আম্মুন' এর বহুবচন। যেমন 'সিয়ামুন' বহুবচন 'সায়েমুন' এর। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে—আমাদেরকে করো সাবধানীদের (মুত্তাকীদের) পথের পথিক এবং তাদের আনুগত্যের সংকল্পকারী।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে—'তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত'। বোখারী, মুসলিম ও আহমদ হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে এবং তিরমিজি হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, নিম্নমর্যাদাধারী জন্নাতীরা উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতীদেরকে দেখবে এভাবে, যেভাবে মেঘলা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্ত থেকে পরিদৃষ্ট হয় তারকাপুঞ্জ। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! উর্ধ্বস্তরের ওই জান্নাত তো নবী-রসুলগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউই তো সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না। আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যারা মনেপ্রাণে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীবাহকগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তারাও পৌঁছতে সক্ষম হবে উর্ধ্বস্তরের বেহেশতে। হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, হাকেম, বায়হাকী, হজরত আলী থেকে তিরমিজি, বায়হাকী, হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. একবার বললেন, বেহেশেতের কোনো কোনো বালাখানার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে। সাহাবীগণ বললেন, কারা হবে ওই সকল বালাখানার অধিকারী? তিনি স. বললেন, বিনম্র ব্যক্তিবর্গ, যারা পবিত্র কথা বলে, নিরন্নকে অন্নদান করে এবং রাতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন দণ্ডায়মান হয় নামাজে। হজরত আলী থেকে বর্ণিত হাদিসটি এরকম—রসুল স. তখন বললেন, যারা হবে নম্র ও পবিত্রভাষী, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম

প্রদানকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী এবং গভীর নিশীথে নামাজ পাঠকারী, যখন মানুষ থাকে নিদ্রিত। হজরত আবু মালেক থেকে বর্ণিত হাদিসটি একরম—রসুল স. তখন বললেন, ওই সকল লোক যারা উচ্চারণ করে নম্র ও পবিত্র বচন, রোজা পালন করে নিয়মিতভাবে এবং নামাজ পাঠ করে তখন, যখন মানুষ থাকে নিদ্রাভিভূত।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, আমি কি তোমাদের নিকটে বেহেশতের বালাখানার বিবরণ দিবো না? উপস্থিত সাহাবীবর্গ বললেন, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, সেখানকার কোনো কোনো বালাখানা হবে বিভিন্নপ্রকার মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত। সেগুলো এতো স্বচ্ছ হবে যে, বাইরে থেকে দেখা যাবে ভিতরের ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহ এবং ভিতর থেকে দেখা যাবে বাইরের বিলাসের আয়োজনসম্ভার। সেখানকার নেয়ামতরাজি শ্রুতি ও দৃষ্টির অতীত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই সকল বালাখানার মালিক হবে কে? তিনি স. বললেন, যারা সালামের প্রচলন করে, অভুক্তকে পানাহার করায়, সর্বদা রোজা রাখে এবং এমন সময় নামাজ পাঠ করে যখন মানুষ থাকে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরকম আমল করার শক্তি রাখে কে? তিনি স. বললেন, আমার উম্মত। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতাকে সালাম দেয়, অথবা তার সালামের জবাব দেয়, সে-ই সালামের প্রচলনকারী, যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করায়, সে-ই অভুক্তকে অন্নদানকারী, যে ব্যক্তি রমজান ছাড়া অন্য মাসগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে) রোজা রাখে, সে-ই সর্বদা রোজা পালনকারী এবং সে-ই ইহুদী-খৃষ্টান-অগ্নিউপাসকদের রাতের নিদ্রাকালে জাগ্রত থেকে নামাজ পাঠকারীর মতো, যে এশা ও ফজর নামাজ আদায় করে জামাতের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই হাদিসের সূত্রশৃঙ্খল তেমন শক্তিশালী নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আদী ও বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. সাহাবীগণের এক সমাবেশে একবার বললেন, জান্নাতের কিছুসংখ্যক ভবন হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ। ওই ভবনের অধিকারীরা ভিতরে অবস্থান করলেও অনায়াসে দেখতে পাবে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থাকলেও ভিতরের দৃশ্য তাদের কাছে গোপন থাকবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কারা হবে ওই সকল ভবনের অধিকর্তা? তিনি স.বললেন, যারা নম্র ও পবিত্রবচনধারী, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী, অন্নহীনকে অন্নদানকারী, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক এবং রাতের এমন সময় নামাজ সম্পাদক, যখন সকলে থাকে সুপ্তিমগ্ন। সাহাবীগণ বললেন, হে

আল্লার বাণীবাহক! পবিত্রবচন অর্থ কী? তিনি স. বললেন, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লহু আকবর। এই পবিত্রবচন হাশরপ্রান্তরে এর পাঠকের সামনে পিছনে সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, নিরবচ্ছিন্ন রোজা প্রতিপালনকারী কারা ? তিনি স. বললেন, যারা প্রতি বছর পূর্ণ রমজান রোজা রাখে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! অন্নহীনকে অন্নদানকারী কারা? তিনি স. বললেন, যারা পানাহার করায় তাদের আপনাপন পরিবার পরিজনকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিসম্ভাষণ প্রচলক তবে কারা? তিনি স. বললেন, যারা তাদের মুসলমান ভ্রাতার সাক্ষাৎ পেলে সালাম বিনিময় করে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, আর মানুষের সুপ্তিমগ্ন অবস্থার নামাজ তাহলে কোনটি? তিনি স. বললেন, এশার নামাজ।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে সুপরিণতসূত্রে হাকেম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, বেহেশতের বালাখানা হবে লাল ইয়াকুত, সবুজ জবরজদ ও শাদা মোতির দ্বারা নির্মিত। সেগুলো হবে বাতায়নবিমুক্ত ও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেহেতু তারা ছিলো ধৈর্যশীল'। একথার অর্থ— তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে একারণে যে, তারা পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকল বিরোধিতায় অবলম্বন করেছে ধৈর্য, প্রবৃত্তির শত প্রলোভনেও প্রদর্শন করেছে সংযম এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিয়মিত সম্পাদন করেছে ইবাদত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। একথার অর্থ— বালাখানার মধ্যে ফেরেশতারা তাদেরকে জানাবে সাদর অভ্যর্থনা, জানাবে অভিবাদন ও শান্তিসম্ভাষণ। অর্থাৎ তারা ওই জান্নাতবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা জানাবে আল্লাহ্ সকাশে। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ তারা একে অপরকে করবে অভিবাদন বিনিময় এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পতিত হবে শান্তির বিরতিহীন বর্ষণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার, আহমদ ও ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে প্রথমে ওই সকল দরিদ্র মুহাজির জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয় সীমান্ত। অথচ তারা পৃথিবী ত্যাগ করে দারিদ্রজর্জরিত হয়ে, নিজেদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে বুকে ধারণ করে। আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিবেন, যাও তাদেরকে সালাম জানাও। ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা আকাশবাসীরা আপনার নির্বাচিত ও নৈকট্যভাজন। অথচ আমাদের উপরে

নির্দেশ করা হচ্ছে মাটির মানুষকে সালাম প্রদান করার। আল্লাহ্ বলবেন, ওরা যে ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে ইবাদত করেছিলো কেবল আমার উদ্দেশ্যে, আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে, তাদের দ্বারা রক্ষা করা হয়েছিলো ইসলামের সীমানা। অন্যান্যরা রক্ষা পেয়েছিলো তাদের অসিলায়। অথচ তারা পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ করেছিলো তাদের কামনা-বাসনা ও অন্যান্য প্রয়োজন অপরিপূরিত রেখে। ফেরেশতারা তখন তাদের নিকটে গিয়ে বলবে, সালামুন আ'লাইকুম বিমা সবারতুম ফা নি'মা উকবাদ্দার। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'তাহিয়্যাত' ও 'সালাম' অর্থ চিরনিরাপত্তা, যা তারা পাবে তাদের মহাসফলতার পুরস্কাররূপে।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতো উৎকৃষ্ট'। একথার অর্থ— জান্নাতই হবে তাদের চিরকালীন আবাস। ওই আবাস ও আশ্রয়স্থলই সর্বোৎকৃষ্ট।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা এবার চিরনিরোগ, আর কখনো তোমরা পীড়িত হবে না, তোমাদের এই জীবন চিরায়ত। সুতরাং তোমরা এখানে থাকবে চিরযুবক। কখনো সাক্ষাৎ পাবে না বার্ধক্যের। মৃত্যুও তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না আর কোনোদিন। তোমাদের সকল দুঃখ কষ্টের এবার হলো চির অবসান।

সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭৭

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

❒ বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা দ্বীনকে অস্বীকার করিয়াছ, ফলে নামিয়া আসিবে অনিবার্য শাস্তি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— ' বলো, তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না'। এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আ'বাআতুল জাইশ' থেকে। এর অর্থ আমি সৈন্যদেরকে সাজিয়ে দিয়েছি, প্রস্তুত করেছি। নেহিয়া গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা না করো, তবে কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'দুয়াউকুম' অর্থ ইবাদত অথবা ঈমান। কোনো কোনো আলেম

বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে কীভাবে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে? তোমরা ইমান গ্রহণ করেছো বলেই তো এখন তিনি তোমাদের জান্নাতগমন সুগম করেছেন। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানকার 'ইয়া'বাউ' শব্দটি এসেছে 'আবা' থেকে। 'আবা' অর্থ ভার বা ওজন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যদি তোমাদের পক্ষ থেকে আনুগত্য ও ইবাদত না থাকে তবে আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কী ওজন বা গুরুত্ব থাকবে। আল্লাহ্ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদা তো কেবল আনুগত্য ও আল্লাহ্পরিচিতির মাধ্যমে হয়। নতুবা তোমরা তো চতুষ্পদ জন্তুতুল্য। বরং তার চেয়েও অধম। অথবা বক্তব্যটি হবে এরকম— যদি তিনি তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান না জানাতেন এবং তোমরা এই আহ্বান গ্রহণ না করতে, তবে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের তো কোনো মূল্যই থাকতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মা ইয়াবাউ বিকুম' অর্থ তোমাদেরকে সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কী ছিলো, যদি না এতে তোমাদের আনুগত্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্য না থাকতো? অর্থাৎ তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। অন্য এক আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলেই দেয়া হয়েছে যে— ' মা খলাক্বতুল জ্বিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন' (আমি জ্বিন ও মানুষকে ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি)। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের উক্তি এরকমই।

কেউ কেউ আবার 'মা ইয়া'বাউ বিকুম' এর অর্থ করেছেন মা ইয়ুবালীবিকুম অর্থাৎ আল্লাহ্র কী প্রয়োজন রয়েছে তোমাদেরকে ক্ষমা করার, যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকো। আর তোমাদের শাস্তি দিয়েই বা তিনি কী করবেন, যদি তোমরা শিরিক না করো? এমতো ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে রয়েছে অন্য একটি আয়াত— 'মা ইয়াসআলুল্লহ বি আজাবিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আমানতুম'। কেউ কেউ আবার আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তির কী পরোয়া করবেন, যদি তোমরা বিপদমুক্তির জন্য তাঁকে না ডাকো? এমতো ব্যাখ্যার সমর্থনে রয়েছে এই আয়াত— 'ফাইজা রকিবু ফিল ফুলকি দাআউল্লাহা মুখলিসীনা লাহুদ্দীন'। কোনো কোনো আলেম আবার বক্তব্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি, তাঁর কাছে তোমাদের কোনো মূল্যও নেই, তিনি তোমাদেরকে কেবল এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, এতে করে লাভবান হবে তো তোমরাই। ক্ষমাপ্রার্থনা করলে

পাবে ক্ষমা, পাপের শাস্তি থেকে পাবে পরিত্রাণ। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, এখানকার 'মা ইয়াবাউ' এর 'মা' নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা দ্বীনকে অস্বীকার করেছো, ফলে নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মাধ্যমে তোমাদেরকে দিয়েছেন তাঁর এককত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর দাসত্বের দাওয়াত। কিন্তু তোমরা তাঁর রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছো, তাহলে জান্নাতে প্রবেশের অবলম্বন তোমাদের আর রইলো কোথায়? অথবা অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা যেহেতু তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছো, সেহেতু তাঁর দরবারে তোমাদের আর মূল্যই বা কী? অথবা— প্রত্যাখ্যানের পরে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি পরোয়াই বা করবেন কেনো? অতএব তোমাদের পরিণতি এই যে, তোমরা রইবে প্রত্যাখ্যানপ্রবণতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। তওবার তওফিক তোমরা পাবেই না। পাবে কেবল তোমাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল, অবধারিত শাস্তি। অথবা কথাটির অর্থ হবে— মিথ্যাচারিতার শাস্তি তোমাদের সঙ্গে থাকবে অবিচ্ছিন্নরূপে। অথবা— মিথ্যাচারের প্রতিক্রিয়া তোমাদের সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। একারণেই অধোমুখী অবস্থায় তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'লিযামান' শব্দটির অর্থ করেছেন মৃত্যু। আবু উবায়দা অর্থ করেছেন ধ্বংস। ইবনে যায়েদ অর্থ করেছেন যুদ্ধ। আর ইবনে জারীর বলেছেন, কথাটির অর্থ— চিরস্থায়ী শাস্তি, যা ক্রমাগত ধাবিত হবে একজন থেকে আরেক জনের দিকে।

বাগবী লিখেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধকে। ওই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো অংশীবাদীদের সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিপতিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী আযাবে।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন ঘটিতব্য পাঁচটি বিষয় ইতোমধ্যে ঘটেই গিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— ১. আকাশের ধুম্র (যা দৃশ্যমান হয়েছে আকাশে) ২. চন্দ্র (যা হয়েছে দ্বিখণ্ডিত) ৩. রুম বিজয়ী হয়েছে পারস্যবাসীদের উপর। ৪. 'বাত্‌শা (বদর যুদ্ধের বন্দীত্ব) ও ৫. 'লিযাম' (বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের নিহত হওয়া)। কেউ কেউ বলেছেন, 'লিযামান' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে পরকালের শাস্তিকে। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌র অপার দয়া ও সমর্থনে সুরা ফুরক্বানের তাফসীর শেষ হলো আজ ৬ই সফর ১২৫০ হিজরী সনে।

সূরা শুআরা

সূরা শুআরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল শেষের চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এই সুরার আয়াতের সংখ্যা ২২৭।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন রসুল স. বলেছেন, সুরা ত্ব হা এবং ত্ব-সীন-মীম (সুরা শুআরা) আর 'হামীম' যুক্ত সুরা সমূহ আমাকে দেয়া হয়েছে রসুল মুসার কিতাবের ফলক থেকে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝

❒ ত্বা, সীন, মীম ।

❒ এইগুলি কিতাবের আয়াত।

❒ উহারা বিশ্বাস করে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হইয়া পড়িবে।

❒ আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারি, ফলে, উহারা নত হইয়া পড়িবে উহার প্রতি।

প্রথমে বলা হয়েছে— ত্ব-সীন-মীম। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' এর তাফসীর করতে আলেমগণ অক্ষম। আলী ইবনে তালহা এবং আলাভীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' হচ্ছে শপথ এবং আল্লাহ্‌র নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে তাঁর এই নামের শপথ করেছেন। কাতাদা বলেছেন, 'ত্ব-সীন-মীম' কোরআনের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। মুজাহিদ বলেছেন, একজন রমণীর নাম। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে আল্লাহ্ কসম করেছেন তাঁর অতুলনীয় শক্তিমত্তার, 'সীনা'র, অর্থাৎ নূরের এবং মহামর্যাদার। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'ত্ব' এর মাধ্যমে এখানে

আল্লাহ্তায়ালা ইঙ্গিত করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার দিকে, 'সীন' দ্বারা নূরের দিকে এবং 'মীম' দ্বারা মহামর্যাদার দিকে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, 'ত্ব-সীন-মীম' বিভিন্ন সুরায় উল্লেখিত হরফে মুকাত্তায়াতের মতো। অর্থাৎ এখানকার 'ত্ব-সীন-মীম' ও বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি, যা চিররহস্যময়। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এর গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আয়াতুল কিতাবিম মুবীন' (এইগুলি কিতাবের আয়াত)। একথার অর্থ— এই কিতাবের আয়াতগুলি স্পষ্ট অথবা স্পষ্টকারী। অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতসমূহ মোজেজারূপে সুপ্রকাশ্য অথবা আল্লাহ্র বিধানাবলী ও হেদায়েতের পথ উন্মুক্তকারী।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তারা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে'। 'লায়া'ল্লাকা বাখিউন্ নাফসাকা' অর্থ মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। যেমন 'বাখাআ'নাফসাহু' অর্থ, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। 'বাখাউ' অর্থ পশ্চাতের একটি শিরা যা স্কন্ধ পর্যন্ত পৌঁছে। জামাখশারী বলেছেন 'বাখা' অর্থ হারাম মগজ ব্যতীত অন্যকিছু। এর প্রকৃত অর্থ পশু জবেহ করার সময় তার গর্দানের একটি শিরায় ছুরি চালিয়ে দেয়া। তারপর পর্যায়ক্রমে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে মুবালাগার (আধিক্যপ্রকাশক) ক্ষেত্রে।

'আল্লা ইয়াকুনু মু'মিনীন' অর্থ তারা বিশ্বাসী হয় না বলে। উল্লেখ্য, রসুল স.কে যখন মক্কার মুশরিকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। রসুল স. এতে করে বড়ই ব্যথিত হন। কারণ তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এক পর্যায়ে তিনি স. একথাও ভাবতে শুরু করেন যে, মক্কাবাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় কিনা। এমতাবস্থায় তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। এখানকার 'লায়া'ল্লা' শব্দটি আশাব্যঞ্জক রহমত বা দয়া অর্থপ্রকাশক । অর্থাৎ এখানে বলে দেয়া হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি আপনার আত্মার উপর দয়াপরবশ হোন। দুরাচারেরা ইমান গ্রহণ করলো না বলে আপনি আপনার বিশুদ্ধতম জীবনকে বিনাশ করবেন কেনো? আমিই তো তাদের ইমান গ্রহণ করাকে পছন্দ করিনি।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি, ফলে, তারা নত হয়ে পড়বে তার প্রতি'। একথার অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করতাম এমন নিদর্শন, যা অবলোকন করে তারা ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। অথবা ইচ্ছা

করলে তাদের উপর অবতীর্ণ করতাম বিপদ-মুসিবত, ফলে ইমান গ্রহণ করা ব্যতিরেকে তাদের আর কোনো উপায়ই থাকতো না।

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এমন নিদর্শন প্রকাশ করতে সক্ষম, যা দেখে কোনো লোকের পক্ষেই ইমানদার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারেন, যা দেখে সকলেই বাধ্য হয়ে ইমানদার হয়ে যেতো। অবাধ্য বলে আর কেউই পৃথিবীতে থাকতো না।

একটি সন্দেহঃ 'উনুকুন' শব্দের বহুবচন 'আ'নাকুন'। 'উনুকুন' স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। তাই এখানে 'আনাকু' এর পরে 'খদ্বিয়াতান' বসানোই সঙ্গত ছিলো। কিন্তু তা না করে এখানে বহুবচনবোধক ও পুংলিঙ্গবাচক 'খদ্বিয়ী'ন' ব্যবহার করা হলো কেনো?

সন্দেহের নিরসন ঃ ১. পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে ছন্দীয় সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এরকম শব্দ ব্যবহার ঘটেছে। ২. কথাটির প্রকৃতরূপ ছিলো 'ফাজল্লু লাহা খদ্বিয়ীন'। এটাই ছিলো বিশুদ্ধ। তবে এখানে নত হওয়ার অঙ্গকে চিহ্নিত করার জন্য অতিরিক্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'আনাকু'। ৩. এখানে উহ্য রয়েছে মুজাফ বা সম্বন্ধপদ। কথাটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো 'আসহাবুল আনাকু' (স্কন্ধধারী) কিন্তু সম্বোধিত বিষয়কে এখানে করা হয়েছে সম্বন্ধ পদের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ ঘাড় বা স্কন্ধ নত হলে তো স্কন্ধধারীও অবনত হয়ে যাবে। ৪. আখফাশ বলেছেন, এখানকার 'খদিয়ীন' শব্দটি সম্পর্কিত হয়েছে 'আ'নাকুহুম' এর পুংলিঙ্গবাচক ও বহুবচনবোধক সর্বনাম 'হুম' (তারা) এর সঙ্গে। শব্দটি সরাসরি 'আনাকু' এর সঙ্গে জড়িত নয়। ৫. বিনত হওয়া জ্ঞানসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে 'আনাকু'কে জ্ঞানসম্পন্নদের স্থলাভিষিক্ত করে 'খদ্বিয়ীন'কে দেয়া হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বহুবচনের রূপ। ৬. আরববাসীরা স্ত্রীলিঙ্গকে পুংলিঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় পুংলিঙ্গবাচকরূপে। আবার পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করলে পুংলিঙ্গবাচক শব্দকে ধরে নেয় স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথমোক্ত নিয়মটি। ৭. 'উনুকু' দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ শরীর অবনত হওয়াকে। কেবল স্কন্ধ অবনত হওয়াকে নয়। যেমন 'জালিকা বিমা ক্বাদ্দামাত ইয়াদাকা'— এই বাক্যে 'ইয়াদা' (হাত) অর্থ হস্তধারী। আবার 'আলযাম্নাহু ত্বয়ীরুহু ফী উনুক্বিহী'— এখানেও আ'নাকু দ্বারা বুঝানো হয়েছে ব্যক্তিকে। ৮. মুজাহিদ বলেছেন, 'আনাকু' এর প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য

নয়। বরং শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে বড় বড় নেতাদেরকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— 'আকাশ থেকে নিদর্শন নেমে এলে তাদের বড় বড় নেতারা সে নিদর্শনের প্রতি নত হয়ে পড়তো'। ৯. আ'নাক্ব দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে দল সমূহকে। যেমন আরববাসীরা বলেন 'জ্বাআ'ল ক্বওমু উনুক্বন উনুক্বন' (মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে এসেছে)।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

❒ যখনই উহাদিগের নিকট দয়াময়ের কোন নূতন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ উহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহারা যথার্থ শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

❒ উহারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি উহাতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ-উদগত করিয়াছি'

❒ নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়'। এখানে 'জিকরিন' অর্থ উপদেশ। অর্থাৎ কোরআনের কোনো অংশ, যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে আল্লাহ্র স্মরণ। এখানে 'মিন জিকরিন' এর 'মিন' অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং 'মিনার রহমান' (দয়াময়ের) এর 'মিন' হচ্ছে প্রারম্ভিক মিন।

'মুহদাছিন' অর্থ নতুন। অর্থাৎ নতুনরূপে অবতারিত, চিরন্তন হলেও। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন এবং এর মৌলিক শিক্ষা একই। যেমন— আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যের অদ্বিতীয়ত্ব, প্রত্যাদেশ, নবুয়ত, ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, হাশর প্রান্তরের মহাসমাবেশ পুণ্য-পাপের পার্থক্যায়ন ইত্যাদি বিবরণ ভিন্নভাষায় হলেও সকল আসমানী কিতাবে উপস্থাপিত হয়েছে

একইরূপে। এসকল বিবরণের উপর কাল ক্রিয়াশীল নয়। কিন্তু কলোত্তর কালামের রয়েছে কালজ প্রকাশ। তাই পৃথিবীতে তার পূর্বাপরতার বিষয়টিও প্রণিধাননীয়। একারণেই পূর্ববর্তী আকাশী পুস্তিকা ও মহাগ্রন্থের সঙ্গে কালগত ব্যবধান রয়েছে কোরআনের। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'যখনই তাদের নিকট দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে'।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার যাথার্থ শীঘ্রই জানতে পারবে'। একথার অর্থ— যে সদুপদেশ তারা এখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা তার প্রত্যক্ষরূপ তারা দর্শন করতে পারবে অনতিবিলম্বে, বদর যুদ্ধের দিবসে, মৃত্যুকালে অথবা কিয়ামতের সময়।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃকপাত করে না? আমি তাতে কতো উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি'। এখানকার প্রথমোক্ত প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশ করা আল্লাহ্‌র মহাসৃজনের একটি অনবদ্য নিদর্শন। এভাবে আয়াতদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা আমার রসুলের নিকট আল্লাহ্‌র অতুলনীয় এককত্ব, মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ইত্যাদির নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু শতসহস্র নির্দশন তো এই পৃথিবীতেই সতত পরিদৃশ্যমান। যেমন আমিই তো তাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করে চলেছি বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের শতসহস্র উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ। ফুল-ফল-বীজ-অঙ্কুরোদগম-কিশলয় উন্মোচন, বিস্তার-বৃদ্ধি এসকল কিছু কি তাঁর মহাসৃজনের বিস্ময়কর নিদর্শন নয়?

এখানে 'কারীমিন' অর্থ উৎকৃষ্ট। উদ্ভিদরাজি থেকে উদগত হয় মানুষ ও পশুর বিভিন্ন রকমের খাদ্য, প্রস্তুত হয় পীড়ার প্রতিষেধক, কখনো এককভাবে আবার কখনো যুথবদ্ধভাবে। এগুলো আল্লাহ্‌র অপার প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার প্রমাণ। আবার বৃক্ষের মৃত্যু, জন্ম ইত্যাদির মধ্যেও তো রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন।

উল্লেখ্য, এখানে 'কাম' শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সকল উৎকৃষ্ট বৃক্ষকে এবং 'কুললি' দ্বারা বুঝানো হয়েছে বৃক্ষরাজির বিভিন্ন প্রকারকে।

এর পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন'। একথার অর্থ— বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ অথবা একটি বৃক্ষের জন্মরহস্য ও উন্মোচনের কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র সৃজননৈপুণ্যের বহুবিধ নিদর্শন, যা সহজে প্রমাণ করে আল্লাহ্‌র এককত্ব ও প্রজ্ঞাময়তাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়'। একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার আদি-অন্তহীন জ্ঞানে ও সিদ্ধান্তে একথা পূর্বস্থিরীকৃত যে, অধিকাংশ লোক ইমান আনবে না। তাই আল্লাহ্র অলৌকিকত্বের দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত হয়েও তারা থেকে যায় বোধ-বুদ্ধিহীন, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও পথহারা। রয়ে যায় বিশ্বাসবিহীন।

শেষোক্ত আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার প্রভুপালনকর্তা মহাশক্তিধর। যে কোনো মুহূর্তে তিনি আপনার বিরুদ্ধবাদীদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি যে দয়াময়ও। তাই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছেন সাময়িক অবকাশ। অথবা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে— আল্লাহ্তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম, কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং বিশ্বাসীগণের প্রতি তিনি দয়া বর্ষণ করেন অবিশ্রান্তভাবে, কারণ তিনি মহাদয়াপরবশ।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

❑ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও,

❑ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; উহারা কি ভয় করে না?'

❑ তখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে,

❑ 'এবং আমার হৃদয় হতবল হইয়া পড়িবে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও।

❑ 'আমার বিরুদ্ধে তো উহাদিগের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'না কিছুতেই পারিবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া শুনিব।'

❒ অতএব তোমরা ফিরাউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল,

❒ 'সুতরাং আমাদিগের সহিত যাইতে দাও বনি-ইসরাঈলকে।'

কুরায়েশ নেতৃবর্গের বারংবার সত্যপ্রত্যাখ্যান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কারণে রসুলে পাক স. মনোক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এখান থেকে শুরু করা হয়েছে হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের কাহিনী। সত্যের প্রতি আহ্বানের পথ যে কুসমাস্তীর্ণ নয়, পূর্ববর্তী আহ্বানকারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে বিষয়ের প্রতি সর্বশেষ রসুল স. এর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাঁকে উজ্জীবিত করাই আলোচ্য কাহিনী অবতারণার উদ্দেশ্য।

ইতিবৃত্তটি শুরু হয়েছে এভাবে— 'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডেকে বললেন, তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভুপালনকর্তা প্রত্যাদেশ প্রদানের নিমিত্তে নবী মুসাকে ডেকে নিলেন তুর পাহাড়ে। সেখানে একটি দ্যুতিদগ্ধ বৃক্ষের মাধ্যমে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি আমার বার্তাবাহক। মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব এখন থেকে অর্পিত হলো তোমার উপর। সুতরাং প্রথমে তুমি গমন করো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে। তারা লংঘন করেছে সত্যের সীমানা। আশ্রয় করেছে অপবিত্র অংশীবাদিতাকে।

পরের আয়াতে (১১)বলা হয়েছে— 'ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি ভয় করে না'?

ফেরাউনের নির্দেশে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাইল জনতাকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলো। হত্যা করে যাচ্ছিলো তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে। তাই এখানে 'ফেরাউনের নিকট যাও' না বলে বলা হয়েছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও। আর এখানকার 'তারা কি ভয় করে না' প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর অর্থ— ওই সীমালংঘনকারীদের সংযত হওয়া উচিত। আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করা উচিত অংশীবাদিতা ও অত্যাচার। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— হে মুসা! তুমি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো, সংযত হও, ভয় করো আল্লাহ্কে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তখন সে বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'। একথার

অর্থ— তখন মুসা বললো, হে আমার প্রভুপালক! আমিতো ফেরাউনের গৃহেই প্রতিপালিত হয়েছি। তারপর দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী। এতদিন পর তার কাছে রেসালতের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে সে কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্ত। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও'। একথার অর্থ— হজরত মুসা আরো বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তারা আমাকে বিশ্বাস না করলে তো আমি হতোদ্যম হয়ে যাবো। আর আমার রসনা ও বাকশক্তি শানিত নয়। সুতরাং আমার ভ্রাতা হারুনকেও এ কাজে আমার সহচর করে দাও। তাকেও দান করো বার্তাবহনের দায়িত্ব। বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে' অর্থ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বললে তো আমার হৃদয় হয়ে পড়বে সংকুচিত।

বায়যাবী লিখেছেন, 'হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও' হজরত মুসার এমতো বাক্যে দায়িত্বপালনে অনীহা প্রকাশিত হয়নি। বরং তিনটি কারণ ছিলো তাঁর এমতো প্রার্থনার— ১. যৌথ আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মিথ্যার মোকাবিলা ২. অসত্যারোপের ফলে হৃদয়ের সংকোচন। ৩. সত্যের সুষম ও শানিত উপস্থাপনা। কারণ তাঁর জিহ্বা ছিলো জড়তাগ্রস্ত এবং হজরত হারুন ছিলেন বাগ্মী।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে'। একথার অর্থ— আমাকে তো ফেরাউন কিবতী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। উল্লেখ্য, মিসরে অবস্থানকালে হজরত মুসার দ্বারা ফেরাউনের সম্প্রদায়ভূত (কিবতী) নিহত হয়েছিলো। সেকারণেই তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পরে রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে মিসরে গমনের নির্দেশ পেয়ে সেই ঘটনার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ওই হত্যাকাণ্ডটি ছিলো তাঁর অনিচ্ছাকৃত। তাছাড়া ওই কিবতীটিও ছিলো অংশীবাদী ও অত্যাচারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে'। একথার অর্থ— 'হে আমার প্রভুপালক! মৃত্যু ভয়ে আমি ভীত নই। কিন্তু আশংকা করি, ফেরাউন তো কিবতী হত্যার অভিযোগে প্রথমেই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন সত্য ধর্মের আহ্বান কার্য সম্পাদনের কী ব্যবস্থা হবে?

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, না, কিছুতেই পারবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে শুনবো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তখন বললেন, ফেরাউন কিছুতেই তোমার জীবনসংহার করতে পারবে না। কারণ তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার পক্ষ

থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। সুতরাং নির্ভয়ে তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে যাও। তোমাদের সঙ্গে থাকবে আমার সতত উপস্থিতি। আর আমি তোমাদের ও তাদের সকল কথোপকথন শুনবো, কারণ আমি যে সর্বশ্রোতা।

'কাল্লা' অর্থ কক্ষনোই নয়। এ কথার দ্বারা অঙ্গীকার করা হয়েছে হত্যা থেকে জীবন রক্ষার । 'ফাজহাবা' (তোমরা দু'জন যাও) দ্বারা হজরত হারুনকে দোসর বানিয়ে দেয়া হয়েছে হজরত মুসার। যেনো বলা হয়েছে— মুসা! তুমি হত্যার আশঙ্কা কোরো না। তোমার আবেদনের প্রেক্ষিতে সাথে করে নিয়ে যাও তোমার ভাই হারুনকে। ইন্না মাআ'কুম (নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে) বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে আমি তোমাদের সাহায্যকারী। অথবা বলা যায়— তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে আমি অবহিত। আর 'মুস্তামিউ'ন' এর মর্মার্থ তোমাদেরকে বিজয়ী করবো আমি তাদের উপর।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বলো, আমরা তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসুল'। এখানে 'রসুল' অর্থ রেসালাত (বার্তাবহনদায়িত্ব)। শব্দটির অর্থ 'মুরসাল' (প্রেরিত)ও হয়। বায়যাবী লিখেছেন, একারণেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় কখনো একবচন, আবার কখনো দ্বিবচনরূপে। এখানে শব্দটি প্রয়োগিত হয়েছে দ্বিবচন অর্থে। অর্থাৎ আমরা দু'জন আল্লাহ্র রসুল। শব্দটি এখানে এভাবে ব্যবহার করার আর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, ফাউলের শব্দরূপে একবচন দ্বিবচন উভয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত। 'কামুস' প্রণেতা লিখেছেন, এখানে' 'ইন্না রসুলু রব্বিল আ'লামীন' বলার কারণ হচ্ছে, ফাউল ও ফায়ীলের নিয়মে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, বহুবচন সকল ক্ষেত্রের শব্দরূপ একইরকম। আবু উবায়দা বলেছেন, 'রসুল' শব্দের ব্যবহার দুই বা দুইয়ের অধিকের সঙ্গেও হয়। আরববাসীরা বলে, হাজা রসুলী ওয়া ওয়াকিলী (এ হচ্ছে আমার বার্তাবাহক ও প্রতিনিধি)। কোরআন মজীদে ফাউল শব্দরূপের শব্দকে বহুবচন অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন— 'ওয়াহুম লাকুম আদুওউন' (তারা তোমাদের শত্রু)। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা ও হজরত হারুন ছিলেন সহোদরভ্রাতা। তাই দু'জনকে একান্ত বা একক সত্তা ধরে নিয়ে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনার্থক 'রসুল'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রসুল হিসেবে তাঁরা দু'জন ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। তাই দু'জনকে সম্মিলিতভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একবচনের শব্দরূপে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— আমাদের দু'জনের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র রসুল।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমাদের সঙ্গে যেতে দাও বনী ইসরাইলকে'। একথার অর্থ— হে রসুল ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা ফেরাউনকে একথাও

জানাও যে, মুক্ত করে দাও এবার বনী ইসরাইলের দাসত্বের শৃঙ্খল, যেনো তারা আমাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে তাদের পিতৃভূমি সিরিয়ায়। এই বার্তাটি পৌঁছানোর ব্যাপারেও আমরা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, মিসররাজেরা বনী ইসরাইলকে চারশ' বছর ধরে ক্রীতদাসতুল্য করে রেখেছিলো। হজরত মুসার সময়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ছয় লক্ষ আশি হাজার। তুর পর্বতে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর হজরত মুসা মিসর অভিমুখে যাত্রা করলেন। হজরত হারুন তখন ছিলেন মিসরে। তিনিও সেখানে তাঁর রেসালতের শুভবার্তা পেলেন। যথাসময়ে পশমী জোব্বা পরে একটি লাঠি হাতে নিয়ে মিসরে উপস্থিত হলেন হজরত মুসা। ওই লাঠির প্রান্তে ঝুলন্ত ছিলো একটি ঝোলা। ঝোলার মধ্যে ছিলো তাঁর পানাহারের সামগ্রী। স্বগৃহে প্রবেশ করলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন হজরত হারুন। তাঁর সম্মানিতা জননী তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, শিগগির পালাও। মিসররাজ তোমাকে পেলেই হত্যা করে ফেলবে। হজরত মুসা নীরবে শুনলেন মায়ের কথা। এতটুকুও শংকিতও হলেন না তিনি। ভ্রাতাকে বললেন, আমরা দু'জন আল্লাহ্‌র বার্তাবহনকারী। আমাদের প্রতি রয়েছে মিসররাজের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ। ওই রাতেই রসুল ভ্রাতৃদ্বয় গমন করলেন রাজপ্রাসাদে। বহির্দরজায় করাঘাত করতেই প্রহরী চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

এক বর্ণনায় এসেছে, প্রাচীরের উপরে পাহারাদানরত নৈশপ্রহরী তাঁদেরকে দেখে চিৎকার করে বললো, কে তোমরা? হজরত মুসা বললেন, আমরা বিশ্ব-জগতের প্রভুপালনকর্তার বার্তাবাহক। প্রহরী তাঁদের আগমনের সংবাদ প্রেরণ করলো অন্দরমহলে। ফেরাউন বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। রাত শেষ হলো। সকালে সে ডেকে পাঠালো দু'জনকে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক বৎসর পর্যন্ত ফেরাউন তাঁদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। তারপর একদিন বললো, ঠিক আছে, তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক, আমি তাদের সঙ্গে কিছুটা ঠাট্টা-মশকরা করবো। রসুল ভ্রাতৃদ্বয় ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি চিনতে পারলেন হজরত মুসাকে। কারণ তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহেই।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

❐ ফিরাউন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে আমাদিগের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করি নাই যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাও নাই?

❐ 'তুমি তো অপরাধ যাহা করিবার তাহা করিয়াছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।'

❐ মূসা বলিল, 'আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, আমরা কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি যখন তুমি শিশু ছিলে? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাওনি?'

এখানে 'ওয়ালিদ' অর্থ শিশুকালে। উল্লেখ্য, হজরত মুসা ফেরাউনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি শিশুকাল থেকে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তার গৃহে। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তারপর চলে যান মাদিয়ানে। সেখানে দশবছর অতিবাহিত করার পর পুনরায় ফিরে আসেন মিসরে। তারপর তিরিশ বছর ধরে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডাকতে থাকেন সত্যধর্মের পথে। আর ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সমুদ্রনিমজ্জনের পরে বেঁচে ছিলেন আরো পঞ্চাশ বছর। মহাতিরোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তুমি তো অপরাধ যা করবার তা করেছো, তুমি অকৃতজ্ঞ'। একথার অর্থ— ফেরাউন আরো বললো, তোমাকে আমরা লালন-পালন করে বড় করলাম। অথচ তুমিই কিনা আমার সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে পালালে। অকৃতজ্ঞ ছাড়া এরকম অপরাধ কি কেউ করে? আউফির বর্ণনায় এসেছে, এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতাও। অর্থাৎ এখানে 'কাফেরীন' শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞ। কেননা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করার বিষয়ে ফেরাউনের কোনো ধারণাই ছিলো না।

হাসান ও সুদ্দী বলেছেন, এখানকার 'আনতা মিনাল কাফিরীন' অর্থ ফেরাউন বললো, হে মুসা! এখন তুমি যে উপাস্যের প্রতি আমাকে আহ্বান করছো, প্রথমে তুমিই তো ছিলে তার প্রত্যাখ্যানকারী। ইতোপূর্বে তুমিতো ছিলে আমাদেরই ধর্মমতানুসারী। অথবা কথাটির অর্থ হতে পারে এরকম— তুমিতো আমাকে অস্বীকারকারী। কিংবা— তুমি আমার উপকারের কথা ভুলে গিয়েছো, ফিরে এসে আবার লিপ্ত হয়েছো আমারই বিরোধিতায়। অথবা অর্থ হবে— তুমি তো আমাদের ধর্মমতানুসারে কাফের।

এরপরের আয়াতে(২০) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, আমি তো তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, ওই সময় তো আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পথপ্রাপ্ত ছিলাম না। এটাই ছিলো আমার অনবধানতার কারণ। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি তো তখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করিনি। ভাবতেও পারিনি যে, এক আঘাতেই সে প্রাণত্যাগ করবে। অথবা অর্থ হতে পারে— আমার ওই অপরাধ ছিলো অনিচ্ছাকৃত, হত্যার উদ্দেশ্যবিবর্জিত। অসতর্কতাই ছিলো আমার এমতো স্খলনের কারণ। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা অজ্ঞতাবশতঃ অন্যায় করে ফেলে, আমার অবস্থা তখন ছিলো তাদের মতন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'দ্বলালাত' শব্দটির অর্থ ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ ভুল বশতঃ তখন আমার দ্বারা ওই অশুভ কর্মটি সম্পন্ন হয়েছিলো। যেমন বলা হয়েছে— 'আন তাদ্বিল্‌লা ইহ্‌দাহুমা ফাতুজাক্‌কির ইহ্‌দাহুমাল উখ্‌রা' অর্থাৎ যদি কোনো রমনী ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এখানেও দ্বলালাত শব্দটির অর্থ করা হয়েছে ভুলে যাওয়া।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২১, ২২

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

❒ 'অতপর আমি যখন তোমাদিগের ভয়ে ভীত হইলাম তখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূল করিয়াছেন।'

❒ 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে তুমি বনি ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুষ্টাঘাতের ফলে যখন লোকটি নিহত হলো, তখন আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম। পালিয়ে গেলাম মাদায়েনে। তারপর আমার প্রভুপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন তাঁর বচনবাহক।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছো তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করেছো'। এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে ফেরাউন কর্তৃক হজরত মুসার প্রতিপালনের প্রতি অথবা তার অন্যায় আচরণের প্রতি।

'আবাদ্‌তা' অর্থ দাসে পরিণত করেছো। উল্লেখ্য, 'আবাদতু' 'ইস্‌তায়বাদ্‌তু' ও 'তায়াবাদতু' শব্দত্রয় সমঅর্থসম্পন্ন। ব্যাখ্যাতাগণ কথাটির অর্থ করেছেন বিভিন্ন রকম। যেমন— ১. হজরত মুসা এখানে ফেরাউনের অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে— তুমি আমাকে বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবজাতকদের মতো হত্যা না করে বাঁচিয়ে রেখেছো সত্য, কিন্তু বধ করেছো হাজার হাজার শিশু। একথাও ঠিক যে, আমাকে তুমি তোমার গৃহে সাদরে প্রতিপালন করেছো, কিন্তু অন্যদিকে দাস বানিয়ে রেখেছো সমগ্র বনী ইসরাইল জনতাকে। দাস বানাওনি কেবল আমাকে।

২. প্রকাশ্যতঃ এখানে অনুগ্রহ স্বীকার করেছেন হজরত মুসা। অপ্রকাশ্যতঃ করেছেন অস্বীকার। সরাসরি তিনি তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করেননি। শুধু বুঝিয়ে দিয়েছেন, তোমার অনুগ্রহ তো প্রকৃত অনুগ্রহ ছিলো না। বরং তা ছিলো তোমার অত্যাচারের পরিণতিরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় ও কৌশল। তাই তো তুমি নিজের অজান্তে বাধ্য হয়েছিলে আমাকে লালন-পালন করতে। বনী ইসরাইলের নর-নারী ছিলো তোমার জুলুমের শিকার। তাদের পুত্র সন্তানেরা ও তোমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তোমার সেই অকথ্য নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র ইশারায় আমাকে পৌঁছানো হয়েছিলো তোমার গৃহে। আর তাঁর ইঙ্গিতেই বাধ্য হয়ে তুমি দায়িত্ব পালন করেছিলে আমার লালন-পালনের। এইতো ছিলো তোমার অনুগ্রহের নমুনা।

৩. বাক্যটি আসলে একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তেফহামে ইনকারী)। তাই বুঝতে হবে, এখানে উহ্য রয়েছে একটি প্রশ্নপ্রকাশক 'হাময়া'। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— তুমি যে অনুগ্রহের কথা তুললে তা কি প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুগ্রহ? আমার গোটা সম্প্রদায় যখন তোমার দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী, যখন সদ্যপ্রসূত শিশুদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে চলেছে তোমার ঘাতকদলের খঞ্জর, শোকাকুলা জননীদের বিলাপে যখন ভারী হয়ে গিয়েছে মিসরের আকাশ বাতাস, তখন একা আমি তোমার রাজানুগ্রহে লালিত। এটাই কি তবে তোমার অনুগ্রহ? বলো, এটাই কি তোমার অনুকম্পা?

ফেরাউন হজরত মুসার দৃঢ়তা দেখে দমে গেলো। বুঝলো এঁকে প্রতিহত করা কঠিন। তাই সে এবার সৃষ্টি করতে চাইলো বিতর্কের কুয়াশা। প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলো মহাবিশ্বের মহাঅধিপতির স্বরূপ সম্পর্কে। বললো—

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○ قَالَ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

❐ ফিরাউন বলিল, 'বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আবার কী?'

❐ মূসা বলিল, 'তিনি হইতেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

❐ ফিরাউন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা শুনিতেছ তো!'

❐ মূসা বলিল, 'তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণেরও প্রতিপালক।'

❐ ফিরাউন বলিল, 'তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল।'

❐ মূসা বলিল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝিতে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী? এরকম প্রশ্ন মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা আনুরূপ্যবিহীন, আকারাতীত, প্রকারাতীত, তাই অবোধ্য, অনির্ণেয়। তবে তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণবত্তা ও কার্যকলাপের ইঙ্গিতার্থক পরিচয় দেয়া যায়। কারণ তার প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বায়ন ইন্দ্রিয়গোচর।

তাই পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে, 'মুসা বললো, তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, তিনি হচ্ছেন আকাশসমূহ, পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, বিবর্তক ও প্রতিপালক। কারণ এই মহা নিসর্গ এককভাবে কেবল তাঁরই কর্তৃত্বাগত। আর সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাকো তবে সহজেই বুঝতে পারবে। এ সকল কিছু হচ্ছে তাঁর অনির্ণেয় এককত্ব ও অস্তিত্বের নিদর্শন, পরিচয় বিধৃতকারী। অর্থাৎ নিজে নিজে এগুলো অস্তিত্বশীল হয়নি। এগুলোর অস্তিত্বদাতা নিশ্চয় কেউ রয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্। সৃষ্টি সম্ভাব্য, নতুন। আর তিনি অনাদি, অনন্ত। তাই সৃষ্টি সকল বিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি সর্ববিষয়ে সকলকিছু থেকে চিরস্বাধীন, চিরঅমুখাপেক্ষী, অব্যয়, অক্ষয়। আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সেই চিরন্তন সত্তার দিকেই। সুতরাং তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করো। প্রভুপালনকর্তা ও উপাস্য বলে মেনে নাও সেই মহাসৃজয়িতাকে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা শুনছো তো? একথার অর্থ— ফেরাউন ছিলো স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাই বুঝতে পারলো না, এই মহাসৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য ও অবোধ্য অস্তিত্বের বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং এগুলো দেখেই পৌছতে হবে বিশ্বাসের গন্তব্যে। এটাই সত্যোপলব্ধির পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু ফেরাউন এপথে আসতে নারাজ। তার জ্ঞান ও বিবেচনার গতি অবরুদ্ধ। তাই সে তার পারিষদবর্গের দিকে লক্ষ্য করে মূর্খের মতো বলে উঠলো, শুনলে তো তোমরা। আমি প্রশ্ন করলাম কী? আর সে উত্তর দিচ্ছে কেমন করে। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— ফেরাউন মনে করতো আকাশ ও পৃথিবী অবিনাশী এবং এ দু'টো যেমন কারো দ্বারা সৃষ্ট নয়, তেমনি নয় কোনো কর্তার প্রভাবের অধীন। কেননা শত শত বছর ধরে এগুলোর অস্তিত্ব অটুট। তাই সে তার পারিষদবর্গকে হজরত মুসার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবজ্ঞাভরে বললো, কী হে, শুনলে তো এ লোকের প্রলাপ।

হজরত মুসা বুঝতে পারলেন, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ সংকীর্ণচিত্ত ও স্থূলদর্শী। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যের মোড় ঘোরালেন অন্যদিকে। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২৬) এভাবে— 'মুসা বললো, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক'। হজরত মুসার এই জবাবটি ছিলো অধিকতর শানিত। কারণ নিরন্তর এই দৃশ্যটি সতত পরিদৃশ্যমান যে, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু নিশ্চিতকারী নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। পূর্বাপর সকল মানুষ ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক তো তিনিই।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসুলটি তো এক বদ্ধ পাগল'। একথার অর্থ— হজরত মুসার এমতো বক্তব্যের বিপরীতে ফেরাউন কোনো যুৎসই জবাব খুঁজে পেলো না। অক্ষমতা ক্রোধকে উসকে দেয়। ফেরাউনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। তাই সে রোষ ও ব্যঙ্গবিমিশ্রিত কণ্ঠে পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললো, দেখলে তো তোমাদের এই উন্মাদ রসুলের কাণ্ড। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সে কেমন একের পর এক প্রলাপ বকে চলেছে। উল্লেখ্য, ফেরাউন এখানে হজরত মুসাকে রসুল বলেছে উপহাসচ্ছলে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে'। একথার অর্থ— হজরত মুসা তখন উপস্থাপন করলেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব-নির্দেশক আর একটি অব্যর্থ প্রমাণ। বললেন, দেখো সূর্যের নিয়মিত নভঃপরিক্রমা। পরিক্রমনরত একই

নিয়মে, অথচ বৃত্ত ভিন্নতরে। দেখো এর স্বচ্ছন্দ উদয়ন ও অস্তায়ন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিদিন একে প্রধাবিত করে চলেছে কে? দিকের সীমানা দিয়ে ঘেরা এই মহানিসর্গের মহাসৃজয়িতা তো তিনিই। তিনিই তো বিশ্বজগতের মহাপ্রভুপ্রতিপালক।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ○ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○

❒ ফিরাউন বলিল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব।'

❒ মূসা বলিল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও?'

❒ ফিরাউন বলিল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর।'

❒ অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

❒ এবং মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো'। ফেরাউন নিজেই মিসরবাসীর প্রভুপালক বলে দাবি করতো। তাই তার কাছে বিশ্বজগতের প্রভুপালকের রসুলের উপস্থিতি ছিলো অসহনীয়। তদুপরি হজরত মুসা যখন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও এককত্বের প্রমাণ একে একে উপস্থিত করতে শুরু করলেন, তখন সে হয়ে পড়লো আরো অসহায়। ফলে রাগান্বিত হয়ে সে বললো, শোনো মুসা, অনেক বকেছো, আর নয়। শিগগীর অন্যদের মতো আমাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো। নতুবা তোমাকে কারারুদ্ধ করবো। জানোই তো আমার শাস্তি কতো কঠোর। এখানকার 'আল মাসজুনীন' শব্দের আলিফ লাম সীমিত অর্থপ্রকাশক।

কালাবী বলেছেন, ফেরাউনের কারাদণ্ড ছিলো মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ। বন্দীদেরকে সে চালান করে দিতো সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের ঘুটঘুটে অন্ধকারে। বন্দীরা সেখানে ঘনঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত মুসা তখন বললেন, হে মিসরের সম্রাট! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্র রসুল। আমার দাবির সমর্থনে রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া অলৌকিকত্ব (মোজেজা)। ওই অলৌকিকত্বের প্রকাশ যদি আমি ঘটাই, তবুও কি তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করার সাহস দেখাতে পারবে? ফেরাউন বললো, তবে প্রকাশ করো তোমার সেই অলৌকিকত্ব যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্য হও। হজরত মুসা তৎক্ষণাৎ তাঁর হস্তধৃত যষ্টিটি নিক্ষেপ করলেন মৃত্তিকাপৃষ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে যষ্টিটি হয়ে গেলো বিশাল এক অজগর। ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ হয়ে গেলো বিস্মিত ও ভীত। পুনরায় অলৌকিকত্ব দেখতে চাইলো তারা। হজরত মুসা তখন ডান হাত প্রবেশ করিয়ে দিলেন তাঁর বাম বগলে। তারপর হাত বের করে আনতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখলো ওই হাত থেকে বিকিরিত হচ্ছে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল দ্যুতি। ওই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো আকাশের প্রান্ত। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে রইলো ফেরাউন ও তার মোসাহেবের দল।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌۙ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝ قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَۙ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

❒ ফিরাউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর।'

❒ 'এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা কী করিতে বল?'

❒ উহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও।'

❒ 'যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।'

❒ অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বললো, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর'। একথার অর্থ— সহসা বিচলিত হলো ফেরাউন। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানিমোচনের উপায়ও স্থির করলো মুহূর্তমধ্যে। নিজেকে এবং তার স্তাবকদেরকে উদ্ধারের জন্য বলে উঠলো, দেখলে তো মুসার কীর্তি। কী সাংঘাতিক! এতো দেখছি এক মহাপারদর্শী যাদুকর।

পরের আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পারিষদবর্গের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলো ফেরাউন। বললো, মুসা ও হারুনের অভিসন্ধি কী, তাতো এবার বুঝতে পারলে। তারা যাদুশক্তির বলে অধিকার করতে চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। বের করে দিতে চায় তোমাদেরকে দেশ থেকে। এখন তবে তোমরাই বলো, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? পারিষদবর্গ বললো, যাদুর মোকাবিলা যাদুর মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। মহামান্য সম্রাট! এবার এই দুই ভাইকে সংযত হতে বলুন। জানিয়ে দিন, তাদের যাদুর মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলুন তাদেরকে। তারপর দিকে দিকে পাঠিয়ে দিন সংগ্রাহকের দল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ যাদুকরদেরকে এনে যেনো আপনার দরবারে একত্রিত করে। ফেরাউন পারিষদবর্গের পরামর্শ মেনে নিলো। সংগ্রাহকের দলকে পাঠিয়ে দিলো বিভিন্ন স্থানে। তারা বড় বড় যাদুকরদেরকে ডেকে আনলো। নির্ধারিত হলো যাদু প্রতিযোগিতার দিন ও তারিখ। দিনটি ছিলো তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাক্রমে ওই দিনটি ছিলো নববর্ষের প্রথম শনিবার।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۝ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

❑ এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও একত্র হও,

❑ 'যেন উহারা বিজয়ী হইলে আমরা উহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি।'

❑ যাদুকরেরা ফিরাউনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

❑ ফিরাউন বলিল, 'হাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের শামিল হইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এতোকিছু করেও ফেরাউন পুরোপুরি স্বস্তিলাভ করতে পারলো না । ভাবলো, প্রতিযোগিতার ময়দানে বিশাল সমর্থক গোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রয়োজন। তাই সে চতুর্দিকে এই মর্মে ফরমান জারী করলো যে, হে মিসরবাসী! বনী ইসরাইলের দুই যাদুকরের সঙ্গে আমাদের যাদুকরদের প্রতিযোগিতাস্থলে তোমরা সকলে হাজির হও, যাতে করে যথাসময়ে আমরা আমাদের বিজয়ী যাদুকরদেরকে দিতে পারি কল্লোলিত সমর্থন।

এখানে 'আস্সাহারাতু' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরাউন পক্ষীয় যাদুকরদেরকে। আবার কথাটির দ্বারা এখানে হজরত মুসা ও হজরত হারুনকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ এর পূর্বে বলা হয়েছে 'লায়াল্লা নাত্তাবিউ'। 'লায়াল্লা' শব্দটি আশাপ্রদায়ক। আর 'নাত্তাবিউ' অর্থ সমর্থন করতে পারি অথবা হতে পারি তাদের ধর্মের অনুসারী। এভাবে ব্যাখ্যা করলে শেষোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— যদি মুসা ও হারুন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়, তবে যেনো আমরা অনুসারী হতে পারি তাদের ধর্মের। আর না হলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি তাদেরকে।

পরের আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যাদুকরেরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে ফেরাউনের কাছে নিবেদন করলো, মহামান্য সম্রাট! আমরা তো আশাবাদী। কিন্তু জানতে চাই বিজয়ী যদি আমরা হই, তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কি? ফেরাউন বললো, নিশ্চয়। বিজয় লাভ করলে তোমরা গৃহীত হবে আমার পারিষদরূপে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ○ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ○ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ○ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ○ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ○ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ○ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ○

❒ মূসা উহাদিগকে বলিল, 'তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা নিক্ষেপ কর।'

❒ অতঃপর উহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, 'ফিরাউনের ইজ্জতের শপথ। আমরাই বিজয়ী হইব।'

❒ অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল; সহসা উহা উহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল।

❒ তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল,

❒ এবং বলিল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের প্রতি—

❒ 'যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

❒ ফিরাউন বলিল, 'কী'! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? দেখিতেছি, এতো তোমাদিগের প্রধান। এ-ই তো তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদিগের সকলকে শূলবিদ্ধ করিব।'

❒ উহারা বলিল, 'কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব,

❒ আমরা আশা করি যে, আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের অপরাধ মার্জনা করিবেন; কারণ, আমরা বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অগ্রণী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মুসা তাদেরকে বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— যাদুকরেরা হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বললো, প্রথমে তুমি যা নিক্ষেপ করতে চাও তা করো, নতুবা অনুমতি দাও আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। তখন হজরত মুসা বললেন, তোমরাই প্রথমে যা করতে চাও তা করো। সুরা আ'রাফে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে— ইম্‌মা আন তুলক্বিয়া ওয়া ইম্‌মা আন্ নাকুনা নাহনুল মুলক্বিন (তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করবো)।

উল্লেখ্য, হজরত মুসা আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে যাদুর হুকুম দেননি। কারণ যাদু হারাম। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে তিনি যাদুকরদেরকে দিয়েছেন প্রথমে যাদু প্রদর্শনের অনুমতি। মোজেজা প্রদর্শন করে মিথ্যার উপরে সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর এমতো অনুমতি প্রদানের উদ্দেশ্য। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন তুচ্ছতা প্রকাশার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ঠিক আছে, তোমাদের যা করণীয় আছে তা প্রথমেই করে ফেলো।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'অতপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তারা বললো ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো'। উল্লেখ্য, ফেরাউনের শক্তিমত্তার উপরে ছিলো তাদের অগাধ বিশ্বাস, তাই তারা এভাবে শপথ উচ্চারণ করতে পেরেছিলো। অথবা তারা এভাবে শপথ করেছিলো রাজানুগ্রহ আকর্ষণার্থে।

এর পরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো'। একথার অর্থ— যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রজ্জু ও লাঠিগুলো যখন সাপের আকারে সারা মাঠ জুড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো, তখন হজরত মুসা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন তাঁর অলৌকিক যষ্টি। যষ্টিটি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটি বিরাট অজগর এবং একে একে গলধঃকরণ করে ফেললো যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে।

পরের আয়াতত্রয়ের (৪৬, ৪৭, ৪৮) মর্মার্থ হচ্ছে— এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলো যাদুকরেরা। তাদের অন্তরের যাদুপ্রীতির অন্ধকারে প্রবেশ করলো সত্য রসুলের অপ্রতিরোধ্য মোজেজার সুতীব্র সূর্যালোক। হৃদয়ে প্রবেশ করলো চিরঅক্ষয় ইমান। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিজের অজান্তেই সেজদাবনত হলো তারা। বললো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বজগতের সেই আনুরূপ্যবিহীন প্রভুপালনকর্তার প্রতি, যিনি এই রসুল ভ্রাতৃদ্বয়েরও প্রভুপালনকর্তা।

যাদু হচ্ছে একপ্রকার কৌশল যা বিভ্রান্ত করে মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যাদু এক প্রকার বাস্তবসম্মত প্রতিক্রিয়া। আমি বলি, আলোচ্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, যাদুর কোনো বাস্তবতা নেই। এর প্রতিক্রিয়া বাস্তবে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অলীক। তাই এখানে যাদুকরদের যাদুর সাপগুলোকে বলা হয়েছে অলীক সৃষ্টি।

'রব্বি মুসা ওয়া হারুন' অর্থ যিনি মুসা ও হারুনের প্রভুপালনকর্তা। ইমানের ঘোষণা দেয়ার পর এই বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে যাদুকরেরা এখানে একথাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, রসুল ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত অভূতপূর্ব মোজেজাদর্শনই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস আনয়নের কারণ। আর সত্যিই তাঁরা আল্লাহ্‌র রসুল।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা এতে বিশ্বাস করলে? দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান। এ-ই তো তোমাদেরকে যাদুশিক্ষা দিয়েছে'। একথার অর্থ— যাদুকরদের শোচনীয় পরাজয় দেখে এবং তাদের ইমানের নির্ভীক ঘোষণা শুনে ফেরাউন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সে আত্মস্থ হলো। বুঝতে পারলো, এখন বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে না তুলতে পারলে উপস্থিত জনতাকেও আর থামানো যাবে না। সকলেই একযোগে অনুগত হয়ে পড়বে মুসা ও হারুনের প্রতি। তাই সে হুংকার ছেড়ে বললো, কী এতো বড় স্পর্ধা তোমাদের! আমার সামনেই তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে তাদের আনুগত্যকে স্বীকার করলে? বুঝতে পারছি, তোমরা আসলে এক। এ তোমাদের পাতানো খেলা। মুসা ও হারুনই হচ্ছে তোমাদের যাদুবিদ্যার গুরু।

এরপর বলা হয়েছে— ' শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবো এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবো'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫০, ৫১) মর্মার্থ হচ্ছে— তওবাকারী যাদুকরেরা বললো, হে মিসররাজ! তুমি যা খুশী তা করতে পারো। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। বরং এতে রয়েছে আমাদের জন্য উপকার। তুমি আমাদেরকে হত্যা করলে আমরা পাবো শাহাদাতের মর্যাদা, ইমানদারদের জন্য যা অত্যন্ত লোভনীয়। যত দ্রুত আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবো তত দ্রুত পাবো আমাদের প্রভুপালনকর্তার সন্দর্শন। আমরা আশাধারী, তিনি আমাদের বিগত জীবনের অপরাধ মার্জনা করবেন। কারণ, আজ এই মহাসমাবেশে আমরাই প্রথম ঘোষণা দিয়েছি ইমানের। সুতরাং এর পর যারা ইমান আনবে আমরা হবো তাদের অগ্রনায়ক।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاۤئِظُوْنَ ۝ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ ۝

❒ আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে ঃ আমার দাসদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও, তোমাদিগের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।

❒ অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোকসংগ্রহকারী পাঠাইল,

❒ এই বলিয়া যে, বনি ইসরাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল,

❒ উহারা তো আমাদিগের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে;

❒ এবং আমরা তো এক দল, সদা সতর্ক।

❒ পরিণামে আমি ফিরাউন-গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদিগের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে

❒ এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে।

❒ এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনি ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরও যখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমান আনলো না, তখন আমি মুসার প্রতি এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম যে, এবার তুমি বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে তোমাদের পিতৃভূমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করো। সাবধান! এ সংবাদ যেনো বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর বাইরে আর কেউ জানতে না পারে। আর যাত্রা করতে হবে রাতে, দিনে নয়। দিনে বহির্গত হলে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে। রাতে রওনা হলেও প্রভাতে যখন ফেরাউনেরা এ সংবাদ জানতে পারবে তখন তারা তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে ছাড়বে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তখন হজরত মুসাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানালেন, বনী ইসরাইল জনতাকে বলো, তারা যেনো প্রতি চার ঘরের লোক একত্র হয় একটি ঘরে। তারপর যেনো ভেড়ার বাচ্চা জবাই করে তার রক্ত লাগিয়ে দেয় ঘরগুলোর দরজায়। আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবো, ওই সকল ঘরে যেনো তারা প্রবেশ না করে। আরো নির্দেশ দিবো, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে হত্যা করো এবং নষ্ট করে দাও তাদের সকল সম্পদ। তারা তাই করবে। হে মুসা, তোমার অনুসারীদেরকে আরো বলো, তারা যেনো পথের পানাহাররূপে সঙ্গে নেয় রুটি। তারপর গভীর রাতে বের হয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রতীরে পৌঁছলে পাবে পরবর্তী প্রত্যাদেশ। হজরত মুসা প্রত্যাদেশানুসারে রাতের আঁধারে মিসর ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে কিবতীরা জানতে পারলো বনী ইসরাইলদের উধাও হওয়ার সংবাদ। তৎক্ষণাৎ তারা এ সংবাদ পৌঁছে দিলো ফেরাউনের কাছে। বললো, বনী ইসরাইলেরা আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করেছে। আর আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে রাতের আঁধারে। ফেরাউন তখন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রস্তুত করলো এক বিশাল বাহিনী। পনেরো লক্ষ সেনাপতি এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে এক হাজার করে সৈন্য নিয়োজিত করে একটি বিশালাকৃতির সিংহাসনে বসে সে-ও রওনা দিলো ওই সেনাবাহিনীর সঙ্গে। আমি বলি, বর্ণনাটি অতিরঞ্জিত। গ্রহণযোগ্য কোনো বিবরণে এরকম কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পরের আয়াতদ্বয়ে (৫৩, ৫৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো এই বলে যে, বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল'। আমি বলি, একথার অর্থ— ফেরাউন বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। আশে পাশের শহরগুলোতে সেনাসংগ্রহের জন্য লোক পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। বনী ইসরাইলেরা তো সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী নয়।

এখানে বলা হয়েছে 'বনী ইসরাইল তো ক্ষুদ্র একটি দল'। একথা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বিবরণে তাদের সংখ্যা ছয়লক্ষ সত্তর হাজার বলা হয়েছে, ওই সকল বিবরণ অতিরঞ্জিত। আবার ফেরাউনের সেনাসংখ্যাও নিশ্চয় সাত লক্ষ বা পনেরো লক্ষ ছিলো না। কারণ পৃথিবীর কোনো রাজ্যের লোকসংখ্যাই তখন অতো বেশী ছিলো না। আমি বলি, 'বনী ইসরাইল তো একটি ক্ষুদ্র দল' বলে ফেরাউন একথাই বুঝাতে চেয়েছে তারা কিবতীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৫, ৫৬) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন আরো বললো, বনী ইসরাইলের এরকম গোপন পলায়ন আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছে ক্রোধ। অথচ তারা কি জানেনা যে, আমরা একটি পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। নিশ্চেষ্টও আমরা নই। আমরা তো সতত সাবধান।

এখানে 'হাজিরূন' অর্থ সদাসতর্ক বা সততসাবধান। ফার্‌রা বলেছেন, 'হাজির' (আলিফ যুক্ত 'হা') অর্থ ওই ব্যক্তি যার উপস্থিতি ভীতিকর। আর 'হাজির'(আলিফ বিহীন 'হা') অর্থ ভয়ংকর দর্শন। শব্দ দু'টোর মধ্যে রয়েছে ক্রিয়ার অস্থায়ীত্ব ও স্থায়ীত্বের পার্থক্য। কেউ কেউ বলেছে, 'হাজিরূন' অর্থ শক্তিমান। আর 'হাজিরূন' অর্থ সতর্কসজাগ। জুজাযও এরকম অর্থের প্রবক্তা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৫৭, ৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউনের কাছে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হলো বহুসংখ্যক কিবতী। ফেরাউন তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরামর্শের পর স্থির করলো, বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে। উপস্থিত সকলেই শিরোধার্য করে নিলো ফেরাউনের ফরমান। একযোগে তারা যাত্রা শুরু করলো সিরিয়ার পথাভিমুখে। পেছনে পড়ে রইলো তাদের সাধের বাগান, প্রিয় প্রস্রবণ, সম্পদের ভাণ্ডার ও নয়নাভিরাম প্রাসাদমালা।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'এইরূপই ঘটেছিলো এবং বনী ইসরাইলকে করেছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী'। একথার অর্থ— ফেরাউনের দল সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হলো। সলিলসমাধি ঘটলো তাদের সকলের। বনী ইসরাইল তখন সাগরের ওপারে। পুনরায় একসময় মিসরে এলো তারা। অধিকার করলো মৃত কিবতীদের পরিত্যক্ত উদ্যান-নির্ঝর-ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ○ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا
لَمُدْرَكُوْنَ ○ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ○ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ

ا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ○ وَ
أَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ○ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ○ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ○
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

❑ উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।

❑ অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল তখন মূসার সংগীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম।'

❑ মূসা বলিল, 'কিছুতেই নয়! আমার সংগে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করিবেন।'

❑ অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে, ইহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল;

❑ আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে

❑ এবং মূসা ও তাহার সংগী সকলকে আমি উদ্ধার করিলাম।

❑ তৎপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করিলাম।

❑ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❑ তোমার প্রতিপালক— তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার বাহিনী বনী ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করলো পরদিন সকালে। সকলেই ছিলো অশ্বারোহী। তাই একসময় তারা গিয়ে পৌঁছলো বনী ইসরাইলের দৃষ্টিসীমানায়। আতংকিত হলো তারা। বললো, আমরা তো ধরাই পড়ে গেলাম। হজরত মুসা বললেন, কিছুতেই নয়। আমাদের এই অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুগামী। তিনি আমাদের সতত সঙ্গী। তাই তিনি আমাদেরকে প্রদর্শন করবেন পরিত্রাণের পথ। সহসা প্রত্যাদেশ হলো, হে আমার প্রিয় নবী! তোমার হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রবক্ষে আঘাত করো। মুসা নির্দেশ পালন করলেন। ফলে সমুদ্রাভ্যন্তরের পানি দু'দিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেলো। এভাবে সৃষ্টি হলো বারোটি শুষ্ক পথ। বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র অগ্রসর হলো ওই পথগুলো দিয়ে। ফেরাউনের দল যখন তটদেশে পৌঁছলো, তখন বনী ইসরাইলেরা মাঝ দরিয়ায়। কালবিলম্ব না করে তারাও নেমে পড়লো সমুদ্রাভ্যন্তরের পথে। সমুদ্রের অপর পাড়ে যখন বনী ইসরাইলেরা পৌঁছে গেলো তখন ফেরাউনের বিশাল বাহিনী মাঝ দরিয়ায়। সহসা ভেঙে পড়লো পানির দেয়াল। ডুবে মরলো ফেরাউন ও তার পুরো বাহিনী। উদ্ধার পেলো মুসা ও

তার অনুসারীরা। এভাবে একদলের বিনাশ ও অন্য দলের পরিত্রাণপ্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মানুষ একথা সহজে বুঝতে চায় না। কারণ তাদের অনেকেই অবিশ্বাসী। আল্লাহ্‌ই তো সকলের পালনকর্তা। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী শত্রুনিধনের ক্ষেত্রে এবং পরমদয়াপরবশ বিশ্বাসীদের বেলায়।

উল্লেখ্য, অল্প কয়েকজন বাদে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মুসার ধর্মাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী মহাপুণ্যবতী হজরত আছিয়া, স্ববিশ্বাস গোপনকারী খারঈল, তাঁর সহধর্মিণী এবং মরিয়ম বিনতে নামুসিয়া। এই মরিয়মই চিহ্নিত করেছিলেন নীলনদাভ্যন্তরস্থিত হজরত ইউসুফের সমাধি।

সূরা শুআরা : আয়াত ৬৯,৭০,৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬,৭৭

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

❒ উহাদিগের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

❒ সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদিগের পূজায় নিরত থাকিব।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা আহ্বান করিলে উহারা কি শুনে?'

❒ 'অথবা উহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে?'

❒ উহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

❒ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ যাহার পূজা করিতেছ—

❒ তোমরা এবং যাহার পূজা করিত তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষেরা?

❒ বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু;

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কাবাসীদের নিকট বর্ণনা করুন আপনার ও তাদের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত। তিনি প্রতিমাপূজক পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে একবার বললেন, তোমরা উপাসনা করো কার? তারা উত্তর দিলো, প্রতিমার। প্রতিমাপূজাই আমাদের ধর্ম। আর এমতো আরাধনায় আমরা নৈষ্ঠিক ও আন্তরিক।

প্রতিমাপূজাকে অসার প্রমাণ করবার জন্যই হজরত ইব্রাহিম অবতারণা করেছিলেন প্রশ্নের। বলেছিলেন 'তোমরা উপাসনা করো কার'। নতুবা বিষয়টি তাঁর জানাই ছিলো। লক্ষণীয়, তাঁর প্রশ্নটি ছিলো সংক্ষিপ্ত। আর তাদের জবাব ছিলো দীর্ঘ। দম্ভপ্রকাশই ছিলো তাদের এমতো প্রলম্বিত জবাব প্রদানের কারণ।

'ফানাজাললু লাহা আকিফীন' কথাটির শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়— আমরা সারাদিনমান তাদের পূজায় নিয়োজিত থাকি। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে— সার্বক্ষণিক আমরা নিয়োজিত থাকি তাদের উপাসনায়। বাগবী লিখেছেন, তারা প্রতিমার উপাসনা করতো দিনের বেলায়, রাতে নয়।

পরবর্তী আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম তখন বললেন, তোমাদের ডাক কি ওই জড়প্রতিমাগুলো শোনে? তোমরা তাদের উপাসনা করলে কি সেগুলো করতে পারে তোমাদের কোনো উপকার, অথবা না করলো কোনো অপকার? তারা বললো, অত শত বুঝি না। বুঝি শুধু এতটুকু যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এরকম করেছেন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, কিন্তু তোমরা বিষয়টির সত্যাসত্য অনুধাবন করতে চেষ্টিত হবে না কেনো। কেনো পার্থক্য করতে চাইবে না সত্য ও মিথ্যার। পূর্বপুরুষেরা করলেই মিথ্যা কখনো সত্যে পরিণত হয় না। শুভবুদ্ধি ও সুস্থ চেতনা একথা সমর্থনও করে না। সুতরাং হে আমার অশুভ বিবেকানুসারী সম্প্রদায়! শুনে রাখো, আমি কিন্তু অন্ধভক্তির প্রশ্রয়দাতা নই। আমি আরাধনা করি সেই অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য মহাসৃজয়িতার, যিনি বিশ্বজগতের মহান প্রভুপালক। তিনি ছাড়া তোমরা, তোমাদের উপাস্যরা ও তোমাদের বিভ্রান্ত পূর্বপুরুষেরা সকলেই আমার প্রতিপক্ষ।

জড়প্রতিমাকে এখানে শত্রু বলা হয়েছে রূপকার্থে। আর 'আমার শত্রু' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই প্রতিমাগুলো তো আসলে তোমাদেরও শত্রু। অর্থাৎ তাদের কারণেই তোমরা অবশেষে হবে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে নিজের উপরে দায় টেনে নিয়ে অন্যকে উপদেশ দেয়ার রীতিটি একটি প্রভাববিস্তারক রীতি। হজরত ইব্রাহিম এখানে এই রীতিটিই অবলম্বন করেছেন। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়ামা লিয়া লাআ'য়্বুদুল্ লাজী ফাত্বারানী' (কী কারণ রয়েছে যে, আমি আমাদের মহাসৃজয়িতার ইবাদত করবো না)। তাছাড়া মহাবিচারের দিবসে প্রতিমাগুলো

সত্যি সত্যিই শত্রু হয়ে যাবে তাদের উপাসকদের। সেকথাই বলা হয়েছে আরেক আয়াতে এভাবে— 'সাইয়াকফুরুনা বি ইবাদাতিহিম ওয়া ইয়াকুনুনা'লাইহিম দ্বিদ্দা' (অচিরেই তাদের পূজকদেরকে তারা অস্বীকার করবে। আর হয়ে যাবে তাদের বিপরীত পক্ষ)।

এখানকার 'আদুওউন' (শত্রু) শব্দটি ফাউলুনের ওজনের। শব্দটি একটি মূল শব্দ। যেমন— 'কুবুলুন'। শব্দটি একবচন। অথবা বহুবচন। বহুবচন হলে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের সকল উপাস্যই আমার শত্রু।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'আদুওউন' ও 'সাদিকুন' 'ফাউলুন' ও 'ফায়িলুন' এর বিশেষণবাচক শব্দরূপ। একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই কথাটিকে 'রজুলুন আদুওউন' এবং 'কওমুন আদুওউন'ও বলা যায়। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া কাজালিকা জায়া'লনা লিকুললি নাবিয়্যিন আ'দুউয়ান শায়াত্বিনাল ইনসি ওয়াল জ্বিন্নি'।

'ইল্লা রব্বাল আ'লামীন' অর্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত। কথাটি পূর্বের বক্তব্যধারা থেকে পৃথক। এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) অর্থ 'কিন্তু' হওয়াই সমীচীন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা সকলেই আমার শত্রু, কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আমার প্রিয়ভাজন, বন্ধু। অথবা বলা যেতে পারে, তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করতো। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— বিশ্বজগতের প্রভুপালক ব্যতীত তোমাদের সকল উপাস্য আমার শত্রু। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যটি হবে পূর্বের বক্তব্যধারার অন্তর্ভুক্ত, পৃথক কোনো বাক্য নয়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ○ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ○ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ○ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

❒ তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ-প্রদর্শন করেন।
❒ তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়,
❒ এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন;
❒ এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন।
❒ এবং আশা করি, তিনি কিয়ামতদিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিয়া দিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন'। একথার অর্থ— তিনিই সৃষ্টি করেছেন আমাকে ও মহাবিশ্বকে। আর তিনিই মহাবিশ্বের সকলের এবং সকলকিছুর মতো আমাকেও পথপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ সকলের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের পথ প্রদর্শন করেন তিনিই। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন— 'এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন'। মানুষের পার্থিব সৃজন শুরু হয় মাতৃগর্ভে, আর সফল সমাপ্তি ঘটে জান্নাতে। আর এমতো অভিযাত্রায় পথনির্দেশনা দান করেন আল্লাহ্ই।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়'। একথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টির জীবনোপকরণ প্রদাতা কেবলই আল্লাহ্। আর তিনি সকলের মতো আমাকেও দান করেন আহার্য ও পানীয়।

এরপরের আয়াতে (৮০) বলা হয়েছে— 'এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন'। রোগ ও সুস্থতা উভয়ের স্রষ্টা আল্লাহ্। কিন্তু এখানে হজরত ইব্রাহিম রোগমুক্তির বিষয়টিকেই গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছেন আল্লাহ্র প্রতি অগাধ সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে। অন্য এক আয়াতে হজরত খিজিরের উক্তিতেও প্রকাশ পেয়েছে এরকম শিষ্টাচার। যেমন— 'আমি ইচ্ছা করেছি এই নৌকাটি ক্রটিযুক্ত করে দিবো' এখানে তিনি ক্রটির সম্পর্ক করেছেন নিজের সঙ্গে। আবার অন্যত্র বলেছেন— 'আমার প্রভুপালক ইচ্ছা করেছেন, তারা দুজন তাদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাবে'। এখানে তিনি শুভকর্মকে সংযুক্ত করেছেন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের সঙ্গে। আল্লাহ্র পরিচয়ধন্য ব্যক্তিগণের বচন এরকমই সতর্কতাসমৃদ্ধ ও শিষ্টাচারমণ্ডিতই হয়।

এখানে 'রোগাক্রান্ত হলে' অর্থ আমি রোগাক্রান্ত হলে। এরকম উক্তির মাধ্যমে তিনি একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের উপরে আপতিত বিপদাপদ আল্লাহ্রই ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন। তাছাড়া হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের বর্ণনা করা। আর রোগ কখনো নেয়ামত নয়। তাই তিনি এখানে রোগের সম্পর্ক নিজের সঙ্গে করে রোগমুক্তির সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্র সঙ্গে। কারণ রোগমুক্তি হচ্ছে নেয়ামত।

এরপরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন'। এখানে আবার মৃত্যুকে সম্পর্কিত করা হয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে। যদিও মৃত্যু প্রকাশ্যতঃ নেয়ামত নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, মৃত্যু কষ্টদায়ক কিছু নয়। কষ্টকর হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের রোগযন্ত্রণা। তাছাড়া বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য

মৃত্যু অবশ্যই নেয়ামত। কারণ তাঁদের প্রিয়তম প্রভুপালকের মিলন তাঁরা লাভ করেন মৃত্যুর মাধ্যমেই। স্মরণীয় একটি বাণী এই যে, মৃত্যু একটি মিলন সেতু, যা বন্ধুকে পৌঁছে দেয় বন্ধুর কাছে। এক হাদিসে এসেছে, সহসা মৃত্যু বিশ্বাসীদের জন্য শান্তি এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জবাবদিহিতা। সুপরিণত সূত্রে জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ও বায়হাকী। অপর এক হাদিসে এসেছে, মৃত্যু হচ্ছে মুমিনের গোনাহর কাফফারা (ক্ষতিপূরণ)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম তাঁর হুলিয়ায় এবং শিথিল সূত্রে বায়হাকী হজরত আনাস থেকে।

আর একটি কথা হচ্ছে— মৃত্যু ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত হয় জীবনোপকরণের স্বল্পতা ও অস্বল্পতার কারণে। আর আগুন-পানি-মাটি-বাতাস এই চারটি পরস্পরবিরোধী বস্তুর সমন্বয়ে জীবনের আধারকে ধরে রাখার বিষয়টি অত্যাশ্চর্যের। এ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার প্রজ্ঞাময়তা ও শক্তিমত্তার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। এই আয়োজনের অবলুপ্তিও কম বিস্ময়ের নয়।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ সমূহ মার্জনা করে দিবেন'। নবী-রসুলগণ আল্লাহ্তায়ালার বিশুদ্ধচিত্ত দাস। নিষ্পাপ তাঁরা। তাই বিনয়-নম্রতা তাঁদের স্বভাবভূষণ। সেই নবীসুলভ বিনম্রতাই প্রকাশ পেয়েছে হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিতে। অথবা এরকম কথা তিনি বলেছেন উম্মতকে শিক্ষাপ্রদানার্থে।

জ্ঞাতব্যঃ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী তাঁর তাফসীরে কবীরে লিখেছেন, হজরত ইব্রাহিমের 'আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন' কথাটিকে বিনম্রবচন বলা, অথবা উম্মতকে শিক্ষাদানার্থে বলা কিংবা কৃতভুলের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলা— এর কোনোটিই ঠিক নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন কেনো? তিনি কি অপরাধী? বিনয়ের কারণে অসত্যভাষণও তো অন্যায়। প্রথমাবস্থায় তিনি তো নিষ্পাপই থাকেন না। আবার উম্মতের শিক্ষাদানার্থেও অসত্যভাষণ অন্যায়। সুতরাং এগুলোর একটিও ঠিক নয়। আমি বলি, ইমাম রাজীর উত্থাপিত সমস্যাগুলোই দৌর্বল্যদুষ্ট। কারণ অসত্যভাষণের অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারতো তখন, যখন তিনি জেনে শুনে এরকম বলতেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি যে নিষ্পাপ সে কথা তিনি তো জানতেনইনা। বিষয়টি এরকম— সুফীসাধকগণ ফানার মাকাম অতিক্রম করার পর নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ সকল শুভঅর্জন আল্লাহ্প্রদত্ত। নিজেকে তখন তাঁর মনে হয় অনুল্লেখ্য কোনোকিছু। তখন তিনি স্পষ্টতই অনুভব করেন যে, আমার প্রবৃত্তিই সকল অনিষ্টের উৎপত্তিস্থল। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেন— 'মা আসবাকা মিন

হাসানাতিন ফামিনাল্লহি ওয়ামা আসবাকা মিন সায়্যিয়াতিন ফামিন নাফসিকা' (তোমাদের নিকট শুভ যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর যা কিছু অশুভ তা সমুদ্ভূত হয় তোমাদের প্রবৃত্তি থেকে)। এমতাবস্থায় তিনি নিজেকে অপরাধী বলেই মনে করেন। আর এমতো দর্শনকে অসত্য বলা যায় না।

রসুল স. একবার জোহরের নামাজ দুই রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়েছিলেন। জুল ইয়াদাইন নামক জনৈক সাহাবী তখন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নামাজ কি হ্রাস করা হয়েছে, না ভুলক্রমে এরকম হলো? তিনি স. বললেন, দু'টোর একটিও নয়। হজরত জুল ইয়াদাইন তখন বললেন, কিছু তো একটা হয়েছেই। লক্ষণীয়, রসুল স. এর এমতো উক্তিকে কি অসত্য বলা যায়? তবে ভুল তো বলা যায় অবশ্যই। পাপ ও ভুল নিশ্চয়ই এক কথা নয়। একটি ইচ্ছাকৃত এবং অপরটি অনিচ্ছাকৃত। একারণেই রসুল স. প্রার্থনা করতেন, 'রব্বিগফিরলি খত্বিয়াতী' (হে আমার প্রভুপালক! আমার ভুলসমূহ মার্জনা করো)। এ হচ্ছে তাঁর রসুলসুলভ বিনয়বচন। আর এরকম উক্তিতে অসত্যাচারের সন্দেহ আসতেই পারে না। হজরত ইব্রাহিমের আলোচ্য উক্তিটিও তেমনি। তাছাড়া এমতো উক্তিকে ঠিক বিনয়বচনও বলা যায় না। এ হচ্ছে আসলে চিরঅমুখাপেক্ষী আল্লাহ্র সকাশে চিরমুখাপেক্ষী সৃষ্টির পরাভব প্রকাশ। বরং এ হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্যভাষণ। বাহ্যিক অথবা আন্তরিক পাপের সঙ্গে এর অনুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গটির কিয়দংশ আমি আলোচনা করেছি 'সুরা মুহাম্মদ' এর 'ইস্তাগফির লিজামবিকা' আয়াতের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিম হয়তো কখনো কখনো উম্মতের হিতাকাংখাজনিত মমতাবশে কষ্টসাধ্য (আযীমত) আমলের স্থলে সহজসাধ্য (রুখসাত) আমল করে থাকবেন, যাতে উম্মতের অনুসরণ কর্ম সহজসাধ্য হয়। সে কারণেই তিনি হয়তো আমলের অপেক্ষাকৃত কম উত্তমতা স্মরণ করে বলেছিলেন 'এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন'।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের তিনটি বক্তব্য ছিলো ভুল। যেমন— তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন 'ইন্নি সাক্বীম' (আমি অসুস্থ)। অথচ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন না। ২. 'বাল ফায়া'লাহু কাবীরুহুম' (একর্ম করেছে বড় মূর্তিটি), অথচ মূর্তি কোনো কর্মই করতে পারে না। ৩. হজরত সারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, 'হাজিহী উখতি' (এ হচ্ছে আমার বোন), অথচ তিনি তাঁর বোন ছিলেন না, ছিলেন পত্নী। এই তিনটি ভুলকে চিহ্নিত করেছেন মুজাহিদ। আর হাসান উদ্ধার করেছেন তাঁর আর একটি ভুলের কথা।

সেটি হচ্ছে 'হাজা রব্বি' (এটিই তো আমার প্রভুপালক)। অনুসন্ধিৎসার পথপরিক্রমার এক পর্যায়ে তারকা-চন্দ্র-সূর্যকে লক্ষ্য করে তিনি এরকম বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর এমতো ভুলের সংখ্যা দাঁড়ালো চারে। আমি বলি, এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোনো ভুলই নয়। এগুলো হচ্ছে লক্ষ্যার্থক উক্তি। এমতো উক্তির মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম এবং শ্রোতা তার অর্থ করে অন্যরকম। আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে অপরাধী ভাবা আল্লাহ্র দাসত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অনুভূতি। নবী-রসুলগণই হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রকৃত দাস। অন্যান্য বিশ্বাসীরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অনুকারক মাত্র। সুতরাং বুঝতে হবে নবী-রসুলগণের অপরাধ মার্জনার বিষয়টিতে রয়েছে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনতা ও দাসসুলভতার সর্বোত্তম দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ও চেতনা। এ বিষয়টি তাই বিচার্য অসাধারণত্বের ও মহাসত্যের নিরিখে। সাধারণ নিরিখ এক্ষেত্রে অচল। মাসরুক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, মূর্খতার যুগে জাদয়া'ন ছিলো পুণ্যকর্মপ্রেমিক। সে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের উপকার করতো, পানাহার করাতো দরিদ্র ও নিরন্নদের। সে কি আখেরাতে এর বিনিময় পাবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে কখনো বলে থাকে, 'আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার প্রভুপালক আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন'।

এভাবে আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রকৃত উপাস্যের বৈশিষ্ট্যাবলী উন্মোচন করলেন এভাবে— তিনি সৃষ্টি করেন, পথপ্রদর্শন করেন, পানাহার করান, দান করেন নিরাময়, মৃত্যু এবং মার্জনা করেন মানুষের অপরাধ। এ সকল গুণ যার মধ্যে নেই, সে বা তারা কখনোই উপাস্য হতে পারে না। সুতরাং তার বা তাদের উপাসনা অসিদ্ধ, নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদিগের শামিল কর।'

❒ 'আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর,

❒ 'এবং আমাকে সুখদ কাননের অধিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর,

❒ 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট।'

❒ 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে,

❒ যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না',

❒ 'সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে যে আল্লাহ্‌র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানদান করো এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল করো'। এখানে 'হুকমান' অর্থ জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণত্ব। আর 'সলিহীন' অর্থ নবী-রসুলগণ, যাঁরা নিষ্পাপ এবং জ্ঞান ও কর্মে যাঁদের অপূর্ণতা বলে কিছু নেই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমাকে সমৃদ্ধ করো জ্ঞানগত ও কর্মগত বৈভবে, যেনো আমি স্থায়ী হই তোমার বচনবহনের দায়িত্বে হই সৎকর্মপরায়নদের সফল সতীর্থ।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করো'। একথার অর্থ— পরবর্তী যুগের মানুষের স্মরণে ও উচ্চারণে আমার স্মৃতিকে করো অমলিন ও উচ্চকিত। আমার প্রসঙ্গকে করো অপযশবিমুক্ত। অথবা অর্থ হবে— আমার শুভস্মরণের মাধ্যমে আগামী মানবতা যেনো পায় পথের দিশা। অযথার্থ সুনামে অথবা দুর্ণামে যেনো তারা কলংকিত না করে আমার স্মৃতিকে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে সুখদ কাননের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো'। একথার অর্থ— আর পরবর্তী পৃথিবীতে যারা পাবে তোমার চিরঅনুগ্রহরঞ্জিত স্বর্গোদ্যানের অধিকার, আমাকে কোরো তাদেরই অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি তো পথভ্রষ্ট'। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা করতেন ততকাল পর্যন্ত, যতকাল তাঁর এই তথ্যটি জানা ছিলো না যে, তাঁর পিতা চিরভ্রষ্ট। কিন্তু যখন তিনি একথা জানতে পারেন, তখন স্থগিত করেন তাঁর এমতো ক্ষমাপ্রার্থনা। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'ওয়ামা কানাস্‌তিগফারু

ইবরহীমা লি আবীহী ইল্লা আন্ মাওয়ি'দাতিন ওয়াআদাহা ইয়্যাহু ফালাম্মা তারা ইয়্যানা লাহু আন্নাহু আদুওউলিল্লাহি তাবাররাআ মিনহু'। আরো উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য নিয়মিত ক্ষমাপ্রার্থনার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার জন্য এরকম প্রার্থনা করে গিয়েছিলেন।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত কোরো না পুনরুত্থান দিবসে'। একথার অর্থ— এবং যখন আপন সমাধি হতে আমি পুনরুত্থিত হবো, তখন আমাকে কোরো না অপমানিত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ওই সকল লোক সম্পর্কে কিছু জানেন কি, পরকালে আল্লাহ্ যাদের সঙ্গে গোপনে কথা বলবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে একদল লোক তখন তাদের প্রভুপালকের এতো নিকটবর্তী হবে যে, পর্দা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্ তাদের এক একজনকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি পৃথিবীতে এই এই অপকর্মগুলো করোনি? তারা বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি সেগুলোকে মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখেছিলাম। আর আজ এগুলোকে মাফ করে দিলাম। এরপর তাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের ডান হাতে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেয়া হবে— 'হাউলায়িললাজীনা কাজজাবু আ'লা রব্বিহিম আলা লা'নাতুল্লহি আ'লাজ্ জলিমীন' (এরা সে সব লোক যারা অসত্যারোপ করেছিলো তাদের পালনকর্তার উপর। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।

এরপর ৮৮ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেদিন কোন কাজেই আসবেনা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি'।

এরপরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে'। এখানে 'ক্বলবিন সালিম' অর্থ শিরিক ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হৃদয়। এরকম প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে যে পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে এমন নয়। কারণ অল্পবিস্তর পাপ মানুষের থাকেই। বাগবী লিখেছেন, এটাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের অধিকারী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটচারীরা। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, পুণ্যবান-পাপী সকল প্রকার বিশ্বাসীরা প্রশান্ত হৃদয় বিশিষ্ট। আবু ওসমান নিশাপুরী বলেছেন, সুন্নতের অনুসারী এবং বেদাত থেকে

বিমুখ ব্যক্তিরাই সালিম কলব বিশিষ্ট। অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী যারা, তাদের অন্তঃকরণই প্রশান্ত। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— ওই দিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না, উপকারে আসবে কেবল তাদের যাদের রয়েছে প্রশান্ত হৃদয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্ম, যেমন স্বজনদের সঙ্গে সদাচার, অতিথি সৎকার, নিরন্নকে অন্নদান ইত্যাদি তাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না, যেহেতু সে বিশ্বাসী নয়। এমন কি তার সন্তান যদি নবীও হন, তবুও তার কোনো লাভ হবে না। কারণ কোনো নবীই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'নবী এবং বিশ্বাসীগণের জন্য বৈধ নয় যে, তারা অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, যদিও তারা হয় নিকটাত্মীয়'।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, মহাবিচারের দিবসে নবী ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে দেখতে পাবেন ধূলিধূসরিত অবস্থায়। বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অনুসরণ করুন? পিতা বলবেন, আজ আমি তোমার অনুগত। নবী ইব্রাহিম প্রার্থনা করবেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি অঙ্গীকার করেছিলে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। আজ আমার জনয়িতা দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর অবমাননা কি আমার অবমাননা নয়? আল্লাহ্ বলবেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জান্নাত হারাম। এরপর তাঁর প্রতি নির্দেশ ঘোষিত হবে, তোমার পায়ের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি তাঁর দৃষ্টি অধোমুখী করলে দেখতে পাবেন, একটি হিংস্র ও লোমশ মাংশাসী জন্তুকে দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। নবী ইব্রাহিম তখন হয়ে যাবেন নির্বাক, নির্বিকার। শোনো, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র পথে পুণ্যার্জনের আশায় যে সম্পদ ব্যয় করে, তার বিনিময় সে অবশ্যই পাবে। আর তার পুণ্যবান সন্তান-সন্ততিরাও সেদিন তাদের জন্য করবে সুপারিশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা।

সূরা শুআরা : আয়াত ৯০—১০১

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ○ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ○ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ○ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ○ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ○ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ○ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ○ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ○ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ○

❒ সাবধানীদিগের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত,

❒ এবং পথভ্রষ্টদিগের জন্য উন্মোচিত করা হইবে জাহান্নাম;

❒ উহাদিগকে বলা হইবে, 'তাহারা কোথায় তোমরা যাহাদিগের ইবাদত করিতে

❒ 'আল্লাহের পরিবর্তে? উহারা কি তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারে? না, উহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম?'

❒ অতঃপর উহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া,

❒ এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও।

❒ উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে,

❒ আল্লাহের শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম,

❒ 'যখন আমরা তোমাদিগের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম।'

❒ 'আমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করিয়াছিল।'

❒ 'পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপারিশকারী নাই।'

❒ এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নাই!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাবিচারের দিবসে বিচারস্থল থেকেই পৃথিবীতে পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরা দেখতে পাবে যথাক্রমে জান্নাত ও জাহান্নাম। তারা তখন সকলেই বুঝতে পারবে তাদের আপনাপন গন্তব্য সুনিশ্চিত। বায়যাবী লিখেছেন, প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উযলিফাত' এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'বুররিযাত'। উভয় শব্দ আল্লাহ্‌তায়ালার দৃঢ় অঙ্গীকারজ্ঞাপক। অর্থাৎ বিষয়টির অন্যথা অসম্ভব।

পরের আয়াতদ্বয়ের (৯২, ৯৩) মর্মার্থ হচ্ছে— পথভ্রষ্টদেরকে তখন বলা হবে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যে সকল মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করতে, তারা কি এখন তোমাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে, তারা নিজেরাই কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? সুতরাং তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা সকলেই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৯৪, ৯৫) মর্মার্থ হচ্ছে—অতঃপর সেই সকল বাতিল উপাস্য ও তাদের উপাসকদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে। নিক্ষেপ করা হবে ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'ফাকুবকিবু' কথাটির অর্থ করেছেন— জাহান্নামের মধ্যে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। মুজাহিদ অর্থ করেছেন,

তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে। মুকাতিল বলেছেন, ঠেলে ফেলে দেয়া হবে। জুজায বলেছেন, একজনকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অপরজনের উপর। কুতাইবী বলেছেন, মাথা নিম্নমুখী করে ফেলে দেয়া হবে দোজখে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'কাব্বাহু' অর্থ উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন— 'আকাব্বাহু ওয়া কাবকাবাহু ফাআকাব্বাহু' (তাকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর সে পড়ে গিয়েছে উপুড় হয়ে)। অর্থাৎ 'কাব্বা' ও 'কাব্কাবা' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। বায়যাবী লিখেছেন, 'কাবকাব' এর দ্বিতীয় 'কাফ' অক্ষরটি পুনরাবৃত্তিজ্ঞাপক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, সে গড়াতে গড়াতে পতিত হবে দোজখের তলদেশে।

'ইবলিসের বাহিনীর সকলকেও' অর্থ যে সকল জ্বিন ও মানুষ ইবলিসের অনুসারী তাদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিসের বংশোদ্ভূতদেরকে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯) মর্মার্থ হচ্ছে— প্রতিমাপূজকেরা সেখানে প্রতিমাগুলোর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আল্লাহ্র শপথ! পৃথিবীতে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রভুপালনকর্তার সমকক্ষ মনে করে কতোইনা বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম। আর আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো শয়তান, পুরোহিত ও বিভ্রান্ত সমাজপতিরা। উল্লেখ্য, সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হবে প্রতিমাগুলো ও তাদের পূজারীরা। আল্লাহ্ তখন জড়প্রতিমাগুলোকে জীবন দান করবেন। অথবা বর্ণিত বিতর্ক উপস্থাপন করবে কেবল পূজারীরা। প্রতিমাগুলো থাকবে পূর্বের মতোই অপ্রাণ। সুতরাং এখানে 'বিতর্ক করবে' কথাটির অর্থ হবে আক্ষেপ করবে। অর্থাৎ ওই নিথর মূর্তিগুলোর সামনে তারা আক্ষেপে জর্জরিত হয়ে স্বীকার করবে যে, তোমাদেরকে উপাস্য মনে করেই আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আর শয়তান, পুরোহিত ও অংশীবাদী সমাজপতিরাই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বিভ্রান্তির দিকে। কালাবী বলেছেন, এখানে 'দুষ্কৃতিকারীরা' অর্থ নেতৃস্থানীয় অংশীবাদীরা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০০, ১০১) মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! আজ আমরা অসহায়। বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী বন্ধুরূপে আজ রয়েছে নবী, ফেরেশতা ও সৎকর্মপরায়ণেরা। অথচ আমাদের পক্ষে আজ কেউই নেই।

এখানে 'শাফিয়ীন' (সুপারিশকারীগণ) বহুবচনে এবং 'সদিক্ব' (বন্ধু) একবচনে ব্যবহার করার কারণ থাকতে পারে কয়েকটি। যেমন— ১. সাধারণতঃ সুপারিশকারী হতে পারে অনেক, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হয় খুব কম। ২. অনেক সুপারিশকারীর চেয়েও একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদের প্রচেষ্টায় থাকে অধিকতর গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসা। ৩. 'সদিক্ব' শব্দটি একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে

ব্যবহার্য। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, ফাউল ও ফায়ীলের ওজনের ব্যবহার হয় একবচন ও বহুবচনে। ৪. 'সদিক্ব' প্রকৃতপক্ষে 'জানীন' ও 'সাহীল' এর মতো ধাতুমূল ও বিশেষণবাচক,আর এরকম মূল শব্দের একবচন ও বহুবচনের শব্দরূপ একইরকম। প্রকৃত কথা হচ্ছে ধাতুমূলের বহুবচন হয়ই না। 'হামীম' অর্থ সহৃদয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটির অর্থ নিকটজন। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে আসীর এর ওজনে। এর বহুবচন 'আহমা'। শব্দটি বহুবচনার্থে এবং স্ত্রীলিঙ্গবাচকরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আজ আমাদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, নিকটাত্মীয়ও নেই, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'ওই দিন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাক্বীগণ ব্যতীত'। অর্থাৎ মুত্তাক্বীরা সেদিন হবে একে অপরের বন্ধু।

হজরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীদের কেউ কেউ বলবে, আমার অমুক বন্ধু কোথায় গেলো? ওই সময় তার ওই বন্ধু জাহান্নামে থাকলেও নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হোক। ওই সময় অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে 'আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই'। হাসান বলেছেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করো। কেননা পরকালে তারা হবে সুপারিশকারী।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০২, ১০৩, ১০৪

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

❒ 'হায়, যদি আমাদিগের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসী হইয়া যাইতাম!'

❒ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বিশ্বাসী নহে।

❒ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা আরো বলবে, হায়! যদি একটিবার আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমরা হয়ে যেতাম বিশ্বাসী। এখানে বাক্যের প্রথমেই ব্যবহৃত হয়েছে 'ফালাও'। উল্লেখ্য, 'লাও' হচ্ছে আকাংখাজ্ঞাপক।

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— ' এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্তে রয়েছে মহাসত্যের মহানিদর্শন। যে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু ও সদুপদেশাকাংখী তার জন্য তাঁর জীবনালেখ্য ও কর্মকুশলতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়ত্বের এবং সৃষ্টিরহস্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কতো গভীর ছিলো তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানবপ্রেম। কতো শানিত ও মর্মস্পর্শী ছিলো বচনামৃত। সত্যের প্রতি আমন্ত্রণের পন্থা ছিলো তাঁর কতো অপরূপ। অসত্যের বিরুদ্ধাচরণের ভঙ্গিটিও ছিলো তাঁর কতো অসাধারণ।

কোরআন মজীদে হজরত ইব্রাহিমের ঘটনা সত্যিই উপস্থাপিত হয়েছে এক অনন্য ব্যঞ্জনায়। সত্যপ্রেমিকেরা তাঁর বৃত্তান্ত পাঠ করে ও শ্রবণ করে আপ্লুত না হয়ে পারেই না। তদুপরি তাঁর এমতো বৃত্তান্তের অভূতপূর্বে পরিবেশনা একথাটিও প্রমাণ করে যে, সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. সত্য নবী। কারণ অক্ষরের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে অক্ষরের এমতো অতুলনীয় বিন্যাস। অতএব একথা মানতেই হবে যে, কোরআন যেমন সত্য, তেমনি সত্য কোরআন ধারণকারীও।

এরপরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— এই কোরআন অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্ অবশ্যই যে কোনো মুহূর্তে শাস্তিতে নিপতিত করতে পারেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিধর। মহাপ্রতাপশালী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যদি তারা ফিরে আসে, অথবা যদি ফিরে আসে তাদের সন্তান-সন্ততিরা। সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ তো সতত উন্মুক্ত। আর প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনিই তো করেন অনন্ত সম্ভাবনা ও অনুগ্রহরাজিতে ভরপুর। তিনি যে তাঁদের প্রতি পরম অনুগ্রহপরবশ।

সূরা শুআরা : আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

❒ নূহের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

❒ যখন উহাদিগের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল,

❒ 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না; আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

❒ 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'নুহের সম্প্রদায় রসুলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো'। এখানকার 'ক্বওমুন' (সম্প্রদায়) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। সুতরাং শব্দটি তাসগীরের (ন্যূনতা প্রকাশক) অবস্থায় 'কুয়াইমাতুন' হতে পারতো। এভাবে প্রকাশ করা যেতো তায়ে তানীসকে। আর 'আল মুরসালীন' (রসুলগণ) বহুবচনের শব্দরূপ হলেও জাতিবাচক অর্থ প্রকাশক। যেমন বলা হয় 'ফুলানুন ইয়ারকাবুনা খইলা' (অমুক ব্যক্তি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে) এমতাবস্থায় লোকটি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেও 'ইয়ারকাবুনা খইলা' বলা যাবে। অথবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত নুহের সম্প্রদায় সকল রসুলকেই অস্বীকার করতো। তাই এখানে ব্যবহৃতা হয়েছে বহুবচনার্থক 'আল মুরসালীন'।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আবু সাঈদ এরকম বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন 'কাজ্জাবাত ক্বওমু নুহি লিল্ মুরসালীন', আর এক স্থানে বলেছেন 'কাজ্জাবাত ছামুদুলিল মুরসালীন'। অথচ হজরত নুহের সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের জন্য রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন একজন করে। হাসান বসরী একথা শুনে বললেন, প্রত্যেক রসুল প্রেরিত হন একই বিশ্বাস ও ধর্মের একই মূলনীতি নিয়ে। তাই তাঁদের যে কোনো একজনকে অস্বীকার করার অর্থ সকলকেই অস্বীকার করা। আর সে কারণেই তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি একজন করে রসুল প্রেরিত হলেও ব্যবহৃত হয়েছে জাতিবাচক ও বহুবচনার্থক 'আলমুরসালীন'।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের ভ্রাতা নুহ তাদেরকে বললো, তোমরা কি সাবধান হবে না?' এখানে 'তাদের ভ্রাতা' অর্থ তাদের বংশসম্পৃক্ত ভ্রাতৃস্থানীয়, ধর্মীয় ভ্রাতা নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১০৭, ১০৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ তাদেরকে আরো বললেন, আমিতো তোমাদের জন্য বিশ্বাসভাজন বার্তাবাহক। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র অসন্তোষের ভয়ে বিগ্রহবন্দনা পরিহার করো। আশ্রয় করো আমার আনুগত্যকে।

এখানে 'বিশ্বস্ত রসুল' (রসুলুন আমীনুন) অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের রক্ষক, আমানতদার। আর তোমাদের মধ্যেও আমার সংরক্ষকত্বক গুণ ও সত্যবাদিতা সুবিদিত।

'আমার আনুগত্য করো' অর্থ প্রত্যাদেশিত যে বিধান আমি তোমাদের সামনে প্রচার করি, আনুগত্য করো সেই বিধানের।

এরপরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটেই আছে'। একথার অর্থ— হজরত নুহ তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানালেন এই মর্মে যে, দ্যাখো, সত্যপ্রচারের যে শ্রম আমি দিয়ে চলেছি তার জন্য আমি পার্থিব প্রতিদানাকাংখী নই, আমার শ্রমের বিনিময় তো জমা রয়েছে আমার, তোমাদের ও মহাবিশ্বের প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে। সুতরাং ভেবে দেখো আমার আনুগত্য তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক কিনা। আমি তো যেমন আমানতদার, তেমনি নির্লোভ। সুতরাং তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবেনা কেনো?

শেষোক্ত আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো'। বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে বক্তব্যকে দৃঢ়তা প্রদানার্থে এবং অতিশয় গুরুত্ব আরোপনার্থে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬

قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ○ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ○ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ○ إِنْ
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ○

❒ উহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব যখন দেখিতেছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে?'

❒ নূহ বলিল, 'উহারা কী করিত তাহা আমি জানি না।'

❒ 'উহাদিগের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে!'

❒ 'বিশ্বাসীদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে।'

❒ 'আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

❒ উহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হইবে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো যখন দেখছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?' এখানে 'আরজালূন'

অর্থ বিত্তহীন, মর্যাদাহীন। বায়যাবী লিখেছেন, যার মর্যাদা ও সম্পদ কম তাকে বলে 'আরজালূন'। বাগবী শব্দটির অর্থ করেছেন, ইতর শ্রেণীর লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ স্বর্ণকার। ইকরামা বলেছেন, তাঁতী ও মুচি।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত নুহের সম্প্রদায়ের উক্তিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিলো নির্বোধ। কারণ পার্থিব সম্মান ও সম্পদকেই তারা মনে করতো আভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রতীক। তাই তাদের ধারণা হয়েছিলো, ব্রাত্যজনেরা নুহের অনুসারী হয়েছে পার্থিব কিছু প্রাপ্তির জন্য, অথবা জাতে ওঠার জন্য। চিন্তা-ভাবনা করে তাদের কেউ নুহের ধর্মমতানুসারী হয়নি। এমতো অপধারণার বশবর্তী হয়েই তারা ভেবে বসেছিলো, নুহের ধর্মমত অভিজাতদের জন্য নয়।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১১২, ১১৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ জবাব দিলেন, আমার অনুসারীরা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, না বিত্তলোভী তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। আল্লাহ্ যথাসময়ে তাদের, তোমাদের ও আমার হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনিই সকলের অন্তরের গোপনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। একথা তোমরা জানো না, জানলে এভাবে নির্বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিহীনদের মতো কথা বলতে পারতে না। ফার্‌রা কথাটির অর্থ করেছেন— যদি তোমরা জ্ঞানী হতে, তবে ব্যক্তিগত কারণে তাদেরকে হীন মনে করতে না। জুজায বলেছেন, ধর্মীয় সম্মান পেশার উপরে নির্ভরশীল নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১১৪, ১১৫) মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলো, তাই নবী নুহ তাদেরকে বললেন, যারা বিশ্বাসবান, তারা সম্মানার্হ, বিতাড়নের পাত্র তারা নয়। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করাই আমার দায়িত্ব। তাই অভিজাতদের আবদারে অনভিজাতদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার জন্য অনাধিকার চর্চা।

জুহাক বলেছেন, এখানকার 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে শেষোক্ত বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি তো সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সাবধানকারী। সুতরাং তোমাদের সন্তোষ সাধনার্থে আমি বিশ্বাসবানদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

এরপরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে নুহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে'। মুকাতিল, কালাবী ও জুহাক এখানকার 'মারজুমীন' কথাটির অর্থ করেছেন 'মাশতুমীন'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হজরত নুহের নবীসুলভ প্রজ্ঞা ও প্রতর্কাস্ত্রের সামনে

টিকতে না পেরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। রোষভরে বললো, হে নুহ! তোমার ধর্মপ্রচার যদি তুমি বন্ধ না করো, তবে আমরা তোমার প্রতি বর্ষণ করবো অকথ্য গালাগালি ও ভর্ৎসনা।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

❒ নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।'

❒ 'সুতরাং আমার ও উহাদিগের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে-সব বিশ্বাসী আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

❒ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিলো তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌ-যানে।

❒ তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

❒ ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুদীর্ঘকাল ধরে সত্যধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত রইলেন হজরত নুহ। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। এক সময় আল্লাহ্র প্রিয় নবী নিশ্চিত হলেন যারা ইমান আনবার তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে, অবশিষ্টরা কস্মিনকালেও আর ইমান আনবে না, তখন তিনি এ বিষয়ে একটি মীমাংসা কামনা করলেন। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! অবাধ্যরা বার বার আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই চলেছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দাও। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করো আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে। হজরত নুহের প্রার্থনা গৃহীত হলো। প্রত্যাদেশানুসারে তিনি নির্মাণ করলেন একটি বৃহৎ তরণী। ওই তরণীতে অনুসারীগণকে নিয়ে

আরোহণ করলেন মহাপ্লাবনের প্রাক্কালে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা উচ্চভূমিতে ও পর্বতশিখরে উঠে বাঁচতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ভয়াবহ প্লাবনে নিমজ্জিত হলো সারা পৃথিবী। পরিত্রাণ লাভ করলেন কেবল হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা।

অবাধ্য ও দুর্বিনীত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বছরের পর বছর হজরত নুহের উপরে চালিয়েছিলো অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু এ সকল অত্যাচারের কথা তিনি তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেননি। উল্লেখ করেছেন কেবল এই কথাটি 'আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। একথার অর্থ— আমি তোমার যে বাণীর প্রচারক, সেই সত্য বাণীকেই তো তারা ক্রমাগত মিথ্যা সাব্যস্ত করে চলেছে। সুতরাং তাদের সঙ্গে আমার ও আমার অনুচরবর্গের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা আমি চাই।

এখানে 'আল বাক্বীন' অর্থ অবশিষ্টরা। অর্থাৎ হজরত নুহের তরণীতে যারা আরোহণ করেনি, তারা। বলাবাহুল্য, তারা সকলেই মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিলো পৃথিবী থেকে। তারা সকলেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১২১, ১২২) মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় নবী নুহ ও মহাপ্লাবনের ইতিবৃত্তের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পরাক্রম ও দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সলিল সমাধিপ্রাপ্তি এবং নৌকারোহী বিশ্বাসীগণের উদ্ধারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে নিদর্শন তাঁর অপার পরাক্রমের ও দয়ার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের অভিযাত্রা যেহেতু বিশ্বাসের দিকে নয়, তাই তারা বিষয়টির অন্তর্নিহিত রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় চিরতরে।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯

كَذَّبَتْ عَادُ ِالْمُرْسَلِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○

❑ আদ-সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

❑ যখন উহাদিগের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্যে কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে।'

❒ 'তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ;'

❒ 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে।'

আদ সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের নাম আদ। কিন্তু এখানে তার নাম উচ্চারণ করে বুঝানো হয়েছে তার সম্প্রদায়কে। সেকারণেই ব্যবহৃত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপে 'কাজ্‌জাবাত'। 'আখুহুম' অর্থ সম্প্রদায়সম্পৃক্ত ভ্রাতা, ধর্মসম্পর্কিত ভ্রাতা নয়। 'আলা তাত্তাকুন' অর্থ সাবধান হও শিরিক থেকে, গ্রহণ করো আল্লাহ্‌র এককত্বের বিশ্বাসকে। আর 'রসুলুন আমীন' অর্থ বিশ্বাসভাজন রসুল। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপথচ্যুত আদ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম আমার প্রিয় নবী সালেহ্‌কে। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তো তোমাদেরই সম্প্রদায়ভূত। আমি তো তোমাদের প্রকৃত সুহৃদ। অতএব আমার কথা মান্য করো। আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বজগতের প্রভুপালকের বচনবাহক। আমি এ দায়িত্বে বিশ্বস্ত। আর তোমাদের কাছেও আমার বিশ্বস্ততার বিষয়টি অবিদিত নেই। হে আমার সম্প্রদায়! সাবধান হও। পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। গ্রহণ করো এক আল্লাহ্‌র চিরঅক্ষয় বিশ্বাস। ভয় করো কেবল তাঁকে এবং আনুগত্য করো আমার। কালাবী বলেছেন, এখানে 'তোমাদের এক বিশ্বস্ত রসুল' কথাটির অর্থ— হজরত সালেহ্‌ তাদেরকে বললেন, রেসালতের দাবি উত্থাপনের পূর্বেও তো তোমরা আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলে মানতে, তথাপি তোমরা কেনো মেনে নিচ্ছো না আমার রেসালাতের শুভসমাচারকে।

পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে'। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী যুগের মনিষীবৃন্দ বলেছেন, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারের পারিশ্রমিক গ্রহণ অসিদ্ধ।

এরপরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছো।' একথার অর্থ— হজরত হুদ তাদেরকে আরো বললেন, তোমরা তো বিনা প্রয়োজনে ও কারণে অধিকাংশ উচ্চ স্থানে প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করছো।

ওয়ালুবির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'রিউন' অর্থ উচ্চস্থান। জুহাক ও মুকাতিল অর্থ করেছেন, প্রতিটি পথ। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। মুজাহিদ বলেছেন, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলে 'রিউন'। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, এর অর্থ প্রমোদগৃহ। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটি 'কাস্‌রা' ও 'ফাতহা' যুক্ত হলে অর্থ হবে, মৃত্তিকার উচ্চ অংশ অথবা পর্বতের সুড়ঙ্গপথ, কিংবা পার্বত্যভূমির পানি নির্গমনের পথ। 'রী' কাস্‌রা সহযোগে অর্থ হবে, ইহুদীদের উপাসনাগৃহ, ধর্মশালা এবং কবুতরের ঘর। আর এখানকার 'আয়াতান' অর্থ স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ।

এরপরের আয়াতে (১২৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে'। একথার অর্থ— তোমাদের এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাসাদ পৃথিবীতে যেমন নিরর্থক, তেমনি অনুপকারী আখেরাতে। কী ভেবেছো তোমরা? এমতো নির্মাণ কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করে রাখবে? তোমরা যেমন মৃত্যুবরণ করবে, তেমনি একসময় এগুলোও হয়ে যাবে ধূলিসাত।

আদ সম্প্রদায় তারকার অবস্থান দেখে নির্ণয় করতো তাদের ভ্রমণের গতিপথ। তাই পথের দিশা নির্ণায়করূপে তারা তাদের সুউচ্চ প্রাসাদমালাগুলো ব্যবহার করতো। হজরত হুদ তাদের ওই নির্মাণকে বলেছিলেন নিরর্থক। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু মিনারগুলিতে উঠে পর্যবেক্ষণ করতো পথিকদের গতিবিধি। আর এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে করতো হাসিঠাট্টা।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আদেরা কবুতর পালতো, আর উঁচু উঁচু মিনারে সেগুলোর জন্য স্থাপন করতো টঙ। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিলো অনর্থক কর্ম। তাই হজরত হুদ বলতেন, এগুলো কি তোমাদেরকে চিরস্থায়ী করবে?

আমি বলি, পৃথিবীপূজকদের রীতি এরকমই। তারা স্মৃতিকে অক্ষয় করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করে বিভিন্ন প্রকার ভাস্কর্য ও স্তম্ভ। এধরনের লোক সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'তোমাদের কি জানা নেই, তোমাদের প্রভুপালক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণকারী আদ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কীরকম আচরণ করেছেন'? রসুল স.ও জাকজমকপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ পছন্দ করতেন না। তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তাকে নিয়োজিত করে দেন মাটি ও পানি মর্দনের কাজে (ইট তৈরীর কাজে)। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত

আবুল বাশার আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দার লাঞ্ছনা কামনা করেন, তখন সে তার সম্পদ ব্যয় করে দালান কোঠা নির্মাণের কাজে। হজরত ওয়াসিলা ইবনে আস্কা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি প্রাসাদ তার মালিকের জন্য বিপদ ও আযাব, ওই প্রাসাদ ব্যতীত, যা এরকম। একথা বলে তিনি প্রসারিত করলেন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় (ইশারায় দেখালেন—যা প্রয়োজনীয়)।

রসুল স. একবার বাজারের দিকে গমনকালে দেখতে পেলেন একটি গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদৃশ্য ভবন। বললেন, এটা কার? সঙ্গী সাহাবী বললেন, অমুক আনসারীর। তিনি স. নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পরে যখন ওই ভবনের মালিক তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম বললেন, তখন তিনি স. সালামের জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওই সাহাবী বুঝতে পারলেন, তিনি স. তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু তার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। পরে অন্যদের কাছে জানতে পারলেন, আসল ঘটনা কী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভবনটির নিকটে গিয়ে সেটাকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার হুকুম দিলেন শ্রমিকদেরকে। কিছুদিন পর রসুল স. সেদিকে গমন করে ভবনটি না দেখতে পেয়ে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, দালানটির কী হলো। সঙ্গীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার অপ্রসন্নতার কথা জানতে পেরে মালিক দালানটিকে ধূলিসাত করে দিয়েছেন। তিনি স. বললেন, শোনো, প্রত্যেক দালান তার মালিকের জন্য বিপদ ও শাস্তি।

হজরত আনাস থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি ইমারত মহাবিচারের দিবসে তার মালিকের জন্য হবে আক্ষেপ ও শাস্তির কারণ, কেবল মসজিদ ও বাসগৃহ ব্যতীত।

আলোচ্য আয়াতের 'মাসানিয়া' শব্দটির অর্থ পানির চৌবাচ্চা, সুদৃঢ় অট্টালিকা, দুর্গ। আর 'লায়াল্লাকুম তাখলুদুন' অর্থ যেনো তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

মাসআলাঃ পার্থিব বিষয়ে অতিরিক্ত আকাংখা মাকরুহ, পরিমিত আকাংখা মোস্তাহাব। হজরত ওমর বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার আমার শরীরে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে আজ্ঞা করলেন, আবদুল্লাহ্ ! দুনিয়ায় বসবাস কোরো প্রবাসীরূপে মুসাফিরি হালে এবং নিজেকে গণ্য কোরো মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। বোখারী।

হজরত ওমর বর্ণনা করেন, একবার আমি নির্মাণ কার্যে রত ছিলাম। ইত্যবসরে সেখানে রসুল স. উপস্থিত হয়ে বললেন, কী করছো? আমি বললাম, গৃহ মেরামতের কাজ। তিনি স. বললেন, নির্ধারিত নির্দেশ (মৃত্যু) তো এর আগেই এসে পড়তে পারে। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীভূত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. সফরের সময় পানি ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি ফেলে দিতেন। পথে আবার ওজুর প্রয়োজন হলে করে নিতেন তায়াম্মুম। এরকম পরিস্থিতিতে আমি একবার বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একটু অগ্রসর হলেই তো পানি পাওয়া যাবে। তিনি স. বললেন, অতদূর যাওয়ার আগে আমার যে শেষযাত্রার সিদ্ধান্ত নেমে আসবে না, সে সম্পর্কে কি তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারো? হাদিসটি বাগবী বর্ণনা করেছেন তাঁর 'শরহে সুন্নাহ্'য় এবং ইবনে জাওজী তাঁর 'কিতাবুল ওয়াফা'য়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৩০—১৪০

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○ وَاتَّقُوا الَّذِي
أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ○ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ○ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ
تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ○ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ○ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

❒ 'আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক নিষ্ঠুরভাবে।'

❒ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান।'

❒ 'তোমাদিগকে দিয়াছেন আনয়াম ও সন্তান-সন্ততি,

❒ 'উদ্যান ও প্রস্রবণ',

❒ 'আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।'

❒ উহারা বলিল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদিগের নিকট সমান।'

❒ 'আমাদিগের এই সব কর্ম পূর্ব পুরুষদিগেরই রীতিনীতি মাত্র,

❒ আমরা শাস্তি পাইব না।'

❒ অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

❒ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াত ষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা তো নিষ্ঠুর, নির্দয়, অহংকারী এবং বিনা কারণে মানুষ বধকারী। অতএব, সংযত হও, ভয় করো আল্লাহ্‌কে। আর আনুগত্য করো আমার আনীত ধর্মমতের। ভয় তো করতে হবে তোমাদেরকে তাঁকেই, যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শতসহস্র নেয়ামত। এসকল কথা তোমাদের অজানাও নয়। যেমন ধরো পশুপাল, উদ্যান ও প্রস্রবণ। এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে কীরূপ অনড়! তাই তো আমার আশংকা, মহাবিচারের দিবসে তোমাদের অন্তহীন শাস্তি হয়তো অবধারিত।

এখানে 'জাব্বারীন' অর্থ নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, শব্দটির অর্থ অহংকারী, ওই অন্তর যা নির্মম এবং অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সংঘটক। 'ইননি আখাফু আ'লাইকুম আ'জাবা ইয়াওমিন আ'জীম' অর্থ হে আমার স্বজাতি! যদি তোমরা আমার আনুগত্য না করো, তবে আশংকা হয় মহাবিচারের দিবসে তোমাদের দণ্ড সুনিশ্চিত। এরকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— তারা হজরত হুদের সদুপদেশ মান্য করলো না। বরং দর্পভরে বললো, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না-ই দাও, আমরা অনড় থাকবো আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতে। আমরা যা কিছু করি তা আমাদের স্বসৃষ্ট কিছু নয়। আমাদের সকল রীতি-নীতি প্রজন্ম পরম্পরাগত। আর শাস্তির কথা বলছো ? তাতো আমাদের হবেই না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন জন্মেছেন, তেমনি মরেও গিয়েছেন। আমাদের জন্ম এবং জীবনও একসময় পর্যবসিত হবে মৃত্যুতে। তারা যেমন পুনরুত্থিত হননি, তেমনি আমরাও হবো না। সুতরাং আমাদের শাস্তি হবে কীভাবে?

ক্বারী কুসাই, ক্বারী আবু জাফর এবং ক্বারী আবু ওমরের উচ্চাররীতিতে এখানকার 'খুলুক্ব' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'খুল্‌ক্ব'রূপে। এমতো উচ্চারণের কারণে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তুমি আমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছো, তা পূর্বযুগের মানুষের স্বরচিত উক্তি। এগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথন। 'খুলুক্ব' অর্থ মিথ্যা রচনা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়াখলুক্বুনা ইফকান (তোমরা মিথ্যা রচনা করেছো)।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ের (১৩৯, ১৪০) আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তারা আমার প্রিয় নবী হুদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে আমার শক্তির সর্বত্রগামিতার শিক্ষণীয় নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তো ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর আমি

তাফসীরে মাযহারী । ৬৪২

তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রকাশ করি আমার মহাপ্রতাপ। কারণ আমি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি বর্ষণ করি অপরিমেয় দয়া। কারণ আমি যে পরম দয়াপরবশ।

এখানে 'তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আদ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অথবা কমপক্ষে যদি অর্ধেকও ইমান আনতো, তবে তারা রক্ষা পেতো সর্বগ্রাসী আযাব থেকে। কারণ ইমানদারদের উপস্থিতির কল্যাণে কাফেরেরাও বেঁচে যায় পার্থিব শাস্তি থেকে। কুরায়েশ অংশীবাদীরা একারণেই বেঁচে গিয়েছিলো আল্লাহ্‌র আযাব থেকে। সেকথাই বিধৃত হয়েছে এক আয়াতে এভাবে— 'যদি বিশ্বাসী নর-নারীরা না থাকতো, তবে অবশ্যই আমি ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে অবতীর্ণ করতাম ভয়াবহ শাস্তি'।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ۙ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ

❒ সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

❒ যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ 'অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর,'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

❒ 'তোমাদিগকে কি পার্থিব ভোগসম্পদের মধ্যে নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া হইবে,

❒ 'উদ্যান, প্রস্রবণ,

❒ 'ও শস্যক্ষেত্রে এবং মঞ্জরিত খর্জুর বাগানে?

আলোচ্য আয়াতগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ সম্প্রদায়ও আমাকর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে অস্বীকার করেছিলো। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরই সম্প্রদায়ভূত সালেহ্‌কে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার

জাতিগোষ্ঠীভূত জনতা, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসুল। আমি যে বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য, সে কথা তোমরাও জানো। তাই বলি, আমার কথা মান্য করো। ভয় করো আল্লাহ্‌কে এবং মান্য করো আমার আনীত ধর্মমতকে। সত্যধর্ম প্রচারের শ্রমজনিত বিনিময় তো আমি তোমাদের নিকট চাই না। আমার প্রভুপালকই যথাসময়ে আমাকে যথাবিনিময় প্রদান করবেন। তোমরা ভেবেছো কী, তোমাদের পার্থিব সম্ভোগ-সম্ভার কি চিরস্থায়ী? এই কানন, স্রোতস্বতী, শস্যপ্রান্তর ও ফলভারাবনত খর্জুর উদ্যান?

এখানে 'তালউ'হা হাদ্বীম' অর্থ মঞ্জরিত খর্জুর কানন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ কোমল। আবুল আলীয়ার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ উপকারপ্রদায়ক, পরিপুষ্ট। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন,নরম। হাসান বলেছেন, ঝুলন্ত। মুজাহিদ বলেছেন, যে খেজুরের খোসা শুকিয়ে যায়, ওই খেজুরকে বলে হাদ্বীম', আর সুপক্ক খেজুরকে বলে 'হাদ্বীম'। জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ স্তরে স্তরে, সারিবদ্ধরূপে, অর্থাৎ বহুলপরিমাণে। অভিধানবেত্তাগণ বলেন, 'হাদ্বীম' ওই খোসা, যা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই অভ্যন্তরস্থিত হয়। আজহারী বলেছেন, কথাটির অর্থ, একটির সঙ্গে অপরটি মিলিতরূপে। কেউ কেউ বলেছেন, 'হাদ্বীম' অর্থ 'হা-যীম' (হজম কারক)।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

❒ 'তোমরা তো নৈপুণ্যর সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ।'
❒ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর
❒ এবং সীমালংঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না;
❒ ইহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।'

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী সালেহ্ তাদেরকে বললেন, হে আমার ঔদাসীন্যদীর্ন জাতিগোষ্ঠী! তোমরা তো পার্থিব নির্মাণকর্মে মগ্ন। পর্বতগাত্রে গৃহনির্মাণে তোমরা সুপটু। নির্মাণনৈপুণ্যের অহমিকা গ্রাস করেছে তোমাদের শুভবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও

আযাবের ভয়ে ভীত হও। অনুসরণ করো আমার আনীত ধর্মাদর্শের । আর যারা অলৌকিক উষ্ট্রী বধপর্বের অগ্রনায়ক, সেই সকল সীমালংঘনকারীদের কথায় কর্ণপাত কোরো না। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, শান্তি স্থাপনকারী তারা নয়।

এখানে 'ফারিহীন' অর্থ প্রস্তরকর্তনকর্মে পারদর্শী। ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন, যারা আপন কুশলতায় দর্পিত। সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ অত্যাশ্চর্য নির্মাতা। আখফাশ বলেছেন, এর অর্থ খুশী। লোভ-লালসাকেও প্রকাশ করা হয় 'ফারেহীন' শব্দটির মাধ্যমে। আবু উবায়দা বলেছেন, বক্তব্যটি এরকম— তোমরা আপন সৃজননৈপুণ্যে মদমত্ত, তাই সত্যবিমুখ।

'মুসরিফীন' অর্থ সীমালংঘনকারী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ অংশীবাদী। মুকাতিল বলেছেন, যে নয়জন মহাদুর্বৃত্ত আল্লাহ্‌র অলৌকিক উষ্ট্রটি বধ করেছিলো, তাদেরকেই এখানে বলা হয়েছে 'মুসরিফীন' (সীমালংঘনকারী)। 'ইউফসিদূন' অর্থ অশান্তি সৃষ্টিকারী। আর 'লা ইউসলিহূন' অর্থ যারা শান্তি স্থাপন করে না।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

قَالُوٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ○ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ○ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

❒ উহারা বলিল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্ত।'

❒ তুমি তো আমাদিগেরই মত একজন মানুষ, 'কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

❒ সালিহ্ বলিল, 'এই যে উষ্ট্রী, ইহার জন্য এবং তোমাদিগের জন্য আছে পানি পানের স্বতন্ত্র পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে;

❒ 'এবং উহাকে কোন ক্লেশ দিও না; দিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

❒ কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল, পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল।

❒ অতঃপর শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি তো যাদুগ্রস্ত'। একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা বললো, হে সালেহ্! তোমাকে তো যাদু করা হয়েছে। তাই তুমি আমাদেরকে অহেতুক কথা শোনাচ্ছো। এরকম অর্থ করেছেন মুজাহিদ ও কাতাদা। কিন্তু আবু সালেহ্ সূত্রে কালাবী অর্থ করেছেন, তারা বললো— তুমি তো প্রতারণাকবলিত। আরববাসীরা বলেন, 'সাহারাহু' (তাকে পানাহার করিয়ে বশ করা হয়েছে)। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— তুমিতো আমাদের মতোই পানাহার করো, সুতরাং তুমি তো ফেরেশতা নও। তাহলে তুমি আবার রসুল হতে পারো কীভাবে?

পরের আয়াতে (১৫৪) বলা হয়েছে— 'তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোনো একটি নিদর্শন উপস্থিত করো'। একথার অর্থ— তারা আরো বললো, হে সালেহ্! তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তোমার বিশেষত্বের প্রমাণ কোথায়? তোমার রেসালতের দাবিতে তুমি যদি সত্য হও, তবে আমাদেরকে তোমার বিশেষ একটি নিদর্শন দেখাও।

এরপরের আয়াতে (১৫৫) বলা হয়েছে— 'সালেহ্ বললো, এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের স্বতন্ত্র পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে'। একথার অর্থ— হজরত সালেহ্ তখন আল্লাহ্র কাছে মোজেজা প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি বড় পাথর ফেটে বের হলো একটি উষ্ট্রী। তিনি তখন বললেন, দ্যাখো, এই অলৌকিক উষ্ট্রীটি আমার রেসালতের প্রমাণ। সুতরাং তোমরা এর সঙ্গে অসৎ আচরণ কোরো না। এখন থেকে তোমাদের কূপের পানি পান করার জন্য পালাবণ্টন করা হলো এভাবে— একদিন পর একদিন এ কূপের পানি পান করবে যথাক্রমে এই উষ্ট্রী ও তোমাদের পশুগুলো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (১৫৬, ১৫৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, সাবধান! আল্লাহ্র এই অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে তোমরা কষ্ট দিয়ো না। যদি দাও, তবে তোমাদের উপরে এসে পড়বে সর্বগ্রাসী আযাব। কিন্তু অবাধ্যরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। একদিন সকলের সম্মতিক্রমে তাদের কয়েকজন মিলে বধ করে ফেললো প্রস্তরাগত অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে। তারপর অত্যাসন্ন আযাব দেখে আক্ষেপ করতে লাগলো।

এরপরের আয়াতের (১৫৮) মর্মার্থ হচ্ছে— তারপর তাদের উপরে এসে পড়লো মহাশাস্তি। ওই সর্বগ্রাসী শাস্তিতে সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটিত হলো চিরভ্রষ্ট ছামুদ সম্প্রদায়। তাদের ওই মূলোৎপাটনের ঘটনার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে প্রণিধাননীয় নিদর্শন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। কীভাবে পারবে? তাদের অধিকাংশই যে বিশ্বাসবিমুখ।

শেষোক্ত আয়াতে (১৫৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের যে কাহিনী আমি আপনাকে জানালাম, তাতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ অবাধ্যদের প্রতি প্রকাশ করেন তাঁর মহাপ্রতাপ। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর সাথে সাথে এ বিষয়টিও প্রমাণ হয়ে যায় যে, বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মেহেরবানীর সীমা পরিসীমা নেই। কারণ তিনি যে তাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র।

সুরা শুআরা ঃ আয়াত ১৬০—১৬৮

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ
مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۝

❒ লূতের সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল,

❒ যখন উহাদিগের ভ্রাতা লূত উহাদিগকে বলিল,'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তো তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

❒ 'আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

❒ 'মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিতই উপগত হও,

❒ এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যে-স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

❒ উহারা বলিল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে।'

❒ লূত বলিল, 'আমি তো তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি।'

আলোচ্য আয়াতসমূহের মর্মার্থ হচ্ছে— আমার প্রিয় নবী লুতের সম্প্রদায়ও আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকবৃন্দকে অস্বীকার করেছিলো। লুত ছিলেন তাদের স্বদেশী ভ্রাতা। তিনি বললেন, হে দেশবাসী! এখনো কি তোমাদের সাবধান হওয়ার সময় হয়নি? আমি যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শনকারী, সে কথা মেনে নেয়ার সময় কি এখনো আসেনি? আমার উপদেশ শোনো, ভয় করো আল্লাহ্র আযাবের এবং আনুগত্য করো আমার আদর্শের। একথা কস্মিনকালেও ভেবো না যে, পথপ্রদর্শনকর্মের পার্থিব পুরস্কার এবং কৃতিত্ব আমি তোমাদের নিকটে চাই। আমাকে তো পুরস্কৃত করবেন আমার, তোমাদের ও বিশ্বজগতের প্রভুপালক আল্লাহ্। ভেবে দ্যাখো, তোমাদের কর্মকাণ্ড কতো ঘৃণ্য, জঘন্য। আল্লাহ্পাক তোমাদের বৈধ যৌনচরিতার্থতার জন্য সৃষ্টি করেছেন রমণীকুলকে। অথচ তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে উপগত হও পুরুষের উপর। পশুরাও এরকম করে না। এখানো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, তোমরা সীমালংঘনকারী? সংযত হও। সাবধান হও। পরিত্যাগ করো ঘৃণ্য সমকামিতাকে। তওবা করো। তারা বললো, হে লুত! আমরা তোমাকে মানি না। সুতরাং তুমি আর আমাদেরকে উপদেশ দিতে এসো না। এর পরেও যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাকে নির্বাসন দান করবো। লুত বললেন, অসম্ভব। সত্যোচ্চারণ আমি করবোই। তোমাদের এই পাপাচারকে আমি ঘৃণা করি।

এখানে 'আখুহুম' (তাদের ভ্রাতা) অর্থ তাদের স্বদেশবাসী ভ্রাতা, বংশীয় কিংবা ধর্মীয় ভ্রাতা নয়। কারণ হজরত লুত যেমন তাদের বংশদ্ভূত কেউ ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না তাদের ধর্মমতানুসারী। 'মিন আযওয়াজিকুম' (তোমাদের জন্য রমণী) কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলক। সুতরাং এর অর্থ হবে পুরুষের সঙ্গে উপগত হওয়া তো যাবেই না, নারীদেরও ব্যবহার করা যাবে না যথাঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ। সুতরাং বুঝতে হবে আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের সঙ্গে যৌনচরিতার্থতা করা যাবে না পুরুষদের মতো করে সমকামের পদ্ধতিতে।

'আলমুখরজীন' অর্থ নির্বাসন দেয়া হবে, বিতাড়িত করা হবে স্বদেশভূমি থেকে। আর 'মিন্নাল ক্বলীন' অর্থ ঘৃণা করি, প্রসিদ্ধি লাভ করি তাদের মতো যারা তোমাদের এহেন অস্বাভাবিক ও অবৈধ কর্মে ঘৃণা পোষণ করে যশস্বী হয়।

সুরা শুআরা : আয়াত ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫

رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

❏ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে তাহা হইতে রক্ষা কর।'

❏ অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম

❏ এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❏ অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম।

❏ তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।

❏ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❏ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতমালার মর্মার্থ হচ্ছে— নবী লুত তখন প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! এই দুর্বিনীত ও দুরাচারেরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। সুতরাং তুমি এদের ঘৃণিত পরিবেশ থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো। আমি তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলাম। যথাসময়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে আমার আযাব থেকে রক্ষা করলাম, কেবল তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত। তাঁর ওই স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী এবং সমকামপ্রিয় জনতার সমর্থক। সে-ও ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের সাথে। তাদের উপরে আমি আপতিত করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি। ওই ভয়াবহ বৃষ্টিপাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো তাদের পুরো

জনবসতি। এ ঘটনার মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার পরাক্রমের এক অনন্য নিদর্শন। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। কারণ তাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। নিঃসন্দেহে সত্যবিমুখদের প্রতি আল্লাহ্‌র পরাক্রম অপার, দুর্বার। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অফুরন্ত বিশ্বাসীদের প্রতি। কারণ তিনি মহাপরাক্রান্ত এবং মহানুগ্রহপরবশ।

উল্লেখ্য, আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ শুরু হওয়ার আগেই নবী লুত প্রত্যাদেশানুসারে ওই জনবসতি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। সে পথ চলছিলো সকলের পশ্চাতে। আকাশ থেকে পতিত অসংখ্য পাথরের একটি আঘাত করেছিলো তাকে। আর ওই আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো সে। এখানে তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'এক বৃদ্ধা ব্যতীত'। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সে হজরত লুতের সঙ্গে বসতি থেকে বেরই হয়নি। ফলে অন্য অবাধ্যদের সঙ্গে সে-ও লাভ করেছে প্রস্তরসমাধি। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌ বলেছেন, তাদের উপরে পতিত হয়েছিলো গন্ধক ও অগ্নিবৃষ্টি।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৭৬—১৮৪

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۝ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

❒ শোয়াইব সম্প্রদায় রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল,

❒ যখন শোয়াইব উহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ 'আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।'

❒ 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।'

❒ 'আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।'

❒ 'মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে কম দেয় তাহাদিগের মত হইও না;'
❒ 'এবং ওজন করিরে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।'
❒ 'লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।'
❒ 'এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অরণ্যবাসীরাও ছিলো আমার বচনবাহকগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। তাদের প্রতি আমি প্রেরণ করেছিলাম আমার প্রিয় নবী শোয়াইবকে। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে অরণ্যবাসী! তোমরা কি আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমাদের অপকর্মসমূহ পরিত্যাগ করবে না? আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সংশোধনার্থে। আর আমার বিশ্বাসভাজনতার বিষয়টিও তোমাদের নিকট অবিদিত নেই। সুতরাং আমার শুভউপদেশ শোনো। ভয় করো আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য করো আমার। আর মনে কোরো না যে, এমতো সংশোধনকর্মের শ্রমফল আমি তোমাদের কাছে চাই। কখনোই নয়। আমি তো কেবল বিশ্বজগতের প্রভুপালয়িতার কাছেই শ্রমফল প্রত্যাশী। মাপে কম প্রদান মহাপাপ। সুতরাং তোমরা মাপে কম প্রদানকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। দাঁড়িপাল্লায় ওজন কোরো যথাযথরূপে। মানুষকে ঠকিয়ো না। পৃথিবীতে সৃষ্টি কোরো না বিপর্যয়। আর একথা ভুলে যেয়ো না যে, আল্লাহ্‌ই সৃজন করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে, যারা এখন বিগত।

এখানে 'আইকাহ্' অর্থ ঘনকণ্টকবিশিষ্ট বৃক্ষ। উল্লেখ্য, এরকম ঘনকণ্টকবিশিষ্টবৃক্ষপূর্ণ অরণ্যে বাস করতো আইকাহ্ সম্প্রদায়। স্থানটি ছিলো মাদিয়ান শহর থেকে দূরে অবস্থিত একটি আরণ্যক জনপদ। মাদিয়ানের অধিবাসী হজরত শোয়াইবকে প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদের সংশোধনার্থে।

'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না' অর্থ— কোরো না ছিনতাই, রাহাজানি, লুণ্ঠন। উল্লেখ্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কিন্তু বিপর্যয় পদবাচ্য নয়। তাই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা শাস্তিযোগ্য।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۙ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۚ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ

الصّٰدِقِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۚ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ
يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ
اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

❒ উহারা বলিল,'তুমি তো যাদুগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত;'

❒ 'তুমি আমাদিগেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অন্যতম।'

❒ 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদিগের উপর ফেলিয়া দাও।'

❒ সে বলিল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যাহা কর।'

❒ অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

❒ ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে।

❒ এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াত গুচ্ছের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই অরণ্যবাসীরা তাদের প্রতি প্রেরিত নবী শোয়াইবকে বললো, নিঃসন্দেহে তুমি যাদুগ্রস্ত। আর তুমি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। রাজা-বাদশাহ কিংবা ঐশ্বর্যশালী কেউ নও। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র রসুল হতে পারো না। তুমি মিথ্যাবাদী। সত্যবাদী যদি হও, তবে আকাশের একখণ্ড মেঘ আমাদের উপরে ফেলে দিয়ে দেখাও। শোয়াইব বললেন, তোমরা ওজনে ও মাপে কম দাও। লুট-তরাজ-রাহাজানি করো এবং অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো। এসকল কিছু আমার প্রভুপালনকর্তা জানেন। এ সকল অপকর্মের জন্য তিনি তোমাদেরকে কখন কোথায় কীভাবে শাস্তি দিবেন তা তিনিই জানেন। এ বিষয়টি আমার দায়িত্বভূত নয়। আমার দায়িত্ব তো কেবল তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাদি তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। দুরাচারেরা তবুও শোয়াইবকে বিশ্বাস করলো না। আরো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রইলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকে। তারপর একদিন তাদের উপরে নেমে এলো মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি। সে শাস্তি ছিলো বিকট, বীভৎস, ভয়ংকর। নিশ্চয় এই বৃত্তান্তে রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বগ্রাসী পরাক্রমের অভূতপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু তারা একথা বুঝবে

কীভাবে? তারা যে অতিমাত্রায় অবিশ্বাসী। আর আল্লাহ্ তো অবিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর মহাপ্রতাপ প্রদর্শনকারী। কারণ তিনি মহাপ্রতাপশালী। আর বিশ্বাসীদের প্রতি প্রদর্শনকারী অপরিমেয় দয়া। কারণ তিনি যে পরম করুণাপরবশ।

ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— একদিন শুরু হলো প্রচণ্ড দাবদাহ। তীব্র উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আশ্রয় নিলো তাদের ভূগর্ভস্থ গৃহসমূহে। কিন্তু সেখানে ছিলো আরো অধিক গরম। তাই তারা পুনরায় ওঠে এলো মাটির উপরে। অকস্মাৎ দেখলো অদূরে আকাশে ভাসছে একখণ্ড কালো মেঘ। মেঘের ছায়ায় স্বস্তিলাভের আশায় তারা অরণ্যাবাস ছেড়ে ছুটে গেলো সেদিকেই। সবাই যখন জড় হলো, তখন ওই মেঘমালা থেকে শুরু হলো অগ্নিবর্ষণ। ওই অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো অবাধ্যরা। এই কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে সুরা হূদের তাফসীরে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত সাতটি ইতিবৃত্তে নবীগণ ও তাদের আপনাপন অবাধ্য উম্মতের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ ছিলো রসুলে পাক স. এর প্রতি সান্ত্বনা। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে এই মর্মে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরায়ত স্বভাব এরকমই। তারা তাদের একান্ত সুহৃদ ও প্রেমময় অভিভাবক নবী-রসুলগণকে চিনতে পারে না। তাঁদের মর্মস্পর্শী আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে বসে। পরিণামে লাভ করে পরাজয় ও ধ্বংস। আর জয় হয় সত্যের, সত্যের পতাকাবাহী নবী-রসুলগণের। সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! মক্কার মুশরিকদের অপ-আচরণে ব্যথিত হবেন না। নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতার সঙ্গে পালন করে চলুন সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। নিশ্চিত জানবেন আল্লাহ্তায়ালার শাশ্বত বিধানানুসারে আপনারও বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝ وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

❒ আল্ কুরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ।
❒ জিবরাইল ইহা অবতীর্ণ করিয়াছে
❒ তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার।
❒ অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
❒ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে।

❐ বনি-ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছে— ইহা কি উহাদিগের নিদর্শন নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল কোরআন তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক থেকে অবতীর্ণ'। এখানে 'তানযীল' অর্থ মুনায্যাল। 'তানযীল' শব্দটি ধাতুমূল ও কর্তৃকারকের অর্থজ্ঞাপক।

পরের আয়াতে (১৯৩) বলা হয়েছে— 'জিবরাইল এটা অবতীর্ণ করেছে'। একথার অর্থ— হজরত জিবরাইল এই কোরআন পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। উল্লেখ্য, হজরত জিবরাইল আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদেশাবলীর বিশ্বস্ত বাহক। তাই এখানে তাঁর নামের শেষে প্রযুক্ত হয়েছে 'আমীন' বিশেষণটি।

এরপরের আয়াতে (১৯৪) বলা হয়েছে— 'তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো'। এখানে 'হৃদয়ে' অর্থ সানুবর বৃক্ষাকৃতিবিশিষ্ট বক্ষস্থিত কলবে, যা স্থূল জগতের কলব বা হৃদয়। এখানে সূক্ষ্ম জগতের মূল কলব বা লতিফায়ে রব্বানীকে বুঝানো হয়নি। কারণ সূক্ষ্ম জগতের (আলমে আমরের) অবস্থান আরশের উর্ধ্বে। আর ওই কলব প্রত্যাদেশের ভার বহন করতে অক্ষম। এই ভার বহন করতে পারে কেবল জড়জগতের (আলমে খালকের) কলব। এই কলব একই সঙ্গে জড়জগত ও সূক্ষ্ম জগতের কেন্দ্র ও প্রকাশস্থল। কিন্তু প্রত্যাদেশের প্রয়োজন হয় জড়জগতেই। তাই বুঝতে হবে জড় জগতস্থিত দেহসম্পৃক্ত কলবের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে 'তোমার হৃদয়ে'। অর্থাৎ তোমার এই জগতস্থিত অস্তিত্বসম্পৃক্ত হৃদয়ে।

'যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো' অর্থ প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পর যাতে আপনি প্রত্যাদেশানুসারে মানুষকে সচেতন ও সাবধান করতে পারেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে। অর্থাৎ পালন করতে পারেন রেসালাতের দায়িত্ব।

এরপরের আয়াতে (১৯৫) বলা হয়েছে— 'অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখন 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়' অর্থ কুরায়েশদের মাতৃভাষায়। এরকম করার কারণ হচ্ছে, তারা যেনো একথা না বলতে পারে যে, কোরআনের ভাষা আমরা বুঝি না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, হজরত জিবরাইল এই কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন রসুল স. এর হৃদয়ে। অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে অবতীর্ণ করতে হতো তাঁর শ্রুতিতে, হৃদয়ে বা মরমে নয়। কারণ মাতৃভাষা সরাসরি মরমে পশে। ফলে হৃদয় ধারণ করতে পারে অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাব। ভাষা এমতোক্ষেত্রে কেবল বাহক, অন্য কিছু নয়। কিন্তু বিদেশীভাষা প্রধানতঃ সচকিত

ও আলোড়িত করে শ্রুতিকে। শব্দাবলীর ধ্বনিব্যঞ্জনাই এমতোক্ষেত্রে আকৃষ্ট ও অভিভূত করে শ্রোতাকে। পরে হৃদয় ধারণ করতে পারে তার মর্ম, যদি তা মর্মাভিসারী হয়।

এরপরের আয়াতে (১৯৬) বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে'। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, কথাটির অর্থ— কোরআন অবতরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— পূর্ববর্তী আকাশজ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হু' (এর) সর্বনামটি সম্পৃক্ত আল্‌কোরআনের সঙ্গে। অর্থাৎ এই কোরআনেই রয়েছে সকলকিছুর উল্লেখ।

এখানে 'যুবুর' অর্থ কিতাব বা আকাশজ গ্রন্থ। শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে হানাফীগণ বলেন, কোরআন শুধু মর্মার্থসম্ভারের নাম। কেননা পূর্ববর্তী আকাশজ পুস্তকগুলোতে কোরআনের অর্থই লিখিত ছিলো। ওগুলো আরবী লিপিবিশিষ্ট ছিলো না। এই ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য প্রদানের কারণে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা বলেন, কোরআনের অর্থসম্বলিত ফারসী ভাষাতেও নামাজের ক্বেরাত সম্পন্ন করা যায়।— কথাটি কিন্তু এরকম নয়। তিনি এমতো মত প্রকাশ করেছিলেন কেবল ওই সকল আলেমগণকে লক্ষ্য করে যারা ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যারা নামাজে কোরআন পাঠকালে কোরআনের ভাষাসৌকর্যে হয়ে যান মগ্ন ও অভিভূত, ফলে আল্লাহ্‌র দিকে তাদের মনোযোগ আর থাকে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাষাসৌকর্যবোধ ও বিদ্যাবত্তাই হয়ে যায় আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যের অন্তরায়। ফলে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে পড়ে বিপন্ন। যারা ভাষাবিশারদ ও ধ্বনিবিজ্ঞানে পারদর্শী নয় সেই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত অভিমতটি প্রযোজ্য নয়। আর এরকম কথা তিনি বলেনওনি। ইমাম আবু হানিফা যদি ঢালাওভাবে মন্তব্যটি করতেন, তবে তো তিনি একথাও বলতেন যে, ফারসী কিংবা অন্যান্য ভাষায় অনূনুদিত কোরআন স্পর্শ করা ঋতুবতী নারী, অথবা জুনুবী (যার উপরে গোসল ফরজ) দের জন্য নাজায়েয। কিন্তু তিনি তো এরকম কথা বলেননি।

আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন অর্থ একই সঙ্গে শব্দ ও মর্ম দু'টোই। সেকারণেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়'। কোরআন যেহেতু মোজেজা, আর মোজেজা যেহেতু প্রধানতঃ প্রকাশ্য, তাই বুঝতে হবে এখানে বলা হয়েছে কোরআনের ভাষার কথা, যা আবার আশ্রয় করে রয়েছে তার মর্মবাণীর উপরে। সেকারণেই আরবী লিপিবিশিষ্ট কোরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা ও

পাঠ করা নাজায়েয, কিন্তু এর অনুবাদ যে ভাষায়ই হোক না কেনো, অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা ও আবৃত্তি করা জায়েয। ইমাম আবু হানিফা বলেছিলেন, কেবল নামাজে কোরআনের মর্ম অন্য ভাষায় পাঠ করা জায়েয। কারণ তাঁর মতে কোরআনের অর্থই আসল, ভাষা নয়। তাই নামাজে ভিন্নভাষায় কোরআনের মর্মবাণী উচ্চারণ জায়েয, যদি আরবী ভাষার বাকশৈলী পাঠককে মগ্ন ও স্থবির করে রাখে। অর্থাৎ যদি তা হয় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যের অন্তরায়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা তাঁর এমতো অভিমতের উপরে স্থির থাকেননি। পরবর্তীতে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। স্পষ্টতই বলেছিলেন, নামাজে আরবীলিপি বিশিষ্ট কোরআনের পাঠ ছাড়া অন্য কোনো ভাষার পাঠ নাজায়েয। এটাই হানাফীগণের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ ইমামও এই অভিমতের প্রবক্তা।

এরপরের আয়াতে (১৯৭) বলা হয়েছে— 'বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ একথা অবগত আছে— এটা কি তাদের নিদর্শন নয়'? এ কথার অর্থ— এই কোরআন যে আল্লাহ্র নিকট থেকে সমাগত, সে কথা বনী ইসরাইলের পণ্ডিতেরা ভালোভাবেই জানে, সুতরাং এটাই কি তাদের জন্য সত্যের নিদর্শন নয়?

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সময়ের পাঁচজন ইহুদী তওরাতবিশারদকে। তাঁরা হচ্ছেন— আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, ইবনে ইয়াসিন, তা'লাবা, আসাদ এবং উসাইদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবাসীরা মদীনায় গিয়ে ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে রসুল স. সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তারা বলেছিলো, হ্যাঁ, শেষ যুগের পয়গম্বরের আবির্ভাবের সময় এটাই। আমরা তওরাতে তাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেছি।

সূরা শুআরা : আয়াত ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ○ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ○ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ○

❐ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত,

❐ 'এবং উহা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না;

❒ এইভাবে আমি অপরাধিগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি।

❒ উহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে;

❒ ইহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে; উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

❒ তখন উহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে না?'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যদি আমি এই কোরআন কোনো অনারবীর উপরে অবতীর্ণ করতাম এবং তিনি তা পাঠ করে শোনাতেনও, তবুও মক্কাবাসীরা তাঁকে বিশ্বাস করতো না। বলতো, তোমার কথাই তো আমরা বুঝতে পারি না।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানকার 'আ'জ্বামীন' শব্দটি 'আ'জ্বামী' এর বহুবচন। সেকারণেই এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সালিম (অবিকৃত) সর্বনামের শব্দরূপে। শব্দটি 'আ'জ্বাম' এর বহুবচন বলে শব্দরূপটি এখানে এরকম হতো না। কেননা এর স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপ হচ্ছে 'উজ্বামাউ'। আর যে ক্রিয়ার শব্দগঠন পদ্ধতিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'ফয়ুলা' এর গঠনপদ্ধতি গৃহীত হয়, তার সালিম (অবিকৃত) সর্বনামরূপ হয় না। যেমন 'আশআ'রুন' এর বহুবচন 'আশআ'রা'। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'আশআ'রীন'। ধ্বনিসংক্ষেপের কারণে তা হয়ে গিয়েছে 'আশআ'রুন'। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যদি আমি এই কোরআন অবতীর্ণ করতাম আরবী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির উপর, তবে তো মক্কাবাসীরা তাকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, তার কথা শুনতোই না। ভাষাবৈভবগত দর্পে অন্ধ হয়ে তারা প্রথমেই তার সঙ্গে শুরু করে দিতো চিরস্থায়ী শত্রুতা। অথবা তার কথা অনুধাবন না করতে পেরে প্রদর্শন করতো চরম বৈমুখ্য। বলতো, কী যে বলো, তোমার কথার আগামাথা কিছুই তো আমরা বুঝতে পারি না। অন্য এক আয়াতে এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ওয়ালাও জ্বায়া'লনাহু কুরআনান আজ্বামিয়্যান লা ক্বলু লা ফুস্‌সিলাত আয়াতুহু'।

পরের আয়াতে (২০০) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি'। হাসান ও মুজাহিদ আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন— এভাবেই আমি সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের অন্তরে সন্নিবেশিত করি অনড় অবিশ্বাস। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, অংশীবাদ ও অবিশ্বাসের স্রষ্টাও আল্লাহ্। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'সালাকনাহু' (আমি উহা সঞ্চার করে দিয়েছি) এর 'হু' সর্বনাম কোরআনের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এই কোরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিয়েছি, ফলে তারা একথাও বুঝেছে যে, কোরআন হচ্ছে আকাশজ বার্তা, তৎসত্ত্বেও কেবল বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা ইমান আনে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (২০১, ২০২) বলা হয়েছে— 'তারা তা বিশ্বাস স্থাপন করবে না যতোক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করবে ব্যথাদায়ক শাস্তি'। 'এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না'। আল্লাহ্পাক যাদের অংশীবাদীতাসহ মৃত্যু হওয়ার কথা নিশ্চিতরূপে অবগত, এখানে বলা হয়েছে সেই সকল চিরঅবিশ্বাসীদের কথা। তাদের উপরে মর্মন্তুদ শাস্তি শুরু হবে তাদের জীবনাবসানের পর। ওই সময় তারা বাধ্য হয়ে প্রকৃত সত্যকে বিশ্বাস করবে, কিন্তু ওই বিশ্বাস তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাই শেষে বলা হয়েছে 'তারা কিছুই বুঝতে পারবে না'।

শেষোক্ত আয়াতে (২০৩) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে না'? একথার অর্থ— তারা তখন বলবে, আমাদেরকে যদি পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করা হয়, তবে আমরা এবার অবশ্যই ইমান আনবো। আমাদেরকে কি সে অবকাশ দেয়া হবে না? প্রশ্নবোধকটি এখানে মিনতিসূচক।

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন, তখন তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগলো, কতোদিন পর্যন্ত আর এভাবে ভয় দেখাবে? কবে আসবে আযাব? তাদের এমতো অপউক্তির পরিপ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ۝ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ۝

❒ উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

❒ তুমি বলত— যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করিতে দিই,

❒ এবং পরে উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ে

❒ তখন উহাদিগের ভোগ-বিলাসের উপকরণ উহাদিগের কোন কাজে আসবে কি?

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! 'কবে আসবে আযাব' বলে অংশীবাদীরা আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্র শাস্তিকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও কোন সাহসে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর সুদীর্ঘ ভোগ-বিলাসময় জীবন দান করলেও তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে তোমাদের পরমায়ু। তখন? তখন তো তোমাদের কাম্য শাস্তি সুনিশ্চিত। বলো, সে অনন্ত শাস্তি শুরু হলে তোমাদের অতীতের সম্ভোগমুখরিত জীবন কি তোমাদের কোনো উপকারে আসবে? ওই ভয়ংকর শাস্তি তো চিরতরে ভুলিয়ে দিবে তোমাদের অতীতের সুখস্মৃতি।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতগুচ্ছ অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার অংশীবাদীদের কতিপয় অপউক্তির প্রেক্ষিতে। কোরআনের অন্যত্র সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন— ১. আনযিল আ'লাইনা হিজ্বারাতাম্ মিনাস সামায়ি আবি'তিনা বি আজাবিন আ'লীম ('আকাশ থেকে আমাদের উপর বর্ষণ করো প্রস্তর অথবা নিয়ে এসো কোনো ব্যাথাদায়ক শাস্তি')। ২. ফা'তিনা বিমা তুয়ি'দুনা ('আমাদের যে অঙ্গিকার দিচ্ছো তা নিয়ে এসো')। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অংশীবাদীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, তাদের জীবন চিরনিরাপদ। আযাব তাদের উপরে কোনোদিনই নেমে আসবে না। তাই তারা রসুল স.কে বিব্রত করণার্থে বার বার ব্যঙ্গচ্ছলে আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলতো।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ۞ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞

❐ আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই সতর্ককারী প্রেরণ না করিয়া,
❐ ইহা উপদেশস্বরূপ, আমি অন্যায়াচারী নহি,
❐ শয়তান আল-কুরআন অবতীর্ণ করে নাই,
❐ উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থ্যও রাখে না।
❐ উহাদিগকে ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

❒ অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্কে আল্লাহের শরীক করিও না; করিলে তুমি শাস্তি পাইবে।

❒ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাৎক্ষণিক-ভাবে শাস্তি দেই না। প্রথমে তাদের নিকট সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি আমার কোনো বার্তাবাহককে। তিনি তাদের নিকট পৌঁছে দেন সত্যের পয়গাম। তৎসত্ত্বেও যদি তারা সতর্ক না হয়, দীর্ঘ অবকাশ প্রদানের পরেও সত্যের দিকে ফিরে না আসে, তখন তাদের উপরে অবতীর্ণ করি সর্বগ্রাসী ধ্বংস। আমার উপদেশরীতি এরকমই অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুতাশোভিত। কারণ আমি অন্যায়াচরণ থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এখানে 'মুনজিরুন' অর্থ সতর্ককারী। আর 'জিকরা' অর্থ উপদেশ। এভাবে এখানে 'উপদেশ' হয়েছে সতর্ককরণের কারণ। অর্থাৎ ধ্বংসের পূর্বে সতর্ককরণের কারণে বা উদ্দেশ্যেই আমি তাদের প্রতি প্রথমে প্রেরণ করি সতর্ককারী। বরং অর্থ হবে সদুপদেশের মূর্ত প্রতীকরূপে প্রথমে আমি তাদের সম্মুখে উপস্থিত করি আমার কোনো না কোনো বাণীবাহককে।

পরের আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— অংশীবাদীরা বলে 'মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান'। তাদের একথা সর্বৈবরূপে মিথ্যা। কারণ কোরআন ও শয়তানের আহ্বান পরস্পরবিরুদ্ধ। কোরআন পথপ্রদর্শন করে হেদায়েতের, আর শয়তান গোমরাহির। সুতরাং শয়তান সত্যপথপ্রদর্শনকর্মের যোগ্য নয়। এমতো সুযোগ ও সামর্থ্যও তার নেই। কোরআনে পরিবেশন করা হয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ। এ সংবাদ শয়তানের জানা সম্ভবই নয়। তারা উপরে উঠে আকাশবাসী ফেরেশতাদের সংবাদ শুনতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কারণ এরকম অধিকার তাদেরকে দেয়াই হয়নি।

এরপরের আয়াতে (২১৩) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি অন্য কোনো ইলাহ্কে আল্লাহ্র শরীক কোরো না, করলে তুমি শাস্তি পাবে'। আলোচ্য বাক্যটি রসুল স.কে লক্ষ্য করে বলা হলেও এর প্রকৃত লক্ষ্য অন্যান্য মানুষ। অর্থাৎ শিরিক এবং তার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ হতে পারে, সে কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়াই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। যেনো এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তাই আপনি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আপনার শিরিকবিজড়িত হওয়ার কল্পনা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যকে আপনি গ্রহণ করবেন বলে ধরে নেয়া হয়, তবে একথা নিশ্চিত যে ওই অবস্থায় আপনিও আর শাস্তিবিমুক্ত থাকবেন না। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।

এরপরের আয়াতে (২১৪) বলা হয়েছে— 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সর্বপ্রথম আপনি আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে, এরপর তদপেক্ষা কম নিকটজনকে। তারপর তদপেক্ষাও কম নিকটজনকে। এভাবে পাড়া, এলাকা, শহর, দেশ এবং বিশ্বকে। কারণ সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যভাজনেরাই সর্বাগ্রে হেদায়েত লাভের অধিকারী। এভাবে অগ্রসর হলে সকলের নিকট আপনার প্রচারকর্ম হয়ে পড়বে অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কারণ মানুষ সাধারণতঃ নিকটজনের সঙ্গে প্রতারণা করে না। আর উত্তম কোনোকিছু তারা নিজের জন্য যেমন চায়, তেমনি কামনা করে নৈকট্যভাজনদের জন্যও। আর এভাবে স্বজন— নিকটজনকে সতর্ক করতে থাকলে দূরবর্তীদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে পড়বে যে, রসুলের নিকটজন হলেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। রক্ষা পাওয়া যায় তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের অনুসারী হলে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো রসুল স. আমাকে ডেকে বললেন, আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে স্বজনকুলকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করার নির্দেশ। এ নির্দেশ আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আমি জানি এ নির্দেশ পালন করতে গেলে তাদের মধ্যে ঘটবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মাত্র জিবরাইল বলে গেলেন, এ নির্দেশ পালন না করলে আমার উপরেও নেমে আসবে শাস্তি। সুতরাং এ নির্দেশ আমাকে পালন করতেই হবে। তুমি এক কাজ করো। অর্ধ ছা আটা দিয়ে রুটি বানাও। আর ছাগলের রান দিয়ে বানাও ব্যঞ্জন। তারপর নিমন্ত্রণ জানাও আবদুল মুত্তালিবের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদেরকে। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। আমাদের বংশভূতরা সকলেই এলেন। রসুল স. প্রথম এক টুকরা গোশত থেকে কিছু অংশ দাঁত দিয়ে কেটে মুখে পুরলেন। বাকী অংশ ব্যঞ্জনপাত্রে রেখে বললেন, শুরু করুন। সকলে আহার করলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। অথচ আল্লাহ্‌র শপথ! পরিবেশিত আহার্য একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করার মতো ছিলো না। বরকতময় ওই ভোজনপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স.বললেন, আলী! এবার সবাইকে দুধ পান করাও। আমি এক পেয়ালা দুধ আনলাম। আল্লাহ্‌র কসম! ওই দুধ একজনকেও পরিতৃপ্ত করতে পারতো না। কিন্তু সকলেই ওই দুধ পান করলেন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে। ভোজন শেষে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বললো, তোমাদের নিমন্ত্রণদাতা যাদুকর। তার একথা শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো সকলে। রসুল স. আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। কিছুদিন পর রসুল স. বললেন, আলী! পুনরায় সকলকে

দাওয়াত দাও। আমি পুনরায় আয়োজন করলাম পানাহারের। নিমন্ত্রণ জানালাম নিকটাত্মীয়দেরকে। যথাসময়ে সকলে এসে পানাহার করলেন। শেষে রসুল স. বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশদ্ভূত ব্যক্তিবর্গ। আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন, আমি যেনো তোমাদেরকে এই কল্যাণের দিকে আহ্বান করি। অতএব, কে এগিয়ে আসতে চাও, হতে চাও আমার প্রতিনিধি ও সহকর্মী। তাঁর কথা শুনে সকলে নিশ্চুপ হয়ে গেলো। ওই সমাবেশে আমিই ছিলাম বয়োকনিষ্ঠ। আমি বলে উঠলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি হবো আপনার সতীর্থ ও সহায়ক। তিনি স. প্রীত হলেন। পবিত্র হস্ত স্থাপন করলেন আমার স্কন্ধদেশে। বললেন, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতা। আমার প্রতিনিধি। সুতরাং তোমরা সকলে এর নির্দেশনা মেনে নিয়ো। একথা শুনে সকলে একযোগে হেসে উঠলো। স্থান ত্যাগ করার সময় বলতে বলতে গেলো, কী কৌতুক! কী কৌতুক! আমাদেরকে নাকি এই বালকের কথা মেনে চলতে হবে।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পর্বতের চূড়ায়। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে বনী ফিহির! হে আওলাদে আদী! শিগগীর সকলে একত্র হও। তাঁর ডাক শুনে একত্রিত হলো কুরায়েশকুল। যারা আসতে পারলো না, তারাও পাঠিয়ে দিলো তাদের প্রতিনিধি। নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আবু লাহাবও উপস্থিত হলো সেখানে। সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে রসুল স. বললেন, হে মক্কাবাসী! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাতে এক দল শত্রুসেনা তোমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত, তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে বললো, অবশ্যই। তিনি স. বললেন, কেনো? তারা বললো, তুমি যে সতত সত্যবাদী, মিথ্যাবচনবিবর্জিত। তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো আমি আল্লাহ্র রসুল। আমি তোমাদেরকে সাবধান হতে বলছি আল্লাহ্র আযাব থেকে। আবু লাহাব একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো, ধ্বংস হও। এ জন্যই তাহলে তুমি আমাদেরকে জমায়েত করেছো? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ' সুরাটি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও' তখন রসুল স. কুরায়েশদেরকে একত্র করে বললেন, হে কুরায়েশ বংশদ্ভূতরা! জীবন ক্রয় করে নাও (আত্মরক্ষা করো আসন্ন আযাব থেকে)। আল্লাহ্র শাস্তি শুরু হলে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে আবদে মান্নাফের সন্তান-সন্ততি!

আল্লাহ্র শাস্তির প্রতিকূলে আমি তোমাদেরকে সহায়তা করতে পারবো না। হে প্রিয় পিতৃব্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্র অসন্তোষের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের কেউ নই। হে আল্লাহ্র রসুলের পিতার ভগ্নি সুফিয়া! হে মোহাম্মদ দুলালী ফাতেমা! এই মুহূর্তে আমার নিকট থেকে আহরণ করো আল্লাহ্ প্রদত্ত মহাকল্যাণ। নতুবা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পর রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পাহাড়ে। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, হে জনতা! একত্র হও। ত্বরা করো। শশব্যস্ত হয়ে সকলে একত্র হলো পাহাড়ের পাদদেশে। তিনি স. বললেন, হে সমবেত জনমণ্ডলী! আমি যদি এখন বলি, এই পাহাড়ের বিপরীত প্রান্তে একদল সশস্ত্র দস্যু তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষমান, তাহলে কি তোমরা আমার একথা মেনে নিবে? সকলে বললো, তুমি তো সত্যবাদী (সুতরাং বিশ্বাস করবো না কেনো?) তিনি স. বললেন, তাহলে বিশ্বাস করো অংশীবাদিতার জন্য আযাব অত্যাসন্ন। আবু লাহাব বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো, নিপাত যাও। এগুলো বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছো? তার এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁউ ওয়া তাব্বা' (উচ্চারণরীতিটি ক্বারী আ'মাশের)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হিমার মাজাশায়ী' সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা প্রচার করবার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে যে বৈধ বিত্তসম্ভার দান করেছি, তা তাদের জন্য হালাল। আর আমি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার অতুলনীয় এককত্বে বিশ্বাসীরূপে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে করে বিশ্বাসচ্যুত। তাদের চোখে আমা কর্তৃক ঘোষিত হালালকে শয়তানই করে দিয়েছে হারাম। আমি সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যাকে এবং যে সকল কিছুকে আমি উপাস্যরূপে প্রামাণ্য করিনি, তাদেরকে ও সেসকল কিছুকে আমার অংশীরূপে কল্পনা কোরো না। রসুল স. আরো বলেছেন, অথচ আরব-অনারব সকল জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখন অংশীবাদিতামগ্ন। তাদের সকলের প্রতিই তিনি অপরিতুষ্ট। কেবল তাদের প্রতি অতুষ্ট নন, যারা আহলে কিতাব এবং মূল ধর্মানুসারী। আর আমার প্রতি এই মর্মেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেনো স্বজনবর্গকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করি। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার প্রভুপালক। এ নির্দেশ পালন করলে তারা তো আমার শিরশ্ছেদ করবে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে আমার মস্তক। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো,

পরীক্ষা করবো তোমার মাধ্যমে অন্যদেরকেও। তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যেই। আমি তোমার উপরে অবতীর্ণ করেছি একটি অক্ষয় গ্রন্থ, (কালের) সলিল যাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না । তুমি ওই গ্রন্থ পাঠ কোরো শয়নে জাগরণে। ওই গ্রন্থের বিধানাবলী প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি সংগ্রাম করো, বিজয়ী হবে। তুমি আমার বান্দাদের জন্য অর্থব্যয় করো, তোমার জন্য ব্যয় করা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামকারীকে প্রস্তুত করো। আমি তোমার সাহায্যার্থে প্রস্তুত রাখবো পাঁচগুণ সৈন্য। তুমি তোমার অনুচরবর্গকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাও নিরন্তর অভিযান। মনে রেখো, তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতী— ১. ন্যায়বিচারক ২. স্বজন ও বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র ও কোমল আচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি ৩. সচ্চরিত্র ও বিত্তশালী, যে সদাচারী ও অপরের জন্য অর্থ ব্যয়কারী। আর পাঁচ শ্রেণীর লোক জাহান্নামী— ১. ওই নির্বোধ, যে ভালো-মন্দবোধবিবর্জিত এবং যে অন্যকে উত্যক্তকারী ২. ওই ব্যক্তি যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তোমাদেরকে ও তার পরিবার পরিজনকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩. ওই লোক যে তুচ্ছ বস্তুর জন্যও লোভাতুর ৪. ওই ব্যক্তি যে অশ্লীল ভাষণবিশিষ্ট এবং ৫. ওই ব্যক্তি যে কৃপণ ও মিথ্যাচারী। বর্ণনাকারী বলেন, কৃপণ ও মিথ্যাচারীদের কথাও সম্ভবতঃ তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবহিত।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও' তখন রসুল স. তাঁর স্বজনদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে লাগলেন। শুরু হলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সাহাবীগণের জন্য এমতো প্রত্যাখ্যানজনিত পরিস্থিতি হয়ে গেলো অসহনীয়। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা শুআরা : আয়াত ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ○ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

❒ এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।

❒ উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তুমি বলিও, 'তোমারা যাহা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।'

❒ তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহের উপর,

❒ যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও সালাতে
❒ এবং তোমাকে দেখেন সিজ্‌দাকারীদিগের সহিত উঠিতে-বসিতে।
❒ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি বিনম্র হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আপনার বিশ্বাসী অনুচরবর্গের প্রতি প্রদর্শন করুন কোমল আচরণ, যাতে করে কেটে যায় তাদের কঠোর নির্দেশপালনের ভীতি। যেনো তারা আশ্বস্থ হয়, হয় সহজ ও স্বাভাবিক।

এখানে 'আখফিদ্ব' অর্থ বিনম্র হও। নিম্নে অবতরণকালে পাখিরা তাদের ডানা গুটিয়ে নেয়। কথাটির মাধ্যমে এখানে রূপকার্থে বুঝানো হয়েছে সেইরূপ সংযত নিম্নগামিতাকে। কথাটির মর্মার্থ তাই— বিনম্র হও, হও সংযত আচরণবিশিষ্ট, মনোহর আচরণপ্রবণ।

'মিনাল মু'মিনীন' অর্থ সেই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি। এখানকার 'মিন' বয়ানিয়া (বর্ণনামূলক), অথবা তাবয়ি'দ্বীয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। আর এখানকার 'যারা তোমার অনুসরণ করে' কথাটি যদি ব্যাপকার্থক হয় তবে পূর্ণ-অপূর্ণ উভয় ধরনের অনুসরণ হবে এর অর্থভূত। আর যদি এর অর্থ কেবল পূর্ণ অনুসরণ হয়, তবে এখানকার 'মিন' হবে তাবয়ি'দ্বিয়া (আংশিক অর্থপ্রকাশক)। অবশ্য 'বিশ্বাসী' অর্থ পুণ্যবান-পাপী উভয় প্রকার বিশ্বাসী। তাই বুঝতে হবে এখানকার 'মিন' বর্ণনামূলকই। অর্থাৎ সকল প্রকার বিশ্বাসীর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন রসুল স.। পরবর্তী আয়াতে (২১৬) দৃষ্টে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। কারণ সেখানে বলা হয়েছ কেবল পাপী-বিশ্বাসীগণের কথা।

বলা হয়েছে— 'তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি বোলো, তোমরা যা করো, তার জন্য আমি দায়ী নই'। উল্লেখ্য, এখানে 'তোমরা যা করো' বলে পাপ থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পাপীদের থেকে পৃথক থাকতে বলা হয়নি। বরং পুণ্যবানদের মতো তাদের সঙ্গেও প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে বিনম্র আচরণ।

এর পরের আয়াতে (২১৭) বলা হয়েছে— 'তুমি নির্ভর করো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো সতত নির্ভরশীল থাকেন সেই আল্লাহ্‌র উপর যিনি অবাধ্যদেরকে শাস্তিদানের ব্যাপারে মহাপ্রতাপশালী এবং যিনি আপনার উপর এবং আপনার বিশ্বাসী অনুসরণকারীদের উপর অতুলনীয়রূপে দয়াপরবশ।

এখানে 'তাওয়াক্কাল্' অর্থ নির্ভরশীল হওয়া। অর্থাৎ নিজের সকলকিছুর ব্যাপারে অন্যের উপরে নির্ভর করা। এই নির্ভরশীলতা অপাত্রে হলে অসিদ্ধ এবং

যথার্থ পাত্রে হলে সুসিদ্ধ। বলা বাহুল্য আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও নির্ভরশীলদের প্রতি মহাকল্যাণপ্রদাতা। তাই তাঁর প্রতি নির্ভর করা অবশ্যই সুসিদ্ধ, বরং অত্যাবশ্যক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (২১৮, ২১৯) মর্মার্থ হচ্ছে— বিশেষভাবে ওই নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় আপনার নামাজের দণ্ডায়মানতায় এবং আপনার জামাতবদ্ধ নামাজের সারিবদ্ধ রুকুতে ও সেজদায়। আপনার নির্ভরশীলতার এমতো সুচারু বিকাশ তিনি অবশ্যই অবলোকন করেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কিয়াম, রুকু, সিজদা, বৈঠক অর্থাৎ নামাজের সকল ভঙ্গিমা ও চলমানতাকে। আর এখানে 'ফীস্সাজ্বিদীন' অর্থ ফীল মুসল্লীন, অর্থাৎ নামাজীগণের সঙ্গে।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ফীস্সাজিদীন' অর্থ নামাজীদের সঙ্গে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়, আল্লাহ্ আপনাকে একাকী নামাজপাঠরত এবং দলবদ্ধরূপে নামাজরত উভয় অবস্থায় অবলোকন করেন।

মুকাতিল বলেছেন— 'ফীলমুসাল্লীন' অর্থ মাআ'ল মুসল্লীন। অর্থাৎ তোমরা একাকী নামাজ আদায় করলে তা প্রত্যক্ষ করেন আল্লাহ্পাক, আবার জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করলে সেটাও অবলোকন করেন আল্লাহ্পাক।

মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— নামাজ পাঠকালে আপনার সম্মুখবর্তী ও পশ্চাদবর্তী দৃষ্টি সঞ্চালনকেও আল্লাহ্ দেখেন। উল্লেখ্য, রসুল স. জামাতে নামাজ পাঠকালে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি দেখতে পেতেন পিছনের নামাজীদেরকেও। এমতো দ্বিমুখী দৃষ্টিপাত ছিলো তাঁর নবীসুলভ আচরণের অন্তর্গত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাদেরকে বললেন, তোমরা নামাজ পাঠকালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো আমার দিকে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের বিনম্রতা ও একাগ্রতার বিষয়টি আমার নিকট গোপন থাকে না। কারণ আমি তো পিছনেও দেখি। বাগবী।

হাসান বলেছেন, এখানে তাক্বাল্লুবাকা' অর্থ 'তাসাররুফা'। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের মধ্যে আপনার আগমন প্রত্যাগমনকেও আল্লাহ্ অবলোকন করেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে 'সাজ্বিদীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে অন্যান্য নবীগণের অবস্থাকে। এভাবে কথাটি দাঁড়িয়েছে— অন্যান্য নবীর চালচলন যেমন আল্লাহ্র সতত পর্যবেক্ষণভূত ছিলো, তেমনি আপনার সকল কিছুও তাঁর সতত পর্যবেক্ষণ বহির্ভূত নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'দেখেন' অর্থ তিনি লক্ষ্য করেন আপনার এবং আপনার অনুসারী তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারীদের আগমন-প্রত্যাগমনকে।

বায়যাবী লিখেছেন, যে রাতে রাত্রিকালীন নামাজের অপরিহার্যতা (ফরজ) রহিত করা হলো, ওই রাতে রসুল স. সাহাবীগণের নিশীথের নামাজ পাঠ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন সকলেই আপনাপন গৃহে নামাজ পাঠে. জিকিরে অথবা কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন। তাঁদের কোরআন পাঠের আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জরণের মতো।

উল্লেখ্য, রসুল স. এর বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত অবস্থা ছিলো অনেক। এখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে সাহাবীগণের সঙ্গে নামাজ আদায় করার প্রসঙ্গটিকে। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পিতামহ থেকে পিতার ললাটদেশে নূরে মোহাম্মদীর স্থানান্তরিত হওয়াকে। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা রসুল স. এর বিশেষত্বকে অনন্যসাধারণ করে তোলে না। কারণ মানুষের জন্মপ্রবাহ পিতামহ-পিতা এভাবেই প্রবহমান হয়। এমতোক্ষেত্রে কুরায়েশেরা এবং সমগ্র মানুষ সমতুল। সুতরাং এমতো ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, এখানে 'তাক্বাল্লুবাকা' দ্বারা বুঝানো হচ্ছে রসুল স. এর পবিত্র পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর পবিত্রা মাতার উদরাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হওয়াকে। আর এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর উর্ধ্বতন সকল পিতৃপুরুষ ছিলেন বিশ্বাসী ও পবিত্র। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা সুয়ূতী।

এসম্পর্কে হাফেজ শামসুদ্দিন ইবনে নাসিরউদ্দিন দামেশকী একটি কবিতা রচনা করেছেন যার অর্থ— প্রত্যেক মহাসম্মানিত নূর স্থানান্তরিত হয়, যা জ্যোতির্ময় হতে থাকে একত্ববাদীগণের বদনমণ্ডলে। এভাবেই ওই মহান নূর স্থানান্তরিত হতে হতে পায় তার প্রকাশ কাল। অবশেষে জন্মলাভ করেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন স.। সহীহ বোখারীর বর্ণনা দ্বারাও এই ব্যাখ্যাটি প্রত্যয়িত হয়। যেমন— রসুল স. বলেছেন, যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়ে আল্লাহ্ আমাকে স্থানান্তরিত করেছেন সর্বোত্তম যুগে। শেষে হয়েছে আমার এ সময়ের এই আবির্ভাবায়ন। হজরত ওয়াছিলা ইবনে আসকাআ থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নবী ইব্রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে মনোনীত করেছেন নবী ইসমাইলকে, তাঁর বংশাবলী থেকে বনী কেনানাকে, বনী কেনানা থেকে কুরায়েশকে, কুরায়েশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে আমাকে। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন্ নবুয়ত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ মনুষ্যজাতিকে বিভক্ত করেছেন দু'টি দলে, উত্তমতর দলভূত করেছেন আমাকে। তারপর আমার পিতামাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন আমাকে। মূর্খতার যুগের সকল অকল্যাণ থেকে আমাকে রেখেছেন

মুক্ত। পিতা আদম থেকে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছি আমি ও আমার পিতৃপুরুষেরা, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। সুতরাং সত্তাগতভাবে আমি যেমন সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম, তেমনি বংশগতভাবেও।

উল্লেখ্য, হজরত আদম থেকে রসুল স. এর সকল পিতৃপুরুষের মুমিন হওয়ার বিষয়ে আমি রচনা করেছি একটি স্বতন্ত্র পুস্তক। ওই পুস্তকে রয়েছে পক্ষ-বিপক্ষের সকল দলিল। শেষে রয়েছে সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে ওই পুস্তকটি পাঠ করা যেতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু সকলের বাক্যাবলী শ্রবণ করেন এবং জানেন সকলের অন্তরস্থিত উদ্দেশ্যাবলী, তাই বিশ্বাসীগণের জন্য কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করা সমীচীন, অন্য কারো উপরে নয়।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২২১, ২২২, ২২৩

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝

❒ তোমাকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়?
❒ উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।
❒ উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

মক্কার মুশরিকেরা বলতো, 'মোহাম্মদের উপরে কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান'। তাদের এমতো অপউক্তির জবাব দেয়া হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে এভাবে— 'তোমাকে কি আমি জানাবো, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট'। এভাবে সকলকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোহাম্মদ মোস্তফা স. আল্লাহ্র সত্য রসুল। আর তাঁর অবস্থান শয়তানের সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষে। শয়তানের সম্পর্ক তো ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠদের সঙ্গে। মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় অদৃশ্যের সংবাদ, যা জানার অধিকার ও যোগ্যতা শয়তানের নেই। তার অনুসারী মিথ্যাবাদী জ্যোতিষী ও পাপিষ্ঠদের তো নেই-ই।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, একবার কিছুসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসুল! গণকদের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তিনি স. বললেন, না। লোকেরা বললো, তাদের কোনো কোনো কথা তো ফলেও যায়।

তিনি স. বললেন, ফেরেশতাদের আলাপচারিতা থেকে শয়তান দুই একটা কথা শুনে এসে তাদের ভক্ত গণকদেরকে মোরগের মতো আওয়াজ করে জানায়। তারা আবার ওই কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জনসমক্ষে প্রচার করে। বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা আরো বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা মেঘের উপরে অবতরণ করে উর্ধ্বদেশের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে। শয়তান মেঘের কাছাকাছি উঠে গিয়ে চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করে। কোনো একটি সংবাদ কোনোক্রমে শুনতে পেলেই তারা পৃথিবীতে নেমে আসে এবং ওই কথা প্রবেশ করিয়ে দেয় গণকদের অন্তরে। গণকেরা তখন ওই কথার সঙ্গে মিশ্রিত করে অনেক মিথ্যা। তারপর তা প্রচার করে জনসমক্ষে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন উর্ধ্বাকাশে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন ফেরেশতারা বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য সভয়ে সঞ্চালন করতে থাকে তাদের পক্ষ। ফলে সৃষ্টি হয় পাথরের উপরে শিকলের আঘাত করার মতো আওয়াজ। এভাবে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ততা দূর হয়ে গেলে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, বলতো দেখি আমাদের পরম প্রভুপালনকর্তা কী ঘোষণা দান করলেন? অপরজন জবাব দেয়, যা কিছুই ঘোষণা করা হোক না কেনো, তা অবশ্যই সত্য, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদায়িত। তাদের ওই আলাপচারিতার দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকে শয়তান। তারপর তা বলে দেয় তাদের ভক্তকুল জ্যোতিষগোষ্ঠীকে। তারা ওই আলাপচারিতা শোনে একে অপরের কাঁধে সওয়ার হয়ে। এভাবে সকলের উপরের শয়তান থেকে একে একে তাদের সংবাদ নেমে আসে পৃথিবীতে। কখনো কখনো আবার তাদের সংবাদের এমতো ক্রমঅবতরণ নির্বিঘ্ন হয় না। হঠাৎ তারকার জ্বলন্ত কোনো অংশ নিক্ষিপ্ত হয় তাদের দিকে। ফলে তারা সকলে হয়ে যায় ভস্মীভূত। কখনো আবার ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগেই সর্বনিম্নস্থিত শয়তানের মাধ্যমে সংবাদটি পৌঁছে যায় গণকদের কাছে। তারা তখন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে করে ভবিষ্যদ্বাণী। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী সাহাবী বলেছেন, এক রাতে আমরা উপবিষ্ট ছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। হঠাৎ অতিউজ্জ্বল হয়ে খসে পড়লো আকাশের একটি তারা। তিনি স. বললেন, মূর্খতার যুগে এরকম তারা খসে পড়া সম্পর্কে তোমরা কি কিছু জানতে? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই এবিষয়ে উত্তমরূপে অবহিত। আমরা তখন বলতাম, আজ রাতে একজন মন্দ লোকের জন্ম হলো। তিনি স. বললেন, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে নক্ষত্রপতনের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এরকম— আমাদের

মহাসৃজয়িতা ও মহামর্যাদাময় প্রভুপালনকর্তা যখন উর্ধ্বাকাশে কোনো সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, তখন সেখানকার ফেরেশতামণ্ডলী মুখর হয় তাঁর সপ্রশংস মহিমা স্মরণে। তারপর আরশবাহী ফেরেশতাদেরকে তারা বলে, আমাদের প্রভুপালনকর্তা তাঁর কী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন? আরশবাহীরা তখন সদ্যঘোষিত সিদ্ধান্তের কথা জানায়। ওই সংবাদ ক্রমান্বয়ে ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পৃথিবীর নিকটতম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে। শয়তান তখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে সে কথা শুনে নেয় এবং পৃথিবীতে এসে প্রচার করে তাদের বশংবদ গণকদের কাছে। গণকেরা তখন তা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে প্রচার করে জনসমক্ষে। তাই তাদের কিছু কিছু কথা বাস্তবে ফলে যায়। মুসলিম।

শয়তানের এমতো কার্যকলাপের কথাই উল্লেখিত হয়েছে শেষোক্ত আয়াতে এভাবে— 'তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী'।

আওফীর সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর যুগে দু'জন কবি পালা করে পরস্পর বিরোধী সমালোচনার কাব্যের আসর করতো। একজন ছিলো আনসারগণের মধ্য হতে, আরেকজন ছিলো ভিন্ন গোত্রের। আরো কিছুলোক ছিলো তাদের সহায়ক। কবিরা মুখস্থ বলতো ও তাদের সাথে জারী ধরতো অন্যান্যরা। তাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সূরা শুআরা ঃ আয়াত ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

❒ এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা, যাহারা বিভ্রান্ত।

❒ তুমি কি দেখ না উহারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করিয়া থাকে?

❒ এবং যাহা বলে, তাহা করে না।

❒ তবে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্‌কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে উহাদিগের গন্তব্যস্থল কোথায়?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াশ্শুআ'রাউ ইয়াত্তাবিউ'হুমুল গউন' (এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত)। একথার অর্থ— বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসারী। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন জুহাক সূত্রে ইমাম বাগবী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতেম এবং ইকরামা সূত্রেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'শুআরা' বলে ওই সকল কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসুল স. এর শত্রুকুলের সাহায্যার্থে তাদের কবিতায় তাঁর দুর্নাম রটনা করতো। মুকাতিল বলেছেন, ওই সকল কবিদের মধ্যে ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের সাহমী, হুবাইরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব মাখজুমী, শফি ইবনে আবদে মান্নাফ, আবু উয্যা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মাহ্জহী এবং উমাইয়া ইবনে সলত সাকাফী। এরা বলতো, মোহাম্মদ যেভাবে কবিতা রচনা করে, সেভাবে আমরাও পদ রচনা করতে পারি। কোনো কোনো লোক তাদের কবিতা শোনার জন্য তাদের কাছে জড়ো হতো। তাদেরকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'গউন' (বিভ্রান্ত)। তাদের কাব্য আসরের মূল উপজীব্যই ছিলো রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি বিদ্রূপ ও শ্লেষ।

কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'গউন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে শয়তানদেরকে। আর 'হুমুল গউন' একটি পৃথক বাক্য। যার মাধ্যমে অপনোদন করা হয়েছে রসুল স. এর কবি হওয়ার ধারণাকে। পরবর্তী আয়াত পাঠে সেকথাই অনুমিত হয়।

পরের আয়াতে (২২৫) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখনা তারা লক্ষ্যহীনভাবে সর্ববিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে'? এখানকার 'ওয়াদী' হচ্ছে বাক্যালাপের একটি প্রকার, অথবা সকল বিষয়ের অতিরঞ্জিত বিবরণ— যেমন, প্রশংসা-দুর্ণাম, অহমিকা-বিনয়, ভালোবাসা-ঘৃণা ইত্যাদির অতিরঞ্জন। আরববাসীরা যেমন বলে 'আনা ফী ওয়াদীন ওয়া আনতা ফী ওয়াদীন' (আমি এক উপত্যকায়, আর তুমি অন্য উপত্যকায়)। অর্থাৎ আমি বলি একরকম, আর তুমি বলো অন্য কিছু।

'ইয়াহীমুন' অর্থ কল্পনাবিহার। এর শাব্দিক অর্থ নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যের সীমানায় যথেচ্ছ পরিভ্রমণকারী। উল্লেখ্য, ওই সকল কবি সত্যমিথ্যার পার্থক্যরেখা মানতো না। তাদের রচিত পঙক্তিগুলো ছিলো কল্পনাবিহারের লাগামহীন প্রতিভাস।

কাতাদা বলেছেন, কবিরা যেমন মিথ্যা প্রশংসা করে থাকে, তেমনি রচনা করে ভিত্তিহীন অপযশ। কেউ কেউ 'সর্ব বিষয়ে কল্পনা-বিহার করে থাকে' কথাটির অর্থ করেছেন— তারা প্রতিটি বক্তব্য প্রকাশ করে ছন্দবদ্ধভাবে, যুগ্মপঙক্তি সহযোগে।

এরপরের আয়াতে (২২৬) বলা হয়েছে— 'এবং যা বলে তা করে না'। একথার অর্থ— তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে অনেক মিথ্যা কথা বলে, যা বাস্তবকর্মসম্মত নয়।

কোরআন অবশ্যই মোজেজা। এই মোজেজার দিক রয়েছে দু'টি— একটি বিবরণগত, আর একটি অর্থগত। ওই সকল কবি বলতো, কোরআন অবতীর্ণ করে শয়তান। আর এর ভাষাশৈলীর নির্মাতা মোহাম্মদ। আর আমরাও তো কাব্যনির্মাণকৌশল জানি। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে এই সুরায় পৃথক করে দেয়া হয়েছে গণকের গণনা এবং কবিদের কবিত্ব থেকে মোহাম্মদ স. এর নবুয়তকে। ইতোপূর্বে গণকদেরকে বলা হয়েছে মিথ্যাবাদী ও পাপী (আয়াত ২২১, ২২২)। আর আলোচ্য আয়াতে কবিদের সম্পর্কে বলা হলো— তারা যা বলে তা করে না। অর্থাৎ তারাও সর্ববিষয়ে কল্পনাবিহারী মিথ্যাবাদী। আর প্রিয়তম রসুল স. অপর কল্পনা অভিসারী কবিদের থেকে অনেক অনেক উর্ধে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কবিতা দ্বারা উদরপূর্তি করা অপেক্ষা রক্ত ও পুঁজ দ্বারা উদরপূর্তি করা উত্তম। বোখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, আমরা একবার রসুল স. এর সঙ্গে পার্বত্যপথ অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় দেখা গেলো এক বাউণ্ডলে কবি তার কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছে। রসুল স. বললেন, শয়তানটাকে ধরে নিয়ে এসো (উচিত শিক্ষা দেই)। তারপর বললেন, কবিতা দ্বারা পেট ভরানো অপেক্ষা রক্ত-পুঁজ দ্বারা পেট ভরানো ভালো।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, রসুল স. একবার বললেন, কথায় অতিশয়োক্তি যারা করে, তারা ধ্বংস হয়েছে। একথা তিনি স. উচ্চারণ করলেন তিনবার।

হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং আখেরাতে সর্বাধিক নৈকট্যভাজন ওই ব্যক্তি, যার স্বভাব-চরিত্র নির্মল। আর আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ও পরকালে আমার সবচেয়ে দূরবর্তী সে, যার স্বভাব-চরিত্র অসুন্দর, যে রচনা করে অশ্লীল বাক্যাবলী, যে বাচাল এবং যে তার বক্তব্যকে করে অতিরঞ্জিত। আমি বলি, কবিরাই সাধারণতঃ এসকল দোষে দোষী। তিরমিজি। হজরত জাবের থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, একবার সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো বাক্যবাগীশ ও অতিরঞ্জনকারীদেরকে জানি, কিন্তু 'মুতাফাইহিক্বুন্' আবার কারা? তিনি স. বললেন, অহংকারীরা।

হজরত আনাস বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, মে'রাজ রজনীর রহস্যময় পরিভ্রমণকালে আমি একস্থানে দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোকের ওষ্ঠকর্তন করা হচ্ছে আগুনের কাঁচি দিয়ে। ভ্রমণসহচরকে বললাম, ভ্রাতা জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল বললেন, আপনার উম্মতের ওই সকল ওয়ায়েজীন, যারা তাদের বক্তৃতায় মানুষকে সদুপদেশ দেয়, কিন্তু নিজে তা পালন করে না। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর।

ওরওয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যখন আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথম তিনটি আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বললেন, আল্লাহ্ ভালো জানেন, আমিও তো কবি (তবে আমার পরিণতি কী হবে?) তাঁর একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরার শেষ পর্যন্ত।

আবুল হাসান সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা লক্ষহীনভাবে সর্ববিষয়ে কল্পনা বিহার করে থাকে এবং যা বলে তা করে না' তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা, হজরত কা'ব ইবনে মালেক এবং হজরত হাস্সান ইবনে সাবেত রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্পাক তো জানেন, আমরা কবি। তাহলে যে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার সর্বশেষ আয়াত (২২৭) এভাবে— 'তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে, সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়'?

'জাকারুল্লহা কাছীরা' অর্থ আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে। অর্থাৎ যাদের কবিতা রচনা ও আবৃত্তি আল্লাহ্র অধিক স্মরণের অন্তরায় নয়। বরং তাদের কবিতায় পুনঃপুনঃ প্রতিভাত হয় আল্লাহ্র স্মরণ, ভালোবাসা, মহিমা, প্রশংসা ও ইবাদতের প্রতি প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা। আবু ইয়াযিদ বলেছেন, আল্লাহ্র নামের সংখ্যাগত উচ্চারণের নাম বার বার স্মরণ করা নয়। বার বার স্মরণ অর্থ হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্মরণমগ্নতা।

'অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে' কথাটির অর্থ— যারা অবিশ্বাসী কবিদের কবিতায় উল্লেখিত ও উচ্চারিত ইসলাম ও মুসলমানবিদ্বেষী বক্তব্য দ্বারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং এমতো অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে নতুন নতুন উৎকৃষ্ট পঙক্তিমালা রচনা করে।

বাগবী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' ও 'মুয়া'লিম' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আল্লাহ্পাক তো কবিদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এখন তবে আমি ও আমার মতো কবিদের উপায় কী? তিনি স. বললেন বিশ্বাসীরা যেমন তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি যুদ্ধ করে রসনা দ্বারাও। যার অধিকারে আমার জীবন সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! তোমাদের কথার তীর, ধনুক থেকে সুতীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপের মতো।

আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত কা'ব ইবনে মালেক একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কবিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারি কি? তিনি স.বললেন, বিশ্বাসীরা জেহাদ করে অস্ত্র ও কথা উভয়ের সাহায্যে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বর্ণনা করেন, ওমরার কাজা আদায়ের নিমিত্তে যখন রসুল স. মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ইবনে রওয়াহা পথ চলছিলেন তাঁর সম্মুখবর্তী সতর্ককারীরূপে। তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন ধ্বনিত হচ্ছিলো কবিতার কতিপয় পঙক্তি। রসুল স. সঙ্গী ওমরকে কিঞ্চিত উত্তেজিত হতে দেখে বললেন, ওমর! ওকে কবিতা পাঠ করতে দাও। দেখেছো. পঙক্তিগুলো বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কীরকম সুতীক্ষ্ণ, শানিত তীরের চেয়েও ধারালো।

হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, বনী কুরায়জার সঙ্গে যুদ্ধের দিবসে রসুল স. হজরত হাস্সানকে লক্ষ্য করে বললেন, কবিতায় অবিশ্বাসীদের অখ্যাতি বর্ণনা করো, জিবরাইল আমীন তোমার সঙ্গী। তিনি স. তখন তাঁকে একথাও বলেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে তাদের কুৎসার জবাব দাও। হে আল্লাহ্! রুহুল কুদুস দ্বারা হাস্সানকে সাহায্য করো।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. আমাকে বললেন, অংশীবাদী কুরায়েশদের নিন্দা করতে থাকো। তোমার এমতো বচন তাদের কাছে হবে তীরবিদ্ধ হওয়ার চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. হাস্সানকে বলেছেন, যখন তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত থাকবে তখন রুহুল কুদুস হবে তোমার সঙ্গী ও সহায়ক। তিনি আরো বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাস্সান সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কুৎসা প্রচার করেছে, সুতরাং সে পরিবেশন করেছে নিরাময়ক।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বর্ণনা করেন, রসুল স. হাস্সানের জন্য মসজিদে একটি আলাদা মিম্বর রেখে দিতেন। ওই মিম্বরে উঠে হাস্সান আবৃত্তি করতেন রসুল স. এর মাহাত্ম্য এবং তাঁর শত্রুদের অপযশমূলক কবিতা।

রসুল স. তাঁর সম্পর্কে বলতেন, আল্লাহ্ রুহুল কুদুসের মাধ্যমে হাস্সানকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে রসুল স. এর পক্ষ হয়ে বাক্যবান ছুঁড়তে থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি।

জননী আয়েশা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কাফের কুরায়েশদের দুর্নাম বর্ণনা করো। ওই দুর্নাম হবে তাদের জন্য শরাঘাত অপেক্ষা অধিক অসহনীয়। তারপর তিনি ইবনে রওয়াহাকে ডেকে এনে বললেন, কাফেরদের নিন্দাবাদসম্বলিত কবিতা রচনা করো এবং তা প্রচার করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর রচনা রসুল স. এর তেমন মনোপুত হলো না। তাই তিনি ডেকে আনলেন কা'ব ইবনে মালেককে। তারপর হাস্সান ইবনে সাবেতকে। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসময় সমুপস্থিত। তুমি ওই অরিকুলের প্রতি শরনিক্ষেপ শুরু করো, যারা তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে। হাস্সান তাঁর রসনা মুখ থেকে বের করলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যিনি আপনাকে সত্যপয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছেন, সেই পবিত্রতম সত্তার শপথ! আমি আমার রসনা দ্বারা তাদেরকে চামড়া ছিলার মতো করে ছিলবো। রসুল স. বললেন, ব্যস্তসমস্ত হয়ো না। আবু বকর কুরায়েশদের বংশপ্রবাহ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত। আমার বংশ কুরায়েশদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে আবু বকর জানেন, কীভাবে আমি তাদের বংশ থেকে পৃথক। হাস্সান তৎক্ষণাৎ গেলেন আমার পিতার কাছে। তাঁর কাছ থেকে সবকিছু শুনে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আবু বকর আপনার বংশ কীভাবে পৃথক হয়েছে তা আমাকে বলেছেন। আপনাকে যিনি সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, সেই মহিমময় সত্তার কসম! আমি তাদের বংশবন্ধন থেকে আপনাকে অবশ্যই পৃথকরূপে প্রতিভাসিত করবো যেমন করে মন্থন করা আটা থেকে পৃথক করা হয় কেশ। এরপর হাস্সান রচনা করলেন—

হাজ্বাওতা মুহাম্মাদান ফাআজ্বাবতু আনহু— ওয়া ইনদাল্লহি ফী জাকাল জ্বাযাউ।

অর্থঃ তুমি মোহাম্মদের অখ্যাতি রচনা করেছো, আমি দিচ্ছি তার জবাব। আমি জানি, এর জন্য আল্লাহ্র নিকটে জমা রয়েছে আমার পুরস্কার।

হাজ্বাওতা মুহাম্মাদান আবাররান তাক্বিয়ান— রসুলুল্লহিশীমা তুহুল ওয়াফা।

অর্থঃ কোন সাহসে তুমি পুতপবিত্র মোহাম্মদের দুর্নাম করছো? তুমি কি জানো না যে তিনি আল্লাহ্র সত্য রসুল, সতত সত্যাধিষ্ঠিত ও সৎচরিত্র? তিনি যে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

ফা ইন্‌না আবী ওয়া ওয়ালাদাতী ওয়া ইরদ্বি— লি ইরদ্বি মুহাম্মাদিন মিনকুম ওয়াক্বাউ

অর্থঃ আমার মাতাপিতা ও আমি আজ মোহাম্মদের কারণেই সম্মানার্হ। সুতরাং তাঁর সম্মানকে চিরভাস্বর করবার জন্য আমরা তাঁরই জন্য উৎসর্গীকৃত।

আমাঁই ইয়াহ্‌জুরু রসুলূল্লহি মিনকুম— ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়া।

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা এই রসুলের কুৎসা গায় এবং বর্ণনা করে তাঁর মহিমা, তারা কি কখনো সমান?

ওয়া জিবরীলু ওয়া রসুলুল্লহি ফীনা— ওয়া রুহুল কুদুসু লাইসা লাহু কাফাউ

অর্থঃ দ্যাখো, আল্লাহ্‌র মহান রসুল এবং মহান জিবরাইল আমীন আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, তোমরা কেউই তাঁদের সমকক্ষ নও।

ইবনে সিরীনের একটি অপরিণত বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার হজরত কা'ব ইবনে মালেককে ডেকে বললেন, শুরু করো তোমার কবিতা। হজরত কা'ব তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। রসুল স. প্রীত হয়ে বললেন, এগুলো তো কুরায়েশদের কাছে শরবিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

জ্ঞাতব্য ঃ উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা ও অশ্লীলতামুক্ত কবিতা পাঠ সিদ্ধ। জননী আয়েশা থেকে দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এটাও এক প্রকার কথা, যা হতে পারে ভালো-মন্দ দু'টোই। সুতরাং তোমরা উত্তমকে গ্রহণ করো এবং পরিহার করো অনুত্তমকে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম পঙক্তি রচয়িতা কবি লবীদ। ওই পঙক্তিটি হচ্ছে— 'আলা কুললি শাইয়িন মা খলাল্‌লাহু বাতিলুন' (ভালো করে শোনো হে মানুষ! আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলকিছুই অস্তিত্বহীন)। বোখারী, মুসলিম।

আমর ইবনে শাদীদ বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, একদিন আমি রসুল স. এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম একই বাহনে। তিনি স. বললেন, উমাইয়া ইবনে সলতের কোনো কবিতা কি তোমার মুখস্থ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আবৃত্তি করো। আমি উমাইয়ার একটি কবিতা শোনালাম। তিনি স. বললেন, আর একটি শোনাও। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। তিনি স. বললেন, আরো। এভাবে তাঁর নির্দেশে আমি আবৃত্তি করলাম একশতটি কবিতা। মুসলিম।

হজরত জুনদুব বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে জখম হলো রসুল স. এর হাতের একটি আঙুল। ওই রক্তাক্ত আঙুলের দিকে চেয়ে তিনি স. আবৃত্তি করলেন—

হাল আনতি ইল্লা ইসবাহুন দুমিতী ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি মা লাক্বীতী।

অর্থঃ তুমি তো আঘাত পেয়েছো। তুমি তো হাতের একটি আঙুল। স্বীকার করো অনন্য এ সৌভাগ্যকে। এ আঘাত তো আল্লাহ্‌র পথে। বোখারী, মুসলিম।

শা'বীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং হজরত আলী— এই ত্রয়ী খলিফা কবিতা আবৃত্তি করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস স্বয়ং কবিতা আবৃত্তি করতেন মসজিদের মধ্যে। অন্যদেরকেও পাঠ করতে বলতেন। একবার তিনি বিখ্যাত কবি আমর ইবনে রবীকে ডেকে এনে তাঁর কবিতা শুনেছিলেন, যার প্রথম ছত্রটি ছিলো এরকম—

আমানা আল্‌ লুগমা আনতা গদিন্‌ওয়া মুবাক্‌কিরিন— গদাতা গদিন আম রাইহুন্‌ ফামুহাজ্‌জারুন।

এভাবে ইবনে রবীয়া তাঁকে শুনিয়েছিলেন সত্তরটি পদ। আর একবার শুনেই তিনি ওই দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে নিলেন। পাঠ করে শোনালেনও। এমনই অসাধারণ ছিলো তাঁর স্মৃতিশক্তি।

জ্ঞাতব্য : যে কবিতায় আল্লাহ্‌র জিকির, ধর্মীয় জ্ঞান ও মানুষের জন্য সদুপদেশ থাকে, সে কবিতা পাঠ করা ইবাদত।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানগর্ভ। বোখারী।

হজরত সাখার ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে বুরাইদা বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো কোনো বক্তব্য যাদুর মতো ক্রিয়াশীল এবং কোনো কোনো কথা মূর্খজনোচিত। আর কিছু কিছু কবিতা জ্ঞানগর্ভ, আবার কিছু কিছু কথা সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আবু দাউদ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুর মতো প্রভাব বিস্তারক। আর কোনো কোনো কথা মূর্খতামণ্ডিত। কতিপয় কবিতা জ্ঞানের আকর। আর কোনো কোনো বিবরণ সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক। আবু দাউদ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, কোনো কোনো ভাষণ যাদুর মতো প্রভাব রাখে, আর কিছু কিছু কবিতায় রয়েছে জ্ঞানের নির্যাস। আবু দাউদ, আহমদ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, বিশ্বাসীরা যেমন তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করে, তেমনি সংগ্রাম করে কথার দ্বারাও। হজরত আনাস থেকে নাসাঈ ও দারেমী বর্ণনা করেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ ও রসনা দ্বারা অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরো।

উল্লেখ্য, এই শেষোক্ত আয়াতের প্রথমাংশে যেমন মুসলিম কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি শেষ বাক্যে প্রদর্শন করা হয়েছে মুশরিক কবিদের প্রতি

ভীতি। বলা হয়েছে 'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়'? এখানে 'অত্যাচারীরা' অর্থ অংশীবাদীরা, যারা রসুল স. এর কুৎসা রটনা করতো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গন্তব্যস্থল' বলে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামকে।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে সকল অংশীবাদীকে দেয়া হয়েছে কঠিন হুমকি, কেবল কবিদেরকে নয়। অর্থাৎ বলা হয়েছে, তাদের এমতো ভয়ংকর অগ্নিশাস্তি অবধারিত।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমার মহাসম্মানিত জনয়িতা তাঁর অন্তিমকালের অসিয়তনামায় লিখেছিলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই অসিয়তনামা আবু বকর ইবনে আবু কোহাফার, যা তিনি লিপিবদ্ধ করালেন তাঁর অন্তিমকালে। এই সময় এমন এক সময় যখন কাফেরেরাও ইমান আনে, পাপিষ্ঠরা হয়ে যায় পুণ্যবান এবং মিথ্যাবাদীরাও করে সত্যোচ্চারণ। আমি তোমাদের জন্য ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে গেলাম, যদি তিনি সতত ন্যায়নিষ্ঠ থাকেন, তাঁর সম্পর্কে অবশ্য আমি এরকমই সুধারণা পোষণ করি। আর যদি তিনি অত্যাচারী হয়ে যান, তবে আমি হবো অক্ষম পদবাচ্য। কারণ আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই। আমি কেবল উচ্চারণ করতে চাই আল্লাহর এই বাণী 'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়'?

সুরা শুআরার তাফসীর শেষ হলো আজ রজব মাসের ৪ তারিখে, বৃহস্পতিবার, ১২০৫ হিজরী সনে।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ী'ন।

অষ্টম খণ্ড শেষ